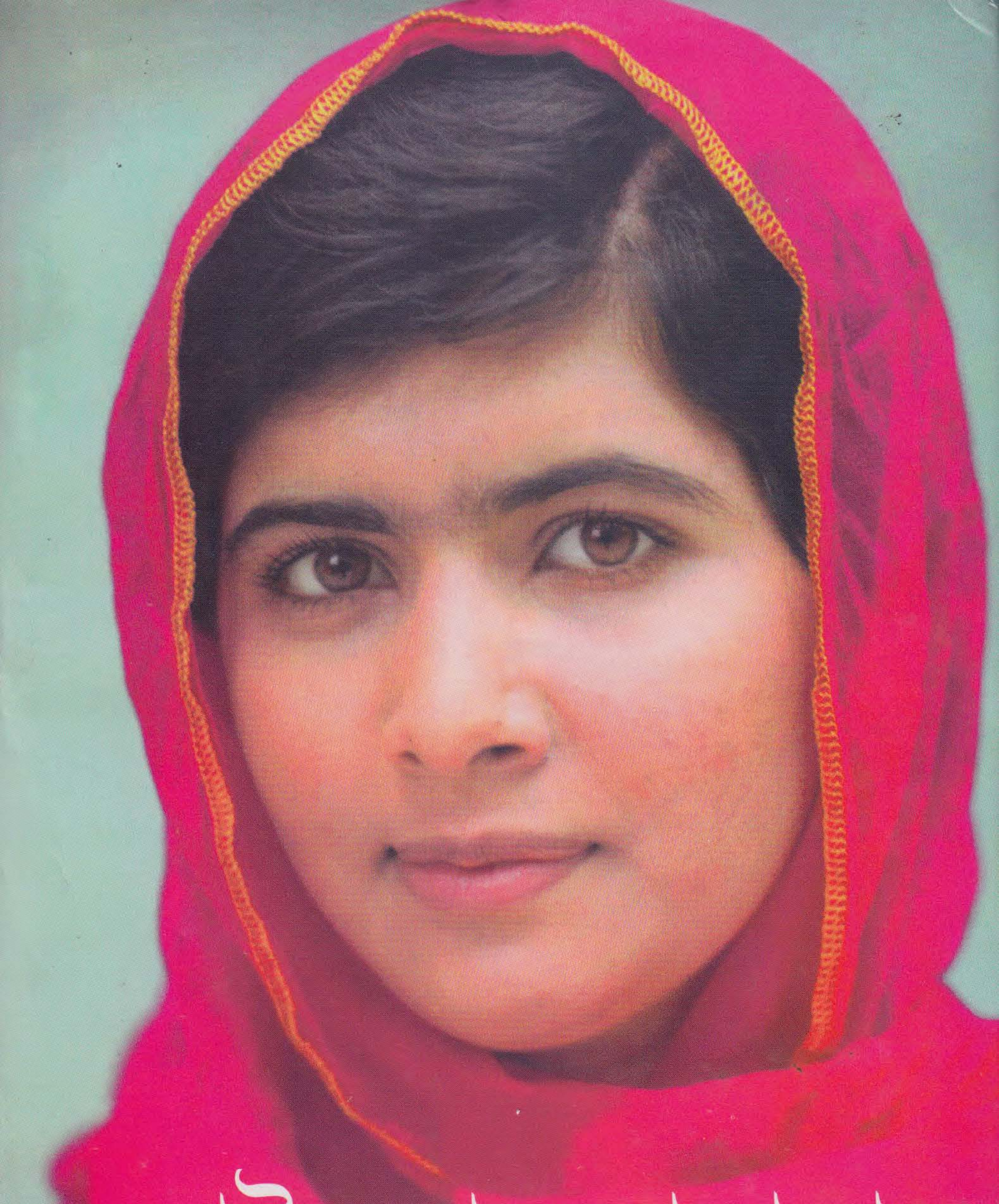

আই অ্যাম মালালা

শিক্ষার পক্ষে দাঁড়াতে গিয়ে যে মেয়েটিকে তালেবানের গুলি খেতে হয়েছে

মালালা ইউসুফজাই

অনুবাদ । সারফুদ্দিন আহমেদ

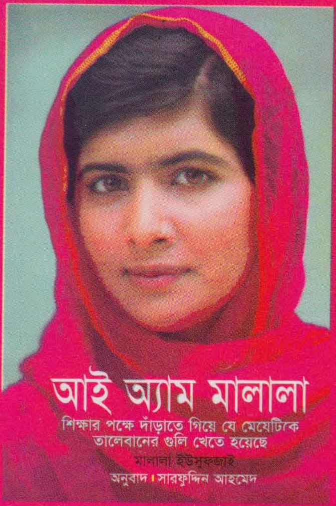

মালালা ইউসুফজাই

পাকিস্তানের সোয়াত উপত্যকায় শিক্ষা প্রসারের একনিষ্ঠ কর্মী। তালেবান প্রভাবিত অঞ্চলে জনজীবন বিষয়ে বিবিসি উর্দু ব্লগে লেখালেখির মাধ্যমে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করে। গুল মাকাই ছদ্মনাম ব্যবহার করে প্রায়ই তুলে ধরত নিজের সম্প্রদায়ে কীভাবে তার পরিবার নারীশিক্ষা প্রসারে সংগ্রাম করছে। ২০১২ সালের অক্টোবরে মালালার ওপর হামলা চালায় তালেবান, বাসে চেপে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে তার মাথায় গুলি করে তারা। অলৌকিকভাবে বেঁচে যায় মালালা। তারপর আবার ফিরে যায় শিক্ষা প্রসারের কাজে। সাহসিকতা ও পরামর্শের স্বীকৃতিস্বরূপ মালালাকে দেওয়া হয় ২০১১ সালে পাকিস্তানের জাতীয় শান্তি পুরস্কার এবং ২০১৩ সালে আন্তর্জাতিক শিশু শান্তি পুরস্কার। এছাড়া শাখারভ শান্তি পুরস্কার ও আরও কয়েকটি পুরস্কার পেয়েছে মালালা। নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত এযাবৎকালের সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তিও সে। টাইম সাময়িকীর বর্ষসেরা ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত তালিকায় তার নাম ছিল। মালালা ফান্ড গঠনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন মালালা।

www.pathagar.com

শিক্ষার পক্ষে দাঁড়াতে গিয়ে যে মেয়েটিকে
তালেবানের গুলি খেতে হয়েছে

আই অ্যাম মালালা

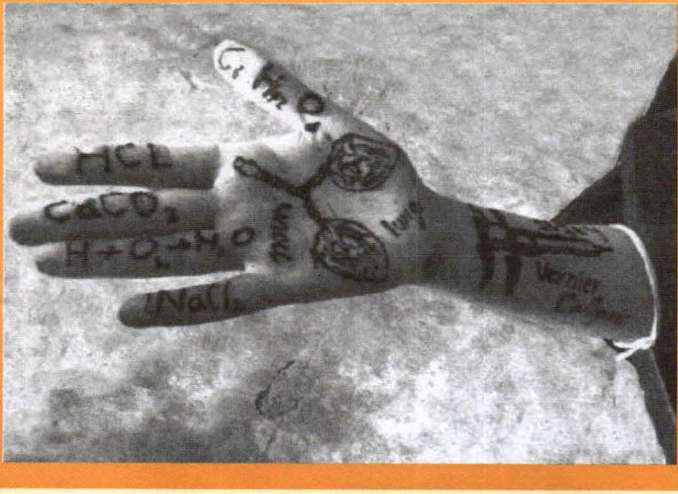

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আই অ্যাম মালালা

শিক্ষার পক্ষে দাঁড়াতে গিয়ে যে মেয়েটিকে তালেবানের গুলি খেতে হয়েছে

মালালা ইউসুফজাই
সাহায্যকারী লেখক : ক্রিস্টিনা ল্যাম্ব

অনুবাদ
সারফুদ্দিন আহমেদ

অন্যধারা
৩৮/২-ক, বাংলাবাজার (৫ম তলা), ঢাকা-১১০০

www.pathagar.com

প্রকাশকাল : ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
মূল © মালালা ইউসুফজাই
বাংলা অনুবাদ © প্রকাশক
প্রকাশকের অনুমতি ছাড়া বাংলাদেশের অন্য কোনো প্রকাশনা সংস্থা অথবা
কোনো ব্যক্তি কর্তৃক এই অনুবাদের কোনো অংশ, কোনো উদ্ধৃতি
কিংবা সমগ্র গ্রন্থটি প্রকাশ আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয়।

প্রকাশক ■ মোঃ মনির হোসেন পিন্টু
অন্যধারা ৩৮/২-ক বাংলাবাজার (৫ম তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৩১৬৬, ০১৭১২৮০৭৯০১
পরিবেশক ■ কৃষ্টি সাহিত্য সংসদ, ৩৮/৪ বাংলাবাজার (৫ম তলা), ঢাকা-১১০০
মিশু প্রকাশন ৩৮/২-ক বাংলাবাজার (৫ম তলা), ঢাকা-১১০০
যুক্তরাজ্য পরিবেশক ■ সংগীতা UK. LTD
22 ব্রিকলেন, লন্ডন
Tel : 0044-2072475954
Fax : 0044-2072475941
প্রচ্ছদ ■ মূল প্রচ্ছদ অবলম্বনে তাহমিদা খাতুন
কম্পোজ ■ বিসমিল্লাহ্ কম্পিউটার্স ৪৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মুদ্রণ ■ আমানত প্রিন্টিং প্রেস, ৩/২, কবিরাজ লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ তিনশ' টাকা

ISBN : 978-984-503-117-2

www.pathagar.com

উ ৎ স র্গ

হাবিবুর রহমান
পুলিশ সুপার, ঢাকা

শ্রদ্ধায়, ভালোবাসায়

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অনুবাদকের কথা

পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সীমান্ত এলাকার একটি ছোট্ট উপত্যকার নাম সোয়াত। নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মোড়ানো এই উপত্যকাকে অনেকে বলেন এশিয়ার সুইজারল্যান্ড। ২০০৮ সালের শেষ দিকে তালেবান আসার আগে প্রতিদিন হাজারো পর্যটকের পদচারণায় মুখরিত হতো সোয়াতের মাটি। এখানকার মানুষ প্রবল ধর্মভীরু হলেও ধর্মান্ধ ও উগ্র নয়। শিশুরা দল বেঁধে স্কুলে যেত। নারীরা বাধাহীনভাবে চলাফেরা করতে পারত। কিন্তু সেখানেই হানা দেয় তালেবান। বহু প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে শত শত স্কুল কলেজ বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হয়। তালেবান মেয়েদের পড়াশুনা নিষিদ্ধ করে। বহু শিক্ষককে হত্যা করে। অনেককে প্রকাশ্যে দোররা মারা হয়।

২০০৯ সালের ১৫ জানুয়ারি সময় বেঁধে দিয়ে তালেবান সোয়াতের সব গার্লস স্কুল বন্ধ করার নির্দেশ দেয়। এই সময় প্রাণভয়ে বেশিরভাগ মানুষ মুখ বুজে ছিল। তবু যে কয়জন সাহসী মানুষ তালেবানের বিরুদ্ধে উচ্চকিত হয়ে উঠেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সোয়াতের প্রধান শহর মিঙ্গোরার শিক্ষক নেতা ও পরিবেশবাদী আন্দোলনকর্মী জিয়াউদ্দিন ইউসুফজাই। পাশে ছিল তাঁর শিশুকন্যা মালালা ইউসুফজাই। এই শিশুটিই আন্দোলনের অগ্রযাত্রায় বাবাকে ছাড়িয়ে যায়।

মাত্র ১২ বছর বয়সে বিবিসির উর্দু ব্লগে মেয়েদের শিক্ষার পক্ষে নিয়মিত মতামত লিখে আন্তর্জাতিক নজরে চলে আসে মালালা। ২০০৯ সালের দ্বিতীয়ার্ধে বিবিসি, রয়টার্স, এপি, এএফপিসহ দেশি বিদেশি টেলিভিশনগুলো নিয়মিত তার সাক্ষাৎকার নিতে থাকে। বিভিন্ন সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়ামে ক্ষুরধার বক্তব্য দিয়ে মেয়েদের শিক্ষার পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে থাকে মালালা। পরিনতি হিসেবে এরপর ২০১২ সালের ৯ অক্টোবর তালেবানের বুলেট তার করোটি ভেদ করে যায়। তবু অলৌকিকভাবে বেঁচে যায় এই লড়াকু কিশোরী। তার পরের ঘটনা প্রায় সবার জানা। আর যা কিছু অজানা, সেগুলো উঠে এসেছে এই আত্মজীবনীতে।

www.pathagar.com

সংজ্ঞার দিক থেকে বইটি হয়তো আত্মজীবনীর কাতারে পড়বে। কিন্তু এটি সমাত্মজীবনী। নিজের ছোট্ট জীবনের ঘটনার মধ্য দিয়ে মালালা পুরো সোয়াত উপত্যকার ভূ-প্রকৃতি, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সমাজব্যবস্থা, রাজনীতির যে বিশাল ক্যানভাস ফুটিয়ে তুলেছে তা বিস্ময়কর। মধ্যবিত্ত স্কুল শিক্ষকের মেয়ে হয়ে ঘোর নিরাপত্তাহীনতার মধ্যেও সে তালেবানের মতো দোর্দন্ড প্রতাপশালী শক্তির বিরুদ্ধে যেভাবে উচ্চকিত ছিল তা যে কাউকে হতবাক করে দেবে।

এই বইয়ে পাকিস্তানে ইসলামের নামে তালেবানের যে দুঃশাসন চলেছে তার তীব্র সমালোচনা আছে। আছে তালেবান দমনে প্রশাসন, সেনাবাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার চরম ব্যর্থতার বর্ণনা। হয়তো এ কারণেই পাকিস্তান সরকারও মালালার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। পাকিস্তান সরকার বইটি সেদেশের স্কুল কলেজে নিষিদ্ধ করেছে। অনেকেই বলে থাকেন বর্তমানে যুক্তরাজ্যের বার্মিংহামে অধ্যয়নরত মালালার আর দেশে ফেরা হবে না। কিন্তু মালালার প্রত্যয় সে ফিরবে। আবার শিক্ষাবঞ্চিত মেয়েদের পাশে এসে দাড়াবে। তাদের অধিকার আদায়ের মিছিলে নেতৃত্ব দেবে।

ইতিমধ্যেই শান্তিতে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীতদের তালিকার প্রথম দিকে তার নাম উঠে এসেছে। শাখারভ পুরস্কার ও সিমোন দ্য বেভোঁয়ার পুরস্কারসহ বহু আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি সম্মাননায় ভূষিত হয়েছে সে। তবে এইসব সম্মাননার ভীড়ে নিজের সংগ্রামী চেতনাকে হারিয়ে ফেলেনি সময়ের এই অগ্নিকন্যা। এখনও প্রতিনিয়ত তার সংগ্রাম চলছে।

এই অনুবাদগ্রন্থটিকে মালালার সেই সংগ্রামী চেতনার সঙ্গে আমার একাত্মতা প্রকাশের বহিঃপ্রকাশ বলা যেতে পারে। আমি আমার সর্বোচ্চ শব্দ সক্ষমতা দিয়ে আক্ষরিক অনুবাদে মূল ভাষার প্রতিচ্ছবি অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা করেছি। এ ক্ষেত্রে বন্ধু শাকিল ফারুকের সহযোগিতা কাজটি শেষ করতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এই অনুবাদগ্রন্থের সফলতা-ব্যর্থতা বিচারের দায় পাঠকের ওপর চাপাচ্ছি। সময়ের হাতে ছেড়ে দিচ্ছি।

সারফুদ্দিন আহমেদ
৪৩/১৭, সবুজ কানন,
কমলাপুর, ঢাকা

www.pathagar.com

সূচিপত্র

অধ্যায় এক
তালেবানের আগে

জন্ম হল এক কন্যার	১৯
আমার আব্বা, ক্ষিপ্র বাজপাখি	৩৩
স্কুলে বড় হয়ে ওঠা	৪৫
সেই গ্রামটি	৬২
আমি কেন কানের দুল পরি না এবং পশতুনরা কেন 'থ্যাংক ইউ' বলে না	৭২
আবর্জনার পাহাড়ের শিশুরা	৮২
যে মুফতি আমাদের স্কুল বন্ধ করতে চেয়েছিলেন	৯১
শরৎকালের ভূমিকম্প	১০২

অধ্যায় দুই
মৃত্যু উপত্যকা

রেডিও মোল্লা	১০৯
টফি, টেনিস বল আর সোয়াতের বুদ্ধ	১২০
বুদ্ধিমতিদের ক্লাস	১৩০
রক্তাক্ত চত্বর	১৪১
গুল মাকাইয়ের ডায়েরি	১৪৮
হাস্যকর শান্তিচুক্তি	১৫৯
উপত্যকা ছেড়ে যাওয়া	১৬৯

অধ্যায় তিন
তিনটি মেয়ে, তিনটি গুলি

দুঃখের উপত্যকা	১৮১
বেড়ে ওঠার প্রার্থনাতে	১৯৪
নারী এবং সমুদ্র	২০৫
ব্যক্তিগত তালেবানিকরণ	২১২
মালালা কে?	২২০

অধ্যায় চার
জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে

'আল্লাহ, আমি ওকে তোমার হাতে সঁপে দিলাম'	২২৭
অজানার উদ্দেশে যাত্রা	২৩৯

অধ্যায় পাঁচ
দ্বিতীয় জীবন

'বালিকাটির মাথায় গুলিবিদ্ধ, বার্মিংহাম'	২৪৯
'তারা তার হাসি ছিনিয়ে নিয়েছিল'	২৬২
অন্তিমকথন	
একটি শিশু, একজন শিক্ষক, একটি বই, একটি কলম...	২৭১

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আঁতুড়কথন: আমার পৃথিবী বদলে দিল যে দিনটা

আমি যে দেশ থেকে এসেছি সেই রাষ্ট্রটির জন্ম হয়েছিল মধ্যরাতে। আর যে মুহূর্তে আমি প্রায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলাম তখন সময়টা ছিল মধ্যদুপুরের ঠিক পরপরই।

এক বছর আগে আমি স্কুলে যাওয়ার জন্য বাসা থেকে বের হয়েছিলাম। তারপর আর বাড়ি ফেরা হয়নি। তালেবানের ছোড়া একটি বুলেট আমাকে বিদ্ধ করলো; বুলেটটি আমাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পাকিস্তানের বাইরে উড়িয়ে আনলো। অনেকে বলেন, আমি আর দেশে ফিরবো না। কিন্তু আমার অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস আমি ফিরবোই ফিরবো। প্রিয় মাতৃভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার মতো বেদনাসিক্ত স্বাদ কেউই গ্রহণ করতে চায় না।

এখন প্রতিদিন ভোরে যখন ঘুম থেকে জাগি; চোখ মেলে তাকাই; তখন আমার দৃষ্টি আকুল আকাঙ্ক্ষায় খুঁজে ফেরে নিজের জিনিসপত্রে ঠাসা সেই পুরনো ঘরটি যার মেঝে জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতো আমার জামাকাপড়, শেলফে সাজানো স্কুলপ্রাইজ। কিন্তু আমি আমার প্রাণপ্রিয় দেশ পাকিস্তান, অতিপ্রিয় জন্মস্থান সোয়াত উপত্যকা থেকে পাঁচ ঘন্টা পিছিয়ে থাকা একটি দেশে পড়ে আছি। সময়ের হিসেবে এই দেশটি পাঁচ ঘন্টা পিছিয়ে থাকলেও আমার দেশ পাকিস্তান এই দেশটি থেকে কয়েকশ বছর পিছিয়ে আছে। আপনার কল্পনাসাধ্য সব নাগরিক সুবিধাই এখানে রয়েছে। প্রত্যেক টিপকলেই আপনি গরম বা ঠান্ডা পানি যেটি চান সেটি পাবেন। কেরোসিনের কুপির দরকার নেই, দিন-রাত যখন খুশি তখনই সুইচ চাপলে আলো মিলবে। বাজারে গিয়ে গ্যাসভর্তি সিলিন্ডার কিনে আনার দরকার নেই, স্বয়ংক্রিয় ওভেনে রান্না করতে পারবেন। এখানকার সবকিছুই এত আধুনিক যে, যে কেউ চাইলে ঘরে বসেই প্যাকেটে মোড়া রান্না করা খাবার পেতে পারেন।

জানালার সামনে দাঁড়িয়ে যখন বাইরে তাকাই তখন দেখি উঁচু উঁচু ভবনগুলো কেমন একরোখাভাবে দাঁড়িয়ে আছে। লম্বা রাস্তা জুড়ে শৃঙ্খলা মেনে সারি সারি গাড়ি চলে যাচ্ছে। নিচে সবুজ বাগান ও লন। হাঁটার জন্য পরিপাটি ফুটপাত। এসব দেখতে দেখতে আমি চোখ বুজি। মুহূর্তেই আমি চলে যাই আমার ফেলে আসা উপত্যকায়– দেখতে পাই তুষারে ঢাকা পাহাড় চূড়া, সবুজ ফসলের মাঠে বাতাসের ঢেউ খেলানো, তরতাজা স্বচ্ছতোয়া নীলাভ নদী। আমার হৃদয় খুশিতে ঝলমল করে ওঠে যখন সোয়াতের পরিচিত মুখগুলো ভেসে ওঠে। আমার মন আমাকে নিয়ে যায় আমার ফেলে আসা স্কুলে। মনে মনে আমি স্কুল বন্ধু আর শিক্ষকদের সঙ্গে পুনর্মিলিত হই। কল্পনায় প্রিয় বান্ধবী মনিবার সঙ্গে আমার দেখা হয়; একসঙ্গে বসে গল্পগুজব-হাসি ঠাট্টায় মেতে উঠি যেন তাদের ছেড়ে আমি অন্য কোথাও কখনও যাইনি।

www.pathagar.com

হঠাৎ সম্বিত ফেরে। টের পাই, আমি এখন ইংল্যান্ডের বার্মিংহামে।

যে তারিখটা আমার সবকিছু ওলটপালট করে দিল, সেই দিনটা ছিল ২০১২ সালের ৯ অক্টোবর, মঙ্গলবার। যেহেতু তখন স্কুল পরীক্ষা চলছিল, সে কারণে ওই দিনগুলোর শুরুটা আমার সবচেয়ে ভালো দিনগুলোর মধ্যে অন্যতম তা বলবো না। অবশ্য অন্য কয়েক সহপাঠীর মতো আমি বইপ্রেমিক ছাত্রী হওয়ায় পরীক্ষাভীতি আমার ছিল না।

ওইদিন সকালে অন্যদিনের মতোই আমরা হাজী বাবা রোডের উল্টোদিকের সরু ও কর্দমাক্ত মেঠো রাস্তায় যেখানে রংবেরংয়ের ডিজেলচালিত রিকশা মিছিলের মতো এসে জড়ো হয় সেখানে এসে পৌঁছলাম। ভটরভটর শব্দ করে ডিজেল পোড়া কালো ধোঁয়ার কুন্ডলী ছিটিয়ে জীবন অতিষ্ঠ করা এই পরিচিত বাহনের একেকটিতে পাঁচ ছয়জন ছাত্রী গাদাগাদি করে বসতে পারে। তালেবান যখন ক্ষমতাসীন তখন থেকেই আমাদের স্কুলে এর (তালেবান শাসনের) কোনো চিহ্ন ছিল না। সাদা দেওয়াল ঘেরা স্কুলটির পিতলের নকশা করা প্রধান ফটকের বাইরে কী ঘটছে তার কোনো আঁচও আমরা স্কুল চত্বরের ভেতরে টের পাইনি।

আমাদের মেয়েদের কাছে স্কুলের প্রধান ফটকটি ছিল আমাদের নিজস্ব ভূবনে প্রবেশ করার এক জাদুর গেটের মতো। সূর্যের আলোর পথ করে দিতে প্রমত্ত বাতাস যেভাবে মেঘরাশিকে এক ঝটকায় উড়িয়ে সরিয়ে দেয়, ফটকটি পার হয়ে ভেতরে ঢোকার পর ঠিক সেভাবেই আমরা মুক্তির আনন্দে মাথার স্কার্ফ খুলে বাতাসে উড়িয়ে এলোপাতাড়ি দৌড় দিতাম। মূল ফটক পার হয়ে একটু দূরে টিলার মতো উঁচু স্থানে মূল ভবন। সিঁড়ি বেয়ে সেখানে উঠতে হয়। মূল ফটক পার হয়ে এক ছুটে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতাম। সিঁড়ির শেষ মাথায় উঠলে ভবন লাগোয়া উন্মুক্ত আঙিনা। আঙিনা পার হলেই বিভিন্ন ক্লাসরুমের দরজা। আমরা প্রথমে ক্লাসরুমে যার যার স্কুলব্যাগ রেখে এসে আঙিনায় জড়ো হতাম। প্রাত্যহিক প্রভাতী সমাবেশ শুরু হলে পেছনে পাহাড় আর মাথার ওপরে খোলা আকাশ নিয়ে লাইন ধরে দাড়াতাম। আমাদের দলনেত্রী কমান্ড করতো, 'আসান বাশ!' বা 'আরামে দাড়াও!'। জবাবে আমরা মাটিতে সজোরে পদাঘাত করে বলতাম 'আল্লাহ!'। তখন দলনেত্রী বলতো, 'হু ..শি..য়া..র!' বা 'সাবধান!' জবাবে আবার আমরা পদাঘাত করে বলতাম 'আল্লাহ!'

আমার জন্মের আগে আমার আব্বা স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন। ভবনের দেওয়ালের ওপরে লাল ও সাদা রংয়ে বড় করে লেখা 'খুশাল স্কুল'। সপ্তাহের ছয়টি ভোরেই আমাদের স্কুলে যেতে হয়েছে। আমার ১৫ বছরের জীবনের ৯ টি বছরই কেটেছে ক্লাসরুমে উচ্চস্বরে রসায়নের নামতা পড়ে বা উর্দু ব্যকরণ পাঠ করে; ইংরেজিতে 'হেস্ট মেকস ওয়েস্ট' ধরণের শিরোনামের নীতিকথা নির্ভর গল্প লিখে; কিংবা ব্ল্যাকবোর্ডে রক্তসঞ্চালনের ডায়াগ্রাম এঁকে। আমার বেশিরভাগ সহপাঠীই চিকিৎসক হতে চেয়েছে। এইরকম পরিবেশ ও কোমলমতি মেয়েদের পড়াশুনার আগ্রহ ও স্পৃহাকে কেউ হুমকি মনে করতে পারে এটা যে কারুর পক্ষেই কল্পনা করা কষ্টকর। তথাপি, স্কুল গেটের বাইরে

www.pathagar.com

শুধু যে মিঙ্গোরার (সোয়াতের প্রধান শহর) হই-হট্টগোল ও উশৃঙ্খলা ছিল তাই নয়, তালেবানের মতো এমন কিছু লোকও ছিল যারা মনে করেন মেয়েদের স্কুলে যাওয়া একেবারেই ঠিক নয়।

সামান্য একটু দেরিতে ওঠা ছাড়া ওইদিনের সকালের শুরুটা অন্যদিনের মতোই ছিল। পরীক্ষা চলছিল বলে সকাল আটটার বদলে সকাল নয়টায় শুরু হচ্ছিল স্কুল। অতি ভোরে ওঠা আমার বরাবরই অপছন্দের। মোরগের বাগ আর ফজরের আজানের মধ্যেও ওই কয়েকটা দিন ঘুমাতে পারছিলাম বলে এক ঘন্টা বিলম্বে স্কুল শুরু হওয়াটা আমার জন্য ভালো ছিল। সোয়াতের দিনগুলোতে ভোরে আমাকে জাগানোর প্রথম চেষ্টা করতেন আব্বা। আব্বা এসে বলতেন, 'সময় হয়ে গেছে, উঠে পড় জানি মান।' ফারসি শব্দ 'জানি মান' মানে 'আত্মার বন্ধু'। প্রতিটি দিনের শুরুতে আব্বা আমাকে এইভাবে সম্বোধন করে ঘুম থেকে উঠানোর চেষ্টা করেন। 'আর কয়েক মিনিট আব্বা, প্লিজ'– আমি চোখ বন্ধ করে বলি। পরমুহূর্তে আবার ঘুমিয়ে পড়ি। আব্বা চলে যাওয়ার পর আসেন আম্মা। জোর গলায় ডাক দেন 'পিশো!' 'পিশো' মানে বিড়াল। আম্মা আদর করে আমাকে মাঝে মাঝে পিশো বলে ডাকেন। আম্মা ডাক দেওয়ার পরই বুঝি সময় শেষ। এবার উঠতে হবে। আমি ধড়ফড় করে উঠে চেঁচিয়ে বলি, 'ভাবি, আমার তো দেরি হয়ে গেল!' আমাদের সংস্কৃতিতে সব পুরুষই আপনার 'ভাই', সব মেয়েই আপনার 'বোন'। মানে এভাবেই আমরা পরস্পরকে মনে করি। আব্বা যেদিন প্রথম আম্মাকে স্কুলে নিয়ে গিয়েছিলেন সেদিন আব্বার সব সহকর্মী আম্মাকে 'ভাবি' ডেকেছিল। তখন থেকে আম্মার নাম সবার কাছে 'ভাবি' হয়ে গেছে। আমিও মাঝে মাঝে তাঁকে 'ভাবি' বলে ডাকি।

সোয়াতে যে বাড়িতে আমরা থাকতাম, সেই ঘরের লম্বা একটা রুমে আমি ঘুমাতাম। আমার রুমে আসবাবপত্র বলতে ছিল একটা খাট আর একটা আলমারি। আমাদের উপত্যকায় শান্তি প্রতিষ্ঠা ও মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার অধিকার নিয়ে আন্দোলন করার জন্য পুরস্কার হিসেবে যে অর্থ পেয়েছিলাম তার থেকে কিছু দিয়ে আলমারিটা কিনেছিলাম। স্কুল পরীক্ষায় প্রথম হওয়ায় পুরস্কার হিসেবে সোনালী রঙের প্লাস্টিকের কাপ ও ট্রফি পেয়েছিলাম। আলমারির কয়েকটা তাকে সেগুলো সাজানো ছিল। স্কুল পরীক্ষায় মাত্র দুইবার আমি প্রথম হতে পারিনি। দুইবারই আমাকে পেছনে ফেলে প্রথম হয়েছে আমার সহপাঠী মালকা-ই-নূর। মনে মনে সংকল্প করেছিলাম এমনটি আর হতে দেবো না।

বাসা থেকে আমার স্কুলের দূরত্ব খুব বেশি না। বাড়ি থেকে স্কুলে হেঁটেই যাওয়া আসা করতাম। তবে গত বছরের শুরুর দিকে আমি অন্য মেয়েদের সঙ্গে ডিজেলচালিত রিকশায় স্কুলে যেতাম। আসতাম বাসে চড়ে। একটা নোংরা পুঁতিগন্ধময় খালের পাশ দিয়ে, ড. হুমায়ূন'স হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট ইনস্টিটিউটের (আমাদের এক টেকো শিক্ষকের মাথায় হঠাৎ ঘন চুল দেখে সবাই তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করতাম। সবাই বলেছিলাম, স্যার নিশ্চয়ই ড. হুমায়ূন'স থেকে টাকে চুল রুয়ে এনেছেন) বিশাল বিলবোর্ডের নিচ দিয়ে যেতে বা আসতে মিনিট পাঁচেক সময় লাগতো। হেঁটে আসলে যেরকম ঘেমে যেতে হয়, বাসে উঠলে ততটা ঘামতে হয় না। পরন্তু বান্ধবীদের সঙ্গে গল্পসল্প করতে করতে আসা

www.pathagar.com

যায়। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো বাসের ড্রাইভার ওসমান আলির (তাঁকে আমরা সবাই 'ভাইজান' বলে ডাকতাম) মজার মজার উদ্ভট ও পাগলামি ভরা গল্প শোনা যায়। এসব কারণে আসার সময় রিকশার বদলে বাসেই আসতাম।

একা একা হেঁটে বাড়ি আসায় আম্মা ভয়ে ভয়ে থাকতেন, এ কারণেই আমি মূলত বাসে চড়া শুরু করি। আমাদের সারা বছর ধরেই হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। কিছু হুমকি আসতো খবরের কাগজে। অনেক সময় লোকজনের কাছে ফেলে যাওয়া চিরকুটেও স্কুলগামী ছাত্রীদের হুমকি দেওয়া হত। তালেবান মেয়েদের ওপর কখনো হামলা না চালালেও আম্মা আমাকে নিয়েই বেশি চিন্তিত ছিলেন। তবে আমার চিন্তা ছিল আব্বা যেহেতু সব সময় তালেবানের বিরুদ্ধে কথা বলেন সেহেতু তাঁর ওপর তারা হামলা চালাতে পারে। গত অক্টোবরে আব্বার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও আন্দোলনের সহযোদ্ধা জাহিদ খানকে নামাজ পড়তে যাওয়ার সময় তাঁর মুখে গুলি করে তাঁকে হত্যা করে তালেবান। ওই ঘটনার পর সবাই আব্বাকে বলছিলেন, 'সাবধানে চলা ফেরা করুন, পরের টার্গেট কিন্তু আপনি।'

আমাদের বাড়ি পর্যন্ত যে রাস্তাটা গেছে সেই রাস্তায় স্কুল বাসটি যেতে পারতো না। সে কারণে বাসায় পৌঁছতে হলে প্রথমে আমাকে বাস থেকে নামতে হতো। বড় রাস্তার ঢাল বেয়ে সরু রাস্তায় নেমে হাঁটতে হতো। কিছুদূর হেঁটে সামনে এগোলে একটা লোহার গেট। সেটা পার হয়ে টিলার মতো উঁচু পাহাড়ি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার পর বাসায় পৌঁছানো যেত। আমার মনে হতো কেউ যদি আমাকে আক্রমণ করে তাহলে সে এই সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময়ই করবে। আব্বার মতো বরাবরই আমার দিবাস্বপ্ন দেখার রোগ আছে। কখনো কখনো ক্লাস চলাকালে বা পড়ার মাঝে আনমনা হয়ে পড়তাম। কল্পনায় দেখতাম ওই উঁচু জায়গাটায় সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় যেন এক সন্ত্রাসী আচমকা আমার সামনে লাফিয়ে এসে পড়লো আর নির্বিচারে গুলি চালাতে লাগলো। ভাবতাম, সত্যি সত্যি এরকম কোনো সন্ত্রাসী এলে আমি কী করবো? মনে হতো, তেমনটা হলে আমি আমার পায়ের জুতো খুলে তাঁকে পেটানো শুরু করব। পরক্ষণেই মনে হতো, এমন কাজ করলে তো সন্ত্রাসী আর আমার মধ্যে কোনো পার্থক্যই থাকবে না। তার চেয়ে বরং তাকে বলা উচিত হবে, 'বেশ তো, গুলি করতে চাও করো; কিন্তু আগে আমার একটা কথা শোনো। তোমরা যা করছ তা ভুল। ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের সঙ্গে আমার বিরোধ নেই; আমি শুধু চাই প্রত্যেকটি মেয়ে স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পাক।'

আমি ভয়ে যে একেবারে তটস্থ হয়ে গিয়েছিলাম তা নয়; তবে রাতে গেটে তালা দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে নিতাম। আমি আমার সবচেয়ে প্রিয় বান্ধবী মনিবাকে সব বলতাম। আমাদের দুজনের বাড়ি একই সড়কের পাশে। একেবারে ছোটবেলা থেকে আমরা একসঙ্গে বড় হয়েছি। প্রাইমারি স্কুলে পড়ার সময় থেকেই মনিবা আমার বান্ধবী। জাস্টিন বিবারের গান ও পুরনো দিনের মুভি থেকে শুরু করে মুখ ফর্সা করার ক্রিম পর্যন্ত আমরা একজন আরেকজনের সঙ্গে শেয়ার করতাম। মনিবা স্বপ্ন দেখতো ফ্যাশন ডিজাইনার হওয়ার, যদিও এতে পরিবারের সদস্যরা কিছুতেই সম্মতি দেবে না এ কথা মনিবা জানতো। এ কারণে সবাইকে সে বলতো সে ডাক্তার হতে চায়। অন্য অনেক কিছু করার

www.pathagar.com

সামর্থ্য ও সক্ষমতা থাকলেও আমাদের সমাজে মেয়েদের পক্ষে ডাক্তারি এবং শিক্ষকতা পেশার বাইরে অন্য কিছু করা খুবই সংগ্রাম ও কষ্টসাধ্য। তবে আমি বরাবরই আলাদা। আমি রাখঢাক না করেই আমার ইচ্ছার কথা সবাইকে আগেই জানিয়েছিলাম। প্রথমে ইচ্ছা ছিল ডাক্তার হওয়ার। পরে মত বদলে ফেলি। সিদ্ধান্ত নেই বড় হয়ে হয় বিজ্ঞানী হবো, নয়তো রাজনীতিক। কখন কী ঘটে এমন দুশ্চিন্তা সব সময়ই মনিবার ছিল। আমি তাঁকে আশ্বস্ত করে বলতাম, 'চিন্তা করিস না, আমাদের মতো এত ছোট মেয়েদের খোঁজে তালেবান আসবে না।'

স্কুল শেষে যখন বাসগুলো স্কুল চত্বরের বাইরে এসে দাঁড়াতো; মেয়েরা আবার মাথায় কাপড় বেঁধে গেটের বাইরে আসতো; তারপর ঝটপট বাসে উঠে পড়তো। বাসগুলো প্রচলিত অর্থে যাত্রীবাহী বড় বাস নয়। এটি আসলে সাদা রংয়ের টয়োটা টাউন এইস ব্র্যান্ডের ছোটো ট্রাক। আমরা একে ডায়না (টয়োটা কোম্পানির একটি মিনি ট্রাকের নাম টয়োটা ডায়না) বলতাম। গাড়ির মধ্যে দুই পাশে দুটি এবং মাঝখানে একটি বেঞ্চি পাতা। ঘটনার দিন আমরা ১২ জন ছাত্রী এবং তিনজন শিক্ষক গাদাগাদি করে বসেছিলাম। বেঞ্চিতে আমার বামপাশে বসা ছিল আমার বান্ধবী মনিবা। ডানপাশে ছিল আমাদের এক ক্লাস ছোট শাজিয়া রমজান। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও ফোল্ডার বুকের কাছে চেপে ধরে বসেছিলাম। যার যার দুই পায়ের পাতার মাঝখানে ছিল স্কুল ব্যাগ।

বাসের ভেতরের গাদাগাদি, শোরগোল সব মিলিয়ে পরিস্থিতি ছিল অস্বস্তিকর। মনে পড়ছে, ডায়নার ভেতরটায় গাদাগাদির কারণে ভ্যাপসা গরম লাগছিল। শীত আসতে তখনও বেশ দেরি। হিন্দুকুশ পর্বতমালার চূড়ায় সবেমাত্র তুষার জমতে শুরু করেছে। গাড়িটাতে জানালা বলে কিছু ছিল না। গাড়িতে লোহার ফ্রেমের ওপর পুরু পলিথিনের তেরপাল ঢেকে সেটা দিয়ে একইসঙ্গে ছাদ ও বেড়ার কাজ সারা হয়েছে। হলুদাভ তেরপালটি এত ময়লা আর পুরু ছিল যে ভেতরে বসে তেরপালের মধ্য দিয়ে বাইরের কিছুই নজরে আনা সম্ভব ছিল না। ভেতরে বসে গাড়ির পেছনের দিক তাকিয়ে কেবলমাত্র আকাশ দেখা যাচ্ছিল। এছাড়া কুয়াশার মতো হলদেটে ধুলোর স্তর ভেদ করে অস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হওয়া সূর্যগোলক চোখে পড়ছিল।

যদ্দুর মনে পড়ছে আমাদের বাসটা ডান দিকে মোড় নিয়ে সেনাবাহিনীর চেকপয়েন্টের উল্টো দিকের রাস্তা দিয়ে চলছিল। এরপর গাড়িটা ক্রিকেটের মাঠকে প্রায় চক্কর দিয়ে মাঠ ছেড়ে এগোলো। এরপর বাসটা সর্বশেষ ঠিক কোথায় গিয়ে থেমেছিল তা মনে করতে পারছি না।

আমার স্বপ্নদৃশ্যে গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় আমার আব্বাও আছেন। আমার স্বপ্নে দেখা দৃশ্যে দেখেছি আমার সঙ্গে বাসে আব্বাও আছেন। তাঁকেও গুলি করা হয়েছে। চারপাশে শুধু মানুষ আর মানুষ। আমি রক্তাক্ত মানুষের স্তূপের মধ্যে আব্বাকে নিরন্তর খুঁজে চলেছি।

তবে বাস্তব দৃশ্য ছিল অন্যরকম। বাস্তবে যা ঘটেছিল, তা হলো আমাদের গাড়িটাকে হঠাৎ থামানো হলো। আমাদের বামপাশে সোয়াত উপত্যকার প্রথম শাসকের অর্থমন্ত্রী শের মোহাম্মাদ খানের মাজার। ডানপাশে একটা স্ন্যাকস ফ্যাক্টরি। আমরা তখন চেকপয়েন্টের দুইশ গজেরও কম দূরত্বের মধ্যে ছিলাম।

www.pathagar.com

গাড়ির সামনের দিকটা আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম না। তবে দেখলাম হালকা রংয়ের পোশাক পরা দাড়িওয়ালা এক তরুণ রাস্তার মাঝখানে এসে আমাদের গাড়ি দাড় করালো। সে আমাদের ড্রাইভার ওসমান ভাইজানকে জিজ্ঞাসা করলো, 'এটা কি খুশাল স্কুলের বাস?' ওসমান ভাইজানের চোখ মুখ দেখে মনে হল তিনি নির্ঘাৎ ছেলেটাকে গাধা শ্রেনির মনে করেছেন, কারণ বাসের দুই পাশে বড় করে 'খুশাল স্কুল' লেখা ছিল। তবু তিনি বললেন, 'হ্যা'। ছেলেটা বললো, 'কয়েকজন ছাত্রীর ব্যাপারে আমার কিছু ইনফরমেশন দরকার।' উসমান ভাইজান বললেন, 'তাহলে স্কুলের অফিসে আপনার খোঁজ নেওয়া উচিত।'

দুজনের মধ্যে যখন কথা হচ্ছিল তখন ফর্সা চেহারার আরেক তরুণকে গাড়ির পেছন দিক থেকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। মনিবা আমাকে বললো, 'দ্যাখ, একজন সাংবাদিক আসছে, তোর ইন্টারভিউ নেবে।' মেয়েদের শিক্ষা আন্দোলনের পক্ষে এবং তালেবানের মতো যারা শিক্ষা থেকে আমাদের দূরে রাখতে চায় তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সভা সেমিনারে আব্বার সঙ্গে আমি নিয়মিত যেতাম। ওইসব অনুষ্ঠানে মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বক্তব্য রাখতাম। আন্দোলনকর্মী হিসেবে তখনই আমি মোটামুটি পরিচিতি পেয়ে গেছি। সেই সুবাদে সাংবাদিকেরা, এমনকি বিদেশিরাও আমার সাক্ষাৎকার নিতে আসতো। অবশ্য, রাস্তার মাঝখানে গাড়ি দাড় করিয়ে কেউ সাক্ষাৎকার নেয়নি। ছেলেটার মাথায় টুপি ছিল। নাক ও গাল ঢাকা মাস্ক পরা দেখে মনে হচ্ছিল তাঁর ঠান্ডা-জ্বর লেগেছে। চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল সে একজন কলেজছাত্র। সে এগিয়ে এসে গাড়ির পেছনের দিকে পাদানিতে উঠে ভেতরে বসা আমাদের দিকে ঝুকে এলো। সে সরাসরি প্রশ্ন করলো, 'মালালা কে?'

আমাদের মধ্যে কেউ কোনো জবাব দিলো না। তবে অধিকাংশ ছাত্রী একসঙ্গে আমার দিকে তাকালো। সবার মধ্যে একমাত্র আমার মুখ নেকাবে ঢাকা ছিল না। ছেলেটা আর কিছু না বলেই কালো একটা পিস্তল বের করল। পরে জেনেছি ওটা কোল্ট ৪৫। কয়েকটা মেয়ে চিৎকার করে উঠলো। মনিবা বলেছে, তখন নাকি আমি তার হাত খাবলে ধরেছিলাম।

আমার বান্ধবীদের কাছ থেকে শুনেছি ছেলেটা পরপর তিনটা গুলি করেছিল। প্রথম গুলিটা আমার বাম চোখের কোটর দিয়ে ঢুকে বাম বাম বগল ভেদ করে বেরিয়ে যায়। আমি মনিবার ওপর ঝুকে পড়ি। আমার কান দিয়ে গলগল করে রক্ত বের হচ্ছিল। বাকি দুটো গুলি আমার পাশে বসা দুজনের গায়ে লাগে। একটা লাগে আমার বান্ধবী শাজিয়ার বাম হাতে। আরেকটা লাগে কায়েনাত রিয়াজ নামের আরেকটি মেয়ের বাম বাহুতে। আমার বান্ধবীরা পরে আমাকে বলেছে, গুলি চালানোর সময় ছেলেটার হাত কাঁপছিল।

আমাদের যখন হাসপাতালে নেওয়া হয়, তখন আমার লম্বা চুল আর মনিবার কোল রক্তে ভিজে একশা হয়ে গিয়েছিল।

মালালা কে?– আমিই মালালা। এটাই আমার গল্প।

www.pathagar.com

অধ্যায় এক

তালেবানের আগে

سوری سوری په ګولو راشې   د بې ننګۍ اواز د رامه شه مئینه

‘সোরে সোরে পা গোলো রাশি
দা বে নানগাই আয়াজ দে রা মা শা মায়েনা’

‘জঙ্গের ময়দানে কাপুরুষতার খবর শোনার চেয়ে
বরং তোমার বুলেট ঝাঝরা দেহ তুলে আনা অনেক গৌরবের।’

(প্রচলিত পশতু শ্লোক)

www.pathagar.com

www.pathagar.com

১

জন্ম হল এক কন্যার

আমার যেদিন জন্ম হলো সেদিন পুরো গ্রামবাসী আম্মাকে কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়ার মত 'অপরাধ' করার পরও যেন করুণা করলো। গ্রামের লোকজনের মধ্য থেকে কেউ এসে আব্বাকে অভিনন্দন জানালো না। রাতের শেষ তারাটি নিভে যাওয়ার পর যখন ভোরে আলো পুরোপুরি ফুটে উঠেছে এমন সময় আমি দুনিয়াতে এলাম। আমরা পশতুনরা ভোররাতে সন্তানের জন্মগ্রহণকে শুভ লক্ষণ বলে মনে করি।

আম্মাকে হাসপাতালে নেওয়া বা বাড়িতে পেশাদার ধাত্রী আনার মতো সামর্থ্য আব্বার ছিল না। আমার জন্মের সময় আম্মাকে প্রসবকালীন সহায়তা দিয়েছিলেন আমাদের একজন প্রতিবেশি। এমন এক ভূখণ্ডে আমার জন্ম যেখানে ছেলে শিশুর জন্ম হলে রাইফেলের গুলি ছুড়ে আনন্দ প্রকাশ করা হয়। অন্যদিকে, কন্যা সন্তানের জন্ম হলে পর্দার আড়ালে ওই শিশুকে লুকিয়ে রাখা হয়। বাকি জীবনে সেই মেয়েটির রান্নাবান্না আর সন্তান জন্ম দেওয়া ছাড়া সংসারে আর কোনো ভূমিকা থাকে না।

যে দিনটায় পশতুন কারও ঘরে কন্যা শিশুর জন্ম হলে পুরো দিনটা ওই পরিবারের জন্য অত্যন্ত বিষাদময় হয়ে থাকে। যে অল্প কয়েকজন লোক আমার জন্মকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যে একজন হলেন আমার আব্বার চাচাতো ভাই জেহান শের খান ইউসাফজাই। তিনি আমার মুখ দেখে উপহার হিসেবে মুঠোভর্তি অর্থ দিয়েছিলেন। তিনি আমার দাদার দাদা দালোক হেল ইউসাফজাই থেকে আব্বা পর্যন্ত আমাদের বংশের একটি বংশলতিকা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। তবে সেই বংশ লতিকায় শুধুমাত্র পুরুষদের নামই উল্লেখ ছিল। আমার আব্বা জিয়াউদ্দিন বরাবরই বেশিরভাগ পশতুনদের চেয়ে একটু আলাদা গোছের মানুষ। আব্বা তাঁর চাচাতো ভাইয়ের দেওয়া বংশলতিকার নকশায় নিজের নামের নিচের দিকে ললিপপের মতো একটা লাইন টানলেন। সেটার নিচে লিখলেন, 'মালালা'। বংশলতিকায় নিজের নামের নিচে আব্বাকে মেয়ের নাম লিখতে দেখে তাঁর চাচাতো ভাই হাসাহাসি করলেন। কিন্তু আব্বা পাত্তা দিলেন না। আব্বার কাছে শুনেছি তিনি নাকি আমি জন্ম নেওয়ার

www.pathagar.com

পর আমার চোখের দিকে চেয়ে গভীর মমতাসিক্ত প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন। তিনি সবাইকে বলেছিলেন, 'আমি জানি, এই বাচ্চার মধ্যে আলাদা কিছু একটা আছে।' আমাদের সমাজে জন্ম নেওয়া ছেলে শিশুকে যখন দোলনায় রাখা হয় তখন পুরনো রেওয়াজ অনুসারে আত্মীয়-স্বজন দোলনায় ফলমূল, মিষ্টি, টাকা-পয়সা ইত্যাদি তোহফা হিসেবে ছুড়ে দেয়। কিন্তু আব্বা আমার দোলনায়ও আত্মীয় স্বজনকে তোহফা ছুড়ে দিতে বলেছিলেন।

আফগানিস্তানের কিংবদন্তী পশতুন বীরাঙ্গনা মালালাই অব মেইবান্দের নামানুসারে আমার নাম রাখা হয় মালালা। আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যবর্তী এই সোয়াত উপত্যকায় বিভিন্ন উপজাতিতে বিভক্ত পশতুনরা ঐতিহাসিকভাবে গর্বিত জাতি। কয়েক শতাব্দী ধরে আমরা পশতুনওয়ালি নামে পরিচিতি পেয়ে আসছি। অতিথি যেই হোক না কেন তাঁকে সর্বোচ্চ সমাদর করা এবং নানগ্ বা আত্মসম্মানকে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ মনে করা– আমাদের চরিত্রের এই দুটি দিক *পশতুনওয়ালি* শব্দের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। একজন পশতুনের কাছে সবচেয়ে ক্ষতির বিষয় হল মান মর্যাদা হারানো। ধিকৃত বা লজ্জিত হওয়া একজন পশতুন লোকের কাছে ভয়ানক ব্যাপার। আমাদের স্থানীয় একটি প্রবাদ আছে, 'দুনিয়া মর্যাদা ছাড়া কিচ্ছু গোনে না।' জ্ঞাতি ভাইদের কাছে দেওয়া কথা রাখতে যেমন আমরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করি, ঠিক একইভাবে শত্রুকে দেওয়া কথা রাখতে গিয়েও আমরা নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ি। কিন্তু এ পর্যন্ত বহিরাগত যে শক্তিই আমাদের ভূমি দখল করার চেষ্টা করেছে, আমরা সবাই এক হয়ে তাকে প্রতিহত করেছি। ১৮৮০ সালে অ্যাংলো-আফগান যুদ্ধের অন্যতম লড়াইয়ের ময়দানে ব্রিটিশ সেনাদের পরাস্ত করতে পশতুন বীরকেশরী মালালাই আফগান বাহিনীকে উজ্জীবিত করেছিলেন। তাঁর সেই বীরত্বগাথা পড়ে প্রত্যেক পশতুন ছেলে মেয়ে বড় হয়।

কান্দাহারের পশ্চিমে অবস্থিত ধুলিধুষর ছোট্ট সমতল শহর মেইবান্দের এক দরিদ্র মেষপালকের মেয়ে ছিলেন মালালাই। তিনি যখন কিশোরী তখন ব্রিটিশ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে হাজার হাজার আফগানের সঙ্গে তাঁর বাবা এবং হবু স্বামী দুজনই লড়াই চালাচ্ছিলেন। আহত যোদ্ধাদের সেবা এবং লড়াইরত যোদ্ধাদের পানি সরবরাহ করতে অন্য নারীদের সঙ্গে মালালাইও গ্রাম থেকে লড়াইয়ের ময়দানে ছুটে যান। মালালাই দেখলেন তাঁর পক্ষের লোকজন হেরে যাচ্ছে। ঝান্ডাবাহককে পড়ে যেতে দেখে তিনি ছুটে গেলেন। মাথার সাদা ঘোমটা খুলে ঝান্ডার মতো উঁচু করে ধরে অগ্রবর্তী সেনাদলের একেবারে সামনে চলে এলেন।

মালালাই চিৎকার করে বললেন, 'তরুণ সাথীরা! মেইবান্দের এই রণক্ষেত্রে যদি তোমরা শহীদ না হও, কসম আল্লাহর, ধরে নাও কেউ তোমাদের লজ্জা ও অপমানের দৃষ্টান্ত হিসেবে বাঁচিয়ে দিচ্ছে।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই শত্রুপক্ষের গুলিতে মালালাই নিহত হন; কিন্তু মৃত্যুর আগে তাঁর দেওয়া বক্তব্য এবং অসম সাহসিকতা প্রায় হেরে যাওয়া সেনাদের আবার

www.pathagar.com

শত্রুপক্ষের ওপর ঝাপিয়ে পড়ার অনুপ্রেরণা দেয়। তাঁরা বীরবিক্রমে ঝাপিয়ে পড়ে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর পুরো একটি ব্রিগেড ধ্বংস করে দেন। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ইতিহাসে এটি ছিল তাদের ঘোরতর পরাজয়। ওই বিজয়ে আফগানরা এতটাই গর্বিত হয়েছিল যে সর্বশেষ আফগান বাদশাহ কাবুলের প্রাণকেন্দ্রে মেইবান্দ বিজয়ের স্মারক ভাস্কর্য স্থাপন করেছিলেন।

হাইস্কুলে উঠে শার্লক হোমসের গল্প পড়ে যখন জানলাম মহান গোয়েন্দা শার্লক হোমসের সাগরেদ হওয়ার আগে ড. ওয়াটসন মেইবান্দের এই যুদ্ধে গিয়ে আহত হয়েছিলেন, তখন খুব হেসেছি। আমরা পশতুনরা মালালাইয়ের মধ্যে ফরাসি বীরাঙ্গনা জোয়ান অব আর্ককে খুঁজে পাই। মালালাইয়ের নামে আফগানিস্তানে বহু গার্লস স্কুল রয়েছে।

আমার দাদা এলাকার একজন বিশিষ্ট আলেম ও গ্রামের সর্বজন শ্রদ্ধেয় সমাজপতি। আব্বার আমার নাম মালালা রাখাটাকে তিনি পছন্দ করেননি। দাদা বলেছিলেন, 'এটা একটা বেদনাদায়ক নাম।' তাঁর কাছে এই নামের অর্থ 'মর্মবিদারী'। আমি যখন খুব ছোট তখন আব্বা আমাকে পেশোয়ারের বিখ্যাত কবি রহমত শাহ সাইলের লেখা একটা গান গেয়ে শোনাতেন। গানটির শেষ স্তবক এরকম–

'ও মেইবান্দের মালালাই

পশতুনদের আত্মগৌরবের মানে বোঝাতে আরেকটিবার জাগো

পদ্যের মত তোমার যত কথা ভাসছে দুনিয়া জুড়ে

তোমার কাছে মিনতি আমার, আরেকটিবার জাগো'

আমাদের বাড়িতে যখন কেউ বেড়াতে আসতো তখন তাকে মালালাইয়ের গল্প শোনাতেন। আব্বা যতবার গল্পটি বলতেন, যতবার গানটি গাইতেন আমি ততবার মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। এভাবে মানুষ যখন মালালাইয়ের নাম বলতো, তার সঙ্গে যেন আমার নামও ছড়িয়ে পড়তো।

আমরা যেখানে বাস করতাম সেটি বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর জায়গাগুলোর একটি। আমাদের এই সোয়াত উপত্যকা পাহাড়-পর্বত, ছন্দময় ঝরণা আর স্বচ্ছতোয়া নদীর এক বেহেশতি দুনিয়া। সোয়াতে ঢোকার সময় মূল প্রবেশপথে বড় করে লেখা 'ওয়েলকাম টু প্যারাডাইজ' (বেহেশতে স্বাগতম) দেখতে পাবেন।

এক সময় সোয়াতের আরেক নাম ছিল, 'উদ্যান'। মাঠভর্তি রংবেরংয়ের বুনো ফুল, উদ্যানে হরেক রকমের সুস্বাদু ফল, মূল্যবান পাথর পান্নার খনি, মিঠাপানির মাছে ভরা নদী–এইসব সম্পদ উপত্যকাটিকে পরিপূর্ণ করে তুলেছে। পাকিস্তানের প্রথম স্কি রিসোর্টও এই উপত্যকায়। অনেকে সোয়াতকে প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ড বলে ডাকে। পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ধনী লোকেরা

www.pathagar.com

সাপ্তাহিক ছুটির দিনটিতে আমাদের এখানকার নির্মল বায়ু, মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য, সুফি দরবেশদের ওরসে নাচ-গান উপভোগ করতে আসে। এছাড়া বহু বিদেশি পর্যটকও এখানে বেড়াতে আসে। শ্বেতাঙ্গ বিদেশিরা যে দেশ থেকেই আসুক আমরা তাদের 'আংরেজান' (ইংরেজ) বলি। এমন কি ইংল্যান্ডের রানী এলিজাবেথও আমাদের এখানে বেড়াতে এসে এখানকার বিখ্যাত 'শ্বেত প্রাসাদে' উঠেছিলেন। তাজমহল যে শ্বেত পাথর দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল সেই একই পাথর দিয়ে এই প্রাসাদটি গড়েছিলেন আমাদের নওয়াব, সোয়াতের প্রথম ওয়ালি।

এছাড়া এই সোয়াতের একটা বিশেষ ইতিহাসও আছে। বর্তমান পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখাওয়া (অনেকে সংক্ষেপে এটিকে কেপিকে বলে থাকে) প্রদেশের একটি অংশ হলেও এই সোয়াত উপত্যকা কার্যত পাকিস্তানের বাকি অংশ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন। প্রতিবেশি এলাকা চিত্রল ও দির-এর মতো সোয়াতেও এক সময় নওয়াবদের শাসন ছিল। উপনিবেশ আমলে এখানে নওয়াবেরা ব্রিটিশদের অনুগত থাকলেও মূলত তাঁরাই শাসন করতেন। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশরা ভারতবর্ষকে দুইভাগ করে দেওয়ার পর আমরা পাকিস্তানের ভাগে পড়ি। তবে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলেও আমরা স্বায়ত্তশাসিত রয়ে গেলাম। আমরা পাকিস্তানি রুপি ব্যবহার করতাম; তবে পাকিস্তান সরকার পররাষ্ট্রনীতি ছাড়া আমাদের আর কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতো না। আমাদের ওয়ালিরা প্রশাসন ও বিচার বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করতেন। যুদ্ধবাজ আদিবাসীদের মধ্যে শান্তি বজায় রাখতেন। তাঁরা উশুর বা খাজনা হিসেবে নাগরিকদের কাছ থেকে তাদের আয়ের দশ শতাংশ আদায় করতেন। ওই রাজস্ব দিয়েই রাস্তাঘাট, হাসপাতাল, স্কুল ইত্যাদি অবকাঠামো নির্মাণ করা হতো।

রাজধানী ইসলামাবাদ থেকে আমাদের এলাকার দূরত্ব মাত্র শ' খানেক মাইল; অথচ মনে হতো আমরা আলাদা কোনো দেশে থাকি। মালাকান্দ গিরিপথ দিয়ে সড়ক পথে ইসলামাবাদে যেতে ঘন্টা পাঁচেক সময় লাগে। উঁচু উঁচু পাহাড়ের মধ্য দিয়ে বিশাল এলাকা জুড়ে এই দুর্গম মালাকান্দ গিরিপথ। মোল্লা সাঈদুল (ব্রিটিশদের কাছে যিনি 'পাগলা ফকির' নামে পরিচিত ছিলেন) নামের একজন ধর্মপ্রচারকের নেতৃত্বে আমাদের পূর্ব পুরুষেরা চড়াই-উৎরাই এই পাহাড়গুলোর মধ্য থেকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। ওই যুদ্ধে তরুণ বয়সে সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টোন চার্চিলও অংশ নিয়েছিলেন। আফগানিস্তানে ব্রিটিশদের লড়াই নিয়ে চার্চিল একটি বই লিখেছিলেন এবং যদিও তিনি আমাদের সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করতেন না, তথাপি সোয়াতবাসী চার্চিলের স্মৃতির স্মারক হিসেবে একটি পাহাড় চূড়ার নাম দিয়েছে 'চার্চিল'স পিকেট'। মালাকান্দ গিরিপথের শেষ প্রান্তে, অর্থাৎ সোয়াতে আসার মূল প্রবেশদ্বারে সবুজ গম্বুজওয়ালা একটা দরগাহ শরীফ আছে। দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে এখানে নিরাপদে পৌছানোর লোকজন শোকরানা হিসেবে এই দরগাহে পয়সা কড়ি ছুড়ে দেয়।

www.pathagar.com

সোয়াতে থাকাকালে ইসলামাবাদে গেছে এমন কাউকে আমি চিনতাম না। সেখানে গণ্ডগোল শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত আমার আম্মার মতো বেশিরভাগ মানুষ সোয়াতের বাইরে জীবনে কোনোদিন যায়নি।

উপত্যকার সবচেয়ে বড় এবং প্রকৃত অর্থে একমাত্র শহর মিঙ্গোরায় আমরা থাকতাম। শহরটা খুব বেশি এলাকা জুড়ে নয়। আশপাশের গ্রাম থেকে লোকজন এখানে উঠে আসায় এখন শহরটিতে মানুষের গাদাগাদি বেড়েছে। দিনকে দিন নোংরা হচ্ছে শহরটি। হোটেল, কলেজ, গলফ খেলার মাঠ–সব এখানে আছে। এই শহরে একটি বিখ্যাত বাজার আছে যেখানে আপনি আমাদের ঐতিহ্যবাহী নকশা করা কাপড় ও দুর্লভ রত্নপাথর থেকে শুরু করে যা চান তার সব পাবেন। এই বাজারের মধ্য দিয়ে মারঘাজার নামের একটা সরু নদী বয়ে গেছে। এর মধ্যে প্লাস্টিকের ব্যাগ ও ময়লা আবর্জনা হরদম ফেলা হয়। পাহাড়ি এলাকার খাল বা নদী কিংবা শহরের বাইরের বড় বড় নদীর অবস্থা এরকম নয়। সেসব নদীর পানি এই নদীর মতো নোংরা নয়। ওইসব নদীতে মাছ ধরার ধুম পড়ে যায়। ছুটির দিনগুলোতে আমরা প্রায়ই সেখানে বেড়াতে যেতাম। আমাদের বাড়িটি যে এলাকায় তার নাম 'গুলকারা'। এর অর্থ 'পুষ্পভূমি'। তবে স্থানীয় লোকজন জায়গাটিকে 'বুৎকারা' বা 'বুদ্ধভূমি' নামেও ডাকে। আমাদের বাড়ির কাছেই অদ্ভুত ও রহস্যময় প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ ছড়ানো একটা চত্বর আছে। প্রাচীন সিংহমূর্তি, ভেঙে যাওয়া স্তম্ভ, মুন্ডহীন মানবদেহের মূর্তিসহ নানা ধরণের ভাস্কর্য এখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এ সবের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন হিসেবে দাড়িয়ে আছে পাথরের নির্মিত কয়েকশ ছাতা।

সপ্তদশ শতকে গজনীর শাসক সুলতান মাহমুদ আফগানিস্তান থেকে এসে আমাদের এই উপত্যকা দখল করেন। তাঁর শাসনামলেই এখানে ইসলামের আবির্ভাব হয়। এর আগে এখানে বৌদ্ধদের শাসন ছিল। মূলত দ্বিতীয় শতকে বৌদ্ধরা সোয়াতে আসে। বৌদ্ধ রাজারা পাঁচশ বছরের বেশি সময় ধরে এই উপত্যকা শাসন করেন। সোয়াতে নদীর দুই পাড় ধরে সে সময় কীভাবে প্রায় এক হাজার চারশ বৌদ্ধ মঠ দাঁড়িয়েছিল, কীভাবে সেই মঠগুলো থেকে জাদুকরী ঘন্টাধ্বনি উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়তো তা চৈনিক গবেষকদের লেখায় পাওয়া যায়। সেইসব মন্দির ধ্বংস হয়ে গেছে বহু আগেই। কিন্তু সোয়াতের যেখানেই আপনি যাবেন সেখানেই বুঁনো ফুলের ঝাড় আর ফলের বাগানে মন্দিরগুলোর চিহ্ন দেখতে পাবেন। পদ্মফুলের ওপর পদ্মাসনে বসা হাস্যোজ্জল বুদ্ধের একটি মূর্তি এখনও সোয়াতে আছে। বিশাল ওই মূর্তির পাশে আমরা প্রায়ই বনভোজন করতে যেতাম। কথিত আছে, জায়গাটি এতটাই শান্ত ও ধ্যান-অনুকূল ছিল যে বুদ্ধ স্বয়ং সেখানে এসেছিলেন এবং মৃত্যুর পর তাঁর দেহভস্মের একাংশ এখানকার একটি মঠে সংরক্ষণ করা হয়।

এই 'বুৎকারা' চত্বরটি লুকোচুরি খেলার জন্য আমাদের কাছে সত্যিই এক জাদুর রাজ্য ছিল। একবার কিছু বিদেশি প্রত্নতাত্ত্বিক এখানে গবেষণা করতে

www.pathagar.com

এসেছিলেন। তাঁরা আমাদের বলেছিলেন, এক সময় এটা নাকি বৌদ্ধদের তীর্থস্থান ছিল। স্বর্ণগম্বুজওয়ালা বহু মন্দির ছিল এখানে। বৌদ্ধ রাজারা মারা গেলে তাঁদের দেহ ওইসব মন্দিরের ভেতরে সমাহিত করা হত। আমার আব্বা 'বুৎকারার পবিত্র স্মৃতি' শিরোনামে একটি কবিতা লিখেছিলেন। এক সময় এখানে বৌদ্ধ মন্দির ও মসজিদের কী শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ছিল তা ওই কবিতায় ফুটে উঠেছে–

'সত্যের স্বর ভেসে আসে যখন মিনার হতে

তখনই বুদ্ধ ওঠেন মুচকি হেসে

তখনই কালের ছেড়া বন্ধনে

মসৃণ জোড়া লাগে।'

মূলত হিন্দুকুশ পর্বতমালার ছায়াময় পরিবেশে আমাদের বসতি ছিল। সেখানকার পাহাড়ে বুনো ছাগল ও বনমোরগ শিকার করতে যেতো আমাদের পূর্বপুরুষেরা। আমরা যে বাড়িতে থাকতাম সেটি ছিল কংক্রিটে তৈরি একটা একতলা ভবন। ভবনের বাম পাশে একটা সিঁড়ি ছিল। সেটা দিয়ে ছাদে ওঠা যেতো। আমাদের মত শিশুদের জন্য ছাদে ক্রিকেট খেলার মতো জায়গা ছিল। ওই ছাদটাই ছিল আমাদের খেলার মাঠ। গোধূলির সময় আব্বা তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে ছাদে চায়ের আসরে বসে গল্পগুজব করতেন। মাঝে মাঝে আমি ছাদে বসে চারপাশের বাড়িগুলোর রান্নাঘর থেকে ধোঁয়ার কুন্ডলী ওড়ার দৃশ্য দেখতাম; সন্ধ্যায় ঝিঁঝিঁ পোকার সম্মিলিত ঐকতান শুনতাম।

আমাদের এই উপত্যকা ফলে ফসলে ভরা। সবচেয়ে মিষ্টি ডুমুর, ডালিম, আনার, পিচফল এখানেই পাবেন। ফলের বাগানে আঙুর-পেয়ারার সমারোহ চোখে পড়বে। আমাদের বাড়ির উঠোনে একটা কিসমিসের গাছ ছিল। কিসমিস পাকলে সেগুলো কে আগে খেতে পারবে তা নিয়ে পাখিদের সঙ্গে আমাদের রীতিমতো কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে যেত। পাখিগুলো, এমনকি কাঠ বিড়ালীরাও গাছটার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল।

মনে পড়ছে, আম্মাকে আমি পাখিদের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছি। ভবনের পেছনের দিকটায় একটা বারান্দা ছিল। সেখানে মহিলারা জড়ো হয়ে গল্পগুজব করতেন। ক্ষুধার কষ্ট আমরা বুঝতাম। আম্মা সব সময়ই প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশি রান্না করতেন। অতিরিক্ত খাবার গরীব প্রতিবেশিদের দিতেন। বেঁচে যাওয়া খাবার অনেক সময় পাখিদের খেতে দিতেন।

পশতু ভাষায় দুই লাইনের এক ধরণের ছড়া কাটা হয়। এই ছড়াকে বলা হয় 'ট্যাপি'। আম্মা যখন পাখিদের দিকে ভাত ছড়িয়ে দিতেন তখন একটা ট্যাপি বলতেন–

www.pathagar.com

'বাগানের ঘুঘুটাকে মেরো না

একজনকে মারলে বাকিরা আর আসে না'

বাড়ির ছাদে বসে পাহাড় দেখা আর কল্পনার রাজ্যে হারিয়ে যাওয়াতেই ছিল আমার আনন্দ। সেখানকার সবচেয়ে বড় পাহাড়টার নাম মাউন্ট ইলাম। পিরামিড আকৃতির এই বিশাল পাহাড়কে আমরা পবিত্র পাহাড় বলে মনে করতাম। এটা এত উঁচু যে সারা বছরই এর চূড়ার চারপাশে মালার মতো মেঘের বৃত্ত ঘিরে থাকে। স্কুলের বইয়ে পড়েছি, ৩২৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, অর্থাৎ সোয়াতে গৌতম বুদ্ধ আসারও আগে মহাবীর আলেকজান্ডার এখানে এসেছিলেন। হাজার হাজার হাতি আর অগণিত সেনা নিয়ে আফগানিস্তান থেকে সোয়াতের মধ্য দিয়ে ইন্দুজের দিকে রওনা হয়েছিলেন তিনি। এই বিশাল বাহিনী দেখে সোয়াতের লোকেরা ভয়ে ইলাম পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল, ওই পাহাড়ে গেলে সেখানে থাকা দেবতারা তাদের আলেকজান্ডারের হাত থেকে রক্ষা করবেন। মহামতি আলেকজান্ডার তাদের কোনো ক্ষতি করলেন না। তিনি কাঠ দিয়ে বিশাল একটা র‍্যাম্প (সিঁড়ির পরিবর্তে তৈরি ঢালু পথ) বানালেন যেখান থেকে তাঁর গুলতি ও ধনুক থেকে ছোড়া তীর পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছাতে পারে। তীরের সঙ্গে বাঁধা দড়ি বেয়ে তিনি একেবারে চূড়ায় উঠে যান। রোমান দেবতা জুপিটারের অবস্থান স্থল ছুঁয়ে আসেন তিনি।

ছাদে বসে লক্ষ্য করতাম, ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়েও নৈসর্গিক পরিবর্তন চলে আসতো। হেমন্ত আসার সঙ্গে হাড় কাঁপুনি দেওয়া বাতাস বইতে শুরু করতো। শীতকালে চারপাশ ঢেকে যেতো শ্বেতশুভ্র তুষারে। ছাদ থেকে ছুরির তীক্ষ্ণ ফলার মতো নিচের দিকে জমাট তুষার বেয়ে এসে ঝুলে থাকতো। সেগুলো মটমট করে ভাঙতে খুব ভালো লাগতো। আমরা তুষারের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করতাম। তুষার দিয়ে মানুষ কিংবা ভল্লুকের মূর্তি বানাতাম। কখনো পেঁজা তুলোর মতো উড়ে বেড়ানো তুষার কণা ধরার জন্য ছুটে বেড়াতাম। পুরো সোয়াত উপত্যকা যখন সবুজে ছেয়ে যেতো তখন বুঝতাম বসন্ত এসে গেছে। ইউক্যালিপটাসের ঝরা ফুল উড়ে উড়ে বাড়ির ওপর এসে পড়তো। সারা বাড়ি ফুলে ঢেকে যেতো। বাতাসে ভেসে আসতো ধানক্ষেতের মেঠো সৌরভ। আমার জন্ম হয়েছিল গ্রীষ্মকালে। হয়তো সে কারণেই গ্রীষ্মই আমার সবচেয়ে পছন্দের ঋতু। যদিও মিঙ্গোরায় গ্রীষ্মকালে প্রচন্ড গরম পড়ে; আমাদের শহরসংলগ্ন খাল প্রায় শুকিয়ে যেতো। সেখানে লোকজন বর্জ্য ফেলায় খালের পানি থেকে প্রচন্ড দুর্গন্ধ ছড়াতো।

আমার যখন জন্ম হয়, তখন আমাদের অভাবের সংসার। খুব টানাটানি অবস্থা। আমার জন্মের কিছুদিন পরে আব্বা আর তাঁর এক বন্ধু তাঁদের প্রথম স্কুলটা চালু করেন। স্কুলের উল্টো পাশে স্যাঁতস্যাঁতে দুটো রুমের একটা বাসায় আমরা থাকতাম। এক রুমে আব্বা-আম্মার সঙ্গে আমি থাকতাম। অন্য রুমটা ছিল

মেহমানদের জন্য। আমাদের ঘর লাগোয়া বাথরুম কিংবা রান্নাঘর ছিল না। আম্মা উঠোনে একটা কাঠের চুলোয় রান্না করতেন। স্কুলের ট্যাপের পানি ছেড়ে কাপড়চোপড় ধুতেন। গ্রাম থেকে আসা লোকজনে সব সময়ই আমাদের ঘর ভরা থাকতো। পশতুন সংস্কৃতিতে আতিথিয়েতাকে খুবই গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয়। এ কারণে কষ্ট হলেও আমরা বিরক্ত হতাম না।

আমার জন্মের দুই বছর পর আমার ছোটভাই খুশালের জন্ম হয়। আব্বার পক্ষে এবারও হাসপাতালের খরচ জোগানো সম্ভব হয়নি। ফলে খুশালের জন্ম হয় বাড়িতেই। পশতুন বীর খুশাল খান খট্টক যিনি একইসঙ্গে যোদ্ধা এবং কবি ছিলেন, তাঁর নামেই আব্বা তাঁর স্কুলের নাম দিয়েছিলেন খুশাল স্কুল। আমার ছোট ভাইয়ের জন্মের পর তার নামও রাখলেন খুশাল। আম্মা ছেলে সন্তানের জন্য অধীর প্রতীক্ষায় ছিলেন। ভাইটির জন্ম হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই তিনি আনন্দ চেপে রাখতে পারেননি। জন্মের পর খুশাল ছিল নলখাগড়ার মতো খুব রোগা ও পাতলা। মনে হত জোর বাতাসে সে উড়ে যাবে। কিন্তু সেই ছিল আম্মার চোখের মনি; তাঁর 'লাড়লা' (আদুরে)। আমার মনে হতো, খুশালের প্রত্যেকটি ইচ্ছা আম্মার কাছে ছিল আদেশের মতো। ও সব সময় চা খেতে চাইতো। স্থানীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী আমাদের দুধ, চিনি আর এলাচ দিয়ে বানানো চা খাওয়ার অভ্যাস আছে। খুশাল বার বার এই চা খেতে চাইতো বলে আম্মা অনেক সময় কড়া লিকার দিয়ে চা'টা একটু তেতো করে দিতেন। বিস্বাদ লাগতো বলে মাঝে মাঝে সে আর চা চাইতো না।

আম্মা খুশালের জন্য একটা নতুন দোলনা কিনতে চেয়েছিলেন। আমার যখন জন্ম হয় তখন আব্বার নতুন দোলনা কেনার সামর্থ্য ছিল না। তিনি প্রতিবেশির কাছ থেকে একটা পুরনো দোলনা চেয়ে এনেছিলেন। খুশালের জন্য আম্মা নতুন দোলনার বায়না ধরলে আব্বা তাতে রাজি হননি। আব্বা বললেন, 'মালালা এই দোলনায় দোল খেয়েছে, খুশালও এতে দোল খেতে পারবে।'

এর প্রায় পাঁচ বছর পর আমার আরেক ভাই অটলের জন্ম হয়। কাঠবিড়ালীর মতো চনমনে অটল বড় বড় চোখ নিয়ে তাকাতো। অটলের জন্মের পর আম্মা বললেন, 'আমার সংসার পূর্ণ হলো।' সোয়াতি সমাজে তিন সন্তানের পরিবারকে ছোট পরিবার হিসেবেই মনে করা হয়। সাধারণত এখানকার বেশিরভাগ পরিবারে সদস্য সংখ্যা সাত থেকে আটজন থাকে।

বেশিরভাগ সময় আমি খুশালের সঙ্গে খেলতাম কারণ ও আমার চেয়ে বয়সে মাত্র দুই বছরের ছোট। অবশ্য যতটা না খেলা হতো তার চেয়ে বেশি হতো ঝগড়া-মারামারি। দুজনের মধ্যে ঝগড়া হলে সে নালিশ নিয়ে যেতো আম্মার কাছে। আমি যেতাম আব্বার কাছে। আব্বা আমার গাল টিপে বলতেন, 'কি হয়েছে জান-ই?'

আমার আম্মা খুবই সুন্দরী। আব্বা বরাবরই আম্মাকে টুক করে একটু আঘাত লাগলেই ভেঙে যায়, কারুকাজ করা এমন চীনা পাত্রের মতো ভঙ্গুর ও

www.pathagar.com

নাজুকস্বভাবী হিসেবে দেখেন। সোয়াতের অধিকাংশ স্বামীর মতো আব্বা কখনোই আম্মার গায়ে হাত তোলেননি। আম্মার চুল কাঠবাদামের মতো বাদামি রংয়ের অথচ তার নাম 'তোর পেকাই'। পশতুন ভাষায় 'তোর পেকাই' মানে 'কৃষ্ণ বেনীগুচ্ছ'। আম্মার জন্ম হওয়ার কিছুক্ষণ আগে আমার নানা রেডিও আফগানিস্তান শুনছিলেন। রেডিওতে ওই নামটা শুনে তাঁর পছন্দ হয়। আম্মার জন্মের পর তিনি নামটা দেন। আমি ভাবি, আমার যদি আম্মার মতো পদ্মশুভ্র গায়ের রং, ছিপছিপে গড়ন ও সবুজ চোখ থাকতো! তার বদলে আমার গায়ের রং হয়েছে আব্বার মতো ঈষৎ পীতবর্ণের; নাক হয়েছে মোটা; আর চোখ হয়েছে বাদামী রংয়ের। আমাদের সংস্কৃতিতে প্রত্যেকেরই ডাক নামের পাশাপাশি উপনাম থাকে। আমি যখন একেবারে ছোটো, তখন থেকেই আম্মা আমাকে 'পিশো' বা 'বিড়াল' বলে ডাকেন। আমার চাচাতো ভাইবোন আমাকে ডাকে 'লাচি' বলে। পশতুন ভাষায় এই শব্দের মানে হল এলাচি বা এলাচ। এখানে যাদের গায়ের রং কালো সবাই তাকে 'ধলা' আর যারা ফর্সা তাদের 'কালো' বলে ডাকে। লম্বা লোকজনকে 'বেটে' আর বেটে লোকজনকে 'লম্বা' নামে ডাকা হয়। আসলে আমাদের রসবোধ বা সেন্স অব হিউমার খুবই মজার। আমার আব্বাকে তাঁর ভাইবোন ও আত্মীয়স্বজন 'খাইস্তা দাদা' বলে ডাকে। পশতুন ভাষায় 'খাইস্তা দাদা' মানে সুন্দর।

যখন আমার বয়স চার কি সাড়ে চার বছর, তখন আব্বাকে বলতাম, 'তুম কালো নাকি ফর্সা?' আব্বা বলতেন, 'তাতো জানি না। মনে হয় কিছুটা কালো, কিছুটা ফর্সা। দুধের মধ্যে চা মেশালে যেমন হয় সেই রকম।' এই কথা বলে আব্বা খুব হাসতেন। শুনেছি আব্বা নাকি যৌবনে তাঁর গাযের রং নিয়ে খুব পেরেশানিতে থাকতেন। মহিষের দুধ দিয়ে মুখ ধুলে মুখ ফর্সা হয় এমন ধারণা থেকে তিনি নাকি মাঠে চলে যেতেন মহিষের দুধ আনতে। তবে শেষ পর্যন্ত আম্মার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর, আম্মা তাঁর প্রেমে পড়ার পর গায়ের রং নিয়ে আব্বার মনের ছটফটানি কমে যায়। আম্মার মতো সুন্দরী মেয়ে তাঁর প্রেমে পড়ায় তাঁর মধ্যে আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়।

আমাদের সমাজে পারিবারিক পছন্দ ও আয়োজনের মাধ্যমে সাধারণত বিয়ে হয়। কিন্তু আব্বা-আম্মার মধ্যে বিয়ের আগে প্রেম ছিল। তাদের দুজনের কীভাবে দেখা হয়েছিল সেই গল্প যে কতবার শুনেছি তার ঠিক নেই।

সোয়াতের উচু দিকটায়; উপত্যকার একেবারে প্রান্তবর্তী শাংলা গ্রামে তাঁরা থাকতেন। সে সময় পড়াশুনার জন্য আমার আব্বা তার এক চাঁচার বাসায় যেতেন। সেই বাড়ির পাশেই ছিল আম্মার খালার বাড়ি। দুই বাড়ি থেকে দুইজনের চোখাচোখি হত। এর মধ্য দিয়েই একজনের প্রতি আরেকজনের ভালোবাসা জানাতেন তাঁরা। আমাদের সমাজে অবিবাহিত নারী-পুরুষের প্রেমের সম্পর্ককে নিষিদ্ধ বলে মনে করা হয়। এ কারণে দুজন দুজনের কাছাকাছি আসতে পারেননি। আম্মা লিখতে পড়তে না পারলেও আব্বা তাঁকে প্রেমের কবিতা লিখে পাঠাতেন।

www.pathagar.com

আম্মা বলেন, 'তার (আব্বার) সরল মনের কারণে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম।' আর আব্বার কথা হল, 'তার (আম্মার) রূপ দেখেই মুগ্ধ হয়েছিলাম।'

আব্বা-আম্মার সম্পর্কের সামনে একটা বড় বাধা আসে। তাদের সম্পর্কের ব্যাপারটিকে আমার দাদা এবং নানা কেউ পছন্দ করেননি। ফলে আব্বা যখন বললেন, তিনি তোর পেকাইয়ের (আম্মার) পানি গ্রহণ করতে চান, তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই দুই পক্ষের কেউ বিষয়টিকে স্বাগত জানালেন না। বহু পীড়াপিড়ির পর দাদা আব্বাকে বললেন, এটা তার (আব্বার) ব্যাপার; তবে তিনি পশতুন রেওয়াজ অনুসারে একজন নাপিতকে দিয়ে মেয়ের বাড়িতে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন। আমার নানা মালিক জনসের খান এই প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন। কিন্তু আব্বা নাছোড়বান্দা। তিনি দাদাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে আবার জনসের খানের কাছে নাপিত পাঠালেন। এবার তিনি বিষয়টি বিবেচনা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। জনসের খানের হুজরায় রাজনৈতিক শলাপরামর্শের জন্য বৈঠক হত। আব্বা প্রায়ই সেসব বৈঠকে থাকতেন। সেই সুবাদে আব্বাকে নানাজান মোটামুটি চিনতেন। তিনি আব্বাকে নয়মাস অপেক্ষা করিয়ে তারপর তার হাতে কন্যা দিতে রাজি হলেন।

আম্মা এমন এক পরিবার থেকে এসেছেন যে পরিবারের পুরুষেরা যেমন প্রভাবশালী ছিলেন, তেমনি মহিলারা ছিলেন সাংঘাতিক তেজি ও শক্ত মনের। আমার আম্মার দাদি খুব অল্প বয়সে বিধবা হন। সংসারে তখন তার ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। ওই সময় তাঁর নয় বছর বয়সী সবচেয়ে বড় সন্তান জানসের খানকে গোষ্ঠী শত্রুতার জের ধরে প্রতিপক্ষের লোকজন ধরে নিয়ে আটকে রাখে। ছেলেকে ছাড়িয়ে আনার জন্য তিনি নাকি একাই পাহাড়ি পথ ডিঙ্গিয়ে চল্লিশ মাইল দূরে তাঁর এক ক্ষমতাধর ভাইয়ের কাছে নালিশ নিয়ে গিয়েছিলেন। আমার মনে হয়, আমাদের জন্যও প্রয়োজনে সেরকম সবকিছু আম্মা করতে পারেন। লিখতে পড়তে না পারলেও আব্বা সব ব্যাপারেই আম্মার মতামত নেন। সারাদিন কী করলেন, কোনটা ভালো কোনটা খারাপ খুঁটিনাটি সবকিছু নিয়েই আলোচনা করেন।

আম্মা আব্বাকে যথেষ্ট বকাঝকা করেন। আব্বার কোন বন্ধুটা ভালো, কোন বন্ধুটা ভালো নয় তা নিয়ে আব্বাকে অনেক সময় বোঝান। নানা বিষয় নিয়ে বুদ্ধি পরামর্শ দেন। আব্বা বলেন, আম্মার কথা সব সময়ই সঠিক হয়ে থাকে। বেশিরভাগ পশতুন এমনটি কখনোই করেনা। বিভিন্ন সমস্যা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয় নিয়ে মহিলাদের সঙ্গে পরামর্শ করাকে তারা দূর্বলতা বলে মনে করে। এরকম কেউ করলে তাঁকে অপমানের সুরে বলে, 'সে তাঁর বউয়ের বুদ্ধিও নেয়!' আব্বা-আম্মাকে আমি ছোটবেলা থেকেই হাসিঠাট্টা গল্প গুজব করতে দেখে এসেছি। লোকজন আমাদের পরিবারকে দেখে মুগ্ধ হয়। তাদের কাছে আমাদের পরিবার হল সত্যিকারের সুখের সংসার।

www.pathagar.com

আমার আম্মা খুবই ধর্মভীরু। পাচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন; মসজিদে শুধুমাত্র পুরুষদের এবাদত করার অনুমতি থাকায় তিনি বাড়িতেই নামাজ পড়েন। নাচে তার আপত্তি রয়েছে কারণ তিনি বলেন, আল্লাহ এটা পছন্দ করেন না। তবে তিনি নকশা করা জরিদার কাপড়, সোনার হার, মল ও বালা পড়ে সাজতে ভালোবাসেন। পোশাকের চাকচিক্য ও গয়নার সাজগোজ নিয়ে আব্বার মতো আমারও তেমন কোনো মাথা ব্যথা না থাকায় আমার ধারণা আমার ওপর আম্মার কিছুটা মনোকষ্ট আছে। বাজারে যাওয়া আম্মার কাছে খুবই ক্লান্তিকর ব্যাপার, তবে রুদ্ধদ্বার কক্ষে স্কুল বন্ধুদের সঙ্গে নাচতে গাইতে আমার খুবই ভালো লাগে।

বেশিরভাগ সময়টা আম্মার কাছে কাটিয়ে আমরা বড় হয়েছি। আব্বা সারাদিনই বাইরে ব্যস্ত থাকতেন। শুধু স্কুলে নয়, সাহিত্য-সমাজ ও জিরগাতে (অনেকটা পঞ্চায়েতের মতো গ্রাম্য সমাজপতিদের নিয়ে গঠিত স্থানীয় প্রশাসন পর্ষদ) তাকে সময় দিতে হতো। পাশাপাশি পরিবেশ, তথা আমাদের উপত্যকা বাঁচানোর আন্দোলনেও তিনি শামিল হতেন। একটি পশ্চাৎপদ গ্রামে জন্ম হলেও আব্বা শুধু তার লেখাপড়া ও ব্যক্তিত্বের জোরে ভালোভাবে জীবনযাপনে সামর্থ্যবান হতে এবং নামডাক অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

মানুষ আব্বার বক্তৃতা শুনতে পছন্দ করতো। আমাদের বাসায় যে সন্ধ্যায় অতিথিরা আসতেন তখন আমার খুব ভালো লাগতো। আম্মা মেঝেতে লম্বা একটা প্লাস্টিক শিট বিছিযে দিতেন। সেখানে আম্মা সবাইকে খাবার দিতেন। আমাদের সংস্কৃতি অনুযায়ী আমরা সবাই একসঙ্গে গোল হয়ে পোলাও-মাংস খেতাম। রাত নামলে সবাই কেরোসিনের কুপির চারপাশে গোল হয়ে বসতাম। কুপির আলোয় আমাদের ছায়ামূর্তি দেওয়ালে যেন কেঁপে কেঁপে নেচে উঠতো। গ্রীষ্মের মাসগুলোতে ঝড়বৃষ্টির সময় প্রায়ই প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়তো। আমি তখন ভয়ে আব্বার হাটুর কাছে গুটিসুটি মেরে বসতাম।

আব্বা যখন উপজাতিদের যুদ্ধ, পশতুন নেতা ও ওলি বুজুর্গদের গল্প করতেন তখন আমি নিবিষ্ট মনে শুনতাম। মাঝে মাঝে আবেগপূর্ণ কণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি করতেন। আবৃত্তির সময় প্রায়ই তার চোখ পানিতে ভরে যেতো। সোয়াতের বেশিরভাগ মানুষের মতো আমরাও ইউসাফজাই গোত্র থেকে এসেছি। আমরা ইউসাফজাইরা (অনেকে এটি ভুল করে 'ইউসুফজাই' কিংবা 'ইয়োসোফজাই' বলে) মূলত এসেছি আফগানিস্তানের কান্দাহার থেকে। পশতুন উপজাতিদের মধ্যে যে কয়টি বড় গোত্র আছে তাদের মধ্যে আমরা অন্যতম। পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের প্রায় সর্বত্রই ইউসাফজাই গোত্রের লোকজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

আমাদের পূর্ব পুরুষেরা ষোড়শ শতকে কাবুল থেকে সোয়াতে আসেন। কাবুলের তৎকালীন এক (Timurid) বাদশাহকে তার নিজের গোত্রের লোকজন ক্ষমতাচ্যুত করার পর আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাকে ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে সর্বাত্মক

www.pathagar.com

সহায়তা দিয়েছিলেন। সিংহাসনে পুনরায় অধিষ্ঠিত হয়ে বাদশাহ পুরস্কার হিসেবে দরবার ও সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে ইউসাফজাইদের বসান। কিন্তু বাদশাহকে তাঁর আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব এই বলে সতর্ক করেন যে, ইউসাফজাইরা দরবার ও সেনাবাহিনীতে যেভাবে শক্তিশালী অবস্থান গেড়ে বসেছে তাতে তারা যে কোনো সময় তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজেরা গদি দখল করে বসতে পারে। এই হুশিয়ারি শুনে বাদশাহ একরাতে ইউসাফজাই সম্প্রদায়ের সব গোত্রপ্রধানকে নৈশভোজে দাওয়াত দেন। খাওয়ার সময় বাদশাহর সেনারা আমাদের নিরস্ত্র পূর্বপুরুষদের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে। ওই রাতে প্রায় ছয়শ গোত্র প্রধানকে হত্যা করা হয়। মাত্র দুইজন গোত্রপ্রধান সেখান থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। তারা তাদের গোত্রের সব লোক নিয়ে কাবুল থেকে পালিয়ে পেশোয়ারে চলে আসেন। নিজ দেশ আফগানিস্তানে যাতে ফিরে যাওয়া সম্ভব হয় সেজন্য কিছু উপজাতীয় নেতার সাহায্য নিতে তারা সোয়াত যান। কিন্তু সোয়াতে এসে এখানকার সৌন্দর্য্য ও প্রাচুর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে যান। তারা আর ফিরে না গিয়ে বরং অন্য উপজাতীয় সম্প্রদায়গুলোকে তাড়িয়ে দেন এবং সেখানেই বসতি গড়ে তোলেন।

সোয়াতে বসতি গড়ে তোলার পর ইউসাফজাই সম্প্রদায় তাদের গোত্রের সব পুরুষ সদস্যদের মধ্যে আবাদী জমি বণ্টন করে নেয়। 'ওয়েশ' নামের এক অদ্ভুত কায়দায় এই জমি বণ্টন হয়, যার মাধ্যমে এককেটি গোত্রকে এককেটি এলাকা পাঁচ বা দশ বছর ভোগ করতে দেওয়া হত। মেয়াদ শেষ হলে তাদের ওই গ্রাম থেকে সরে অন্য গ্রামে চলে যেতে হত। যাতে সবাই পালাবদলের মাধ্যমে ভালো জমি এবং মন্দ জমি ভোগ করার সুযোগ পেতে পারে। নিজেদের মধ্যে জমি নিয়ে কোন্দল ঠেকাতে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হতো বলে ধারণা করা হয়। গ্রামবাসীদের শাসন করতেন খানেরা। তাদের প্রজা হিসেবে কৃষক, শ্রমিক তাঁতীরা বাস করতো। খাজনা হিসেবে উৎপাদিত ফসলের একটা অংশ খানদের গোলায় যেতো। এছাড়া এককে খণ্ড জমি ভোগ করার বিনিময়ে একজন করে সশস্ত্র লোককে খানদের মিলিশিয়া বাহিনীতে যোগ দিতে হতো। এইভাবে প্রত্যেক খানের অধীনে শত শত সশস্ত্র লোকের দ্বারা গঠিত মিলিশিয়া বাহিনী থাকতো। গোষ্ঠী কোন্দল মোকাবিলা এবং অন্যগ্রামে লুটপাট চালাতে এই বাহিনী ব্যবহার করা হতো।

যেহেতু সোয়াতে কেন্দ্রীয় পর্যায়ের কোন শাসক ছিল না, সেজন্য খানদের মধ্যে, এমনকি তাদের নিজেদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সারাক্ষণ বিবাদ লেগে থাকতো।

আমাদের সবার কাছে রাইফেল থাকে। অবশ্য পশতুন অন্যান্য এলাকায় সব সময় যেভাবে লোকজন তাদের রাইফেল সঙ্গে নিয়ে ঘোরাফেরা করে আমাদের এলাকার লোকজন সেভাবে অস্ত্র নিয়ে চলাফেরা করেনা। আমার দাদাজানের আব্বা তাঁর ছেলেবেলায় দেখা বন্দুকযুদ্ধের গল্প বলতেন। গত শতকের প্রথমার্ধে আমাদের পূর্ব পুরুষেরা চারপাশের প্রায় সব ভূমির দখলে ছিলেন। ব্রিটিশরা

www.pathagar.com

তাদের ভূমি দখল করে নিতে পারে এমন আশঙ্কায় ছিলেন তাঁরা। এছাড়া বিরামহীন রক্তপাতে তাঁরা নিজেরাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। এ কারণে যুগ যুগ ধরে চলা এই গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব অবসানের জন্য তাঁরা এমন একজন নিরপেক্ষ শাসককে খুজছিলেন যিনি পুরো এলাকা শাসন করবেন এবং গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ থামাবেন।

পরপর কয়েকজন শাসক এলেও কেউই পশতুন সব গোষ্ঠীর আনুগত্য লাভ করতে পারেননি। অবশেষে ১৯১৭ সালে মিয়াগুল আব্দুল ওয়াদুদ নামের একজন শাসককে সব গোত্রপ্রধান একসঙ্গে মেনে নিলেন। আমরা তাঁকে পরম শ্রদ্ধেয় 'বাদশাহ সাহেব' নামে জানি। তাঁর একেবারেই অক্ষরজ্ঞান ছিল না। কিন্তু তিনিই প্রথম এই উপত্যকায় শান্তি ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন। একজন পশতুনের কাছ থেকে তার রাইফেল কেড়ে নেওয়া মানে তার জীবন ছিনিয়ে নেওয়া। এ কারণে বাদশাহ সাহেব তাঁদের হাতিয়ারহীন করতে পারেননি। তার বদলে তিনি সোয়াতের চারপাশে পাহাড়ের ওপর দুর্গ বানালেন এবং গঠন করলেন এক শক্তিশালী সেনাবাহিনী। ব্রিটিশ সরকার ১৯২৬ সালে তাকে এই এলাকার 'রাষ্ট্রপ্রধান' হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং আমাদের ওয়ালি শাসক হিসেবে তাকে নিযুক্ত করেন।

বাদশাহ সাহেব আমাদের এই উপত্যকায় প্রথম টেলিফোন ব্যবস্থা ও প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু করেন। একইসাথে তিনি 'ওয়েশ' পদ্ধতিতে জমি বন্টনের নিয়ম বাতিল করেন; কারণ উপত্যকাবাসীকে নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে গ্রাম ও বাসস্থান পরিবর্তন করতে হতো বলে কেউ সে সময় জমি বিক্রি করতে পারতো না। স্থায়ী মালিকানা না পাওয়ায় ওইসব জমিতে লোকজন অবকাঠামো স্থাপন করতে বা ফলফলাদির গাছ লাগাতে আগ্রহী হতো না।

১৯৪৯ সালে, অর্থাৎ পাকিস্তান সৃষ্টির দুই বছর পর বাদশাহ সাহেব তাঁর বড় ছেলে মিয়াগুল আবদুল হক জেহানজেবকে ক্ষমতাসীন করার স্বার্থে ওয়ালির দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ান। আমার আব্বা সব সময় বলেন, 'এই উপত্যকায় বাদশাহ সাহেব শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আর তাঁর ছেলে এনেছিলেন সমৃদ্ধি। জেহানজেবের শাসনামলকে আমরা আমাদের ইতিহাসের সুবর্ণ সময় বলে মনে করি। জেহানজেব পেশোয়ারে একটি ব্রিটিশ স্কুলে পড়াশুনা করেছিলেন এবং হয়তো তাঁর আব্বা নিরক্ষর ছিলেন বলেই তিনি প্রচণ্ড শিক্ষানুরাগী হয়ে ওঠেন। তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছায় সে সময় এই অঞ্চলে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও রাস্তাঘাট নির্মাণ করা হয়। ১৯৫০ সালে তিনি খানদের তহবিলে জনগণের খাজনা জমা দেওয়ার প্রথা বিলুপ্ত করেন। তবে তাঁর সময়ে মত প্রকাশের কোনো স্বাধীনতা ছিলনা। কেউ ওয়ালির সমালোচনা করলে তাকে উপত্যকা থেকে বহিষ্কার পর্যন্ত করা হতো। ১৯৬৯ সালে, যে বছর আমার আব্বার জন্ম, সেই বছর ওয়ালি তার ক্ষমতা ছেড়ে দেন এবং আমরা পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় সীমান্ত প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হই। বছর কয়েক আগে এই প্রদেশের নাম বদলে নতুন নাম দেওয়া হয়েছে 'খাইবার পাখতুন খাওয়া'। তার মানে পাকিস্তানের গর্বিত কন্যা হিসেবে আমার জন্ম হয়; যদিও সব সোয়াতির মতো

www.pathagar.com

আমিও নিজেকে প্রথমে সোয়াতি তারপর পশতুন; তারপর পাকিস্তানি মনে করি।

আমাদের বাড়ি যে সড়কের পাশে ছিল সেই সড়কের পাশেই আরেকটা পরিবার ছিল। সেখানে সাফিনা নামে আমার বয়সী একটা মেয়ে এবং আমার দুই ভাইয়ের বয়সী তারও দুই ভাই বাবর এবং বাসিত ছিল। আমরা রাস্তা অথবা বাড়ির ছাদে ক্রিকেট খেলতাম। কিন্তু আমি জানি আমরা যারা খেলা করছি তাদের মধ্যে আমাদের মেয়েদের বরাবরের জন্য ঘরে ঢুকে যেতে হবে। রান্না বান্না করতে হবে অথবা বাবা-ভাইয়ের সেবা করতে হবে। পুরুষেরা যখন বাধাহীনভাবে শহরে ঘুরে বেড়াতে পারছে, সেখানে আমি বা আমার মাকে অবশ্যই পুরুষ স্বজনের সাথে, এমনকি পাঁচ বছর বয়সী ছেলে শিশুকে নিয়ে বাইরে বের হতে হচ্ছে। এটাই আমাদের সংস্কৃতি।

খুব ছোটবেলাতেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, আমি এমন হবো না। আমার আব্বা সব সময় বলতেন এবং এখনও বলেন, 'মালালা হবে পাখির মতো স্বাধীন।' আমি মহামতি আলেকজান্ডারের মতো মাউন্ট ইলমের চূড়ায় উঠে জুপিটারকে ছোঁয়ার স্বপ্ন দেখতাম; এমনকি এই উপত্যকার বাইরের রাজ্যেও আমি ছড়িয়ে পড়বো। কিন্তু যখন ছাদের ওপর আমার ভাইদের ঘুরি ওড়াতে দেখতাম, তারা যখন একজন অন্যজনের ঘুড়ির মাঞ্জা সুতো কৌশল করে কেটে দিতো আর ঘুড়িগুলো কাঁপতে কাঁপতে নিচে পড়ে যেতো; তখন ভাবতাম মেয়েরা কতটা স্বাধীন হতে পারে।

www.pathagar.com

২

আমার আব্বা, ক্ষিপ্র বাজপাখি

ছেলেবেলা থেকেই আব্বার উচ্চারণগত সমস্যা আছে। অনেক সময় তার কথা আটকে যেত এবং রেকর্ডের মতো কোনো একটি শব্দের প্রথমাংশ তিনি বারবার বলতে থাকতেন; আর আমরা শব্দটির শেষাংশ তার মুখ দিয়ে বের হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতাম। আব্বা বলতেন, কথা বলার সময় কেমন যেন একটা অদৃশ্য দেওয়াল তার গলায় বাধা সৃষ্টি করত। বিশেষ করে 'ম', 'প' এবং 'ক' আদ্যাক্ষরের শব্দ তার উচ্চারণের পথে বড় শত্রু ছিল। এগুলো উচ্চারণ করতে গেলেই তোতলামি শুরু হয়ে যেতো। আমি আব্বাকে খোঁচা দিয়ে বলতাম, 'মালালা' নামে ডাকার চাইতে সহজ বলে তিনি আমাকে 'জানি' বলে ডাকতেন। যে লোক বক্তৃতা এবং কবিতা আবৃত্তি পছন্দ করে তার জন্য তোতলামির সমস্যা খুবই ভয়ানক ব্যাপার। আব্বার এক মামা এবং এক চাচাও তোতলা ছিলেন। কিন্তু প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায় আব্বার তোতলামি দশাকে আরও করুণ পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর আব্বা মানে আমার দাদাজান। তিনি এমনিতেই চড়া কণ্ঠে কথা বলতেন; আর তাঁর ধমক শুনে আব্বার কথা এমনিতেই গলায় আটকে যেত।

কথা বলার সময় একটি বাক্য উচ্চারণের মাঝখানে আটকে গেলে দাদাজান আব্বাকে, ধমক দিয়ে বলতেন, 'থু থু ফেল, বেটা!' দাদাজানের নাম রুহুল আমিন যার অর্থ 'সরল আত্মা'। জিব্রাইল ফেরেশতার আরেক নাম রুহুল আমিন। নিজের এই নাম নিয়ে দাদাজানের এতটাই গর্ব ছিল যে নিজের পরিচয় দেওয়ার সময় তিনি একটা বিখ্যাত কবিতার চরণ আবৃত্তি করতেন যার মধ্যে তার নামের উল্লেখ রয়েছে। দাদাজান ছিলেন খুবই খিটখিটে মেজাজের লোক। মুরগী দাপাদাপি করে অ্যাশট্রে বা কাপ ভেঙে ফেলেছে- এমন সব অতি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তিনি গলা ফাটিয়ে বাড়ি মাথায় করতেন। রেগে গেলে পুরো মুখ লাল হয়ে যেতো; রাগের চোটে তিনি কেতলি বা হাড়ি পাতিল যা হাতের সামনে পেতেন ছুড়ে মারতেন। আমি দাদিমাকে দেখিনি। আব্বার কাছে শুনেছি তিনি নাকি হাসতে হাসতে দাদাজানকে বলতেন, 'সব সময় ভ্রু কুঁচকে, নাক সিটকিয়ে আপনি আমাদের সাথে কথা বলেন। আমার মউতের পর আল্লাহ্ যেন আপনাকে এমন একটা বউ দেয় যে জীবনে কোনদিন হাসে নি।'

www.pathagar.com

আব্বার তোতলামি নিয়ে দাদিজান এত চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন যে শিশু অবস্থায় তাকে নিয়ে দাদীজান এক দরবেশের কাছে যান। বাসে করে লম্বা পথ পাড়ি দেওয়ার পর প্রথম এক ঘন্টা হাঁটা পথে একটা পাহাড়ে উঠতে হয়। দাদীজানের সঙ্গে ছিলেন তাঁর ভাতিজা ফজলি হাকিম। তিনি আব্বাকে কাঁধে করে পাহাড়ি পথ বেয়ে সেই দরবেশের আস্তানায় পৌছান। পাগল ও উন্মত্ত রোগীদের শান্ত করতে পারতেন বলে লোকে ওই পীরকে 'লেবানো ফকির' বা 'পাগলা দরবেশ' বলে ডাকতো। পীরের কাছে যাওয়ার পর তিনি আব্বাকে হা করতে বললেন। আব্বা হা করার পর তার গালে একটা টোকা দিলেন। এরপর তিনি খানিকটা আখের গুড় এনে নিজের মুখে নিলেন। থু থু মিশিয়ে গুড়টুকু নরম করে একটা পিণ্ডের মতো বানালেন। এবার গুড়টুকু দাদীজানের হাতে দিয়ে এর থেকে রোজ একটু একটু করে ছেলেকে খাওয়াতে বললেন। তবে শেষ পর্যন্ত এই চিকিৎসায় আব্বার তোতলামি সারে নি। অনেকে ভেবেছিলেন আব্বার তোতলামী ভয়ানক মাত্রায় চলে গিয়েছিল। ফলে আব্বা একদিন দাদাজানকে যখন বললেন তিনি একটি বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে যাচ্ছেন তখন বিস্ময়ে দাদাজানের ফিট পড়ার দশা। রুহুল আমিন হাসতে হাসতে বললেন, 'তুই পারবি কিভাবে? একটা বাক্য শেষ করতেই তো তোর এক-দুই মিনিট লেগে যায়।' আব্বা বললেন, 'চিন্তা করবেন না। আপনি শুধু বক্তৃতাটা লিখে দেন। আমি পুরোটা মুখস্ত করে নেব।'

বক্তা হিসেবে দাদাজানের তখন খুব নামডাক। শাহপুর গ্রামে সরকারি হাইস্কুলে তিনি তখন ধর্মশিক্ষা পড়ান; পাশাপাশি স্থানীয় একটি মসজিদে ইমামতি করেন। তিনি ছিলেন অপূর্ব সম্মোহনী ক্ষমতাসম্পন্ন বক্তা। জুমার দিনে তাঁর বয়ান শুনতে বহু দূরের পাহাড় থেকে লোকজন গাধার পিঠে চড়ে কিংবা পায়ে হেঁটে চলে আসতো।

অনেক বড় পরিবারে আব্বার জন্ম। সাঈদ রমজান নামে আব্বার এক বড় ভাই যাকে আমি খান দাদা বলে ডাকি তিনি এবং তাঁদের পাঁচ বোন আছে। বারকানা নামের একটা গণ্ডগ্রামে মাটির ছাদ ওয়ালা একটা জীর্ণ একতলা ভবনে জড়াজড়ি করে তারা বাস করতেন। বৃষ্টি নামলে বা তুষারপাত হলে ওই ছাদ চুইয়ে ঘরের ভেতরে পানি পড়তো। বেশিরভাগ পরিবারের মতো এই পরিবারের মেয়েদেরও বাড়িতে থাকতে হতো। শুধুমাত্র ছেলেরা স্কুলে যেতে পারতো। আমার আব্বা বলেন, 'তখন মেয়েরা কেবলমাত্র বিয়ে হওয়ার অপেক্ষায় থাকতো।'

আমার ফুপুরা যে শুধুমাত্র স্কুলে যাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছে তা নয়। প্রতিদিন সকালে নাস্তার সময় আব্বাকে মাখন অথবা দুধ খেতে দেওয়া হতো। আর তাঁর বোনদের দেওয়া হতো দুধ ছাড়া রং চা। নাশতায় কখনো যদি ডিম থাকতো সেগুলো কেবলমাত্র ছেলেদেরই দেওয়া হতো। রাতের খাবারের জন্য মুরগী জবাই হলে মেয়েদের পাতে পড়তো পাখনা আর গলার হাড়; অন্যদিকে রান অথবা বুকের মাংস দেওয়া হতো আব্বা, তাঁর ভাই এবং দাদাজানের পাতে। আব্বা বলেন, 'খুব ছোটবেলায়ই টের পেয়েছিলাম আমি আমার বোনদের থেকে আলাদা।'

www.pathagar.com

ওই গ্রামে বাস করে কিছু করার সুযোগ খুব কমই ছিল। দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী গ্রামটা এত চিপা ও সংকীর্ণ ছিল যে সেখানে একটা ক্রিকেটের পিসও বানানো সম্ভব ছিল না। পুরো গ্রামে মাত্র একটি বাড়িতে একটি টেলিভিশন ছিল। প্রতি শুক্রবার আব্বা আর তার বড় ভাই মসজিদে যেতেন; ঘণ্টা খানিক মিম্বরে দাঁড়িয়ে দাদা যে মোহময়ী বয়ান করতেন তা তারা অবাক বিস্ময়ে শুনতেন। দাদাজানের কণ্ঠ চড়া হতে হতে কখন প্রায় চিকার পর্যায়ে চলে যাবে এবং আক্ষরিক অর্থেই মসজিদ ঘরের আড়া কেঁপে উঠবে সেই মুহূর্তের জন্য তারা অপেক্ষা করতেন।

আমার দাদাজান ভারতে পড়াশুনা করেছিলেন। সেখানে তিনি মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহ (পাকিস্তানের স্থপতি), জওহরলাল নেহেরু, মহাত্মা গান্ধী এবং আমাদের মহান পশতুন নেতা ভরতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মী খান আবদুল গফফার খানের মতো বক্তা ও নেতাকে সামনা সামনি দেখেছিলেন। এমনকি বাবা (দাদাজানকে আমি 'বাবা' সম্বোধন করতাম) ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট মধ্যরাতে উপনিবেশিক ব্রিটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের ঘটনারও প্রত্যক্ষদর্শী। তাঁর একটা বহু পুরনো রেডিও ছিল (সেটা আমার চাচার কাছে এখনও আছে) যাতে তিনি নিয়মিত খবর শুনতেন। এ কারণে তিনি যখন বয়ান করতেন তখন তার বক্তব্যে কুরান ও হাদীসে বর্ণিত ঘটনার পাশাপাশি সমসাময়িক বিশ্বের ঘটনা ও ঐতিহাসিক বিষয় উঠে আসতো। রাজনীতি নিয়েও তিনি কথা বলতে ভালোবাসতেন। ১৯৬৯ সালে, অর্থাৎ যে বছর সোয়াত পাকিস্তানের অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়, সে বছরই আব্বার জন্ম। পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বহু সোয়াতি অখুশি হন। তাদের অভিযোগ, পাকিস্তানের বিচার ব্যবস্থায় তাদের পুরনো উপজাতীয় শালিস আদালতের চেয়ে দীর্ঘসূত্রতাদুষ্ট এবং কম কার্যকর। সামাজিক শ্রেণি বৈষম্য, বংশ পরম্পরায় খানদের ক্ষমতায় থাকা, ধনী গরীবের অব্যাহত ফারাক– এসবের তীব্র সমালোচনা করতেন দাদাজান।

আমার দেশ পাকিস্তানের বয়স খুব বেশি না হলেও দুর্ভাগ্যজনকভাবে দেশটির একের পর এক সামরিক অভ্যুত্থানের কলঙ্কজনক ইতিহাস রয়েছে। আমার আব্বার বয়স যখন আট বছর তখন জিয়াউল হক নামের একজন জেনারেল ক্ষমতা দখল করেন। এখনও এখানে সেখানে তাঁর ফটো দেখা যায়। পাণ্ডার চোখের চারপাশে যেরকম কালো বৃত্ত থাকে ভয়ানক চেহারার এই লোকটির দুই চোখের চারপাশেও তেমন কালো বৃত্ত ছিল। সামনের পাটির উচু দাঁত দেখে মনে হয় অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য দাঁতগুলো বেরিয়ে থাকতো। চুলগুলো মাথার চাঁদির সঙ্গে সেঁটে থাকতো। এই জিয়াউল হক আমাদের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টোকে গ্রেপ্তার করে তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগ আনেন। এরপর বিচারের নামে তাঁকে রাওয়ালপিন্ডির জেলে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করেন। এখনও পাকিস্তানের মানুষ রাজনৈতিক আলাপ উঠলে ভুট্টোকে চমকপ্রদ এক মহান রাজনীতিক হিসেবে উল্লেখ করে থাকে। তারা বলে নিজে দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ভূস্বামী হওয়া সত্ত্বেও ভূট্টোই পাকিস্তানের প্রথম নেতা

www.pathagar.com

হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন যিনি দেশটির সাধারণ মানুষের পক্ষে দাড়িয়েছিলেন। ভুট্টোর ফাঁসি প্রত্যেককে আহত করে এবং এতে সারাবিশ্বে পাকিস্তানের ভাবমূর্তি ভীষণভাবে ক্ষুন্ন হয়। আমেরিকানরা সাহায্য সহযোগিতা দেওয়া বন্ধ করে দেয়।

দেশের মানুষের সমর্থন পাওয়ার জন্য জেনারেল জিয়া খাঁটি মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়ে ইসলামীকরণের এক ক্যাম্পেইন শুরু করেন। একই সঙ্গে তিনি আমাদের দেশের আদর্শিক ও ভৌগলিক সীমানার রক্ষাকর্তা হিসেবে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করা শুরু করেন। তিনি ঘোষণা দেন তার সরকার ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে। সে কারণে তার সরকারকে মেনে নেওয়া মুসলমানদের ঈমানী দায়িত্ব। আমরা কীভাবে এবাদত করবো তা নিয়েও জেনারেল জিয়া খবরদারি করা শুরু করেন। প্রতিটি জেলায়, এমনকি প্রত্যন্ত গ্রামেও তিনি সালাত কমিটি গঠন করেন এবং প্রায় এক লাখ সালাত বা নামাজ পরিদর্শক নিয়োগ করেন। এর আগে সমাজে মোল্লারা খুবই হাস্যকর অবস্থানে ছিল। আব্বা বলেন, তখন বিয়ে বাড়িতে বা অন্য কোনো অনুষ্ঠানে তাঁদের রেওয়াজ অনুসারে দাওাত করা হতো। অনুষ্ঠানস্থলের এক কোণে কাচুমাচু করে তারা বসতেন তারপর খেয়ে দেয়ে আগে ভাগে বিদায় হতেন। কিন্তু জেনারেল জিয়ার আমলে এরাই হয়ে ওঠে দোর্দণ্ড প্রতাপশালী। ইসলামী মাহফিলে ওয়াজ করার সময় কী বয়ান করতে হবে তার নির্দেশনা দিতে জেনারেল জিয়া তাদের ইসলামাবাদে দাওয়াত করে নিতেন। এমন কি দাদাজানও সেখানে যেতেন।

জিয়ার আমলে পাকিস্তানের নারীদের জীবনযাত্রার ওপর আরও অনেক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। জিন্নাহ বলেছিলেন, 'পুরুষের পাশাপাশি নারীদের অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো কালে কোনো সংগ্রাম সফল হয়নি; হতে পারে না। পৃথিবীতে দুটি ক্ষমতাধর বস্তু আছে– একটি অসি অপরটি মসি। তবে এই দুটির চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতাধর হল নারী।' কিন্তু জেনারেল জিয়া শরীয়া আইন চালু করলেন যার আওতায় আদালতে একজন পুরুষ সাক্ষীর সমান দুইজন নারীর সাক্ষ্যকে সমান করা হয়। অর্থাৎ পুরুষদের তুলনায় নারীর সাক্ষ্যের মূল্যকে অর্ধেক করা হয়। এর ফলে দেখা গেল, অতি দ্রুতই ধর্ষণের শিকার হয়ে গর্ভধারণ করা তের বছরের কিশোরীদের মতো বহু ভুক্তভোগী নারী কয়েদিতে জেলখানাগুলো পূর্ণ হয়ে উঠলো। নিজেদের নির্দোষ ও ধর্ষণের শিকার প্রমাণ করতে চারজন পুরুষ সাক্ষী হাজির করতে হতো। তা করতে না পারায় তাদের নির্দোষ হয়েও জেনা করার দায়ে কারাগারে পঁচে মরতে হতো।

পুরুষের অনুমতি ছাড়া একজন নারী একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পর্যন্ত খুলতে পারতো না। হকি খেলায় বরাবরই আমরা পাকিস্তানিরা ভালো। কিন্তু জেনারেল জিয়া নারী হকি খেলোয়াড়দের হাফ প্যান্টের বদলে ঢিলেঢালা পায়জামা পরা বাধ্যতামূলক করেন। এমনকি মেয়েদের জন্য কিছু খেলাকে একেবারে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

www.pathagar.com

ওই সময় পাকিস্তানে বহু মাদ্রাসা খোলা হয় এবং সব স্কুলেই ধর্মশিক্ষা বিষয়টি যেটিকে আমরা বলতাম 'দ্বীনিয়াত' সেটি বন্ধ করে সেখানে 'ইসলামিয়াত' বা ইসলামী শিক্ষা বিষয়টি চালু করা হয় যেটি পাকিস্তানের শিশুদের এখনও পড়তে হচ্ছে। আমাদের পাঠ্যপুস্তকের ইতিহাস বিকৃত করে লেখা হয় যেখানে পাকিস্তানকে 'ইসলামের দুর্গ' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। ওই ইতিহাসে এমনভাবে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে যাতে মনে হবে ১৯৪৭ সালেরও বহু আগে থেকেই পাকিস্তান আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং এসব বইয়ে হিন্দু এবং ইহুদিদের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। ওই সব বই পড়ে যে কারও মনে হতে পারে আমাদের মহাশত্রু দেশ ভারতের সঙ্গে ইতিপূর্বে সংঘটিত তিনটি যুদ্ধেই আমরা জয়ী হওয়ার পর তাদের করুণাবশত ছেড়ে দিয়েছি।

আব্বার বয়স যখন দশ বছর তখন সব কিছু বদলে গেল। ১৯৭৯ সালের বড়দিনের পর পরই রাশিয়া আমাদের প্রতিবেশি দেশ আফগানিস্তানে অভিযান চালায়। সীমান্ত পার হয়ে লাখ লাখ আফগান উদ্বাস্তু পাকিস্তানে আসতে থাকে। জেনারেল জিয়া তাঁদের আশ্রয় দেন। পাকিস্তানে, বিশেষ করে পেশোয়ারের সর্বত্র সাদা তাঁবু গাঁড়া বিশাল বিশাল শরণার্থী শিবির গড়ে ওঠে; এসব শিবিরের কিছু কিছু এখনও সেখানে রয়ে গেছে। সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রিত আমাদের সবচেয়ে বড় গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেওয়া এসব উদ্বাস্তদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার এবং প্রশিক্ষণ শেষে মুজাহিদীন হিসেবে রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করতে পাঠানোর এক বৃহৎ প্রকল্প হাতে নেয়। যদিও আফগানরা বরাবরই যোদ্ধা হিসেবে সুপরিচিত, ততাপি আইএসআইয়ের এই প্রকল্পের প্রধান কর্ণেল ইমাম আফগান যোদ্ধাদের ব্যাপারে বলেছিলেন তাদের সংগঠিত করা আর দাড়ি পাল্লায় ব্যাঙের ওজন করা সমান কথা (অর্থাৎ লাফালাফি করায় ব্যাঙ যেরকম দাড়িপাল্লায় ওজন করা দুঃসাধ্য, আফগানদের সামাল দেওয়া তেমনই কঠিন)।

আফগানিস্তানে রাশিয়ার অভিযান জেনারেল জিয়াকে রাতারাতি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিহীন দো-আশলা নেতা থেকে শীতল যুদ্ধকালীন স্বাধীনতার মহান পৃষ্ঠপোষকে রূপান্তরিত করে। রাশিয়া আমেরিকার– জানি দুশমন থাকাকালে যেমন আমরা আমেরিকানদের– নেক নজরে ছিলাম; ঠিক একইভাবে আফগানিস্তানে রাশিয়ার অভিযানের পর আমরা আবার আমেরিকার বন্ধু হয়ে উঠি। রাশিয়ায় অভিযান চালানোর অল্প কয়েক মাস আগে আমাদের পাশের দেশ ইরানের শাহ ইসলামী বিপ্লবে ক্ষমতাচ্যুত হন। এতে ইরানে সিআইএ তার ঘাঁটি হারায়।

যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র দেশ হিসেবে ইরানের শূন্যস্থান পূরণ করে পাকিস্তান। আমেরিকা এবং অন্যান্য পশ্চিমা দেশ থেকে শত শত কোটি ডলারের স্রোত পাকিস্তানের দিকে আসতে থাকে। রাশিয়ার কমিউনিস্ট রেড আর্মির বিরুদ্ধে লড়াই চালানোর জন্য আফগান মুজাহিদীনদের সাহায্য করতে এসব দেশ আইএসআইকে অত্যাধুনিক সমরাস্ত্রও সরবরাহ করতে থাকে।

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান হোয়াইট হাউসে এবং প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে বৈঠক করার জন্য জেনারেল জিয়াকে আমন্ত্রণ জানান। তারা দুজনই জেনারেল জিয়ার ব্যাপারে প্রশংসার ফুলঝুরি ছিটাতে থাকেন।

জিয়া তেমন একটা চালাকচতুর নন এবং তিনি ভবিষ্যতের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারবেন না– এমন ধারণা থেকে প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো জিয়াকে সেনাপ্রধান বানিয়েছিলেন। ভুট্টো তাঁকে আদর করে বাঁদর বলতেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই জেনারেল জিয়া কুচক্রি-ধূর্ত হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি আফগানিস্তানকে শুধু যে পশ্চিমাদের সেনা সমাবেশের স্থান বানিয়ে ছেড়েছিলেন তাই নয় তাঁর উসকানিতেই সুদান থেকে তাজিকিস্তানের মুসলিম জিহাদিরা আফগানিস্তানে এসে জড়ো হয়।

পশ্চিমাদের চাওয়া ছিল, যে কোনো মূল্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে কমিউনিজমের বিস্তার ঠেকানো। অপরদিকে সুদান থেকে তাজিকিস্তানের মুসলমানের রাশিয়ায় আফগান ভূমি দখলকে ইসলামি রাষ্ট্রের ওপর কাফেরদের আক্রমন হিসেবে দেখেছিল। পশ্চিমা দেশগুলোর পাশাপাশি সমগ্র আরব জাহান, বিশেষ করে সৌদি আরব থেকে অর্থকড়ির বন্যা আসতে থাকে। পাশাপাশি সৌদি ধনকুবের ওসামা বিন লাদেনের মতো বহু স্বেচ্ছাসেবী যোদ্ধা মুজাহিদীনদের সঙ্গে যোগ দেয়।

পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সীমান্ত রেখা আমাদের– পশতুনদের ভাগ করেছে; যদিও একশ বছরেরও বেশি সময় আগে ব্রিটিশদের আঁকা এই সীমান্ত নকশা আমরা কখনোই স্বীকার করিনি বা মেনে নেইনি। সোভিয়েত ইউনিয়নের এই আগ্রাসনে ধর্মীয় ও জাতীয়তাবাদী চেতনার কারণে আমাদের পশতুনদের রক্ত টগবগ করে ফুটতে থাকে। মসজিদে ইমাম সাহেবরা বয়ান করার সময় আফগানিস্তানে সোভিয়েত হামলার কথা তুলে ধরতে থাকেন। তাঁরা রাশিয়ান সেনাদের কাফের-মুরতাদ ঘোষনা দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য মুসলমানদের নির্দেশ দিতে থাকেন। তাঁরা বলতে থাকেন এই জিহাদে যোগ দেওয়া প্রত্যেক মুমিনের জন্য ফরয। বিষয়টা এমন পর্যায়ে চলে যায় যে এক পর্যায়ে অনেকে মনে করা শুরু করে ইসলামের পাঁচ স্তম্ভ কালিমা, নামাজ, রোজা, হজ যাকাতের পর ষষ্ঠ স্তম্ভ হলো জেনারেল জিয়ার অধীনে জিহাদে যোগ দেওয়া। আব্বা বলেন আমাদের এই অঞ্চলে এই ধরনের জিহাদি তত্ত্ব ছড়িয়ে দিতে প্রবল উৎসাহ দিয়েছিল সিআইএ। যুক্তরাষ্ট্রের একটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরবরাহ করা যে পাঠ্য বই পেশোয়ারের শরনার্থী শিবিরে পড়ানো হতো তাতে পর্যন্ত জিহাদের ধারণা ঢোকানো ছিল। ছোট ছোট শিশুদের গণিতের বইয়েও সুকৌশলে যুদ্ধের উসকানি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যেমন, 'যদি ১০জন রাশিয়ান কাফেরকে একজন মুসলমান কৃতল করে তাহলে বাকি থাকে আরও পাঁচজন' অথবা '১৫টি গুলি–১০টি গুলি=৫টি গুলি।'

www.pathagar.com

আমার আব্বার জন্ম যে জেলায়, সেখান থেকে কিছু ছেলে আফগানিস্তানে লড়াই করতে গিয়েছিল। আব্বার কাছে শুনেছি, সুফি মোহাম্মাদ নামের একজন মাওলানা একদিন তাঁদের গ্রামে এসে সেখানকার নওজোয়ানদের রুশ সেনাদের বিরুদ্ধে চলমান জিহাদে যোগ দিতে বলেছিলেন। তাঁর বয়ান শুনে বহু তরুণ পুরনো রাইফেল অথবা মামুলি কুড়াল বা বাজুকা নিয়ে আফগানিস্তানে চলে গিয়েছিল। ওই মাওলানার সংগঠন যে পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে সোয়াত তালেবানে রূপ নেয় সে খবর আমাদের প্রায় অজানাই ছিল। রুশবিরোধী লড়াইয়ের সময় আব্বার বয়স ছিল মাত্র ১২ বছর।

এত ছোট থাকায় তিনি লড়াই করতে যেতে পারেননি। তবে রাশিয়া আফগানিস্তানে প্রায় ১০ বছর ধরে যুদ্ধ চালায়। অর্থাৎ আশির দশকের পুরোটাই সেখানে লড়াই চলেছে। একটু বড় হওয়ার পর আব্বা যখন উঠতি তরুণ তখন তিনি জিহাদি হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ওই সময় তিনি নিয়মিত নামাজ পড়তেন না বটে, তবে প্রতিদিনি ভোরে ফজরের নামাজ শেষে পাশের গ্রামের একটি মসজিদে কোরআন শিখতে যেতেন। সেখানে তার চেয়ে বয়সে বড় একজন তালেবও কোরআন শিখতেন। ওই সময় 'তালেব' বলতে শুধুমাত্র 'মাদ্রাসা ছাত্র'কেই বোঝানো হত। আব্বা ওই তালেবের সঙ্গে পুরো ৩০ পারা কোরআন তাফসীর (ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ)-সহ শুদ্ধভাবে তেলাওয়াত করা শেখেন।

ওই তালেব এমনভাবে জিহাদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতেন যা শুনে আব্বা তার মায়াজালে বন্দী হয়ে গিয়েছিলেন। লোকটা আব্বাকে নিরন্তর বোঝাচ্ছিলেন এই দুনিয়ার জিন্দেগি খুবই ছোট; আর এই গ্রামে নওজোয়ানদের তেমন কিছু করার সুযোগও খুব কম। আব্বার পরিবারের সম্পত্তি বলতে অল্প কিছু জমি ছিল। অন্য অনেক সহপাঠীর মতো দক্ষিণের কয়লাখনিতে কাজ করতেও তার মনে সায় দিচ্ছিল না। কয়লাখনিতে কাজ করা ভয়াবহ ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। যারা খনিতে কাজে যায়, দুর্ঘটনার শিকার হয়ে তাঁদের অনেকে মারা যায়। বছরে দু'একবার তাদের কফিনবন্দি লাশ নিয়ে আসতে দেখা যায়। গ্রামের বেশিরভাগ ছেলেরা সৌদি আরব কিংবা দুবাইয়ে গিয়ে নির্মাণ প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সুযোগকে অনেক বড় ব্যাপার বলে মনে করে। এ কারণে ৭২ জন হুরের সঙ্গে জান্নাতি জীবন কাটানোর খায়েশ তাদের বেশি আকর্ষণ করে। প্রতি রাতে আমার আব্বা আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন, 'ও আল্লাহ, আমাকে তুমি কাফেরদের সঙ্গে মুসলমানদের ওই জিহাদে শরিক করো যাতে তোমার জন্য মৃত্যুবরণ করে শহিদী মর্যাদা লাভ করতে পারি।'

এই সময়কালে আব্বা তাঁর মুসলমান পরিচয়টাকেই তাঁর জীবনের অন্য যে কোনো কিছুর চেয়ে মূল্যবান মনে করতেন। ওই সময় তিনি নিজেদেরকে 'জিয়াউদ্দিন পাঁচপিরি' (পাঁচপিরি একটি তরিকার অনুসারী সম্প্রদায়) বলে পরিচয় দিতেন এবং দাড়ি রাখা শুরু করেন। আব্বা বলেন, সে সময় তিনি এক ধরনের মগজ ধোলাইয়ের শিকার হন। এখন তাঁর মনে হয় আর কিছুদিন ওই জগতে থাকলে তিনি হয়তো একজন আত্মঘাতী হামলাকারী হয়ে যেতেন। কিন্তু

www.pathagar.com

ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন সন্দিগ্ধ ধরনের লোক। যদিও আমাদের সরকারি বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষা ব্যবস্থায় পুঁথিগত বিদ্যাকেই শাশ্বত হিসেবে মেনে নেওয়া এবং এ নিয়ে শিক্ষকদের প্রশ্ন করাটাকেও শিক্ষার্থীদের এখতিয়ারের বাইরের বিষয় মনে করা হয়; তথাপি আব্বা শিশুকাল থেকেই প্রশ্নমুখর ও অনুসন্ধিৎসু ছিলেন।

আব্বা যখন শহিদী মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জান্নাতে যাওয়ার জন্য ইবাদত বন্দেগী করছিলেন; এমন সময় আম্মার ভাই, অর্থাৎ আমার মামা ফাইয়াজ মোহাম্মদের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। সেই সুবাদে তিনি ওই পরিবারের সঙ্গে মিশতে এবং নানার হুজরায় যেতে শুরু করেন। ওই পরিবারটি ইহজাগতিক জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিল। তাঁরা যুদ্ধে জড়ানোর ঘোর বিরোধী ছিলেন। পেশোয়ারের যে বিখ্যাত কবি মেইবান্দের মালালাইকে নিয়ে কবিতা লিখেছিলেন, সেই রহমত শাহ্ সায়েলের আফগানিস্তানের যুদ্ধ নিয়ে একটি বিখ্যাত কবিতা আছে। সে কবিতায় আফগানিস্তানের যুদ্ধকে তিনি 'দুই হাতির লড়াই' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, এটি যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এই দুই দানবাকৃতির হাতির লড়াই; এটি আমাদের যুদ্ধ নয়। এই দুই দানবের ধ্বস্তাধ্বস্তির মাঝখানে পড়ে আমরা পশতুনরা ঘাসের মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। আমি যখন খুব ছোট তখন আব্বা প্রায়ই আমাকে কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনাতেন। তবে তখন আমি এর মানে বুঝতে পারতাম না।

আম্মার ভাই ফাইয়াজ মোহাম্মদ আব্বাকে মুগ্ধ করেন। আব্বা বলেন, ফাইয়াজ গণচেতনার কথা বারবার বলতেন। বিশেষ করে, আমাদের দেশের সামন্তবাদী ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যেখানে ধনী শ্রেণি দিন দিন ধনী আর গরীবেরা ক্রমাগত গরীব হচ্ছে– এই অবস্থার তিনি পরিবর্তন কামনা করতেন। একদিকে উগ্র ইহজাগতিকতাবাদ ও সমাজতন্ত্র এবং অন্যদিকে ইসলামী জঙ্গিবাদ– এই দুই মতবাদের মাঝখানে পড়ে আব্বা নিজেকে নিষ্পেষিত মনে করা শুরু করেন। আমার মনে হয়; আব্বা অবশেষে এই দুই উগ্র আদর্শবাদ থেকে সরে এসে মাঝামাঝি একটা অবস্থানে এসে স্থিত হয়েছেন।

আব্বা দাদাজানকে সমীহ করতেন; ভয় করতেন। দাদাজান সম্পর্কে আব্বার কাছ থেকে অনেক মজার মজার গল্প শুনেছি। 'বাবা' (দাদাজান) এত জনপ্রিয় বক্তা ছিলেন যে, আর একটু বেশি কূটনৈতিক জ্ঞান সম্পন্ন এবং তার চাচাতো ভাইদের সঙ্গে একটু কম রেষারেষি করলে তিনি নিশ্চিতভাবেই একজন বড় নেতা হতে পারতেন। আমাদের পশতুন সমাজে জ্ঞাতিভাইরা যদি আপনার চেয়ে বেশি জনপ্রিয় বা ধনী হয়ে যায় তাহলে তা আপনার পক্ষে হজম করা খুবই কঠিন। দাদাজান যে স্কুলে শিক্ষকতা করতেন ওই একই স্কুলে তাঁর এক চাচাতো ভাই শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। যোগ দেওয়ার সময় তিনি কাগজপত্রে যে জন্মতারিখ উল্লেখ করেন, তাতে দাদাজানের চেয়ে তার বয়স অনেক কমে যায়। কিন্তু আদতে তিনি দাদাজানের চেয়ে বড় ছিলেন। আমাদের সমাজে বেশিরভাগ লোকই তাঁদের সুনির্দিষ্ট জন্মতারিখ জানে না। যেমন আমার মা জানেন না তাঁর জন্ম কোন বছরের কী মাসের কত তারিখে হয়েছিল।

www.pathagar.com

আমাদের এখানে লোকজন সাধারণত জন্মতারিখ মনে রাখার জন্য ভূমিকম্প বা এই ধরনের ঘটনার সময়কে উল্লেখ করে। দাদাজান জানতেন তাঁর চাচাতো ভাই বয়সে তাঁর চেয়ে অনেক বড়। কিন্তু ওই চাচাতো ভাই বয়স কম দেখানোয় দাদাজান সাংঘাতিক ক্ষেপে যান। তিনি সারদিন বাসে চড়ে মিদোরায় এসে সরাসরি সোয়াতের শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। তিনি মন্ত্রীকে বললেন, 'সাহেব, আমার এক চাচাতো ভাই আছে যে আমার চেয়ে কম করেও ১০ বছরের বড়। কিন্তু আপনি তাঁকে আমার চেয়ে ১০ বছরের ছোট দেখিয়ে সার্টিফিকেট দিয়েছেন। মন্ত্রী বললেন, 'ঠিক আছে মাওলানা, আপনিই বলুন আপনার বয়স কত লিখবো। লিখে দেবো, কোয়েটায় ভূমিকম্প হওয়ার বছর আপনার জন্ম হয়?' দাদাজান এবার মন্ত্রীর কথায় রাজী হলেন। তাঁর নতুন জন্মতারিখ হয় ১৯৩৫ সাল। ফলে তাঁর বয়স তাঁর চাচাতো ভাইয়ের চেয়ে কয়েক বছর কমে গেল।

এই পারিবারিক দ্বন্দ্বের কারণে ছোটবেলা থেকেই আব্বা তাঁর চাচাতো ভাইদের উৎপীড়নের শিকার হয়েছিলেন। আব্বা ছিলেন তুলনামূলকভাবে উচ্চতায় খাটো এবং গায়ের রং ছিল শ্যামলা। স্কুলে বেশি ফর্সা ও লম্বা ছেলেদের কালো ও বেটে ছেলেদের তুলনায় শিক্ষকেরা বেশি পছন্দ করতেন। সেদিক থেকে আব্বার যে দুর্বলতা ছিল, তিনি যে হীনমন্যতায় ভুগতেন, সেকথা তাঁর চাচাতো ভাইয়েরা জানতেন। তাঁরা তাঁকে স্কুলে যাওয়া-আসার পথে থামাতেন এবং 'বেটে-কালো' বলে উত্যক্ত করতেন। আমাদের সমাজে এ ধরনের অপমানের প্রতিশোধ নেওয়াটা খুব স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু আব্বা তাঁদের চেয়ে অনেক খাটো ছিলেন বলে তাঁদের কিছু বলতে পারতেন না। এ ছাড়া আব্বার মনে হতো, দাদাজানকে সন্তুষ্ট করার মতো কোনো কাজ এ জীবনে তাঁর হয়তো করে ওঠা হবে না। দাদাজানের হাতের লেখা ছিল খুবই সুন্দর। তাঁর মতো হাতের লেখা শিখতে আব্বা ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনুশীলন করতেন কিন্তু দাদাজান কখনোই তাঁর হাতের লেখার প্রশংসা করতেন না।

আমার দাদীজান কিন্তু আব্বার চেষ্টা ও অধ্যবসায়কে মূল্যায়ন করতেন। আব্বা তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন। দাদীজানের বিশ্বাস ছিল, আব্বার ভাগ্যে অনেক বড় কিছু আছে। তিনি আব্বাকে এত পছন্দ করতেন যে, সবার চোখ এড়িয়ে তিনি আব্বার জন্য বাড়তি একটু মাংস কিংবা দুধের সর রেখে দিতেন। সেই সময় গ্রামে বিদ্যুৎ না থাকায় সেখানে পড়াশুনা করা খুব সহজ ছিল না। হুজরাতে আব্বা কেরোসিন তেলের কুপি জ্বালিয়ে রাতে পড়াশুনা করতেন। একদিন সন্ধ্যায় পড়তে পড়তে আব্বা ঘুমিয়ে গিয়েছিলেন। ধাক্কা লেগে তেল গড়িয়ে পড়েছিল। ভাগ্যিস, আগুন ধরার আগেই দাদীজান দেখতে পেয়েছিলেন। দাদীজানের কারণেই আব্বা জীবনের কঠিন পথে একলা চলার আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছিলেন। পরবর্তীতে আব্বা আমাকে সেই পথ দেখান।

তবে দাদীজান আব্বার ওপর একবার খুব ক্ষেপে গিয়েছিলেন। আমাদের ওখানে দেরাই সায়দান নামে সবার কাছে পবিত্র বলে পরিচিত একটা জায়গা আছে।

www.pathagar.com

সেখান থেকে প্রায়ই সুফি-ফকিরেরা আমাদের গ্রামে দান-খয়রাত হিসেবে আটা-ময়দা তুলতে আসতেন। একদিন সেরকম কয়েকজন এলো। বাড়িতে সেদিন দাদাজান-দাদীজান কেউই ছিলেন না। আব্বা তালা দেওয়া কাঠের বাকশো খুলে তাঁদের গামলা ভরে যবের আটা দিয়ে দিলেন। দাদাজান-দাদীজান বাড়ি ফিরে খুবই রেগে গেলেন এবং আব্বাকে মারধর করলেন।

মিতব্যয়িতার দিক থেকে পশতুনরা বরাবরই বিখ্যাত (যদিও অতিথি আপ্যায়নে তাঁরা খুবই দিলখোলা) এবং 'বাবা' (দাদাজান) বিশেষ করে অর্থকড়ির ব্যাপারে খুবই সাবধান ছিলেন। দুর্ঘটনাক্রমে কেউ যদি কখনও পাতে খাবার এঁটো রেখে উঠে যেতো তিনি ভয়ানক রেগে যেতেন। তিনি সাংঘাতিক নিয়মবাঁধা জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন এবং অন্যরা কেন তার মতো নয় তা তিনি বুঝতে চাইতেন না। শিক্ষক হিসেবে স্কুলের ক্রীড়া প্রতিযোগীতা বা বয়স্কাউটে তাঁর ছেলেদের যোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি কিছু আর্থিক ছাড় পেতেন। এই ছাড়ের পরিমাণ এত কম ছিল যে বেশিরভাগ শিক্ষক সামান্য দুই-চার পয়সা বাঁচানোর জন্য এ নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। কিন্তু দাদাজান এই ছাড়ের জন্য প্রধান শিক্ষক বরাবর আবেদন করতে আব্বাকে বাধ্য করতেন। দরখাস্ত নিয়ে আব্বা যখন প্রধান শিক্ষকের অফিসের বাইরে অপেক্ষমান থাকতেন তখন লজ্জায় তাঁর শরীরে ঘাম ঝরতো। অফিসের ভেতরে ঢোকার পর তাঁর তোতলামী অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেড়ে যেতো। আব্বা আমাকে বলেছিলেন, 'তখন আমার মনে হত মাত্র পাঁচ রুপির জন্য আমার মান সম্মান সব ধুলোয় মিশে যাচ্ছে।' দাদাজান কখনো আব্বাকে নতুন বই কিনে দিতেন না। বছরের শেষ দিকে তিনি তাঁর ভালো ছাত্রদের তাঁদের বই আব্বাকে দেওয়ার জন্য রেখে দিতে বলতেন। নতুন ক্লাস শুরু হওয়ার আগে আব্বাকে ওই বই আনার জন্য সেসব ছাত্রদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিতেন। লজ্জায় আব্বার মাথা হেট হয়ে আসতো। কিন্তু তাঁর কিচ্ছু করার ছিলনা। পুরনো বইগুলোর পৃষ্ঠায় অন্যদের নাম লেখা থাকতো; তার নিজের নাম নয়।

আব্বা বলেন, 'অন্যের কাছ থেকে ধার করে বই পড়া খারাপ কিছু নয়। কিন্তু আমি চাইতাম আমার নিজের বাপের পয়সায় কেনা নতুন বই থাকবে যে বইয়ের পাতায় পাতায় অন্য ছাত্রদের নাম ঠিকানা লেখা থাকবে না।'

দাদাজানের এই মিতব্যয়ীতার প্রতি আব্বার তীব্র বিতৃষ্ণাই আব্বাকে বস্তুগত এবং চেতনাগত উভয় দিক থেকে শক্তি বাড়িয়ে দেয়। তিনি তাঁর এবং তাঁর চাচাতো ভাইদের মধ্যকার প্রথাগত দ্বন্দ্ব ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মনোভাবের অবসান ঘটাতে স্থির সংকল্পবদ্ধ হন। একবার প্রধান শিক্ষকের স্ত্রী গুরুতর অসুস্থ হন। আব্বা তাঁকে রক্ত দেন। ভদ্রমহিলা বেঁচে যান। এতে প্রধানশিক্ষক খুব অবাক হন এবং আব্বাকে তিনি ইতিপূর্বে যে নির্যাতন করেছেন তার জন্য আব্বার কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন।

আব্বা যখন তাঁর ছোটবেলার গল্প বলেন, তখন একটা কথা সব সময় বলেন। সেটা হলো, দাদাজান একজন জটিল এবং শক্ত মনের মানুষ হলেও তিনি

www.pathagar.com

আব্বাকে পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা উপহার দিয়েছিলেন। সে উপহারটি হলো শিক্ষা। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে ও ইংরেজী শিখতে মাদ্রাসায় ভর্তি না করিয়ে দাদাজান আব্বাকে সরকারি স্কুলে ভর্তি করিয়েছিলেন।

মসজিদের ইমাম হয়ে ছেলেকে আধুনিক স্কুলে ভর্তি করানোর জন্য অবশ্য দাদাজানকে তখন প্রচণ্ড সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল। 'বাবা' তখন আব্বার মধ্যে জ্ঞান অর্জনের তীব্র পিপাসা সৃষ্টি করতে এবং মানুষের অধিকারের বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করতে পেরেছিলেন যা পরবর্তীতে আব্বা আমার মধ্যে সঞ্চারিত করেন। জুমার বয়ানে দাদাজান গরীব মানুষ ও ভূস্বামীদের বৈষম্যের সমালোচনা করতেন এবং সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে ইসলামের অবস্থান কী তা ব্যাখ্যা করতেন।

তিনি ফার্সি ও আরবী বলতে এবং শব্দের গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা করতে পারতেন। বাড়িতে আব্বাকে শেখ সাদী, আল্লামা ইকবাল, জালালুদ্দিন রুমির মতো মহান কবিদের কবিতা এমন আবেগ দিয়ে পড়ে শোনাতেন, মনে হতো যেন তিনি মসজিদের মুসল্লিদের সেগুলো শেখাচ্ছেন।

তোতলামীবিহীন দরাজ গলার বাগ্মীতা অর্জনের তীব্র বাসনা ছিল আব্বার মধ্যে। অবশ্য আব্বা জানতেন, দাদাজানের একান্ত ইচ্ছা ছিল তাঁকে ডাক্তার বানানোর। কিন্তু একজন মেধাবী ছাত্র এবং প্রতিশ্রুতিশীল কবি হলেও তিনি বিজ্ঞান ও গণিতে ছিলেন কাঁচা। এটি দাদাজানের মনোকষ্টের কারণ হয়ে দাড়িয়েছিল। একারণে দাদাজানকে খুশি করতে তিনি জেলা পর্যায়ের উন্মুক্ত বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় নাম লেখান। এমন সিদ্ধান্তে সবাই তাঁকে পাগল মনে করেছিল। শিক্ষক ও বন্ধুরা তাঁকে প্রতিযোগিতায় নাম দিতে নিরুৎসাহিত করেছিলেন। দাদাজানও বক্তৃতা লিখে দিতে গা ছাড়া ভাব দেখাচ্ছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত তিনি একটি চমৎকার বক্তৃতা লিখে দিলেন। আব্বা বক্তৃতাটি মুখস্ত করে একা একা চর্চা করতে লাগলেন। বাড়িতে একান্ত নিভৃতপূর্ণ পরিবেশ ছিল না বলে তিনি পাহাড়ের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে মুখস্থ করতে লাগলেন। আকাশের দিকে চেয়ে অথবা পাখিদের লক্ষ্য করে বক্তৃতা দিতে থাকলেন।

এ অঞ্চলে বিনোদনমূলক তেমন কিছুই হতো না। ফলে বক্তৃতার দিন উৎসবমুখর পরিবেশে গ্রামের হাজারো লোক এসে জড়ো হলো। যেসব ছেলে ভালো বক্তা হিসেবে আগে থেকেই পরিচিত তাঁরা একে একে বক্তৃতা দিয়ে গেল। সব শেষে আব্বার নাম ডাকা হলো। আব্বা আমাকে বলেছিলেন, 'যখন বক্তৃতামঞ্চে গিয়ে দাঁড়ালাম তখন দুই হাত কাঁপছিল; এক পা আরেক পায়ের সঙ্গে বাড়ি খাচ্ছিল। সামনে বসা মুখগুলো ঝাপসা লাগছিল। হাতের তালু ঘামছিল; গলা কাগজের মতো শুকনো হয়ে আসছিল।' তবে কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি নিজেকে সামলে নেওয়ার চেষ্টা করলেন। সামনে বসা শিক্ষকসুলভ মানুষগুলোর কথা মন থেকে ঝেড়ে ফেলার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন। শুকনো গলা থেকে কথা বের করার চেষ্টা করলেন। শেষ পর্যন্ত যখন তার মুখে কথা ফুটলো তিনি যেন নতুন

www.pathagar.com

এক শক্তি পেলেন। মুক্ত প্রজাপতিদের স্বাচ্ছন্দ ওড়াউড়ির মতো বাধাহীন উচ্চারণে বক্তৃতা দিতে লাগলেন তিনি। দাদাজানের মতো তাঁর গলা দরাজ না হলেও যথার্থ আবেগের কারণে প্রতিটি কথা যেন জীবন্ত হয়ে উঠছিল এবং আব্বা দ্রুত তাঁর আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছিলেন।

বক্তৃতা শেষ হলে তুমুল হর্ষোধ্বনি আর হাততালি পড়ে। বক্তৃতায় প্রথম হয়ে যখন তিনি পুরস্কারের কাপ নিতে যাচ্ছিলেন তখন আড়চোখে দেখলেন তাঁর পেছনে দাঁড়ানো লোকগুলোর মধ্য থেকে দাদাজান হাস্যোজ্জ্বল মুখে হাততালি দিচ্ছেন। আব্বা বলেন, 'এই প্রথম আমি তাঁর মুখে হাসি ফোটানোর মতো কোনো কাজ করলাম।'

এরপর থেকে আমাদের এলাকার প্রতিটি বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় আব্বা অংশ নিতেন। দাদাজান বক্তৃতা লিখে দিতেন। প্রায় সব অনুষ্ঠানেই প্রথম হতেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি স্থানীয়দের কাছে একজন খ্যাতিমান বক্তা হিসেবে পরিচিতি পেয়ে গেলেন। আসলে আব্বা তাঁর দুর্বলতাকে শক্তিতে পরিণত করতে পেরেছিলেন। এরপর এই প্রথমবারের মতো দাদাজান সবার সামনে আব্বার প্রশংসা করতে শুরু করলেন। তিনি গর্ব করে অন্যদের বলতে লাগলেন, 'জিয়াউদ্দিন হচ্ছে একটা শাহিন।' 'শাহিন' মানে বাজপাখি। বাজপাখি অন্যসব পাখিদের চেয়ে ওপরে উঠতে পারে। সেজন্য সবাইকে ছাড়িয়ে প্রথম হওয়ায় দাদাজান আব্বাকে বললেন, "এখন থেকে তুই তোর নাম লিখবি, 'জিয়াউদ্দিন শাহিন'।" তাৎক্ষণিকভাবে ওই নামটি আব্বা নিজের নাম হিসেবে লিখলেও পরে ভেবে দেখলেন বাজপাখি অন্য সবার চেয়ে উঁচুতে উঠলেও এটা একটা নিষ্ঠুর পাখি। এই ভেবে তিনি এই নাম লেখা বন্ধ করলেন। তার বদলে তিনি আমাদের সম্প্রদায়ের নামানুসারে নিজের নাম লিখলেন জিয়াউদ্দিন ইউসাফজাই।

www.pathagar.com

৩

স্কুলে বড় হয়ে ওঠা

আমার আম্মার বয়স যখন ছয় বছর তখন তিনি স্কুলে যান এবং ওই বছরই স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেন। পুরো গ্রামে তিনিই ছিলেন ব্যতিক্রম যাঁর বাবা এবং ভাইয়েরা তাঁকে স্কুলে যেতে উৎসাহ দিয়েছিলেন। পুরো ক্লাসে ছেলেদের মধ্যে তিনিই ছিলেন একমাত্র মেয়ে। বইভর্তি ব্যাগ কাঁধে করে খুব গর্বের সঙ্গে তিনি স্কুলে গিয়েছিলেন এবং দাবি করে বসেছিলেন ক্লাসের সব ছেলেদের চেয়ে তিনি পড়াশুনায় ভালো। তবে প্রতিদিনই তাঁকে বাড়িতে খেলাধুলায় ব্যস্ত থাকা চাচাতো বোনদের ছেড়ে ভগ্ন হৃদয়ে স্কুলে আসতে হতো। চাচাতো বোনেরা বাড়িতে খেলাধুলা করছে দেখে তাঁর ঈর্ষা হতো। রান্না করা, কাপড়চোপড় ধোয়া, ভাইবোনদের দেখাশুনা করা এসবই মেয়েদের জন্য শেষ পরিণতি মনে করে তখন মেয়েদের স্কুলে পাঠানোকে অর্থহীন মনে করা হতো। ফলে একদিন আম্মা তাঁর সব বই নয় আনায় বেচে দিলেন; ওই পয়সা দিয়ে রসগোল্লা কিনে খেলেন; অতঃপর আর কোনোদিন স্কুলে গেলেন না। তাঁর আব্বা কিছুই বললেন না। আম্মা এখন বলেন, তিনি যে স্কুলে গিয়ে আবার সেখানে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন তা তাঁর আব্বা খেয়ালও করেননি। তিনি রোজ সকালে নাস্তা হিসেবে মাখন দিয়ে রুটি খেয়ে জার্মান পিস্তলটা বগলের নিচে গুজে বেরিয়ে পড়তেন। স্থানীয় রাজনীতি ও শালিস বিচার করতে করতে তাঁর ব্যস্ত দিন কাটতো। তাছাড়া আরও সাত সন্তানকে নিয়ে তাঁর চিন্তা করতে হতো।

আব্বার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর লেখাপড়া শিখতে না পারার আক্ষেপ আম্মা প্রথম উপলব্ধি করেন। আম্মা এমন একজন মানুষের সংস্পর্শে আসেন যিনি অসংখ্য বইপত্র পাঠ করেছেন, যিনি তাঁকে (আম্মাকে) নিয়ে কবিতা লিখেছেন অথচ সে কবিতা পড়ার মতো অক্ষরজ্ঞান তাঁর নেই। তিনি যে লোকটার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়েছেন যিনি নিজে একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। স্ত্রী হিসেবে আব্বাকে তাঁর স্বপ্ন পূরণে সহায়তা করতে চেয়েছেন। নিজে একটা স্কুল চালু করা আব্বার কাছে ছিল একেবারে স্বপ্নের মতো। পরিবারের আর্থিক বা অন্য কোনো ধরণের সহায়তা ছাড়াই সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা ছিল খুবই কঠিন। আব্বা মনে করতেন শিক্ষাদীক্ষার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই হতে পারে না। আব্বা বলেন, সাগর থেকে বৃষ্টি–পানিচক্রের এই রহস্যের কথা বইয়ে

www.pathagar.com

পড়ার আগ পর্যন্ত তাঁদের গ্রামের নদীর পানির উৎস তাঁর কাছে খুবই রহস্যের ব্যপার ছিল। তিনি ভাবতেন নদীতে এত পানি আসে কোথা থেকে, আবার কোথায়ই বা এই পানি চলে যায়?

আব্বা শৈশবে যে স্কুলে পড়েছেন সেটা ছিল ছোট একটা একতলা ভবন। তাঁদের অনেক ক্লাস করতে হয়েছে খোলা মাঠে, গাছের নিচে বসে। সেখানে কোনো বাথরুম-টয়লেট ছিল না। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে তাঁদের মাঠে দৌড়াতে হতো। তারপরেও আব্বা মনে করেন তিনি অনেক ভাগ্যবান। পাকিস্তানের লাখ লাখ মেয়ের মতো আব্বার বোনেরা, মানে আমার ফুপুরা স্কুলে যেতে পারেননি। আব্বা মনে করেন লেখাপড়া তাঁর জীবনের জন্য একটা বিরাট বড় উপহার। তিনি বিশ্বাস করেন, পাকিস্তানের যাবতীয় সমস্যার মূল কারণ শিক্ষার অভাব। অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে রাজনীতিকেরা বার বার জনগণকে বোকা বানান এবং ঘুরে ফিরে বার বার খারাপ প্রশাসকেরাই নির্বাচিত হন। তিনি বিশ্বাস করেন, ধনী-গরিব, ছেলে-মেয়ে সবারই স্কুলে যাওয়ার অধিকার রয়েছে। আব্বা স্বপ্ন দেখতেন তিনি যে স্কুল প্রতিষ্ঠা করবেন তাতে শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা ডেস্ক থাকবে। একটা লাইব্রেরি থাকবে। কম্পিউটার থাকবে। দেওয়ালে ঝুলানো থাকবে বিভিন্ন শিক্ষামূলক পোস্টার। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিসটি থাকবে সেটি হলো স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার।

ছোট ছেলেকে নিয়ে আমার দাদাজানের স্বপ্ন ছিল ভিন্ন ধরণের– তিনি চেয়েছিলেন দুটি ছেলের মধ্যে এই ছেলেটি (আমার আব্বা) ডাক্তার হবে এবং সংসারের খরচাপাতির একটা বড় অংশ সে দেবে। আব্বার বড় ভাই একটা স্থানীয় স্কুলে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন। তিনি তাঁর পরিবার নিয়ে দাদাজানের সঙ্গে গ্রামে থাকতেন। বেতনের অর্থ থেকে কিছু জমিয়ে তিনি বসতঘরের পাশে একটা কংক্রিটের ছোট হুজরা বানিয়েছিলেন। জ্বালানি কাঠের যোগান দিতে তিনি পাহাড় থেকে গাছের গুড়ি কেটে নিজে বয়ে আনতেন। স্কুলে পড়ানো শেষ করে মাঠে কাজ করতে চলে যেতেন। সেখানে আমাদের কয়েকটি মহিষ ছিল। সেগুলো তিনিই দেখাশুনা করতেন। এছাড়া ছাদের তুষার সরানোর মতো ভারী কাজেও তিনি দাদাজানকে সাহায্য করতেন।

সোয়াতের সবচেয়ে উন্নত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জেহানজেব কলেজে এ লেভেলে ভর্তির জন্য আব্বা মনোনীত হলেও দাদাজান সেখানে আব্বার থাকাখাওয়ার খরচ যোগাতে অস্বীকৃতি জানালেন। দিল্লিতে তিনি বিনা বেতনে পড়াশুনা করেছেন; একজন তালেবের মতো রাতে মসজিদে ঘুমাতেন; স্থানীয় লোকজন যে ছাত্রদের খেতে দিতো তিনিও তাদের মধ্যে ছিলেন।

জেহানজেব কলেজ কর্তৃপক্ষ আব্বার ফি মওকুফে রাজি ছিল কিন্তু তাঁর থাকা-খাওয়ার অর্থ দরকার ছিল। পাকিস্তানে ছাত্রদের জন্য কোনো ব্যাংকঋণের ব্যবস্থা নেই এবং তখন পর্যন্ত কোনো ব্যাংকে পা পর্যন্ত রাখেননি। কলেজটি মিঙ্গোরার জোড়া শহর হিসেবে পরিচিত সাইদু শরিফ নামক এলাকায়। সেখানে

www.pathagar.com

আব্বার কোনো আত্মীয় বা পরিচিত এমন কেউ ছিল না যার বাসায় থেকে পড়াশুনা করা সম্ভব হয়। শাংলা গ্রামে কোনো কলেজ ছিল না। ফলে আব্বা যদি কলেজে না যেতে পারেন তাহলে আর কোনোদিনই তিনি গ্রাম থেকে বের হতে এবং স্বপ্ন পূরণ করতে পারবেন না।

কলেজে পড়া হবে না দেখে আব্বার বোধশক্তি লোপ পাওয়ার যোগাড় হলো। তিনি হতাশ হয়ে কান্নাকাটি করতে লাগলেন। স্কুল থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়ে বের হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে প্রিয় মাকে হারান আব্বা। আব্বা জানতেন, বেঁচে থাকলে অবশ্যই এ সময় তিনি ছেলের পাশে থাকতেন। আব্বা এই নিয়ে শেষ বারের মতো দাদাজানের কাছে কাকুতি মিনতি করলেন, কিন্তু কাজ হলো না। তখন একমাত্র আশা ছিল করাচিতে থাকা আব্বার দুলাভাই। দাদাজান বললেন, তাঁর জামাতা যদি তাঁকে করাচিতে তাঁর কাছে নিয়ে যান তাহলে সেখানকার কলেজে তিনি ভর্তি হতে পারেন। দাদীজানের মৃত্যুর পর শোক সন্তপ্ত পরিবারকে শান্তনা দিতে কয়েকদিনের মধ্যে আব্বার বোন এবং দুলাভাইয়ের আসার কথা ছিল।

আব্বা মনে মনে দোয়া করতে থাকলেন যেন তাঁরা তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যেতে রাজি হয়। তিন দিনের বাস জার্নি করে অবশেষে তাঁরা গ্রামে এসে পৌছলেন। তাঁরা বাড়িতে আসার পরপরই দাদাজান আব্বাকে তাঁদের সঙ্গে নেওয়ার জন্য দুলাভাইকে অনুরোধ করেন। কিন্তু দুলাভাই তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। এতে দাদাজান এতটাই রেগে যান, তাঁরা যে কয়দিন সেখানে ছিলেন সে কয়দিন তাঁদের সঙ্গে তিনি আর কথাই বলেননি। আব্বার মনে হলো তাঁর আর উচ্চশিক্ষা নেওয়ার কোনো আশাই নেই এবং তাঁকে তাঁর বড় ভাইয়ের মতোই গ্রামের কোনো স্কুলে শিক্ষকতা করে জীবন পার করতে হবে। প্রায় দেড় ঘন্টার হাঁটাপথের দূরত্বে সেবুর নামের একটি পাহাড়ি গ্রামে একটি স্কুলে খান দাদা (আমার চাচা) শিক্ষকতা করতেন। স্কুলটার নিজস্ব কোনো ভবনও ছিল না। একটা মসজিদের মিলনায়তন কক্ষে পাঁচ থেকে ১৫ বছেরর শ' খানেক শিশুকে পড়ানো হতো।

সেবুর গ্রামে মূলত গুজার, কোহিস্তানি এবং মিঞাঁ- এই তিন গোষ্ঠীর লোকজনের বাস। মিঞাঁদের আমরা স্থায়ী বাসিন্দা ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণির বলে মনে করতাম। তবে গুজার ও কোহিস্তানিদের বলতাম গেঁয়ো পাহাড়ি। মূলত মহিষ লালনই ছিল তাঁদের প্রধান জীবিকা। অধিকাংশ গুজার ও কোহিস্তানি শিশুদের দেখতে অপরিচ্ছন্ন ও নোংরা মনে হতো। পশতুনরা নিজেরা গরীব হলেও তাঁরা তাঁদের খাটো চোখে দেখতো। পশতুনরা তাঁদের ব্যাপারে বলতো, 'ওরা নোংরা, কালো, নির্বোধ। ওই গো মুর্খরা যেমন আছে তাদের তেমনই থাকতে দেওয়া উচিত। শিক্ষকেরা এইসব প্রত্যন্ত ও দুর্গম স্কুলগুলোতে পোস্টিং নিতে চান না। যে শিক্ষকেরা সেখানে চাকরি করতে বাধ্য হন তাঁরা নিজেদের মধ্যে সমঝোতা করে নিয়ে এক একদিন এক একজন ক্লাস নিতে যান। যে স্কুলে মাত্র দুইজন শিক্ষক, সেখানে একজন তিনদিন; অন্যজন বাকি তিনদিন যান। সপ্তাহের

www.pathagar.com

তিনদিন গরহাজির হয়েও দুইজনই হাজিরা খাতায় অগ্রিম সই করে রাখেন। স্কুলে পৌছে তাঁরা মূলত যেটা করে থাকেন তা হলো, বিরাট একটা লাঠি হাতে নিয়ে তাঁরা শিশুদের চিৎকার চেঁচামেচি বন্ধ করে তাদের শান্ত রাখেন। পড়াশুনা যে ভবিষ্যতে কাজে লাগবে শিক্ষকদের পড়ানোর ধরণের কারণে শিশুরা এই বিষয়টি কল্পনাই করতে পারে না।

তবে আমার চাচা অন্য শিক্ষকদের চেয়ে একটু বেশি কর্তব্যপরায়ণ। তিনি পাহাড়ি লোকদের পছন্দ করতেন। তাঁদের কষ্টসাধ্য জীবনযাত্রাকে সম্মান করতেন। এ কারণে বেশিরভাগ দিনই তিনি স্কুলে যেতেন এবং শিশুদের সাধ্যমতো শেখানোর চেষ্টা করতেন। স্কুলের পড়া শেষ করার পর আব্বার যেহেতু করার মতো কিছু ছিল না সেহেতু তিনি খান বাবাকে তাঁর কাজে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে সাহায্য করতে লাগলেন। এই সময় তাঁর ভাগ্যে পরিবর্তন আসে। আমার আরেক ফুপুর বিয়ে হয়েছিল আমাদের গ্রামেই।

স্কুলটা যে গ্রামে আমার ফুপুর বিয়ে হয়েছিল সেই গ্রামেই। ওই ফুপুর শ্বশুরবাড়ির দিকের এক আত্মীয় যার নাম নাসির পাচা; তিনি সেখানে বেড়াতে এসেছিলেন। তিনি আব্বাকে স্কুলে পড়াত দেখেছিলেন। নাসির পাচা দীর্ঘদিন সৌদি আরবে একটি নির্মাণ কোম্পানিতে কাজ করেছেন। সেখান থেকে যথেষ্ট অর্থকড়ি দেশে পাঠিয়েছিলেন। আব্বা নাসির পাচাকে বললেন, তিনি স্কুলের শিক্ষাজীবন কেবলই শেষ করেছেন এবং জেহানজের কলেজ থেকে সেখানে ভর্তির জন্য আমন্ত্রণও পেয়েছেন।

নিজের পিতার মুখ যাতে ছোট না হয়, সেজন্য তিনি নাসির পাচাকে বললেন না যে থাকা খাওয়ার সামর্থ্য নেই বলে তাঁর সেখানে যাওয়া হচ্ছে না।

আব্বার কথা শুনে নাসির পাচা বললেন, 'তুমি আমাদের বাসায় এসে উঠছো না কেন? সেখানে থেকেই তো তুমি পড়তে পারো।'

আব্বা তখন বলেন, 'ওফ! তার কথা শুনে যে সেদিন কী খুশি হয়েছিলাম!' যাই হোক এরপরই পাচা এবং তার স্ত্রী জাজাইয়ের সংসারই আব্বার দ্বিতীয় পরিবার হয়ে উঠলো। সোয়াতের হোয়াইট প্যালেস বা শ্বেতপ্রাসাদে যাওয়ার পথে স্পাল বান্দি নামের একটি চমৎকার পাহাড়ি গ্রাম পড়ে। আব্বার কাছে গ্রামটা ভারি রোমান্টিক এবং জীবনসঞ্চারী বলে মনে হলো। আব্বা বাসে চড়ে ওই গ্রামে চলে গেলেন এবং নিজের গ্রামের তুলনায় এলাকাটি এত বড় যে তাঁর মনে হলো তিনি কোনো শহরে এসে পৌছেছেন।

মেহমান হিসেবে তাঁকে খুব খাতির যত্ন করা হতো। আব্বা মনে মনে তাঁর সদ্য প্রয়াত মায়ের স্থানে জাজাইকে বসালেন, তিনি ছিলেন আব্বার জীবনে সবচেয়ে আপন ও গুরুত্বপূর্ণ মহিলা। একবার এক গ্রামবাসী জাজাইয়ের কাছে আব্বার নামে নালিশ করতে এসেছিলেন। তাঁর অভিযোগ ছিল আব্বা নাকি তাঁর মেয়ের সঙ্গে রাস্তায় অশোভন আচরণ করেছেন। কিন্তু জাজাই সে অভিযোগ কানে

www.pathagar.com

তুললেন না। তিনি বললেন, 'চুলহীন ডিমের মতোই জিয়াউদ্দিনের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক। তাঁর নামে নালিশ না করে, ঘরে গিয়ে নিজের মেয়েকে সামলাও।'

স্পাল বান্দি গ্রামে এসেই আব্বা প্রথমবারের মতো নারীদের বাড়ির বাইরে যাওয়ার স্বাধীনতা উপভোগ করতে দেখেন। তাদের গ্রামে যেমন নারীরা ঘরের মধ্যে এক প্রকার লুকিয়ে চুরিয়ে জীবন যাপন করত এখানে সেরকম ছিল না। স্পাল বান্দি গ্রামের মহিলারা সেখানকার একটা পাহাড়ের মাথায় প্রতিদিন জড়ো হতেন; সংসারের এটা ওটা নিয়ে গল্প গুজব করতেন। আমাদের সমাজে এভাবে বাড়ির বাইরে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় গল্পগুজব করার জন্য নারীদের একত্রিত হওয়াটা বেশ অস্বাভাবিক। এখানেই আকবার খান নামের শুভাকাঙ্ক্ষীর সঙ্গে আব্বা জায়গাটিতে অনেক সময় দেখা করতেন। নিজে কলেজ অবধি না যেতে পারলেও আব্বাকে তিনি পছন্দ করতেন; সময় অসময়ে অর্থকড়ি ধার দিতেন। আম্মার মতো আকবার খানের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাদীক্ষা ছিল না, তবে তাঁর অন্য ধরনের প্রকৃতিগত প্রজ্ঞা ছিল। কাউকে নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য সহযোগিতা করলে অপ্রত্যাশিত প্রতিদান মিলে যেতে পারে– এই বিষয়টি বোঝাতে গিয়ে আব্বা প্রায়ই আকবার খান ও নাসির পাচার দয়ালু মানসিকতার কথা বলেন।

পাকিস্তানের ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা মুহূর্তে আব্বা কলেজে ভর্তি হন। তখন গ্রীষ্মকাল। ওই সময় একদিন এক রহস্যময় বিমান দুর্ঘটনায় পাকিস্তানের স্বৈরশাসক জেনারেল জিয়া নিহত হন। অনেকে বলেন, প্লেনের ভেতরে আমের কার্টনে লুকিয়ে রাখা বোমার বিস্ফোরণেই ওই বিমান দুর্ঘটনা হয়। কলেজে আব্বা যখন প্রথম বর্ষের ছাত্র তখন সাধারণ নির্বাচন হয় এবং তাতে জুলফিকার আলী ভুট্টোর মেয়ে বেনজির ভুট্টো জয়ী হন। বেনজির ছিলেন পাকিস্তানের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী এবং মুসলিম বিশ্বের প্রথম কোনো রাষ্ট্রপ্রধান। তিনি নির্বাচিত হওয়ায় পাকিস্তানের ভবিষ্যত নিয়ে মানুষের মধ্যে নতুন আশাবাদ জেগে ওঠে।

জিয়ার সময় নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্র সংগঠনগুলো নতুন উদ্যমে সক্রিয় হয়ে ওঠে। আব্বা খুব শিগগিরই ছাত্ররাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন এবং বিতার্কিক ও বক্তা হিসেবে অল্প সময়ের মধ্যেই পরিচিত হয়ে ওঠেন। পশতুনদের সম অধিকার নিয়ে আন্দোলনরত সংগঠন পাখতুন স্টুডেন্টস ফেডারেশনের (পিএসএফ) তিনি সাধারণ সম্পাদক নির্ধারিত হন। সেনাবাহিনী ও জনপ্রশাসনসহ সরকারের প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ চাকরি পাঞ্জাবীরা বাগিয়ে নিচ্ছিল, কারণ তারাই পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় এবং শক্তিধর প্রদেশ থেকে আসা নাগরিক।

আরেকটি অন্যতম প্রধান ছাত্র সংগঠন ছিল ধর্মভিত্তিক দল জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন জামায়াতে তালাবা পাকিস্তান। পাকিস্তানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ছাত্র সংগঠনটি অত্যন্ত প্রভাবশালী।

তারা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিলি করতো; গরীব ছাত্রদের নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করতো; কিন্তু তারা ছিল খুবই অসহিষ্ণু প্রকৃতির।

www.pathagar.com

তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মহড়া দিতো এবং ক্যাম্পাসে মিউজিক কনসার্ট হলে তা ভণ্ডুল করে দিতো। এই দলটি জেনারেল জিয়ার খুব ঘনিষ্ঠ ছিল এবং নির্বাচনের সময় এদের ভরাডুবি হয়। জমিয়তে তালাবায়ে আবাবিয়া জেহানজেব কলেজ শাখার সভাপতি ছিলেন ইহ্সানুল হক হক্কানি। তিনি এবং আমার আব্বা যদিও পরস্পরের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বি ছিলেন, তথাপি তাঁরা পরস্পরের প্রশংসা করতেন এবং পরে তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়। হক্কানি এখনও বলেন, আমার আব্বা যদি কোনো ধনী খান পরিবারের সন্তান হতেন তাহলে তিনি পিএসএফ'এর প্রেসিডেন্ট এবং পরে অনেক বড় রাজনীতিক হতে পারতেন। বিতর্ক, বক্তৃতা, প্রতিভার প্রকাশ–এসবকে কেন্দ্র করেই মূলত ছাত্র রাজনীতির কার্যক্রম আবর্তিত হতো; তবে দলীয় রাজনীতি করতে অবশ্যই অর্থের দরকার হতো।

কলেজে প্রথম বর্ষে হক্কানি এবং আব্বার মধ্যে কতগুলো বিষয় নিয়ে বিতর্ক হয় তার মধ্যে অন্যতম উত্তপ্ত বাকযুদ্ধ হয় একটা উপন্যাস নিয়ে। উপন্যাসটি হলো সালমান রুশদীর স্যাটানিক ভার্সেস। মুম্বাইয়ের পটভূমিতে মহানবী (সা.) এর জীবনীর ব্যাঙ্গ গল্পে লেখা হয়েছে এটি। মুসলমানেরা উপন্যাসটিকে তীব্র ইসলামবিরোধী হিসেবে বিবেচনা করে এবং এটি এত ক্ষোভের সৃষ্টি করে যে মানুষকে এ উপন্যাসটির বিষয় ছাড়া অন্য বিষয় নিয়ে খুব কমই আলোচনা করতে দেখা যায়। বিরক্তিকর ব্যাপার হলো, পাকিস্তানের কেউই তখনও উপন্যাসটি চোখেও দেখেনি; এটা তখন পাকিস্তানে বিক্রিই হচ্ছিল না–কিন্তু উর্দু পত্রিকাগুলোতে একজন মোল্লা ধারাবাহিকভাবে এটা নিয়ে উস্কানিমূলক লেখা লিখছিলেন। আমাদের গোয়েন্দা সংস্থার ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত ওই মোল্লা তাঁর লেখায় জানালেন, বইটি মহানবী (সা) এর মর্যাদায় আঘাত হেনেছে এবং এর প্রতিবাদ করা প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব। কয়েকদিনের মধ্যেই মোল্লারা পাকিস্তানের সর্বত্র বইটির তীব্র নিন্দা জানালেন, বইটিকে নিষিদ্ধ করার দাবি তুললেন এবং এটা নিয়ে সহিংস বিক্ষোভও হলো। সবচেয়ে হিংসাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় ১৯৮৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি ইসলামাবাদে। রুশদী এবং তাঁর প্রকাশক ব্রিটিশ হলেও ওইদিন আমেরিকান সেন্টারের সামনে মার্কিন পতাকা পোড়ানো হয়। জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলে পুলিশ গুলি ছোড়ে। এতে পাঁচজন নিহত হয়। এই ক্ষোভ শুধু পাকিস্তানেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়। এর দুইদিন পর ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খোমিনী রুশদীকে হত্যার ফতোয়া দেন।

স্যাটানিক ভার্সেস নিয়ে আব্বার কলেজে জনাকীর্ণ একটি কক্ষে উত্তপ্ত বিতর্ক হয়। বহু ছাত্র বইটি নিষিদ্ধ করা, পোড়ানো এবং ফতোয়া জারি রাখার পক্ষে যুক্তি দেখান। আমার আব্বাও মনে করেন বইটি ইসলামের প্রতি আঘাত হেনেছে, তবে তিনি বাকস্বাধীনতার পক্ষে জোরালো অবস্থান নেন। আব্বার যুক্তি, 'আসুন আমরা বইটি প্রথমে পড়ি এবং তারপর কেন আমরা নিজেদের লেখা বইয়ের মাধ্যমে এর জবাব দিতে পারব না?' আব্বা আমার দাদাজানের

www.pathagar.com

বজ্রকণ্ঠে উচ্চারিত প্রশ্নবোধক বক্তব্য দিয়ে তার যুক্তির উপসংহার টানলেন, 'ইসলাম কি এতই দুর্বল ধর্ম যে এর বিরুদ্ধে লেখা একটি বইকেও সে সহ্য করতে পারবে না? আমার ইসলাম সেটা পারবে না।'

জেহানজের কলেজ থেকে স্নাতক শেষ করার পর বেশ কয়েক বছর আরো একটা সুপরিচিত বেসরকারি কলেজে ইংরেজির শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। তবে সেখানে বেতন পেতেন খুবই কম, মাসে মাত্র ১৬০০ রুপি (প্রায় ১২ পাউন্ড)। দাদাজান অভিযোগ করতে লাগলেন, তিনি (আব্বা) সংসারে কোনো সহযোগিতা করছেন না। এদিকে, প্রিয়তমা টোর পোকাইকে বিয়ে করার খরচের অর্থ জমানোও এই বেতন দিয়ে সম্ভব হচ্ছিল না।

ওই সময় মোহাম্মদ নাঈম খান নামে আব্বার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং সহকর্মী ছিলেন। তিনি এবং আব্বা ইংরেজিতে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পড়েছেন এক সঙ্গে। দুজনই লেখাপড়ার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। যে স্কুলে তাঁরা শিক্ষকতা করছিলেন সেখানকার কড়াকড়ি নিয়ম এবং অসৃজনশীল পরিবেশ তাঁদের দুজনকেই হতাশ করে। সেখানে না ছাত্র না শিক্ষক–কেউই তাঁদের মতামত স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করতে পারতেন না। স্কুলের ওপর মালিকদের নিয়ন্ত্রণ এতটাই কড়া ছিল যে শিক্ষকদের পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককেও তাঁরা সন্দেহের চোখে দেখতেন। এ অবস্থায় আব্বা তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠিত স্কুল চালানোর মধ্য দিয়ে পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি স্বাধীনতা উপভোগের স্বপ্ন দেখছিলেন। আব্বা স্বাধীন এবং মুক্তচিন্তাকে সব সময় উৎসাহ দিতেন। একই সঙ্গে তিনি তাঁর স্কুলে মুক্তমন ও সৃজনশীলতাকে পাশ কাটিয়ে আজ্ঞাবহতাকে যেভাবে পুরস্কৃত করা হতো তাকে প্রচণ্ড ঘৃণা করতেন। ফলে কলেজ প্রশাসনের সঙ্গে মতবিরোধের জের ধরে নাঈম খান যখন চাকরি হারালেন তখন দুজন মিলে নিজেদের মালিকানায় একটা নতুন স্কুল চালু করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

প্রথমে তাঁরা পরিকল্পনা করেছিলেন, আব্বার গ্রাম শাহপুরে তাঁরা স্কুল খুলবেন। আব্বা বলেন, যেখানে একটা বসতি আছে অথচ একটাও দোকান নেই–এইরকম জায়গায় দোকানের প্রয়োজনীয়তা যতটা তাদের সেখানে একটা স্কুল ততখানি জরুরি হয়ে পড়েছিল।

কিন্তু তাঁরা যখন স্কলের জন্য একটা ভবন খুঁজতে সেখানে যান, সেখানে গিয়ে দেখেন এখানে-সেখানে অন্য একটা স্কুলের বিজ্ঞাপন ব্যানার টানানো। আর সবগুলো ব্যানার কে বা কারা ছিড়ে নষ্ট করে ফেলেছে। এরপর তাঁরা সেখানে স্কুল করার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন। তাঁরা ভেবে দেখেন, সোয়াত যেহেতু পর্যটকদের একটা আদর্শ গন্তব্যস্থল সে কারণে এখানে ইংরেজি শেখার চাহিদা বাড়বে। এই চিন্তা থেকেই তাঁরা মিঙ্গোরায় ইংরেজি মাধ্যমের একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নেন।

আব্বা তখনও স্কুলের চাকরিটা ছাড়েননি। তাঁকে যেহেতু চাকরিতে সময় দিতে হচ্ছিল, এ কারণে মিঙ্গোরায় ঘুরে ঘুরে স্কুলের জন্য ভাড়া পাওয়া যাবে এমন

www.pathagar.com

একটা জায়গা খুঁজছিলেন। একদিন তিনি খুব উত্তেজিতভাবে এসে বললেন, স্কুলের জন্য তিনি চমৎকার একটা জায়গা পেয়েছেন। তিনি জানালেন, লান্ডিকাস নামের একটা এলাকায় একটা দোতলা ভবনের নিচতলা ভাড়া দেওয়া হবে। নিচতলার সঙ্গে বাঁধাই করা একটা বিশাল উঠোন আছে। সেখানে শিক্ষার্থীরা সমবেত হতে পারবে। এই ভবনের নিচতলা আগে যিনি ভাড়া নিয়েছিলেন, তিনিও এখানে রামাদা স্কুল নামে একটা স্কুল চালাতেন। স্কুলের যিনি মালিক তিনি একবার তুরস্কে গিয়ে সেখানে রামাদা হোটেল নামের একটা হোটেল দেখেন। এই হোটেলের নামানুসারে স্কুলটার নাম দিয়েছিলেন তিনি। তবে স্কুলটা শেষ পর্যন্ত দেউলিয়া হয়ে পড়ে এবং হয়তো সে কারণেই কর্তৃপক্ষ স্কুলটা চালানোর বিষয়ে দ্বিতীয়বার ভাবতে বাধ্য হয়েছিল। এছাড়া ভবনটার পাশ দিয়ে যে ছোট একটা নদী বয়ে গেছে তাতে লোকজন ময়লা আবর্জনা ফেলতো। গরমকালে নদীটা থেকে সাংঘাতিক দুর্গন্ধ ছড়াতো।

যাহোক, কাজ শেষে রাতে আব্বা বিল্ডিংটা দেখতে গেলেন। সেদিন ছিল ভরা পূর্ণিমা। ভবন চত্বরের গাছগুলোর ওপরে অসংখ্য তারার সঙ্গে চকচকে চাঁদ দেখে আব্বা এটাকে শুভলক্ষণ হিসেবে ধরে নিলেন। আব্বা বলেন, 'ভবন দেখে আমি এত খুশি হলাম! মনে হচ্ছিল আমার স্বপ্ন সত্যি হতে যাচ্ছে।

নাঈম এবং আব্বা তাঁদের সারাজীবনের সঞ্চয় ৬০ হাজার রুপি স্কুলে বিনিয়োগ করলেন। স্কুল ভবনটায় রং দেওয়ার কাজ করতে এবং রাস্তার পাশে নিজেদের থাকার জন্য একটা ছোট ঘর ভাড়া করতে তাঁদের আরও ৩০ হাজার রুপি ধার করতে হলো এবং শিক্ষার্থী জোগাড় করার জন্য দ্বারে-দ্বারে ধরণা দিতে লাগলেন। দুর্ভাগ্যবশত ইংরেজি মাধ্যমে পড়ানোর ব্যাপারে তখন সেখানে চাহিদা ছিল কম, অন্যদিকে আয় রোজগার একেবারে কম হলেও তাঁদের খরচ বেড়েই চলছিল। কলেজে যাওয়ার পর থেকেই রাজনৈতিক সভা-সেমিনারের সঙ্গে আব্বার সম্পৃক্ততা ছিল। প্রায় প্রতিদিনই তাঁর অধস্তন রাজনৈতিক কর্মীরা স্কুলে কিংবা স্কুলের পাশেই ভাড়া করা ছোট্ট বাসায় আসতেন। প্রায় প্রতিদিনই তাঁদের আপ্যায়ন করতে হতো। নাঈম বিরক্ত হয়ে বলতেন, 'এইসব মৌজমাস্তি করার পয়সা আমাদের নেই!' ধীরে ধীরে বিষয়টি তিক্ততায় গড়াতে থাকলো। তাঁরা বুঝতে পারলেন দুজন খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলেও তাদের পক্ষে ব্যবসায়িক পার্টনার হিসেবে এক সঙ্গে কাজ করা খুবই কঠিন।

এই দুই বন্ধুর মধ্যে ঝগড়া লাগার সবচেয়ে বড় কারণ ছিল গ্রামের বাড়ি সাংলা থেকে স্রোতের মতো মেহমান আসতো। তাঁরা মিঙ্গোরাতে থাকার জায়গা হিসেবে আমাদের বাসাকে বেছে নিতেন। অসুবিধা যতই থাক, আমরা পশতুনরা আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধব থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারি না। আমরা কারও প্রাইভেসি বা একান্ত নিভৃতির ধার ধারি না; কারও সঙ্গে দেখা করার জন্য তার পূর্ব অনুমতি নেওয়ারও প্রয়োজন মনে করি না। মেহমানরা আমাদের বাড়িতে যখন খুশি আসতো, যতদিন খুশি থাকতো। এই অবস্থায় যে কারও জন্য একটা ব্যবসা শুরু করা দুঃস্বপ্নের মতো, এবং এটাই শেষ পর্যন্ত নাঈমের চিত্তবিক্ষেপ

www.pathagar.com

ঘটায়। নিরন্তর অতিথি আগমনে ক্ষেপে গিয়ে তিনি একদিন আব্বাকে রসিকতা করে বলেছিলেন, যার বাসায় মেহমান এসে অবস্থান করবে তাকে জরিমানা দিতে হবে। এরপর থেকে নাঈমের বাড়িতে কেউ এলে আব্বা তাঁদের থেকে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করতেন যাতে নাঈমকেও জরিমানা দিতে হয়।

তিন মাস বাদেই নাঈম ভাবলেন যথেষ্ট হয়েছে; আর নয়। তিনি বললেন, 'স্কুলের তালিকাভুক্তির জন্য আমাদের যেখানে অর্থকড়ি যোগাড় করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা, সেখানে শুধু ভিখারি শ্রেণির লোকজনই আমাদের দরজায় কড়া নেড়ে চলেছে! এটাতো অসম্ভব কঠিন কাজ!' তিনি আব্বাকে সোজাসুজি বললেন, 'আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়।'

দুই বন্ধুর মধ্যে ঝগড়া বেধে গেল। মুরব্বীদের মধ্যস্থতায় শালিস বসলো। নাঈম স্কুল বন্ধ করে দিতে চাইলেন। কিন্তু আব্বা যে কোনো মূল্যে স্কুল না ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং নাঈমকে তার বিনিয়োগ করা শেয়ারের অর্থ ফেরত দিতে রাজি হলেন। অবশ্য কীভাবে এত অর্থ যোগাড় হবে সে বিষয়ে তাঁর কোনো ধারণা তখন ছিল না। সৌভাগ্যক্রমে হেদায়েতউল্লাহ নামে আব্বার অন্য এক বন্ধু নাঈমের প্রাপ্য সব অর্থ দিয়ে ওই শেয়ার নিতে রাজি হলেন। আব্বা নতুন এই পার্টনারকে নিয়ে আবার বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছাত্র যোগাড়ের চেষ্টা করতে লাগলেন, লোকজনকে বলতে লাগলেন তাঁরা একটা নতুন স্কুল খুলেছেন। আব্বার মধ্যে মানুষকে মুগ্ধ করার দারুণ ক্ষমতা ছিল। হেদায়েতুল্লাহ বলেন, তিনি (আব্বা) হচ্ছেন এমন লোক যাকে আপনি যদি আপনার বাড়িতে দাওয়াত করে নেন তাহলে আপনার বন্ধুদের সঙ্গেও তিনি অল্প সময়ের মধ্যে বন্ধুত্ব করে ফেলবেন। তবে বাস্তবতা হলো স্থানীয় লোকজন আব্বার সঙ্গে কথাবার্তা বলে মুগ্ধ হলেও শেষ পর্যন্ত তাঁরা তাদের বাচ্চাদের প্রতিষ্ঠিত স্কুলেই ভর্তি করছিলেন।

সপ্তদশ শতকে মুঘলদের বিরুদ্ধে পশতুনদের একত্রিত করার চেষ্টা করেছিলেন সোয়াতের দক্ষিণাঞ্চলীয় আকোরা এলাকার কিংবদন্তী কবি ও যোদ্ধা খুশাল খান খাট্টক। আব্বার প্রিয় এই কবি-যোদ্ধার নামেই স্কুলের নাম রাখা হয়, খুশাল স্কুল। স্কুলে ঢোকার মুখেই ফটকে লেখা, 'তোমার জন্য নতুন যুগের আহ্বান সৃষ্টিতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।' আমার আব্বা ফটকে আরেকটি ফলক লাগিয়েছিলেন। সেখানে পশতু ভাষায় খাট্টকের লেখা একটা লাইন। যার অর্থ, 'আফগান সম্মানের নামে তলোয়ার তুলেছি হাতে।' আব্বা আমাদের এইসব মহানায়কদের মাধ্যমে প্রেরণা যোগাতে চেয়েছিলেন। তবে সেই প্রেরণার পদ্ধতিটি ছিল আধুনিককালের সনাতন যুগের নয়। কলমের তলোয়ারের নয়। খাট্টক যেভাবে বিদেশী শত্রুদের বিরুদ্ধে পশতুনদের ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন; অজ্ঞতার বিরুদ্ধে আমাদেরও এক হওয়া প্রয়োজন।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে লোকজনের মধ্যে আস্থা জন্মানো সম্ভব হলো না। যেদিন আব্বা স্কুলটি চালু করলেন সেদিন সব মিলিয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল মাত্র তিনজন। তা সত্ত্বেও আব্বা যথাযথ আনুষ্ঠানিকতায় জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের

www.pathagar.com

মধ্য দিয়ে স্কুল শুরু করলেন। আব্বার ভাতিজা আজিজ তাঁকে সাহায্য করার জন্য এসেছিলেন। আব্বা সেই আজিজকে দিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করালেন।

মাত্র এই কয়জন শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়ায় স্কুলের কোনো আয় ছিল না। স্কুলের শিক্ষা সরঞ্জাম ও উপকরণ কেনার জন্য অর্থকড়ি পর্যাপ্ত ছিল না। খুব শিগগিরই তাদের জমানো অর্থ শেষ হয়ে গেল। আব্বা কিংবা হেদায়েতুল্লাহ দুজনের কারও পক্ষেই তাদের পরিবারের কাছ থেকে অর্থ যোগাড় করা সম্ভব ছিল না। হেদায়েত উল্লাহ যখন দেখলেন, আব্বা তাঁর কলেজের সহকর্মীদের কাছ থেকে নেওয়া ঋণের ভারে জর্জরিত, তখন তিনি খুশি হতে পারলেন না। স্কুলে সর্বক্ষণই পাওনা অর্থ পরিশোধের তাগাদা দিয়ে পাঠানো চিঠি আসতে লাগলো।

আব্বা যখন স্কুলটির নিবন্ধন কাজে গেলেন তখন তাকে সবচেয়ে জঘন্য পরিস্থিতির মুখে পড়ত হলো। কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষারত থাকার পর অধৈর্য হয়ে আব্বা স্কুল তত্ত্বাবধান কর্মকর্তার কক্ষে ঢুকলেন। দেখলেন পাহাড় সমান উঁচু ফাইলের গাদা সামনে নিয়ে তত্ত্বাবধায়ক বসে আছেন। আব্বার আবেদনপত্র হাতে নিয়ে তিনি তাচ্ছিল্যের হাসি দিয়ে বললেন, কি ধরনের স্কুল আপনার? অ্যা ... আপনার স্কুলে শিক্ষক কয়জন? তিনজন! ও আচ্ছা ... তার ওপরে তাদের কোনো ট্রেনিং নেই। আরে সাহেব, আপনার মতো স্কুল তো যে কারও মন চাইলে সে করতে পারে।' তাঁর কথা শুনে অফিসের অন্য সবাই হো হো করে হেসে উঠলেন। রীতিমতো আপমান করলেন আব্বাকে। আব্বার প্রচণ্ড রাগ হলো। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছিল লোকটা ঘুষ চাচ্ছে। কেউ যদি পশতুনদের খাটো করার চেষ্টা করে তাহলে তারা সহ্য করে না; তাছাড়া প্রাপ্য অধিকার পেতে আব্বাও কোনোভাবেই ঘুষ দিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

আব্বা এবং হেদায়েতুল্লার খাবার কেনার অর্থ জোগাড় করাই কষ্টকর ছিল, ঘুষের অর্থ দেওয়ার কথা তো চিন্তারে বাইরের বিষয়। তখন নিবন্ধনের রেট ছিল ১৩ হাজার রুপি; আর যদি তারা বোঝে আপনি বড়লোক, তাহলে সেই ঘুষের রেট আরও বেশি। এছাড়া স্কুলগুলোর কাছে আশা করা হতো, কর্মকর্তারা পরিদর্শন করতে গেলে স্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁদের নিয়মিত দামি মাছ-মুরগি দিয়ে খাইয়ে দাইয়ে বাড়তি আদর আপ্যায়ন করবে। শিক্ষা কর্মকর্তারা আগেভাগেই স্কুল কর্তৃপক্ষকে তাঁরা আসছেন বলে জানিয়ে দিতেন এবং দুপুরে সেখানে কী কী খাবেন নিজেরাই তার বিস্তারিত অর্ডার দিয়ে দিতেন। আব্বা তাঁদের এমন চরিত্র দেখে রাগে গজগজ করতেন, 'আমাদের এটা একটা স্কুল, পোলট্রি ফার্ম না।'

এ কারণে আব্বা যখন দেখলেন, শিক্ষা কর্মকর্তা ঘুষ চাওয়ার দিকে মোড় নিচ্ছেন, তখন আব্বা তাঁর দীর্ঘদিনের বিতার্কিক জীবনের সমস্ত শক্তি দিয়ে তাঁর ওপর চড়াও হলেন।

আব্বা বললেন, 'আপনি এই ধরনের অবান্তর প্রশ্ন করছেন কেন?' এই ধরনের কর্মকর্তাদের ভীতিপ্রদর্শন ও দুর্নীতি থেকে অন্য স্কুল মালিকদের বাঁচাতে তিনি

www.pathagar.com

শিক্ষা কর্মকর্তাদের চ্যালেঞ্জ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন। তিনি বললেন, 'আমি কি একটা অফিসে এসেছি? নাকি আদালত অথবা পুলিশ স্টেশনে এসেছি? আমি একজন অপরাধী?'

আব্বা ভালো করেই জানতেন, এসব কর্মকর্তাদের চাপে রাখতে গেলে তাঁর নিজের কিছু শক্তি দরকার। এ কারণে তিনি সোয়াত অ্যাসোসিয়েশন অব প্রাইভেট স্কুলস নামের ব্যক্তি মালিকানাধীন স্কুলগুলোর একটি সংগঠনে যোগ দিয়েছিলেন। তখন এটি ছোট সংগঠন ছিল। এর সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র ১৫ জন। আব্বা দ্রুতই সংগঠনটির ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। অন্য স্কুলের প্রিন্সিপালরা নিবন্ধন পাওয়ার জন্য ঘুষ দিতে রাজি ছিলেন এবং তাঁরা ঘুষের অর্থ সঙ্গে করে নিয়েও এসেছিলেন। কিন্তু আব্বা তাঁদের বললেন, যদি সবাই এক হন তাহলে তাঁরা এর প্রতিবাদ করতে পারবেন।

আব্বা তাঁদের বললেন, 'স্কুল চালানো তো কোনো অপরাধ না। কেন আপনারা ঘুষ দেবেন? আপনারা যে পতিতাপল্লী চালাচ্ছেন না; বাচ্চাদের শিক্ষা দিচ্ছেন। আর সরকারি কর্মকর্তারা তো আপনাদের বস না। তাঁরা পাবলিক সার্ভেন্ট মানে আপনার চাকর। আপনাকে সেবা দেওয়ার বিনিময়ে সরকারের কাছ থেকে তাঁরা বেতন কড়ি নিচ্ছেন। আপনারা তো সেই ব্যক্তি যারা এইসব কর্মকর্তাদের ছেলেমেয়েদেরও শিক্ষিত করে তুলছেন।'

আব্বা শিগগিরই সংগঠনটির প্রেসিডেন্ট হন এবং চারশ জন প্রিন্সিপাল সদস্য না হওয়া পর্যন্ত তিনি সংগঠনটিকে বাড়াতেই থাকেন। বলা যায় হঠাৎ করেই স্কুল মালিকেরা ক্ষমতাশালী সব স্থানে চলে আসেন। তবে আব্বা যতটা না ব্যবসায়ী ছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশি রোমান্টিক মানুষ ছিলেন। তিনি এবং হেদায়েতুল্লাহ স্থানীয় দোকানদারদের কাছ থেকে এত বেশি বাকি নিয়েছিলেন যে তারা তাদের আর বাকি দিচ্ছিলেন না, তাদের দুজনের অবস্থা ততটাই খারাপ হলো যে চা-চিনি কেনার মতো অবস্থাও রইল না।

আয় রোজগার বাড়ানোর জন্য তারা স্কুলেই একটা অস্থায়ী দোকান চালাতেন। ভোরে স্কুলে আসা শিশুরা ছিল তাদের খদ্দের। আব্বা বাজার থেকে ভুট্টা কিনে এনে গভীর রাত পর্যন্ত সেগুলো দিয়ে পপকর্ন বানাতেন।

হেদায়েতুল্লাহ বলতেন, 'আমি খুব হতাশ হয়ে পড়েছিলাম এবং আমাদের চারপাশের এত সমস্যা দেখে একেবারে ভেঙে পড়তাম। কিন্তু জিয়া উদ্দিন যখন কোনো সংকটে পড়তো, সে খুব শক্ত হয়ে মোকাবিলা করতো। তার মনমানসিকতা থাকতো খুবই দৃঢ়।

আব্বা সব সময়ই বলতেন, তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা ও চিন্তাভাবনা বড় রাখতে হবে। একদিন হেদয়েতুল্লাহ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করানোর জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে অভিভাবকদের সঙ্গে আলাপ করে স্কুলে আসলেন। এসে দেখেন অফিস কক্ষে

www.pathagar.com

আব্বা পাকিস্তান টিভির স্থানীয় প্রধান কর্মকর্তার সঙ্গে টেলিভিশনে স্কুলের বিজ্ঞাপন দেওয়ার ব্যাপারে কথা বলছেন। ভদ্রলোক চলে যাওয়ার পর হেদায়েতুল্লাহ হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়লেন। তিনি বললেন, 'জিয়া উদ্দিন, আমাদের তো একটা চিঠিও নাই, সত্যিই যদি বিজ্ঞাপন দেখানো হয়, তাহলে তাই বা দেখবো কেমন করে?' কিন্তু আব্বা এতটাই আশাবাদী লোক ছিলেন যে, বাস্তবতার কঠিন উপহাস তাকে দমাতে পারতো না।

একদিন আব্বা হেদায়েতুল্লাহকে বললেন, তিনি কয়েক দিনের জন্য গ্রামে যাবেন। আসলে তিনি গ্রামে যাচ্ছিলেন বিয়ে করতে। আপ্যায়ন করার সামর্থ্য ছিল না বলে তিনি মিঙ্গোরার কাউকে বিয়েতে দাওয়াত দেননি। আমাদের সমাজে বিয়ের উপলক্ষে কয়েকদিন ধরে ভালো ভালো খাওয়াদাওয়া চলতে থাকে। আসলে আম্মা প্রায়ই আব্বার সঙ্গে যোগাযোগ রাখায় মূল অনুষ্ঠানে আব্বা যাননি। আব্বা শুধু আনুষ্ঠানিকতার শেষ দিন গিয়ে উপস্থিত হন। শেষ অনুষ্ঠানে পরিবারের সদস্যরা বর-কনের মাথার ওপর কোরান শরিফ এবং একটি শাল রেখে সামনে বড় একটা আয়না মেলে ধরে। ওই আয়নায় বর-কনে দুজন দুজনকে দেখে। আমাদের সমাজে বহু নব-দম্পতি এই আয়নাতেই প্রথম দুজন দুজনকে দেখে। তাদের দুজনের কোলে ফুটফুটে একটি ছেলে শিশু বসিয়ে দেওয়া হয়। ছেলে শিশু জন্মদানে উৎসাহ দিতেই মূলত এমনটা করা হয়ে থাকে।

আমাদের ঐতিহ্য অনুযায়ী বিয়ের সময় কনের পরিবারের পক্ষ থেকে নতুন সংসারে কিছু আসবাবপত্র বা ফ্রিজের মতো প্রয়োজনীয় জিনিস দিয়ে থাকে। বরপক্ষ থেকে কনেকে গয়না দেওয়া হয়। দাদাজানের পক্ষে প্রয়োজনীয় স্বর্ণালংকার কেনা সম্ভব ছিল না। ফলে বিয়ের কাঁকন কেনার জন্য আব্বাকে আরও অর্থ ধার করতে হলো। বিয়ের পর আম্মা দাদাজান ও চাচার সঙ্গে গ্রামের বাড়িতে চলে গেলেন। আব্বা চলে এলেন মিঙ্গোরা। দুই তিন সপ্তাহ পর পর আব্বা আম্মাকে দেখতে গ্রামে যেতেন। আব্বা ভেবেছিলেন, স্কুলটা একটু দাড়িয়ে গেলেই তিনি আম্মাকে শহরে নিয়ে আসবেন। কিন্তু বাবা (দাদাজান) ক্রমাগত আব্বার বিরুদ্ধে একেবারে কম মাসোহারা পাঠানোর অভিযোগ করতে থাকেন এবং আম্মার জীবন অতিষ্ঠ করে তোলেন। আম্মার কাছে তাঁর নিজের কিছু অর্থকড়ি ছিল। তাই দিয়ে তাঁরা একটা ভ্যান ঠিক করে মিঙ্গোরার দিকে রওনা হন। মিঙ্গোরায় কীভাবে চলবেন সে ব্যাপারে তাদের কোনো আইডিয়াই ছিল না। আব্বা বলেন, 'আমরা তখন শুধু এটুকুই বুঝতে পারছিলাম, যে আব্বা (দাদাজান) আমাদের আর সেখানে দেখতে চাচ্ছিলেন না। সেই সময় আমার পরিবারের আচরণে খুব কষ্ট পেয়েছিলাম বটে, তবে মনে পরে এটা আমার জন্য ভালোই হয়েছে। এতে আমি আগের চেয়ে বেশি স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পেয়েছি।

www.pathagar.com

আব্বা তাঁর পার্টনারকে বিষয়টি জানাননি। হেদায়েতুল্লাহ যখন দেখলেন আব্বা জলজ্যান্ত একটা বউকে নিয়ে মিঙ্গোরায় এসে হাজির হয়েছেন তখন তিনি ভয়ানকভাবে আঁতকে উঠলেন। তিনি আব্বাকে বললেন, 'পরিবার পালা পোষার মতো মুরোদ এখনও আমাদের হয়নি। সে (আম্মা) থাকবে কোথায়?' আব্বা বললেন, 'না, ঠিক আছে, সে আমাদের জন্য রান্নাবান্না করবে–কাপড়চোপড় কাঁচবে।

মিঙ্গোরায় এসে আম্মার খুব আনন্দ হচ্ছিল। তাঁর কাছে এটাই ছিল সর্বাধুনিক শহর। বিয়ের আগে তরুণী বয়সে আম্মা বান্ধবীদের সঙ্গে নদীর পাড়ে ঘুরতে যেতেন। তারা তাদের ভবিষ্যত স্বপ্ন নিয়ে নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করতেন। তাদের বেশিরভাগেরই স্বপ্ন ছিল বিয়ে করে স্বামী সন্তান নিয়ে সংসার করবেন। স্বামীদের ভালো ভালো জিনিস রান্না করে খাওয়াবেন। আম্মাকে তাঁর ভবিষ্যত স্বপ্নের কথা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলতেন, 'আমার স্বপ্ন আমি যেন শহরে থাকতে পারি। অল্প কিছু পয়সাকড়ি যেন থাকে যাতে রান্না করার বদলে বাজার থেকে নানরুটি আর কাবাব কিনে আনতে পারি।' তবে দেখা গেল, প্রত্যাশা অনুযায়ী শান্তির জীবন তার সামনে এলো না। স্কুল ভবনের সঙ্গেই একটা ঘরে আব্বা এবং হেদায়েতুল্লাহ থাকতেন। এক রুমে তারা দুজন থাকতেন। অপর রুমটি অফিস কক্ষ হিসেবে ব্যবহার করতেন। কোনো রান্নাঘর ছিল না। আম্মা আসার পর হেদায়েতুল্লাহ অফিস রুমে আস্তানা গাড়লেন। সেখানে শক্ত চেয়ারের ওপরই তাকে রাতে ঘুমাতে হতো।

আব্বা সব বিষয়েই আম্মার পরামর্শ নিতেন। আম্মাকে বলতেন, 'পোকাই, আমাকে এই বিষয়ে একটু সাহায্য করো। বিভ্রান্তি লাগছে। সমাধান করে দাও তো।' আম্মা সব কাজে তাঁকে সাহায্য করতেন। এমন কি রাতেরবেলা স্কুলভবনের দেওয়াল রং করার সময় বিদ্যুৎ চলে গেলে আম্মা একবার হারিকেন জ্বালিয়ে এনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেই আলোয় আব্বা এবং হেদায়েতুল্লাহ দেওয়াল রং করেছিলেন।

হেদায়েতুল্লাহ বলতেন, 'জিয়াউদ্দিন ভারি সংসারী গোছের লোক; বৌয়ের সঙ্গে সে যেমন ঘনিষ্ঠ, অন্যদের বেলায় তেমনটা চোখে পড়ে না। হেদায়েতুল্লাহ বলতেন, 'আমাদের বেশিরভাগ লোকই বউকে সময় দিতে চায় না। কিন্তু জিয়াউদ্দিন বউকে ছাড়া চলতেই পারে না।'

কয়েক মাসের মধ্যেই আম্মা সন্তানসম্ভবা হলেন। ১৯৯৫ সালে তাঁদের প্রথম বাচ্চা হয়। সেটি কন্যা সন্তান ছিল। কিন্তু জন্মের আগেই বাচ্চাটির মৃত্যু হয়। আব্বা বলেন, 'আমার মনে হয়, স্যাঁতস্যাঁতে কর্দমাক্ত ঘরের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে কোনো সমস্যা হয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম, আমার মা ও

www.pathagar.com

বোনেরা যেমন গ্রামের বাড়িতেই সন্তান প্রসব করেছেন, তেমনি হাসপাতালে যাওয়া ছাড়াই মহিলারা সন্তান প্রসব করতে পারে। আমার আম্মার দশটি ছেলে মেয়ে হয়েছিল বাড়িতেই।'

স্কুলে লোকসান হয়েই যাচ্ছিল। মাসের পর মাস যাচ্ছিল। তাঁরা না দিতে পারছিলেন শিক্ষকদের বেতন-কড়ি, না দিতে পারছিলেন স্কুল ভবনের ভাড়া। বিয়ে করার সময় যে স্বর্ণকারের কাছ থেকে আব্বা বাকিতে আম্মার জন্য হাতের বালা কিনেছিলেন, তিনি পাওনা আদায়ের জন্য নিয়মিত বাড়িতে আসা শুরু করলেন। আব্বা তাঁকে পাওনা টাকা দিতে না পেরে চা-বিস্কুট খাইয়ে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করতেন। হেদায়েতুল্লাহ হাসতেন। আব্বাকে বলতেন, 'তুমি কি ভেবেছো চা খেয়েই সে খুশি হবে? সে তাঁর পাওনা চায়।'

আব্বার অবস্থা এতটাই খারাপ হলো যে, তিনি আম্মার সেই সোনার বালা বেচতে বাধ্য হলেন। আমাদের সমাজে বিয়ের গয়নাকে দম্পতির বন্ধনসূত্র মনে করা হয়। বিবাহিত নারীরা তাঁদের স্বামীদের ব্যবসা করার জন্য কিংবা ভাগ্যান্বেষণে বিদেশে পাড়ি জমানোর রাহা খরচ যোগানোর জন্য সাধারণত বিয়ের গয়না বিক্রি করে থাকে। আব্বা তাঁর এক ভাতিজাকে কলেজে ভর্তির খরচ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ওই খরচ দেওয়ার জন্য আম্মা আগেই আব্বাকে বালা জোড়া বিক্রি করতে বলেছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে আব্বার চাচাতো ভাই জেহান শের খান তাঁর ভর্তির খরচ দেন। কিন্তু আম্মা বুঝতে পারেননি আব্বা তাঁর বালা জোড়া বেচে দেনার কিছু অংশ পরিশোধ করেছেন। আম্মা যখন জানলেন আব্বা যে দামে তাঁর বালা বেচেছেন তা আসল দামের চেয়ে অনেক কম তখন তিনি খুব চটে গিয়েছিলেন।

যাহোক, যেইমাত্র মনে হচ্ছিল অবস্থা আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে না, ঠিক এমন সময় মিঙ্গোরায় প্রবল বন্যা দেখা দেয়। একদিন হঠাৎ করেই প্রচণ্ড বর্ষণ শুরু হয়। বৃষ্টি থামছিলই না। সন্ধ্যা নাগাদ বন্যার সতর্কতা জারি করা হয়। জান বাঁচাতে সবাইকে জেলা ছেড়ে নিরাপদে চলে যেতে বলা হয়। আম্মা সেদিন মিঙ্গোরা থেকে দূরে ছিলেন। পানি বিল্ডিংয়ের নিচতলায় ঢুকে পড়েছিল। মালপত্র নষ্ট হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে হেদায়েতুল্লাহ সেগুলো দোতলায় নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। তাঁকে সাহায্য করার জন্য তিনি আব্বাকে খুঁজছিলেন, কিন্তু আব্বাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। হেদায়েতুল্লাহ বাইরে বেরিয়ে এসে চিৎকার করছিলেন, 'জিয়াউদ্দিন! জিয়াউদ্দিন!' এই খুঁজতে যাওয়াটা তাঁর জীবন প্রায় বিপন্ন করে তুলেছিল।

স্কুলের বাইরের সরু রাস্তা তখন বন্যায় তলিয়ে গেছে। প্রায় কাঁধ পর্যন্ত পানির মধ্য দিয়ে তিনি হেঁটে চিৎকার করে আব্বাকে খুঁজছিলেন। রাস্তার ওপর দিয়ে

www.pathagar.com

বিদ্যুতের যে তার গেছে বাতাসে সেগুলো ঢিলা হয়ে দুলছিল। আরেকটু হলেই তার পানি স্পর্শ করবে। এটা দেখে হেদায়েতুল্লাহ ভয়ে প্রায় অসাড় হয়ে পড়েছিলেন।

শেষমেষ আব্বাকে তিনি খুঁজে পেলেন। আব্বা বললেন, পাশের বাসা থেকে এক মহিলা চিৎকার করে বলছিলেন, তাঁর স্বামী ঘরের মধ্যে আটকা পড়েছেন। আব্বা সেখানে গিয়ে লোকটাকে উদ্ধার করেছেন এবং তারপর তাঁদের বাসার ফ্রিজটাকেও নিরাপদে রেখে আসতে সাহায্য করেছেন। শুনে দেহায়েতুল্লাহ রেগে আগুন। তিনি বললেন, 'তুমি ওই মহিলার স্বামীকে বাঁচিয়েছো, কিন্তু তোমার নিজের ঘর বাঁচাতে পারোনি। এই দরদের মূল কারণ কি শুধুএ ওই মহিলা?

পানি নেমে যাওয়ার পর এই দুই বন্ধু দেখলেন তাদের থাকার ঘর ও স্কুল ভবন একেবারে শেষ। তাদের আসবাবপত্র, কার্পেট, বই-খাতা, কাপড়চোপড়, অডিও ক্যাসেট সবকিছু ভয়ানক দুর্গন্ধযুক্ত থকথকে কাদার মধ্যে দলা পাকিয়ে আছে। ঘুমানোর কোনো জায়গা নেই, পরিধান করার মতো পরিষ্কার কোনো পোশাকও নেই। ভাগ্য ভালো, আমানুদ্দৌলা নামে তাঁদের এক প্রতিবেশী তাদের তাঁর বাসায় নিয়ে গেলেন এবং সেখানে ঘুমাতে দিলেন। ময়লা আবর্জনা সরাতে পুরো এক সপ্তাহ লেগে গেল। এর দশ দিন পর আবার বন্যা হলো এবং আবার বিল্ডিং পানিতে ভরে গেল। এ সময় তাঁরা দুজনেই বাইরে ছিলেন। এর কয়দিন বাদে পানি ও বিদ্যুৎ কোম্পানি ওয়াপদার কয়েকজন কর্মকর্তা এসে বললেন, তাদের মিটারে সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং এটা ঠিক করতে তারা ঘুষ চাইলেন। আব্বা যখন ঘুষ দিয়ে রাজি হলেন না, তখন মোটা অংকের জরিমানাসহ একটা বিল তাঁকে ধরিয়ে দেওয়া হলো। অত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করা তাদের পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। এ কারণে আব্বা তাঁর একজন রাজনৈতিক বন্ধুকে প্রভাব খাটাতে বললেন।

সব মিলিয়ে পরিস্থিতি যেদিকে যাচ্ছিল তাতে স্কুল চালানো যাবে না বলেই মনে হচ্ছিল। কিন্তু আব্বা তাঁর স্বপ্নকে এত সহজে ছেড়ে দেওয়ার পাত্র ছিলেন না। এর বাইরেও তাঁকে একটা পরিবার চালাতে হচ্ছিল। আমার জন্ম হয় ১৯৯৭ সালের ১২ জুলাই। প্রতিবেশী এক মহিলার বেশ কয়েকটি প্রসব কাজে সহায়তা করার অভিজ্ঞতা ছিল। ওই ভদ্রমহিলাই আম্মাকে প্রসবকালীন সহায়তা দিয়েছিলেন। আব্বা স্কুলে অপেক্ষা করছিলেন। সন্তান জন্মের খবর শুনে তিনি দৌড়ে এলেন। ছেলে হয়নি, মেয়ে হয়েছে–একথা আব্বাকে জানাতে আম্মা বিব্রত বোধ করছিলেন। কিন্তু আব্বা আমার চোখের দিকে চেয়ে আনন্দে উচ্ছসিত হয়ে উঠলেন। হেদায়েতুল্লাহ এখনও বলেন, 'মালালা খুব সৌভাগ্যবতী। সে জন্ম নেওয়ার পরই আমাদের ভাগ্য খুলে যায়।'

www.pathagar.com

তবে ভাগ্য তাৎক্ষণিকভাবে খোলেনি। ১৯৯৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভের পঞ্চাশতম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে দেশ জুড়ে বিশেষ কুচকাওয়াজ ও স্মরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কিন্তু আব্বা ও তাঁর বন্ধুরা বললেন, পাকিস্তানের সঙ্গে একীভূত হওয়ার পর সোয়াত কেবলই বঞ্চিত হয়েছে, কষ্ট পেয়েছে। সুতরাং সোয়াতবাসীর আনন্দের কিছু নেই। বাহুতে কালো কাপড় বেঁধে তারা বিক্ষোভ করলেন এবং পুলিশ তাঁদের ধরে নিয়ে গেল। ছাড়া পাওয়ার জন্য যে পরিমাণ জরিমানা দেওয়া দরকার ছিল তা তাঁদের কাছে ছিল না।

আমার জন্মের কয়েক মাস পর স্কুলের ওপর তলার তিনটি রুম খালি হলো। আমরা সবাই সেখানে চলে গেলাম। এখানকার দেওয়াল ছিল কংক্রিটের এবং পানির সরবরাহও ছিল নিয়মিত। সেদিক থেকে নিচের কর্দমাক্ত স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশের তুলনায় এটা অনেক উন্নত ছিল। কিন্তু হেদায়েতুল্লাহ আমাদের সঙ্গে থাকতেন এবং অনেক অতিথি প্রায় নিয়মিত থাকতো বলে সেখানেও গাদাগাদির পরিবেশ ছিল। প্রথম স্কুলটি ছিল ছেলে-মেয়েদের প্রাইমারি স্কুল। স্কুলটা খুবই ছোট ছিল। আমার যখন জন্ম হয় তখন শিক্ষক শিক্ষিকা ছিলেন সব মিলিয়ে পাঁচ-ছয়জন। প্রায় একশজন ছাত্রছাত্রী ছিল। তাদের প্রত্যেকে একশ রুপি করে স্কুল ফি দিতো।

আব্বা একাই ছিলেন স্কুলটির শিক্ষক, অ্যাকাউন্টেন্ট, প্রিন্সিপাল–সব কিছু। তিনি নিজেই স্কুলের মেঝে ধুতেন, দেওয়াল সাফ করতেন, এমনকি বাথরুম পর্যন্ত ধুতেন। নিজেই স্কুলের বিজ্ঞাপন ব্যানার টাঙাতে বৈদ্যুতিক খাম্বায় উঠে যেতেন; যদিও তার এত বেশি উচ্চতাভীতি ছিল যে মই বেয়ে ওপরে ওঠামাত্র তাঁর পা ঠকঠক করে কাঁপতো। পানির পাম্প বিকল হয়ে গেলে তিনি নিজে ট্যাংকিতে নেমে গিয়ে সেটা ঠিক করে ফিরে আসতেন। আব্বা যখন ট্যাংকির নিচে নেমে যেতেন তখন আমি কান্নাকাটি করতাম। ভাবতাম আব্বা আর বেরিয়ে আসতে পারবে না। ভবনের ভাড়া ও শিক্ষকদের বেতন কড়ি দেওয়ার পর যা থাকতো তা দিয়ে আমাদের খাবার কেনাই কষ্ট হয়ে যেতো। দুধ চা খাওয়ার সামর্থ্য ছিল না বলে আমরা সবুজ চা খেতাম। তবে স্কুলটা যখন ব্রেক ইভেনে আসলো, অর্থাৎ স্কুলের আয়-ব্যয় সমান সমান হয়ে আসলো, তখন আব্বা দ্বিতীয় স্কুল করার পরিকল্পনা করলেন। দ্বিতীয় স্কুলটির নাম তিনি দিতে চেয়েছিলেন, 'মালালা এডুকেশন একাডেমি।'

স্কুলটা আমার ছোটাছুটি করার জায়গা ছিল। আব্বার কাছে শুনেছি, কথা বলা শেখার আগে থেকেই নাকি আমি স্কুলের বিভিন্ন ক্লাসে পিলপিল করে হেঁটে যেতাম। কথা বলা শেখার পর ক্লাসে গিয়ে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে শিক্ষকদের ভঙ্গিতে কথা বলতাম। মিস উলফাতের মতো কিছু শিক্ষিকা আমাকে কোলে

www.pathagar.com

তুলে নিতেন। মাঝে মাঝে তাঁরা আমাকে তাঁদের বাড়িতেও নিয়ে যেতেন। আমার যখন তিনচার বছর বয়স তখন আমার চেয়ে বয়সে বড় বাচ্চাদের মধ্যে আমাকে রেখে আসা হতো। আমি তাদের মধ্যে বসে, তাদের কথা শুনতাম, তারা কীভাবে পড়াশুনা করে তা দেখতাম। মাঝে মাঝে শিক্ষকদের গলা ও বলার ধরন নকল করতাম। বলতে পারেন, স্কুলেই আমি বড় হয়েছি।

আব্বা তাঁর বন্ধু নাঈমের সঙ্গে স্কুল শুরু করতে এসে বুঝেছিলেন ব্যবসা আর বন্ধুত্ব এক সঙ্গে চালানো সহজ ব্যাপার নয়। হেদায়েতুল্লাহর ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটলো এবং তিনি আব্বার সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিন্ন করে নিজে আলাদা স্কুল বানালেন। ছাত্রছাত্রীও দুইভাগ করে নিলেন। তাঁরা যে আলাদা হয়েছেন একথা শিক্ষার্থীদের বললেন না। তারা চাইছিলেন লোকে ভাবুক স্কুলটা সম্প্রসারিত হয়ে আলাদা বিল্ডিংয়ে এসেছে। এই সময় আব্বা এবং হেদায়েতুল্লাহ দুজন দুজনার সঙ্গে কথা বলতেন না। তবে হেদায়েতুল্লাহ আমাকে মিস করতেন এবং আমাকে দেখতে আমাদের বাসায় আসতেন। ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরের এক সন্ধ্যায় এমনিভাবে হেদায়েতুল্লাহ আমাদের বাসায় এলেন। সেটা ছিল উদ্বেগ উৎকণ্ঠার এক সন্ধ্যা। আরও লোকজন আমাদের বাসায় আসা শুরু হলো। সবাই বলাবলি করছিল নিউইয়র্কে একটা বিশাল বিল্ডিংয়ে হামলা হয়েছে। দুটো বিমান উড়ে এসে এর মধ্যদিয়ে ঢুকে গেছে। আমার বয়স তখন চার বছর। এত ছোট যে আমি তাদের কথার মানে বুঝতে পারছিলাম না। এমন কি সেখানকার বয়স্কদের মধ্যে অনেকের পক্ষেও বিষয়টি কল্পনা করা কঠিন ছিল। সোয়াতের সবচেয়ে উঁচু ভবন ছিল একটি হাসপাতাল ও একটি হোটেল। এর একটা ছিল তিন তলা আরেকটা ছিল দোতলা। নিউ ইয়র্ক কী জিনিস আর আমেরিকা কোথায়–এসব সম্পর্কে তখন আমার কোনো আইডিয়া ছিল না। তখন আমার জগৎই ছিল স্কুল এবং স্কুলটাই ছিল আমার জগৎ। তখনও আমরা ঘুনাক্ষরে বুঝতে পারিনি এই নাইন ইলেভেন আমাদের জগৎকেও পাল্টে দিতে যাচ্ছে এবং আমাদের এই শান্তির উপত্যকায় যুদ্ধ বয়ে নিয়ে আসছে।

www.pathagar.com

৪

সেই গ্রামটি

আমাদের স্থানীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী নবজাতকের বয়স সাত দিন হলে আমরা একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করি। অনুষ্ঠানটিকে স্থানীয় ভাষায় 'ওমা' বলা হয় যার অর্থ 'সাত'। আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশি ও বন্ধু বান্ধব নবজাতককে শুভেচ্ছা জানাতে ও দোয়া করতে ওই অনুষ্ঠানে মিলিত হয়। অনুষ্ঠানটির আয়োজন করতে যে চাল-খাসির যোগাড় করতে হয় তার খরচ যোগানোর সামর্থ্য ছিল না বলে আমার আব্বা আম্মা আমার জন্মের পর তা করতে পারেন নি। আর যেহেতু আমি ছেলে শিশু ছিলাম না, সে কারণে আত্মীয়-স্বজন এই বিষয়ে আব্বাকে আর্থিক সাহায্য করতেও চাননি। আমার পর আমার ভাইদের যখন জন্ম হলো তখন দাদাজান আব্বাকে 'ওমা' আয়োজনের খরচ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমার জন্মের পর যেহেতু তা করা সম্ভব হয়নি সেজন্য আব্বা দাদাজানের সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। যেহেতু আমার জন্মের আগেই নানা মারা গিয়েছিলেন, সে কারণে আমি দাদার ঘনিষ্ঠ সাহচর্য পেয়েছিলাম। আব্বা-আম্মা বলেন, দাদা এবং নানা দুজনেরই গুণ নাকি আমার মধ্যে আছে। তারা বলেন, আমার মধ্যে নাকি নানার জ্ঞান-বুদ্ধি ও রসবোধ আছে। একই সঙ্গে দাদার মতো কণ্ঠ পেয়েছি। বৃদ্ধ বয়সে কোমল ও শুভ্র শশ্রুমণ্ডিত দাদাজানকে দেখতে আমি প্রায়ই গ্রামে যেতাম।

আমাকে দেখামাত্রই দাদাজান সেই গানটা গেয়ে উঠতেন। আমার নামটার সঙ্গে যে বেদনাসূচক অর্থ জড়িয়ে আছে সেটা যেন তখনও তাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। তাই আমাকে খুশি করতে একটু আনন্দ মিশ্রিত গলায় তিনি গানটি গাইতেন। গানটি ছিল 'মালালা মেইবান্দ ওয়ালা দা। পা তুন জেহান কে দা খুমালা দা।' অর্থটা এরকম– 'মেইবান্দের কন্যা মালালা। দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী কন্যা সে।'

প্রত্যেক ঈদে আমরা গ্রামের বাড়ি যেতাম। সবচেয়ে ভালো জামাকাপড় পরে আমরা লোকজনে ঠাসাঠাসি মিনিবাসে চড়ে আমাদের গ্রাম শাংলার দিকে রওনা হতাম। প্রতিবছর দুটি ঈদ উদযাপিত হয়। রমজান মাসের রোজা শেষে যে ঈদ হয় সেটাকে বলে 'ঈদ-উল-ফিতর' বা ছোট ঈদ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য পুত্র ইসমাইলকে নবী ইব্রাহীমের কোরবানী করার ঘটনার স্মারক হিসেবে পালিত হয় ঈদুল আজহা বা 'বড় ঈদ।' ঈদের দিন নির্ধারণ করার জন্য

www.pathagar.com

আলেমদের একটা বিশেষ প্যানেল আছে। তাঁরা নতুন চাঁদ দেখে ঈদের দিনের ঘোষণা দেন। রেডিওতে আমরা চাঁদ দেখার ঘোষণা শুনে গ্রামের দিকে রওনা হতাম।

ঈদের আগের রাতে খুশি আর উত্তেজনায় আমাদের ঘুম আসতো না। বৃষ্টি বা ভূমি ধ্বসের কারণে রাস্তাঘাট ভেঙেচুরে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে থাকলে গ্রামের বাড়িতে পৌঁছাতে আমাদের ঘণ্টা পাচেক সময় লাগতো। খুব ভোরে আমাদের নিয়ে 'ফ্লাইং কোচ' নামের ওই মিনিবাস রওনা হতো। নিজেদের কাপড় চোপড়, উপহার সামগ্রী, ফুল, গ্রামে পাওয়া যায় না এমন সব প্রয়োজনীয় ওষুধ বিষুধে বোঝাই গাটরি বোচকা নিয়ে আমরা মিঙ্গোরা বাস স্টেশনে হুড়োহুড়ি করে পৌঁছাতাম। অনেকে আটা ময়দার বস্তাও সঙ্গে নিতো। বাসের সবখানে কানায় কানায় ভরে যেতো ব্যাগ বোস্কা। ছাদের ওপরও জায়গা থাকতো না। জানালার পাশের সিট দখল করার জন্য যাত্রীদের মধ্যে এক রকম যুদ্ধ শুরু হয়ে যেতো। ধুলো ময়লায় জানালার কাঁচ এতটাই বিবর্ণ থাকতো যে তা দিয়ে বাইরের কিছু দেখার জো ছিল না। তারপরও সবাই চাইতো জানালার পাশের সিট দখল করতে। সোয়াতের যাত্রীবাহী বাসের দুই পাশে গোলাপী ও হলুদ রংয়ের ফুল, গাঢ় কমলা রংয়ের বাঘ আর তুষারাচ্ছন্ন পাহাড় পর্বতের ছবি আঁকা থাকতো। যদিও আব্বা বলতেন, আমাদের রাজনীতিবিদেরা পরমাণু বোমা বানানোর পেছনে কাড়ি কাড়ি পয়সা না ঢাললে আমাদের পর্যাপ্ত স্কুল করার অর্থ হাতে থাকতো; এই পরমাণু বিষয়ের উল্লাসিকতা সত্ত্বেও আমার ছোট দুই ভাইয়ের কাজকর্ম দেখলে মনে হতো তাদের এফ-১৬ জঙ্গি বিমান কিংবা পারমাণবিক মিসাইলে বসিয়ে দিলে তারা খুশি হতো।

ডেন্টিস্টদের টাঙিয়ে রাখা দাঁত কেলানো হাসিযুক্ত মুখের ছবিওয়ালা বিজ্ঞাপনী বিলবোর্ড, কাঠের ঝাকার ফাঁক দিয়ে রক্তাভ ঠোঁট বের করে ক্রমাগত ঝিমুতে থাকা সাদা মুরগী, জানালা দিয়ে দৃশ্যমান বিয়ের গয়নায় সাজানো সোনার দোকান– গাড়ির জানালা দিয়ে এইসব দেখতে দেখতে আমরা বাজার এলাকা থেকে বের হতাম। মিঙ্গোরা থেকে উত্তর দিকে যাওয়ার সময় বাজারের সর্বশেষ যে দোকানগুলো চোখে পড়তো সেগুলো ছিল কয়েকটা চালাঘর। মনে হতো ঘরগুলো একটা আরেকটার দিকে ঝুকে আছে। সামনে অনেকটা পথ খারাপ রাস্তা বলে সেখানে পুরনো টায়ার বিক্রি হতো। এরপরই আমরা আমাদের সর্বশেষ ওয়ালির নির্মাণ করা প্রধান সড়কে উঠতাম। এই সড়কের বাম পাশে ছিল প্রশস্ত সোয়াত নদী, ডান পাশে পান্নার খনিওয়ালা পাহাড়চূড়া নদীর পাশের পাহাড়ের ওপর বিশাল বিশাল কাঁচের জানালাওয়ালা পর্যটন রেঁস্তোরা; যেখানে আমাদের কোনোদিনই যাওয়া হয়নি। শহর ছাড়িয়ে একটু এগোলেই রাস্তায় চোখে পড়তো ধুলো ময়লায় বিবর্ণ চেহারার শিশুরা কাঁধে ঘাঁস বোঝাই ভারী ছালা নিয়ে কুঁজো হয়ে হাঁটছে; ছাগলের পাল নিয়ে লোকেরা এগিয়ে চলেছে। এদিক-ওদিক চলে যাওয়া ছাগলগুলো সামলাতে সামলাতে এগোচ্ছে তারা।

www.pathagar.com

আরেকটু দূরে যেতেই দৃশ্যপট আরও পাল্টে যেতো। সবুজের সমারোহ ভরা ধানক্ষেত থেকে নির্মল সুবাস ভেসে আসতো। আরেকটু এগোলে কমলা রংয়ের অ্যাপ্রিকট বা খুবানি ফল আর ডুমুরের ঝাড়। মাঝে মাঝে খালের ওপরে মার্বেল পাথর প্রক্রিয়াজাত করার কাজ চোখে পড়তো। দুধের মতো সাদা পদার্থের সঙ্গে রাসায়নিক বর্জ্য নদীতে মিশে যেতো। এটা দেখে আব্বা ক্ষেপে যেতেন। তিনি সব সময় বলতেন, 'দেখো, এইসব ক্রিমিনাল আমাদের এই সুন্দর উপত্যকাটাকে কীভাবে দূষিত করছে।' খাল পার হয়ে পথ চলে গেছে উঁচু পাহাড়ের চড়াই গা বেয়ে। কান ভোঁ ভোঁ না করা পর্যন্ত আমাদের গাড়ি ওপরের দিকে উঠতেই থাকে, উঠতেই থাকে। কিছু পাহাড়ের চূড়ায় প্রাচীন দূর্গের ধ্বংসস্তূপ চোখে পড়তো যেখানে শকুনদের জড়ো হয়ে থাকতে দেখা যেত। আমাদের প্রথম ওয়ালি এইসব দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। পাহাড়ি পথ দিয়ে নিচের দিকে নামার সময় বাসটি প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে নিয়ন্ত্রিত গতিতে সামনে এগোতো। পেছন থেকে আসা ট্রাকগুলো বেপরোয়া গতিতে যখন আমাদের বাসটিকে পাশ কাটিয়ে যেত তখন আমাদের ড্রাইভার ট্রাকগুলোকে অভিসম্পাত করতো। আমার ভাইদের এটা ভালোই লাগতো। তাঁরা আমাকে আর আম্মাকে ভয় দেখানোর জন্য পাহাড়ের নিচে পড়ে থাকা দুর্ঘটনা কবলিত গাড়ির ছিন্নভিন্ন অংশ আঙুল দিয়ে দেখাতো।

অবশেষে গাড়িটি যখন আমাদের নিয়ে শাংলা চূড়ার তোরণদ্বার হিসেবে পরিচিত স্কাই টার্নে পৌঁছাতো তখন মনে হতো আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু জায়গায় চলে এসেছি। আমাদের চারপাশে সেখান থেকেও অনেক উঁচু উঁচু পাথুরে চূড়া দাঁড়িয়ে থাকতো। অনেক দূরে অবস্থিত আমাদের স্কি রিসোর্ট মালাম জাব্বার গায়ে জন্মে থাকা তুষার এখান থেকেই চোখে পড়তো। রাস্তার পাশ দিয়ে স্বচ্ছতোয়া ঝর্ণা ও ছোট ছোট জলপ্রপাত বয়ে যেতো। একটু জিরিয়ে নিতে বা চা খাওয়ার জন্য পাহাড়ের ওপর গাড়ি থামিয়ে নামতাম তখন বিশুদ্ধ বাতাসের সঙ্গে চিরহরিৎ বৃক্ষ আর পাইন ফুলের সুবাস ঝাপটা দিয়ে যেতো। প্রবল প্রশান্তিতে আমরা সেই পার্বত্য বাতাস আনিঃশ্বাস গ্রহণ করতাম।

শাংলা জুড়ে শুধু পাহাড়, পাহাড় আর পাহাড়; মাথার ওপরে শুধু এক টুকরো আসমান। পাহাড়ি পথ আবার নিচের দিকে নামতে নামতে ঘৌরবান নদী পর্যন্ত চলে গেছে। নদীর কাছাকাছি এসে এবড়ো থেবড়ো পাথরে এসে পথ মিলিয়ে গেছে। এই নদী পার হওয়ার একটাই মাধ্যম। সেটা হলো দড়ির ব্রিজ। একটা ধাতব বাক্সের মতো ঝুলন্ত ব্রিজের মধ্য দিয়ে সাবধানে হেলেদুলে নদীটি পার হতে হয়। বিদেশিরা এটিকে সুইসাইড ব্রিজ বললেও আমাদের কাছে সেটি খুবই প্রিয় ছিল।

আপনি যদি সোয়াতের মানচিত্র দেখেন, তাহলে দেখবেন লম্বা একটা উপত্যকার মধ্যে গাছের প্রশাখার মতো ছোট ছোট উপত্যকা আছে। এই খুদে উপত্যকাগুলোকে আমরা বলি ডারাই। উপত্যকার পূর্বপ্রান্ত থেকে আধা কিলোমিটার দূরে আমাদের গ্রাম। গ্রামটি পড়েছে কানা ডারার মধ্যে। দুই পাশে

www.pathagar.com

ছোট দুটো পাহাড়। মাঝখানে যে সমতল ভূমিতে আমাদের গ্রাম সেটা এতটাই সরু যে একটা ক্রিকেট মাঠের জায়গাও সেখানে নেই। আমাদর গ্রামটিকে আমরা শাহপুর নামে জানতাম। তবে আদতে ওই কানা ডারায় গ্রাম ছিল তিনটি। সবচেয়ে বড় গ্রামটির নাম শাহপুর, যে গ্রামে আব্বা বড় হয়ে ওঠেন সেটির নাম বারকানা এবং যেখানে আম্মার জন্ম ও বেড়ে ওঠা সেই গ্রামটি হলো কারশাত। এর দক্ষিণ প্রান্তে তোরঘার বা কালো পাহাড় এবং উত্তর প্রান্তে স্পিন ঘার বা সাদা পাহাড়।

আমরা গ্রামে গেলে সাধারণত বারকানায় দাদাবাড়িতে থাকতাম। এই বাড়িতেই আব্বার শৈশব কেটেছে। ওই এলাকার প্রায় সব বাড়ির মতো দাদাবাড়ির ভবনও ছিল পাথর ও মাটি দিয়ে তৈরি সমতলবিশিষ্ট ছাদের। আমার অবশ্য কারশাতেই নানাবাড়িতে থাকতে ভালো লাগতো। কারণ তাদের বাড়িটি কংক্রিটের তৈরি ছিল, পাকা বাথরুম ছিল। এছাড়া অনেক ছেলেমেয়ে ছিল যাদের সঙ্গে খেলা করা যায়। নানাবাড়িতে নিচতলায় মহিলাদের ঘরে আম্মার সঙ্গে আমি থাকতাম। বাচ্চাদের দেখাশুনা করা ও ওপর তলার বৈঠকখানা বা হুজরায় পুরুষদের খাবার তৈরি করতে করতে মহিলাদের দিন কেটে যেত। আমার মামাতো বোন আনিসা এবং সুম্মুলের সঙ্গে একটা রুমে ঘুমাতাম। রুমটায় মসজিদের আদলে বানানো একটা দেওয়াল ঘটি ছিল। এছাড়া দেওয়ালের সঙ্গে একটা কেবিনেট লাগানো ছিল। কেবিনেটে একটা গুলিভরা রাইফেল আর কতকগুলো চুলের কলপের প্যাকেট ছিল।

গ্রামে অতি ভোরে দিন শুরু হয়ে যায়। আমি এমনিতে দেরি করে উঠি। কিন্তু গ্রামে গেলে ভোরের আলো ফোটার সময় মোরগের বাগ এবং নাস্তা বানানোর জন্য মহিলাদের থালাবাসন মাজার শব্দে উঠে যেতাম। ভোর বেলায় সূর্যের আলো তোরঘার পাহাড়ের চূড়ায় প্রতিফলিত হতো। ফজরের নামাজ পড়ার জন্য ঘুম থেকে জেগে দেখতাম স্পিনঘারের তুষার চূড়ায় সূর্যের প্রথম রশ্মি জ্বলজ্বল করছে। মনে হতো যেন এক ধবধবে ফর্সা নারী কপালে জুমার টিকা (এক ধরনের স্বর্ণালঙ্কার) পরে বসে আছে।

সবকিছু ধুয়ে মুছে পরিবেশটাকে স্নিগ্ধ ও নির্মল করে তুলতে মাঝে মাঝেই বৃষ্টি নামতো ঝমঝমিয়ে। সবুজে ছাওয়া পাহাড়গুলোর ওপর মেঘের দল গড়িয়ে বেড়াতো। এসব পাহাড়ে লোকজন মূলা জাতীয় কন্দ আর আখরোটের চাষ করতো। কোথাও কোথাও মৌচাক চোখে পড়তো। থিকথিকে দানাপড়া মধু আমার খুব পছন্দের। এই মধু আখরোটের সঙ্গে মিশিয়ে আমরা খেতাম। কারশাত গ্রামের শেষ মাথায় পাহাড়ি নদীতে মোষের পাল দেখা যেত। এছাড়া সেখানে নদীতে একটা কাঠের ওয়াটার হুইল বসানো ছিল। এর মাধ্যমে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করে মেশিনে গম ও যব ভাঙিয়ে আটা, ময়দা বা ছাতু বানানো হতো। সেসব আটা ময়দা ছেলেরা বস্তায় ভরে বাড়িতে নিয়ে যেত। এর পাশেই ছিল ছোট্ট একটা চালাঘর। ঘরটির মধ্যে একটা প্যানেল বসানো যার ভেতর থেকে প্যাচানো এক গাদা তার বেরিয়ে থাকতো। সরকার থেকে এই গ্রামে

www.pathagar.com

তখনও বিদ্যুৎ দেওয়া হয়নি। ফলে অনেকে নিজেদের উদ্যোগে হস্তচালিত হাইড্রোলিক প্রকল্পের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতো।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সূর্য যত ওপরে উঠত সাদা পাহাড়টা সোনালী সূর্যচ্ছটায় তত বেশি অবগাহন করতো। বিকেল গড়িয়ে এলে পাহাড়টা ক্রমশ ছায়ায় ঢাকা পড়তো; অন্যদিকে সূর্যরশ্মি তখন আছড়ে পড়ত কালো পাহাড়ের গায়ে। পাহাড়ের ওপর পড়া ছায়া দেখে আমরা নামাজের ওয়াক্ত ঠিক করতাম। সূর্যের আলো যখন পাহাড়ের নির্দিষ্ট জায়গায় পড়ত তখন আমরা আসরের নামাজ আদায় করতাম। এরপর গোধূলীতে স্পিন ঘারের সাদা চূড়ায় যখন সূর্যের আলো পড়ত তখন ভোরের চেয়ে বেশি সুন্দর দৃশ্য চোখে পড়ত। তখন আমরা মাগরিবের নামাজ পড়তাম। সাদা পাহাড়টা যে কোনো জায়গা থেকে চোখে পড়ত। আব্বা বলতেন তিনি এই পাহাড়টাকে আমাদের উপত্যকার শান্তির প্রতীক হিসেবে দেখেন। তিনি মনে করেন এই উপত্যকার শেষ প্রান্তে শান্তির সাদা নিশান হয়ে পাহাড়টা তার অস্তিত্ব মেলে ধরেছে। আব্বা ছোটবেলায় এই উপত্যকাটাকেই গোটা পৃথিবী মনে করতেন। তাঁর ধারণা ছিল, যেখানে পাহাড়ের উঁচু চূড়া আকাশকে চুম্বন করেছে তার ওপাশে কেউ গেলেই পৃথিবীর বাইরে ছিটকে পড়ে যাবে।

আমার জন্ম শহরে হলেও আমি আব্বার প্রকৃতিপ্রেমকে উপলব্ধি করতাম। চারপাশের উর্বর জমি, বৃক্ষদলের অবারিত সবুজ, শস্যের প্রাচুর্য, সার বেঁধে যাওয়া মহিষের পাল, হেঁটে যাওয়ার সময় চারপাশে ওড়াউড়ি করা রঙিন প্রজাপতি– এসব আমি ভালোবাসতাম। উপভোগ করতাম। আমাদের গ্রামের মানুষ খুব গরীব। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা গ্রামে আসলে আমাদের যৌথ পরিবার ধুমধাম করে খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করত। বড় বড় গামলায় মুরগী, পোলাও, সবজি, খাসির মাংস ভুনা, পরিবেশন করা হতো। এসবই বাড়ির মহিলারা রান্না করত। এসব খাবারের পর টসটসে আপেল, স্লাইস করে কাটা হলুদ কেক আর বড় এক কেতলি দুধ চা দেওয়া হতো। কোনো শিশুর হাতেই খেলনা কিংবা বই থাকতো না। ছেলেরা উঠোনে ক্রিকেট খেলত। আসল বল না থাকায় প্লাস্টিকের ব্যাগ দলাই মলাই করে গোল বানিয়ে তা ইলাস্টিক ব্যান্ড দিয়ে বাধা হতো।

গ্রামটি ছিল একেবারেই বিস্মৃত এলাকা। ঝর্ণা থেকে পানি নিয়ে সেখানকার লোকজন ব্যবহার করত। যেসব পরিবারের গৃহকর্তা কিংবা ছেলেরা দক্ষিণের খনিতে অথবা উপসাগরীয় দেশে থাকতো এবং সেখান থেকে নিয়মিত অর্থ পাঠাতো তাদের বাড়িগুলো ছিলো কংক্রিটের তৈরি। আমাদের মোট চার কোটি পশতুনদের এক কোটি লোকই দেশের বাইরে কাজ করে। আব্বা বলতেন, খুব দুঃখের বিষয় হলো, পরিবারের অন্য সবার আধুনিক জীবনযাত্রা নিশ্চিত করার স্বার্থে বিদেশে থাকা এই লোকগুলো আর স্থায়ীভাবে ফিরে আসতে পারে না।

www.pathagar.com

অনেক পরিবার আছে যাদের মধ্যে কোনো পুরুষ সদস্য পরিবারের সঙ্গে থাকে না। তারা শুধু বছরে একবার বাড়িতে বেড়াতে আসে এবং এর নয়মাস পর পরিবারটিতে কোনো নতুন শিশু সদস্য যুক্ত হয়।

পাহাড়ের নিচে আমার দাদাজানের ঘরের মতো পাথর আর মাটি দিয়ে নির্মিত অসংখ্য ঘর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বড় ধরনের বন্যা দেখা দিলে প্রায়ই ঘরগুলো ধ্বসে পড়ে। শীতকালে সেখানে বহু শিশু উষ্ণ ঘর ও কাপড়ের অভাবে মারা যায়। সেখানে কোনো ডাক্তারও নেই। একমাত্র শাহপুরে একটা ক্লিনিক আছে। অন্য গ্রামগুলোতে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে লোকজন তাকে তক্তা দিয়ে বানানো একটা খাঁটিয়ায় শুইয়ে এই ক্লিনিকে নিয়ে আসতো। আমরা ঠাট্টা করে এই খাঁটিয়াকে শাংলা অ্যাম্বুলেন্স বলে থাকি। যদি রোগীর অবস্থা আশংকাজনক হয়ে পড়ত তখন তাঁকে বাসে করে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে মিঙ্গোরার হাসপাতালে নেওয়া হতো।

রাজনীতিকরা সাধরণত নির্বাচনের সময় এখানে একবার চেহারা দেখাতে আসতেন। তাঁরা যথারীতি রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, বিশুদ্ধ পানি, স্কুল ইত্যাদি নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিতেন। একই সঙ্গে স্থানীয় প্রভাবশালী লোকজনকে অর্থকড়ি দিয়ে যেতেন। এই স্থানীয় নেতারাই নিজ নিজ গোষ্ঠীর লোকজনকে বলে দিতেন কাকে কীভাবে ভোট দিতে হবে। এই ভোটের বিষয়টি অবশ্যই শুধুমাত্র পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমাদের গ্রামে মহিলাদের কোনো ভোটই নেই। এইসব নেতারা জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হলে ইসলামাবাদে আর প্রাদেশিক পরিষদে নিবাচিত হলে পেশোয়ারে গিয়ে হারিয়ে যেতেন। আমরা তাদের আর দেখাও পেতাম না; তাঁদের প্রতিশ্রুতির কথাও আর শুনতাম না।

আমার শহুরে চালচলন দেখে আমার চাচাতো-মামাতো ভাই-বোন ঠাট্টা মশকরা করত। খালি পায়ে আমি বাইরে বের হতাম না। আমি বই পড়তাম এবং তাদের সঙ্গে আমার উচ্চারণগত ভিন্নতা ছিল। আমার কথাবার্তায় মিঙ্গোরার শহুরে কথ্যভঙ্গি চলে আসতো। তারা বাড়িতে বানানো জামাকাপড় পরত। আর আমি পরতাম দোকান থেকে কেনা রেডিমেড পোশাক। আমার আত্মীয়-স্বজনেরা আমাকে বলতো, 'আমাদের তুমি কি মুরগি রান্না করে খাওয়াতে পারবে?' আমি বলতাম, 'না, মুরগী অবলা জীব। ওদের হত্যা করা উচিত না।' তারা ভাবতো, আমি শহর থেকে এসেছি, এ কারণে আমি তাদের চেয়ে আধুনিক। তারা তো আর জানতো না ইসলামাবাদ কিংবা পেশোয়ারে যারা থাকে তারা আমাকে খুবই গেঁয়ো এলাকার মেয়ে বলেই ভাবে।

মাঝে মাঝে পরিবারের সবাই এক সঙ্গে পাহাড়ের ওপরে আবার কখনো নীচে নদীর ধারে বেড়াতে যেতাম। গ্রামের পাশেই যে নদীটা ছিল সেটা ছিল বেশ বড় এবং গভীর। গ্রীষ্মকালে তুষার গলার কারণে প্রচণ্ড খরস্রোতা হয়ে উঠতো নদীটি। লম্বা লাঠিতে সুতো বেঁধে; সুতোর এক প্রান্তে বড়শি বেঁধে; তারপর সেই

www.pathagar.com

বড়শিতে কেঁচো গেঁথে দিয়ে ছেলেরা নদীতে মাছ ধরত। অনেকে বড়শি দিয়ে মাছ ধরার সময় শিস দিতো। তাদের ধারণা ছিল, শিস শুনে মাছ বড়শির কাছে চলে আসে। মাছগুলো যে বিশেষ কোনো স্বাদের তা নয়। মাছগুলোর মুখ খুব এবড়ো থেবড়ো আকৃতির আর মুখের ওপর শিংয়ের মতো কাঁটা। আমরা এগুলোকে 'চাকওয়ারতি' মাছ বলতাম। কখনো কখনো মেয়েরা দলবেধে হাড়িতে করে চাল-ডাল নিয়ে নদীর কিনারে বনভোজন করতে যেত। আমাদের খুব প্রিয় একটা খেলা ছিল 'বিয়ে বিয়ে খেলা'। এই খেলায় আমরা ছেলে মেয়েরা দুইভাগে ভাগ হয়ে যেতাম। একটি বরপক্ষ অন্যটি কনেপক্ষ। প্রত্যেকেই চাইতো, আমি যেন তাদের পক্ষে থাকি; কারণ আমি মিঙ্গোরা থেকে এসেছি এবং এ কারণে তাদের চোখে আমি আধুনিকা। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী ছিল তানজিলা। আমরা তাকে অপরপক্ষের দলে নিতে চাইতাম যাতে তাকে আমাদের পক্ষে 'বউ' করে আনতে পারি।

এই বিয়ে বিয়ে খেলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল গয়নাসজ্জা। সত্যি সত্যি কনে সাজানোর মতো এই কনেকে কানের দুল, চুড়ি, হার দিয়ে সাজাতাম। কনে সাজানোর সময় সমস্বরে বলিউড সিনেমার গান গাইতাম। এরপর আমরা আমাদের মায়েদের মেক-আপ বক্স থেকে নিয়ে আসা সাজ গোজের জিনিস দিয়ে কনের চেহারায় মেকআপ দিতাম। মুখ ফর্সা করতে লেবুর পানি ও সোডার পানি দিয়ে কনের মুখ ধুইয়ে দিতাম। আঙুল ও নখ রাঙিয়ে দিতে হেনা লাগাতাম। সাজানো হয়ে গেলে কনে কান্না কাটি করত। আমরা তার মাথায় হাত বুলিয়ে শান্তনা দিয়ে বলতাম, 'বিয়ে তো জীবনেরই অংশ। সবাই কি সবদিন বাপের বাড়ি থাকে। যাও, শ্বশুর শ্বাশুড়ির ঠিকমতো দেখাশুনা করো। স্বামীকে সুখী করো।'

মাঝে মাঝে আসল বিয়ে হতো। কনের বাবাকে দেউলিয়া করে নয়তো দেনায় ডুবিয়ে কয়েকদিন ধরে ধুমধাম অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে খাওয়া-দাওয়া চলত। বিয়েতে কনেকে ঝলমলে পোশাক পরানো হতো। উভয় পক্ষ থেকে দেওয়া সোনার হার, চুড়ি, বালায় বউকে সাজিয়ে তোলা হতো। আমি পড়েছি, দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য বেনজির ভুট্টো নাকি তার বিয়েতে সোনার চুড়ির বদলে কাঁচের চুড়ি পরেছিলেন। কিন্তু আমাদের সংস্কৃতিতে কনেকে সোনার গয়নায় সাজানোর রেওয়াজ এখনও আছে।

মাঝে মাঝে কোনো কোনো খনি থেকে গ্রামে প্লাইউডের কফিনে স্থানীয় কারও কারও লাশ আসত। মৃত ব্যক্তির স্ত্রী বা মাকে শান্তনা দেওয়ার জন্য প্রতিবেশি মহিলারা এই বাড়িতে যেতেন। এরপর শোকাহত স্ত্রী বা মায়ের সঙ্গে তারাও সমস্বরে আহাজারি করতেন। পুরো উপত্যকায় প্রতিধ্বনিত হওয়া সেই সম্মিলিত বিলাপধ্বনিতে আমার গায়ের চামড়ায় কাঁটা দিতো।

রাতে পুরো উপত্যকা জুড়ে নিকষ আঁধার নেমে আসত। পাহাড়ি কুটিরগুলোতে কেবলমাত্র লণ্ঠনের টিমটিমে আলো চোখে পড়ত। বয়স্ক মহিলাদের কেউই

www.pathagar.com

লেখাপড়া জানতেন না। কিন্তু তারা রাতের বেলায় সুন্দর সুন্দর গল্প বলতেন এবং এক ধরনের পশতুন ভাষার ছড়া কাটতেন। এসব ছড়াকে আমরা বলি 'ট্যাপি'। আমার নানী এই গল্প খুব সুন্দর বলতে পারতেন। গল্পগুলো সাধারণত প্রেম অথবা পশতুন চেতনাকেন্দ্রীক হতো। আমার নানি বলতেন, 'কোনো পশতুনই হাসিমুখে তার মাটি ছেড়ে যেতে চায় না। হয় অভাবে পড়ে নয়তো প্রেমে পড়ে সে নিজের মাটি ছাড়তে বাধ্য হয়।' আমার খালারা বলতেন ভূতের গল্প। এর মধ্যে সবচেয়ে ভয়ানক ভূত ছিল 'শালগওয়াতাই'। খালারা বলতেন এই ভূতের ২০টা আঙুল। সে আমাদের বিছানায়ই ঘুমায়। কিন্তু আমরা টের পাইনা। শুনে ভয়ে আমরা কেঁদে ফেলতাম। পশতুন ভাষায় হাত এবং পায়ের আঙুল বোঝাতে একই শব্দ ব্যবহৃত হয়। সেই দিক থেকে আমাদের সবারই ২০টি করে আঙুল আছে। অথচ এই সোজা ব্যাপারটা না বুঝতে পেরে আমরা ২০ আঙুলের ভূতের ভয়ে জড়ো সড়ো হয়ে যেতাম। আমরা যাতে হাত পা ধুয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকি সেজন্য খালারা শশাকা নামের এক ডাইনি বুড়ির গল্প বলতেন। বলতেন, 'তোমরা যদি গোসল না করো, যদি চুল পরিষ্কার না রাখো তাহলে নোংরা হাত আর দুর্গন্ধযুক্ত মুখে শশাকা তোমাদের কাছে আসবে। তারপর সে তোমাদের এক কুৎসিত মহিলা বানিয়ে দেবে। তোমাদের চুল হবে ইঁদুরের লেজের মতো। তারমধ্যে পোকা গিজগিজ করতে থাকবে। এমনকি শশাকা তোমাকে হত্যাও করতে পারে।' শীতকালে যে অভিভাবকেরা চাইতেন না তাঁদের বাচ্চারা বাইরে তুষারের মধ্যে যাক, তাঁরা তখন ছেলে মেয়েদের বাঘ-সিংহের গল্প বলতেন। তারা বলতেন, বাইরে তুষারের ওপর বাঘ বা সিংহের পায়ের ছাপ দেখা গেছে। যখন ওই ছাপ আর দেখা যাবে না তখন তারা বাইরে যেতে পারবে।

আমরা একটু বড় হওয়ার পরই গ্রামটিকে একঘেঁয়ে লাগতে শুরু করে। সারা গ্রামে ধনী পরিবারগুলোর মধ্যে একটি পরিবারের হুজরায় একটিমাত্র টেলিভিশন ছিল। কোনো বাড়িতে কম্পিউটার ছিল না।

গ্রামের মহিলারা তাদের বাড়ির পর্দা ঘেরা চৌহদ্দী পার হয়ে কখনো বাইরে এলে অবশ্যই মুখ ঢেকে আসত এবং নিকট স্বজন ছাড়া বাইরের কোনো পুরুষের সঙ্গে দেখা করত না বা কথা বলত না। আমি একটু ফ্যাশনদুরস্ত পোশাক পরতাম এবং টিনেজার বয়সেও বাইরে যাওয়ার সময় মুখ ঢাকতাম না। এটা দেখে আমার এক চাচা আব্বাকে রেগে গিয়ে বললেন, 'সে মুখ ঢাকছে না কেন?' আব্বা তাঁকে বললেন, 'সে আমার মেয়ে। তুমি তোমার চরকায় তেল দাও।' তবে কিছু পরিবার মনে করতো লোকজন আমাদের নিয়ে নানা কথা বলে। তারা নাকি বলে আমরা পশতুনওয়ালীর আদব-কায়দা একদম মানছি না।

একজন পশতুন হয়ে আমি খুবই গর্বিত। কিন্তু কখনো কখনো আমাদের জীবনাচরণে অনেক প্রশ্নের জবাব দাবি করে। বিশেষ করে নারীদের প্রতি

www.pathagar.com

পশতুন সমাজের আচরণ আমাকে বিচলিত করে। শাহিদা নামের এক মহিলা আমাদের বাসায় কাজ করতেন। তাঁর তিনটি শিশু সন্তান ছিল। সেই শাহিদা আমাকে বলেছিলেন, তাঁর বয়স যখন মাত্র দশ বছর তখন এক বুড়ো লোকের কাছে বিয়ের নামে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। ওই বুড়োর এক বউ থাকার পরও অল্পবয়সী আরেকটা বউ চাচ্ছিল। আমাদের সমাজে যখন কোনো মেয়ে নিখোঁজ হয়ে যায়; তার একমাত্র কারণ যে, তারা ভালোবাসার মানুষকে বিয়ে করে ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়; তা না। আমাদের গ্রামেই সীমা নামের ১৫ বছর বয়সী একটা ফুটফুটে মেয়ে ছিল। সবাই জানতো একটা ছেলের সঙ্গে তার প্রেম ছিল। ছেলেটা তাদের বাড়ির কাছ দিয়ে যেত, মেয়েটাও তাকে উঁকি দিয়ে দেখতো। অন্য সব মেয়েরা তা দেখে ঈর্ষান্বিত হতো। আমাদের সমাজে কোনো পুরুষ কোনো নারীর প্রতি আগ্রহ দেখালে বা তাঁকে প্রেম নিবেদন করলে সমস্যা নেই, কিন্তু একটি মেয়ে যদি একটি ছেলের প্রতি অনুরক্ত হয় তাহলে সেটা তার পরিবারের কাছে বিরাট লজ্জার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। হঠাৎ শুনলাম মেয়েটা আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু পরে সবাই জানলো, মান সম্মানের ভয়ে মেয়ের পরিবারের লোকজনই তাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছে।

আমাদের সমাজে 'স্বরা' বলে একটা ব্যাপার আছে যার মাধ্যমে দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব মিমাংসার জন্য কোনো একটি মেয়েকে প্রতিপক্ষের লোকজনের হাতে তুলে দেয়। দাপ্তরিকভাবে এটা নিষিদ্ধ ঘোষিত হলেও এটা এখনও চলছে। আমাদের গ্রামে সোরাইয়া নামের একজন বিধবা ছিলেন। তাঁর পরিবারের সঙ্গে অপর এক গোত্রভূক্ত পরিবারের কোন্দল ছিল। সোরাইয়া তাদের শত্রু পরিবারের এক বিপত্নীক লোককে বিয়ে করেন। আমাদের সমাজে কোনো বিধবাকে তার পরিবারের অনুমতি ছাড়া কেউ বিয়ে করতে পারে না। সোরাইয়ার পরিবার যখন তাদের বিয়ের কথা জানতে পারে তখন তারা প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়। তারা সোরাইয়ার স্বামীকে হুমকি দিতে থাকে। পরে গ্রামের মুরব্বীরা মিমাংসার জন্য জিরগার (শালিস) বসে। জিরগায় সিদ্ধান্ত হয়, শাস্তি হিসেবে বিপত্নীক লোকটির (সোরাইয়ার স্বামী) পরিবারের সবচেয়ে সুন্দরী একটি মেয়েকে প্রতিপক্ষের (সোরাইয়ার পরিবারের) সবচেয়ে কম যোগ্যতাসম্পন্ন লোকের সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে। যে ছেলেটার সঙ্গে সুন্দরী মেয়েটার বিয়ে দেওয়া হলো সে ছিল একেবারেই অপদার্থ। সে এত গরীব ছিল যে মেয়ের বাবাকেই মেয়ে এবং জামাইয়ের সংসার খরচ যোগান দিতে হতো। যে বিবাদে মেয়েটার কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই তার জন্য তাকে কেন নিজের জীবন নষ্ট করতে হবে?

আমি যখন এই বিষয়টি নিয়ে আব্বাকে প্রশ্ন করেছি, তখন তিনি বলেছেন, আফগানিস্তানের মহিলাদের জীবন আরও কষ্টের। আমার যে বছর জন্ম, তার আগের বছর একজন কানা মোল্লার নেতৃত্বে তালেবান নামক একটি গ্রুপ দেশটিকে দখল করে নেয় এবং মেয়েদের স্কুলগুলো পুড়িয়ে দিতে থাকে। তারা

পুরুষদের একটা লণ্ঠনের সমান লম্বা দাড়ি রাখতে এবং মহিলাদের বোরখা পরতে বাধ্য করে। বোরখা পরা অনেকটা বিশাল আকৃতির একটা কাপড়ের মুরগির খাচার মতো, যার মধ্য দিয়ে দেখার জন্য মাত্র একটা জানালার মতো জায়গা আছে। গরমকালে এটা যেন উনুনের মতো হয়ে উঠত। এই জিনিস অন্তত আমাকে পরতে হয়নি। আব্বা বলতেন, তালেবান এমনকি মেয়েদের উচ্চস্বরে হাসা এবং তাদের সাদা জুতো পরা নিষিদ্ধ করে। তারা বলতো, 'সাদা রংটা শুধুমাত্র পুরুষের জন্য।' মেয়েদের একেবারে বাদী করে রাখা হয়েছিল এবং নেইল পালিশ ব্যবহার করার জন্যও তাদের পেটানো হতো। আব্বা যখন এসব বলতেন, তখন আমি রীতিমতে আঁতকে উঠতাম।

আমি জেন অস্টেনের উপন্যাস এবং 'আন্না কারেনিনা'র মতো বই পড়ছি এবং আব্বার কথায় বিশ্বাস রেখেছি : 'মালালা এক মুক্ত পাখি।' আমি যখন আফগানিস্তানের উৎপীড়নের কথা শুনি তখন সোয়াতে জন্মগ্রহণ করার জন্য গর্ববোধ করতাম। আমি বলতাম, 'এখানে একটি মেয়ে স্কুলে যেতে পারে।' কিন্তু অপর প্রান্তেই ছিল তালেবান। আমার কাছে উপত্যকাটি ছিল এক রৌদ্র করোজ্জল জায়গা। আমি তখনও বুঝিনি পাহাড়ের ওপারেই অশুভ কালো মেঘ জমা হচ্ছে। আমার আব্বা বলতেন, 'আমি তোমার স্বাধীনতা রক্ষা করব, মালালা। তুমি তোমার স্বপ্নের পথে এগিয়ে যাও।'

www.pathagar.com

৫

আমি কেন কানের দুল পরি না এবং পশতুনরা কেন 'থ্যাংক ইউ' বলে না

সাত বছর বয়স থেকেই আমি ক্লাসে প্রথম স্থান অধিকার করে আসছি। ক্লাসে অন্য যারা পড়াশুনায় কিছুটা কাঁচা ছিল আমি তাদের বরাবরই সাহায্য করতাম। আমার সহপাঠীরা বলতো 'মালালা আসলেই মেধাবী।' এছাড়া ব্যাডমিন্টন, নাটক, ক্রিকেট, ছবি আঁকা, এমনকি গান গাওয়ার চর্চাও করতাম; যদিও এগুলোতে আমি খুব ভালো ছিলাম না। মালকায়ে নূর নামের নতুন একজন ছাত্রী যখন ক্লাসে এলো; আমি তখন সে আমাকে টপকে যেতে পারে কিনা তা নিয়ে কিছুই ভাবিনি। তার নামের অর্থ হলো 'নূর বা আলোর রানী'। সে বলতো যে, পাকিস্তানের প্রথম নারী সেনাপ্রধান হতে চায়। আমাদের ক্লাসের অন্য সব মেয়েদের মায়েরা ঘরকন্নার কাজ ছাড়া অন্য কিছু না করলেও; মালকায়ে নূরের মা অন্য একটা স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। আমাদের স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর ক্লাসে প্রথমদিকে মালকা তেমন কিছুই বলতো না। ক্লাসে বরাবরই আমার সঙ্গে আমার প্রিয় বান্ধবী মনিবার প্রতিদ্বন্দ্বীতা হতো। মনিবার হাতের লেখা এবং উপস্থাপনা চমৎকার, শিক্ষকরা তা খুব পছন্দ করতেন। তবে আমি জানতাম কন্টেন্টের দিক দিয়ে আমি মনিবার চেয়ে ভালো, এবং তাকে অবশ্যই পরাস্ত করতে পারবো। কিন্তু বার্ষিক পরীক্ষা শেষে দেখা গেল মাঝখান থেকে মালকায়ে নূর প্রথম হয়ে গেছে। এটা দেখে আমি রীতিমতো ধাক্কা খেলাম। বাসায় ফিরে আমি শুধুই কাঁদতে লাগলাম। কান্না থামাতে আব্বাকে এসে দীর্ঘক্ষণ আমাকে সান্ত্বনা দিতে হলো।

ওই সময় আমরা আমাদের ভাড়া বাড়ি ছেলে অন্য এলাকায় চলে যাই। আগের বাড়িটা যে রাস্তার পাশে ছিল, ওই একই সড়কের পাশে ছিল মনিবাদের বাড়ি। নতুন এলাকায় আমার মেশার মতো তেমন কোনো বন্ধুবান্ধব ছিল না। নতুন যে এলাকায় আমরা চলে আসি, সেখানে সাফিনা নামের একটি মেয়ে ছিল। সে আমার চেয়ে বয়সে ছোট হলেও আমরা বিকেলে দুজনে খেলতাম। সাফিনা আহ্লাদি প্রকৃতির মেয়ে। তার প্রচুর খেলনা পুতুল আর বাকশো ভরা নানান পদের গয়না ছিল। কিন্তু আব্বার কিনে দেওয়া আমার একমাত্র খেলনা প্লাস্টিকের মোবাইল ফোনসেটের দিকেই ছিল সাফিনার নজর। আব্বা তাঁর

www.pathagar.com

মোবাইল ফোনে কথা বলতেন। আমিও তার মতো করে খেলনা মোবাইলে মিথ্যেমিথ্যি কথা বলতাম। একদিন আমার সবেধন নীলমণি মোবাইলটা হাওয়া হয়ে গেল। কয়েকদিন পরে দেখি সাফিনা ঠিক আমার মোবাইলের মতো একটা মোবাইল নিয়ে খেলছে। আমি তাঁকে বললাম, 'এটা কোথায় পেয়েছ?' সে বললো, 'আমি তো এটা বাজার থেকে কিনেছি।'

আমি এখন বুঝতে পারছি সে তখন সত্যি কথাটা বলতে পারতো। কিন্তু সে সময় আমার মনে হলো, আমার সঙ্গে সে যা করেছে আমিও তার সঙ্গে তেমনটাই করবো। আমি তাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে পড়াশুনা করতে যেতাম। এরপর যখনই সুযোগ পেতাম আমি তার টুকটাক জিনিসপত্র বিশেষ করে কানের দুল ও নেকলেস পকেটে ভরে চলে আসতাম। এটা খুব সহজ ছিল। প্রথমবার চুরি করার সময় রোমাঞ্চ অনুভূত হচ্ছিল। কিন্তু পরে আর সে রোমাঞ্চ থাকলো না। শিগগিরই সেটা বদঅভ্যাসে পরিণত হলো। কিন্তু এই চুরির অভ্যাস কীভাবে থামাবো বুঝতে পারছিলাম না। একদিন বিকেলে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে অন্য দিনের মতো ঝড়ের বেগে রান্নাঘরে ঢুকলাম। 'ভাবী, আমি খিদের জ্বালায় মরছি।'–কোনো সাড়াশব্দ পেলাম না। আম্মা রান্নাঘরে মেঝেতে বসে হলুদ আর জিরা পিশছিলেন। তার মুখে থমথমে ভাব। তিনি মশলা পিশে যাচ্ছিলেন। তিনি আমার দিকে তাকালেন না। আমি ভাবছিলাম আমি কী করেছি? মন খারাপ করে আমি আমার রুমে গেলাম। কাপবোর্ড খুলে দেখি আমার চুরি করা জিনিসগুলো সেখানে নেই। বুঝলাম ধরা পড়ে গেছি।

আমার চাচাতো বোন রিনা আমার রুমে এলো। সে বললো, 'তারা আগেই জেনে গেছে তুমি এসব চুরি করছো। তুমি ওগুলো সরিয়ে ফেলবে মনে করে তারা অপেক্ষা করছিল। কিন্তু তুমি সেগুলো রেখে দিয়েছে।'

লজ্জায় আমার পাকস্থলি তখন গুলিয়ে আসছিল। আমি মাথা নিচু করে আম্মার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আম্মা বললেন, 'মালালা, তুমি খুব খারাপ কাজ করেছো। তিনি বললেন, 'তুমি কি আমাদের এই লজ্জা দেওয়ার চেষ্টা করছো যে এসব তোমাকে আমরা কিনে দিতে পারি না?' 'এটা সত্যি না। আমি ওগুলো চুরি করিনি।'–আমি মিথ্যে বললাম।

কিন্তু আম্মা জানতেন আমি সত্যিই চুরি করেছি। পরে আমিই অধৈর্য্য হয়ে বললাম, 'সাফিনাই তো শুরু করেছে। আব্বা আমাকে যে গোলাপী ফোনটা কিনে দিয়েছিল, সেটা তো সে-ই নিয়েছে।'

আম্মা শান্তভাবে বললেন, 'সাফিনা তোমার চেয়ে অনেক ছোট। ওকে তোমার বোঝানো উচিত ছিল। বড় হিসেবে, তোমারই তো দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত ছিল।'

www.pathagar.com

আমি তখন শুধু কাঁদছিলাম আর মাফ চাইছিলাম। আমি আম্মাকে কাকুতি মিনতি করে বললাম, 'আব্বাকে এসব বলো না।' আব্বা রাগ করলে আমি সইতে পারতাম না। বাবা-মায়ের চোখে খারাপ প্রতিপন্ন হওয়াটা সত্যিই ভয়ানক।

এ ধরনের ঘটনা যে সেটাই প্রথম তা নয়। আমি আম্মার সঙ্গে বাজারে যেতাম। একদিন দেখি ঝাকা ভরে এক লোক কাঠ বাদাম বেচতে বসেছে। সেগুলো দেখতে এমন স্বাদের মনে হচ্ছিল যে, আমি ঝাকা থেকে এক মুঠো কাঠবাদাম তুলে নেওয়ার লোভ সামলাতে পারলাম না। আম্মা আমাকে সেগুলো ঝাকায় রেখে দিতে বললেন আর বাদামওয়ালাকে বললেন যেন তিনি কিছু মনে না করেন। কিন্তু বাদামওয়ালা এতটাই চটে গিয়েছিলেন যে আম্মা দুঃখ প্রকাশ করার পরও শান্ত হচ্ছিলেন না। রাগে গজগজ করছিলেন। আম্মা তার ব্যাগ হাতড়ে দশ রুপি বের করে বললেন, 'দশ রুপিতে এগুলো দেবেন?' সে বললো, 'না, কাঠবাদামের দাম অনেক। এতে হবে না।'

বাড়ি ফিরে আম্মা মন খারাপ করে আব্বাকে বিষয়টা বললেন। আব্বা তক্ষুণি বাজারে গিয়ে ওই লোকের সব বাদাম কিনে আনলেন। একটা কাঁচের গামলায় করে সেগুলো এনে আমাকে দিলেন।

আব্বা বললেন, 'কাঠবাদাম খুব ভালো জিনিস। প্রতিদিন ঘুমানোর আগে দুধের সাথে মিশিয়ে যদি খাও তাহলে ভালো মাথা হবে।' কিন্তু আমি জানতাম কাঠবাদাম কেনার মতো অত পয়সা তার কাছে নেই। কাঁচের গামলায় রাখা কাঠবাদামগুলো যেন আমাকে আমার অন্যায়ের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। আমি আমার নিজের কাছে অঙ্গীকার করলাম, আর কখনো এমন করবো না।

যাহোক আম্মা আমাকে সাফিনা এবং তার বাবা মার কাছে আমাকে দুঃখ প্রকাশ করার জন্য নিয়ে গেল। এটা আমার জন্য সাংঘাতিক কঠিন আর লজ্জার বিষয় ছিল। সাফিনা আমার মোবাইল ফোনের ব্যাপারে অবশ্য কিছু বললো না। অবশ্য আমিও তাকে এ নিয়ে কিছু বললাম না।

প্রথমে নিজের কাছে খারাপ লাগলেও, শেষ পর্যন্ত আত্মদহন থেকে মুক্তি পাওয়ার আনন্দ পেলাম। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি চুরি করিনি কিংবা কোনো মিথ্যে বলিনি। একটি মিথ্যেও বলিনি। আব্বার পকেট ঘরের মধ্যে পড়ে থাকা ভাংতি পয়সা টিফিন খাওয়ার জন্য নিতে মানা নেই জেনেও তাও আমি আর নেইনি। একই সঙ্গে আমি কানে দুল পরাও বন্ধ করে দেই। আমি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করি, 'একটা সস্তা খেলনা আমাকে লোভী করে তুলবে? অতি তুচ্ছ ধাতব অলঙ্কারের জন্য আমি আমার মানসম্মান বিসর্জন দিতে যাবো কোন দুঃখে?' কিন্তু এখন আর নিজেকে অপরাধী মনে হয়। এখনও নামাজ পড়ার সময় আমি আল্লাহর কাছে ওই ঘটনার জন্য তওবা পড়ি।

আব্বা-আম্মা পরস্পরকে সব কথা বলতেন। ফলতঃ আব্বা খুব শিগগিরই আমার মন খারাপের কারণ জেনে গেলেন। আমি তার চোখ দেখেই বুঝতে

www.pathagar.com

পারলাম, আমার আচরণে তিনি মর্মাহত হয়েছেন। প্রতি বছর ক্লাসের পরীক্ষায় প্রথম হয়ে বিজয়ীর ট্রফি হাতে যেদিন এসেছি, অথবা যেদিন কিন্ডারগার্টেন শিক্ষিকা মিস উলফাত আব্বাকে বলেছিলেন, উর্দু ক্লাসের শুরুতে আমি ব্ল্যাকবোর্ডে লিখেছিলাম 'শুধুমাত্র উর্দুতে বলো',–সেদিন আব্বার যেমন গর্ব হয়েছিল, সেভাবেই সব সময় তাঁকে আমি গর্বিত দেখতে চাই।

যাহোক আব্বা আমাকে কঠিন কিছু বললেন না। তিনি উল্টো সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, বেশিরভাগ মহাপুরুষ শৈশবে কোনো না কোনো ভুল করেছিলেন। আব্বা মহাত্মা গান্ধীর একটা বাণী শুনিয়ে আমাকে সান্ত্বনা দিলেন,–'ভুল করার স্বাধীনতা যেখানে নেই সেখানে স্বাধীনতার কোনো মূল্য নেই।'

স্কুলে আমরা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সম্বন্ধে অনেক গল্প পড়েছি। শৈশবে তিনি যখন করাচিতে তখন তিনি রাস্তার আলোতে পড়তেন; কারণ তাঁর ঘরে তখন আলো ছিল না। জামা কাপড় ও হাত পায়ে যাতে ধুলো ময়লা না লাগে সেজন্য তিনি তখন অন্য বাচ্চাদের মার্বেল খেলার বদলে ক্রিকেট খেলতে বলতেন।

আব্রাহাম লিংকন তাঁর ছেলের শিক্ষককে একটি চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিটি পশতু ভাষায় অনুবাদ করে আব্বা তার একটা কপি তাঁর অফিসের বাইরে দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখেছিলেন। ওই চিঠিতে লিংকন তার ছেলের শিক্ষককে বলেছেন, 'যদি পারো তাকে (ছেলেকে) বইয়ের অপূর্ব ভাষা শিখিয়ো ... তবে আকাশে উড্ডয়মান পাখি, সূর্যালোকে ছুটে বেড়ানো মৌমাছি আর সবুজ পাহাড়ের গায়ে ফুটে থাকা পুষ্প সম্ভারের অবিনশ্বর রহস্যময়তায় হারিয়ে যাওয়ার মতো ফুরসতও তাকে দিও।' ওই চিঠিতে লিংকন তাকে লিখেছিলেন, 'তাকে শিখিয়ো প্রতারণার চেয়ে ফেল করা অনেক বেশি সম্মানের।'

আমি মনে করি, প্রত্যেকেই জীবনে একবার হলেও কোনো না কোনো ভুল করে। কিন্তু সেই ভুল থেকে আপনি কতটা শিক্ষা নিলেন, সেটাই হলো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আমার পরিচয়ের সঙ্গে 'পশতুনওয়ালী'–এই তকমা থাকায় আমার সমস্যা ছিল অনেক বেশি। কেউ দুর্ব্যবহার করলে পাল্টা দুর্ব্যবহার; আঘাত করলে প্রতিঘাত করাটা আমাদের জাতিগত রেওয়াজের অংশ। কিন্তু এই পাল্টাপাল্টি শোধ নেওয়ার শেষ কোথায় কেউ জানে না। একটি পরিবারের কেউ অন্য পরিবারের কারও হাতে খুন হলে হয় খুনিকে নয়তো খুনির স্বজনদের কাউকে খুন করে বদলা নিতেই হবে। খুনির স্বজন বা খুনি নিজে খুন হওয়ার পর আবার তাদের পক্ষ থেকে বদলা নেওয়ার উন্মত্ততা শুরু হয়। এভাবে একের পর এক বংশ পরম্পরায় খুনোখুনি চলতে থাকে। এর শেষ হওয়ার কোনো সময়সীমা নেই। আমাদের এখানে একটা কথা প্রচলিত আছে, 'পশতুনরা কুড়ি বছর পর প্রতিশোধ নিলে অন্যরা বলে প্রতিশোধটা নেওয়া হয়েছে অনেক আগেই।'

www.pathagar.com

আমরা বলতে গেলে প্রবাদ প্রবচনের জাতি। আমাদের সমাজে বহু প্রবাদ প্রবচন প্রচলিত আছে। একটা প্রবাদ এরকম : 'পানিতে ভিজলেও পশতুন পাথরে শ্যাওলা জমে না।' অর্থাৎ আমরা না ভুলি না ক্ষমা করি। হয়তো একারণেই আমরা সাধারণত উপকার পেলে কাউকে 'আপনাকে ধন্যবাদ' বলি না। কারণ উপকারীর উপকারের কথা আর অপকারীর অপকারের কথা আমরা কখনো ভুলি না। সময় এলে ঠিক ফেরত দেই। আমরা মনে করি উপকারের প্রতিদান উপকারই হতে পারে; 'থ্যাংক ইউ' নয়।

আমাদের এলাকায় বহু পরিবার আছে যাদের বাড়ি উঁচু দেয়ালে ঘেরা। শত্রুদের কেউ আসছে কিনা তা দেখার জন্য উঁচু ওয়াচ টাওয়ার বসানো। পারিবারিক শত্রুতার বলি হয়েছে এমন বহু লোককে আমরা চিনি। তেমনই একজন হলেন শের জামান। আব্বার সঙ্গে একই ক্লাসে পড়তেন। বরাবরই আব্বার চেয়ে অনেক ভালো রেজাল্ট করতেন। আমার দাদা ও চাচারা এই নিয়ে আব্বাকে সব সময় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতেন। তারা বলতেন, শের জামানের মতো ভালো ছাত্র হতে পারলি না?' শের জামানের সুখ্যাতির যন্ত্রণায় আব্বা নাকি মনে মনে বলতেন, পাহাড় থেকে পাথর পড়ে শের জামানের মৃত্যু হোক। তবে স্কুলে ভালো ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও শের জামান কলেজে যেতে পারেননি। গ্রামে একটা ওষুধের ফার্মেসি খুলে তিনি ব্যবসা শুরু করেন। ছোট্ট একখণ্ড বাগানের মালিকানা নিয়ে তার পরিবারের সঙ্গে তাঁর চাচাদের সঙ্গে কোন্দল বাধে। একদিন শের জামান তাঁর দুই ভাইকে নিয়ে ওই জমিতে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তাঁর চাচা লোকজন নিয়ে অতর্কিত হামলা চালিয়ে তিনজনকেই মেরে ফেলেন।

সমাজের সম্মানিত লোক হিসেবে দ্বন্দ্ব-কোন্দল মেটানোর জন্য আব্বাকে সামাজিক বিচার বা শালিসে ডাকা হতো। আমার আব্বা 'বদলা' বা প্রতিশোধ পরায়নতায় বিশ্বাসী নন। তিনি কোন্দলরত দুই পক্ষকে সব সময় বোঝানোর চেষ্টা করতেন–বদলা নেওয়ার মাধ্যমে কোনো পক্ষই লাভবান হয় না। তার বদলে একসঙ্গে মিলেমিশে থাকা সবার জন্যই মঙ্গলজনক। তবে হাজার চেষ্টা করেও আমাদের গ্রামের কোন্দলরত দুটো পরিবারকে আব্বা বোঝাতে পারেননি। পরিবার দুটি এত আগে থেকে বিবাদে জড়িয়ে আছে যে তারা নিজেরাও বলতে পারে না ঠিক কবে তাদের বিবাদের শুরু। হয়তো মাথা গরম করে কোনোদিন একজন তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে অন্যজনের ওপর চড়াও হয়েছিল। সেই থেকে বংশানুক্রমে চলে আসছে পাল্টাপাল্টি মারামারি।

আমাদের লোকজন বলে থাকে, এটিই ভালো। এতে অ-পশতুন এলাকার চেয়ে আমাদের এলাকায় অপরাধের সংখ্যা অনেক কম। কিন্তু আমি মনে করি, কেউ আপনার ভাইকে হত্যা করলে, তাদের বা তাদের ভাইদের হত্যা না করে আপনার উচিত তাদের অন্যভাবে শিক্ষা দেওয়া; যাতে তারা শোধরাতে পারে।

www.pathagar.com

এই আদর্শে আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন খান আবদুল গাফফার খান নামের একজন অহিংসবাদী নেতা। তাঁকে অনেকে এখানকার গান্ধী বলে থাকেন। তিনিই আমাদের সংস্কৃতিতে অহিংস দর্শনের সূচনা করেছিলেন।

চুরির ব্যাপারটাও অনেকটা একই রকম। আমার মতো অনেকে ধরা পড়ে এবং জীবনে আর কোনোদিন চুরি করে না। অন্য অনেকে আবার চুরির বিষয়টি পাত্তা দেয় না। তারা বলে, 'ওহ্ এটা এমন কোনো বড় কিছু না। ওতো একেবারে তুচ্ছ ব্যাপার।' কিন্তু দ্বিতীয়বার যে আরও বড় চুরি করে; তৃতীয়বার আরও বড়। আমার দেশের অধিকাংশ রাজনীতিক চৌর্যবৃত্তিকে তেমন কিছু মনে করেন না। তারা এমনিতে অনেক ধনী। গরীব দেশ হওয়া সত্ত্বেও তারা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি লুটপাট করতেই থাকে; করতেই থাকে। বেশির ভাগ রাজনীতিক ট্যাক্স দেয় না; যদিও ট্যাক্সের টাকা তাঁর সম্পত্তির তুলনায় একেবারে নগণ্য। তারা সরকারি ব্যাংক থেকে লোন নেয় কিন্তু পরিশোধ করে না। বন্ধুবান্ধবের প্রভাবে সরকারি ঠিকাদারি কাজ বাগিয়ে নেয়। এই রাজনীতিকের অনেকেরই লন্ডনে নিজস্ব বিলাসবহুল ফ্ল্যাট আছে।

আমি বুঝি না, আমার দেশের দরিদ্র মানুষগুলো যখন না খেয়ে থাকে, বিদ্যুতের অভাবে অন্ধকারে ডুবে থাকে; দারিদ্র্যের কারণে যখন তারা তাদের বাচ্চাদের স্কুলে না পাঠিয়ে কাজ করতে পাঠাতে বাধ্য হয়, তখন কেমন করে এইসব রাজনীতিক তাদের বিবেক জলাঞ্জলি দিয়ে বেচে থাকে। আমার আব্বা বলেন, নিজের আখের গোছানোর ধান্ধায় থাকা এইসব রাজনীতিকেরাই পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় অভিশাপ। সেনাবাহিনী প্লেনের আসল চালক হলেও তাদের কিছু আসে যায় না। ককপিটের বাইরে বিজনেস ক্লাসের সিটে বসে, পর্দা টেনে আয়েশি ভঙ্গিমায় খাবার খেতে পারলে আর সেবাযত্ন পেলেই তারা খুশি। বাকি যারা, মানে আমরা সাধারণ জনগণ দারিদ্র্যের কষাঘাতে মরলেও তাদের কিছু যায় আসে না।

আমার যখন জন্ম হয় তখন পাকিস্তানে নামমাত্র গণতন্ত্র। বেনজির ভুট্টো এবং নওয়াজ শরীফ একজন আরেকজনের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছিলেন। তাদের কেউ পুরো মেয়াদে ক্ষমতায় থাকতে পারেননি এবং বরাবরই দুজন দুজনকে দুর্নীতির জন্য দোষারোপ করে এসেছেন। তবে আমার জন্মের দুই বছর পরই জেনারেলরা আবারও ক্ষমতা নিলেন। ঘটনাটি এত নাটকীয় ছিল যে মনে হবে এটা কোনো সিনেমার গল্প। নওয়াজ শরীফ তখন প্রধানমন্ত্রী। তিনি তাঁর সেনাপ্রধান জেনারেল পারভেজ মোশাররফকে বরখাস্ত করে বসলেন। মোশাররফ তখন শ্রীলংকা সফর শেষ করে প্লেনে করে পাকিস্তান ফিরছিলেন। বরখাস্তের ঘোষণায় জেনারেল মোশাররফের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে নওয়াজ শরীফ এতটাই উদ্বিগ্ন ছিলেন যে মোশাররফের বিমান যাতে ল্যান্ড করতে না পারে সেজন্য তিনি

www.pathagar.com

সব ধরনের চেষ্টা করেছিলেন। মোশাররফের সঙ্গে বিমানে দুইশ গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা ছিলেন এবং অন্য কোনো দেশে যাওয়ার মতো জ্বালানিও বিমানটিতে ছিল না। তা সত্ত্বেও নওয়াজ শরীফ করাচি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে ল্যান্ডিং লাইটের সব সুইচ বন্ধ করে দিতে এবং রান ওয়েতে ফায়ার ইঞ্জিন বসাতে নির্দেশ দিলেন যাতে মোশাররফকে বহনকারী বিমানটি অবতরণ করতে না পারে।

মোশাররফকে বরখাস্ত করার ঘোষণা টেলিভিশনে সম্প্রচারিত হওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যে সেনাবাহিনী ট্যাংক নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। তারা বিমানবন্দর ও টেলিভিশনের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিল। স্থানীয় কমান্ডার ইফতিখার করাচির দখল নিলেন যাতে মোশাররফের বিমান নামতে পারে। পরে মোশাররফ ক্ষমতায় বসলেন। নওয়াজ শরীফকে আট্টক ফোর্টের কারা প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করলেন। শরীফ অজনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। এ কারণে তাঁর পতনের খবর শুনে অনেকে রাস্তায় নেমে উল্লাস করেছিলেন। মিষ্টি বিতরণ করেছিলেন। কিন্তু আব্বা খবরটি শুনে কেঁদে ফেলেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন আমরা আবার সেনাশাসনের কবজায় পড়ে গেছি। শরীফের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহীতার অভিযোগ আনা হলো। তবে সৌদি রাজকীয় পরিবারে থাকা বন্ধুবান্ধবের তদ্বিরের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত নওয়াজ নির্বাসনে যাওয়ার সুযোগ পান।

মোশাররফ ছিলেন আমাদের চতুর্থ সামরিক শাসক। পূর্ববর্তী সব একনায়কের মতো তিনিও টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণের শুরুতে বললেন, 'মেরে আজিজ হামওয়াতানো'–'প্রিয় দেশবাসী'। এরপরই শরীফের বিরুদ্ধে হাজারও অভিযোগ আনলেন। বললেন, নওয়াজের শাসনামলে পাকিস্তান 'আমাদের সম্মান, মর্যাদা হারিয়েছে।' তিনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়ার ঘোষণা দিলেন এবং যারা রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুটপাট করেছে তাদের বিচার করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। তিনি নিজের সম্পদ ও আয়কর বিবরণীর হিসাব জনসমক্ষে প্রকাশ করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তিনি বললেন, খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য তিনি দেশ চালাবেন। তবে তাঁর কথা কেউ বিশ্বাস করল না। এর আগে জেনারেল জিয়া ক্ষমতায় বসে অঙ্গীকার করেছিলেন, তিনি মাত্র ৯০ দিন ক্ষমতায় থাকবেন। কিন্তু বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি ১১ বছর ক্ষমতা আকড়ে ছিলেন।

আমার আব্বা বললেন, সেই একই গল্পের পুনরাবৃত্তি হতে যাচ্ছে, শেষ পর্যন্ত আব্বার কথাই ঠিক হলো। মোশাররফ প্রতিশ্রুতি দিলেন, কয়েক ডজন পরিবার যুগ যুগ ধরে যে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা জারি রেখেছে তিনি তার অবসান ঘটাবেন এবং রাজনীতিতে ক্লিন ইমেজের কিছু নতুন মুখ নিয়ে আসবেন। কিন্তু তা না করে তিনি যে মন্ত্রীসভা গঠন করলেন, সেখানেও সেই পুরনো মুখগুলোকেই

www.pathagar.com

দেখা গেল। আমাদের দেশকে আবার কমনওয়েলথ থেকে বহিষ্কার করা হলো এবং দেশটা আবার আন্তর্জাতিক কুলাঙ্গারের খাতায় নাম লেখালো। যে বছর পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা করা হয় তার আগের বছরই আমেরিকানরা তাদের সহায়তার বেশিরভাগ বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু এবার প্রায় সবাই আমাদের বয়কট করলো।

দেশের ইতিহাসের এই অবস্থা দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন সোয়াতের মানুষ কেন পাকিস্তানের অংশ হওয়ার বিষয়টিকে ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। কয়েক বছর পরপরই পাকিস্তান ভারত শাসন করার জন্য আমাদের ওখানে নতুন ডেপুটি কমিশনার বা ডিসি পাঠাতো। ঔপনিবেশিক শাসনামলে ব্রিটিশরা যেভাবে শাসন দমনের জন্য প্রশাসক পাঠাতো ঠিক একই কায়দায় নতুন ডিসিদের পাঠানো হতো। আমাদের কাছে মনে হতো এই আমলারা আমাদের প্রদেশে আসতো স্রেফ পয়সা কড়ির জন্য। তারা লুটপাট করে ধনী হয়ে বাড়ি ফিরে যেতো। সোয়াতকে উন্নত করার ব্যাপারে তাদের কোনো আগ্রহই ছিল না। আমাদের লোকজনও গোলামের মতো আদেশ পালন করে যেতো, কারণ ওয়ালীর অধীনে থেকে তাদের কোনো সমালোচনা করা মোটেও বরদাশত করা হতো না। কারও দ্বারা ওয়ালী আক্রান্ত হলে তার পুরো পরিবারকে সোয়াত থেকে বের করে দেওয়া হতো। সুতরাং ডিসিরা যখন সেখানে আসতেন তখন তাঁরা কার্যত সেখানকার রাজা হয়ে আসতেন। কেউ তাঁদের নিয়ে কোনো প্রশ্ন তুলতে পারতো না। প্রবীণ লোকজন শেষ ওয়ালীর শাসনামলের স্মৃতিচারণ করতেন। তাঁরা বলতেন, সেই সময় পাহাড়গুলো বৃক্ষাশোভিত ছিল। প্রতি পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে স্কুল ছিল। মানুষের সমস্যার সমাধানের জন্য ওয়ালী সাহেব তখন নিজে এলাকায় এলাকায় ঘুরতেন।

সাফিনার সঙ্গে ওই ঘটনার পর ঠিক করলাম আমি আর কোনোদিন বন্ধুদের খারাপ চোখে দেখবো না। আমার আব্বা সব সময় বলেন, বন্ধুদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি যখন কলেজে পড়েন তখন তাঁর খাবার ও বইপত্র কেনার অর্থ ছিল না। সে সময় বন্ধুরাই তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিল এবং তিনি সে কথা কখনো ভোলেননি। আমার তিনজন ঘনিষ্ঠ বান্ধবী আছে–আমার এলাকার সাফিনা, আমার গ্রামের বাড়ির সুমবুল এবং স্কুলের বান্ধবী মনিবা। প্রাইমারি স্কুলে পড়ার সময় একই এলাকায় থাকার সূত্রে মনিবা আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বান্ধবী হয়ে ওঠে। আমার পীড়াপীড়িতে সে আমার স্কুলে ভর্তি হয়। সে সাংঘাতিক বুদ্ধিমতি। তিন বোন ও চার ভাইয়ের বিরাট সংসার তাদের। তার চেয়ে আমি ছয় মাসের বড় হলেও আমি তাকে বড় বোনের মতো মানি। মনিবা যেসব আইন-কানুন ঠিক করে আমি তা মেনে চলি। আমাদের দুজনের কারও কিছু দুজনের কাছে গোপন থাকে না। অন্য মেয়েদের সঙ্গে আমার বেশি মেলামেশা সে পছন্দ করে না। সে বলে যেসব লোকের আচরণ উল্টোপাল্টা

www.pathagar.com

এবং যাদের বদনাম আছে সেসব লোকের সঙ্গে কথা বলা বা তাদের সাহায্য সহযোগিতা করার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। সে সব সময় বলে, আমার চার চারটি ভাই। আমি যদি সামান্যতম কোন ভুল কিছু করে বসি তাহলে তারা নিশ্চিত আমার স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেবে।'

আব্বা-আম্মাকে দুঃখ না দেওয়ার চেষ্টা আমার এতটাই ছিল যে কেউ কোনো সাহায্য সহযোগিতা চাইলে তা করার চেষ্টা করতাম। যে কারও সাহায্যে যে কোনো কোথাও ছুটে যেতাম। একদিন এক প্রতিবেশী আমাকে বাজার থেকে কিছু ভুট্টো কিনে আনতে বললো। বাজারে যাওয়ার সময় একটা ছেলে বাইসাইকেল নিয়ে হুমড়ি খেয়ে আমার ওপর পড়লো। আমার বাম কাঁধে এত ব্যথা পেলাম যে চোখ দিয়ে পালিয়ে বেরিয়ে এলো। কিন্তু অত ব্যথা পাওয়ার পরও আমি বাজারে গিয়ে ভুট্টা এনে ওই প্রতিবেশীকে দিলাম। এরপর বাড়ি গেলাম। একমাত্র সেইদিনই আমি কেঁদেছিলাম। এর অল্প কিছুদিন পরই আমি আমার প্রতি আব্বার পূর্ণ স্নেহ পুনরুদ্ধারের মোক্ষম সুযোগ পেলাম। স্কুলের নোটিশ বোর্ডে দেখলাম উপস্থিত বক্তৃতার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। আমি আর মনিবা তাতে অংশ নেব বলে ঠিক করলাম। আব্বা উপস্থিত বক্তৃতায় অংশ নিয়ে দাদাজানকে কীভাবে চমকে দিয়েছিলেন সে গল্প মনে পড়লো। মনে হচ্ছিল ঠিক সেইভাবে যদি আব্বাকে আমিও চমকে দিতে পারতাম।

যখন বক্তৃতার বিষয়বস্তু হাতে পেলাম, তখন যেন বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না। এটা ছিল, 'সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।' সকালবেলা এসেম্বলিতে কবিতা আবৃত্তি করা এই ছিল আমাদের একমাত্র চর্চার বিষয়। আমাদের স্কুলে ফাতিমা নামে আমার চেয়ে বয়সে বড় একটা মেয়ে ছিল। সে ছিল দারুণ বক্তা। শত শত লোকের সামনে সে খুব সাবলীলভাবে বক্তৃতা দিতে পারতো। তার উচ্চারিত প্রত্যেকটি শব্দে শ্রোতারা যেন আটকে থাকতো। আমি আর মনিবা তার মতো বক্তৃতা দেওয়ার স্বপ্ন দেখতে লাগলাম এবং তার বলার ধরন অনুকরণ করার চেষ্টা করলাম।

আমাদের সংস্কৃতিতে আমাদের মা-বাবা-চাচা বা শিক্ষকেরাই বক্তৃতা লিখে দেন। সেগুলো হয় ইংরেজি নয়তো উর্দুতে লিখতে হতো। কিছুতেই পশুতুতে নয়। আমরা ভাবতাম ইংরেজিতে বক্তৃতা দিলে বক্তাকে বেশি মেধাবী মনে হয়। কিন্তু অবশ্যই আমাদের ধারণা ভুল ছিল। কোন ভাষায় বক্তৃতা দেওয়া হবে সেটা মোটেও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার না। নিজের বক্তব্য প্রকাশের ক্ষেত্রে কোন শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে সেটাই আসল বিষয়। মনিবার তিন বড় ভাইয়ের মধ্যে একজন মনিবার বক্তব্য লিখে দিয়েছিল। আমাদের জাতীয় কবি আল্লামা ইকবালের সুন্দর কয়েকটি কবিতা তাতে জুড়ে দেওয়া ছিল। আর আমার বক্তব্য লিখে দিয়েছিলেন আমার আব্বা। আমার বক্তব্যের সার কথা ছিল যদি তুমি ভালো

www.pathagar.com

কিছু করতে চাও, কিন্তু সেই ভালো কিছু যদি মন্দ উপায়ে করা হয় তাহলেও তা খারাপ। একইভাবে তুমি যদি ভালো কোনো উপায়ে খারাপ কিছু করতে চাও সেটাও খারাপ। লিংকনের সেই বিখ্যাত উক্তি দিয়ে বক্তব্য শেষ করেছিলেন আব্বা–'প্রতারণা করার চেয়ে ফেল করা অনেক বেশি সম্মানের।'

অনুষ্ঠানে মাত্র আটজন কি নয়জন ছেলে মেয়ে প্রতিযোগী ছিল। মনিবা খুব সুন্দরভাবে বললো। আমার ভাষণ মনিবার চেয়ে অনেক বেশি তথ্যবহুল ও বাণীপ্রধান হলেও মনিবার ভাষণ ছিল অনেক বেশি আবেগময় ও কাব্যিক। সে খুব সুন্দরভাবে বক্তব্য উপস্থাপন করলো। ভাষণের সময় আমি এতটা নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম যে আমি রীতিমতো কাঁপছিলাম। দাদাজান আমার বক্তৃতা শোনার জন্য এসেছিলেন। তিনি আশা করছিলেন আমি আমিই জিতবো। এই ভাবনা আমাকে আরও বেশি নার্ভাস করে ফেলেছিল। আমি বারবার মনে করছিলাম, আব্বা শিখিয়ে দিয়েছিলেন বক্তৃতা শুরু করার আগে কীভাবে বুক ভরে দম নিতে হয়। কিন্তু যখন দেখলাম সারিসারি চোখ আমার দিকে চেয়ে আছে, আমি খেই হারিয়ে ফেললাম। খেয়াল করলাম আমার হাতে বক্তৃতার কাগজ যেন নাচছিল। তবে যখন লিংকনের উদ্ধৃতি দিয়ে বক্তৃতা শেষ করলাম তখন সামনে বসা আব্বার চোখে চোখ পড়লো। দেখলাম আব্বা হাসছেন।

বিচারক ফল ঘোষণা করলেন। মনিবা প্রথম হলো। আমি হলাম দ্বিতীয়।

এটা কোনো ব্যাপার না। লিংকন তাঁর ছেলের শিক্ষককে আরও লিখেছিলেন, 'তাকে শিখিয়ো কী করে সম্মানজনকভাবে হারতে হয়।' আমি প্রত্যেক শ্রেণি পরীক্ষায় প্রথম হয়ে এসেছি। কিন্তু আমি বুঝেছি, তিন বা চারবার জয়ী হওয়ার পরও চেষ্টা ছাড়া পরবর্তী বিজয় তোমার কাছে আসবে না, এমন অনেক সময় আছে যখন নিজের এইসব পরাজয়ের গল্প অন্যদের শোনানো ভালো। এরপর আমি নিজের বক্তৃতার খসড়া নিজে লেখা শুরু করি এবং এক সময়–উপস্থাপনার ধরনই বদলে ফেলি। কাগজে লেখা বক্তৃতা পড়া বাদ দিয়ে নিজের হৃদয় থেকে উৎসারিত বক্তব্যই জবানিতে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করি।

www.pathagar.com

৬

আবর্জনার পাহাড়ের শিশুরা

খুশাল স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা যখন বাড়তে লাগলো, তখন আমাদেরও কিছুটা আয় উন্নতি হওয়া শুরু হলো এবং অবশেষে আমাদের বাসায় একটা টেলিভিশন এলো। আমার প্রিয় অনুষ্ঠান ছিল 'শাকা লাকা বুম বুম'। এটি শিশুদের জন্য তৈরি একটা ভারতীয় সিরিয়াল। তাতে সঞ্জু নামের একটি চরিত্র ছিল। সঞ্জুর ছিল একটা যাদুর পেন্সিল। ওই পেন্সিল দিয়ে সে যা আঁকতো তাই সত্যি হয়ে তার সামনে আসতো। সে শাকসবজি কিংবা একজন পুলিশের ছবি আঁকলে সেই শাকসবজি কিংবা পুলিশ বাস্তব রূপ নিয়ে তার সামনে হাজির হতো। ভুল করে সে সাপ একে বসলে সাপ হাজির হতো। সে তাড়াতাড়ি ছবিটা মুছে ফেললে সাপটাও আবার 'নাই' হয়ে যেতো। লোকজনকে সাহায্য করতে–এমনকি বাবা মাকে ডাকাতদের হাত থেকে বাঁচাতে সঞ্জু এই পেন্সিল ব্যবহার করতো। আমি মনে মনে এই পেন্সিলটা যেভাবে চেয়েছি, পৃথিবীর অন্য কোনো কিছু সেভাবে চাইনি।

রাতে মুনাজাত করে বলতাম, 'আল্লাহ, মঞ্জুর পেন্সিলটা একবার আমাকে দাও। আমি কাউকে কিচ্ছু বলবো না। তুমি শুধু কাপবোর্ডের মধ্যে জিনিসটা এনে ফেলে দাও। সবাই যাতে সুখে থাকে সেজন্য আমি পেন্সিলটা ব্যবহার করবো।' মুনাজাত শেষ করে ড্রয়ার খুলে দেখতাম পেন্সিলটা সেখানে আছে কিনা। সেখানে পেন্সিল কখনো আসেনি; কিন্তু আমি জানতাম কাকে আমার প্রথম সাহায্য করা দরকার।

আমাদের নতুন বাসাটা যে সড়কে তার কাছেই এক টুকরো ভিটের মতো জমি ছিল। সেখানে এলাকাবাসী বাসাবাড়ির যত নোংরা আবর্জনা ও রান্নাঘরের বর্জ্য ফেলতো, কারণ সোয়াতে বর্জ্য গুছিয়ে-কুড়িয়ে নিয়ে তা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলার কোনো সরকারি কার্যক্রম ছিল না। সবাই সেখানে ময়লা ফেলার কারণে জায়গাটা একটা আবর্জনার টিলা পাহাড় হয়ে পড়েছিল। জায়গাটা থেকে এত দুর্গন্ধ ছড়াতো যে আমি কখনো জায়গাটার কাছে যেতাম না। আবর্জনার ওই বিশাল স্তূপের ওপর আমরা প্রায়ই ইঁদুর দৌড়ে বেড়াতে দেখতাম। এছাড়া সেখানে প্রায় সব সময়ই কাকের দল যত্রতত্র বসে থাকতো।

www.pathagar.com

একদিন বাসায় আমার ছোট ভাই দুটি ছিল না। আম্মা কিছু আলুর ছোবড়া আর ডিমের খোলস সেখানে ফেলে আসতে বললেন। নাক চেপে ধরে আর মাছি তাড়াতে তাড়াতে আমি ময়লার স্তূপের দিকে এগুচ্ছিলাম। খেয়াল রাখছিলাম আমার সুন্দর জুতো জোড়ায় যাতে ময়লা লেগে না যায়। পঁচা ভ্যানভ্যানে খাবারের গাদার ওপর যখন আমি ময়লার টোপলাটা ফেললাম, দেখলাম সেখানে কিছু একটা নড়ে উঠলো। আমি ভয়ে আঁতকে উঠলাম। চেয়ে দেখি সেখানে আমার বয়সী একটা মেয়ে। তার চুলগুলো প্রায় জট পাকানো, সারা গায়ে আবর্জনা লেপ্টে আছে। গ্রামে আমাদের গা হাত-পা ধোয়ানোর জন্য বড়রা শলাকা নামের নোংরা মহিলার গল্প বলতো। মেয়েটাকে দেখে আমার সেই কল্পনার শশাকার কথা মনে হলো। দেখলাম মেয়েটার কাছে বড় বড় বস্তা। সে ওই আবর্জনা ঘেটে একটা ছালায় বোতল, একটাতে ক্যান, একটাতে কাঁচ এবং একটাতে কাগজ ভরছে। পাশেই কয়েকটা ছেলে বড় বড় চুম্বকের সাহায্যে ওই আবর্জনার মধ্য থেকে ফেলে দেওয়া লোহা বা অন্যান্য ধাতব জিনিসপত্র বের করছে। তাদের সঙ্গে একবার কথা বলতে মন চাইল, কিন্তু আমি এতটাই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম যে তা আর সম্ভব হল না।

ওই দিন বিকেলে আব্বা স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পর আমি তাকে ওই শিশুদের কথা বললাম। তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলাম বাচ্চাদের দেখানোর জন্য। আব্বা তাদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তারা দৌড়ে পালিয়ে গেল। আব্বা আমাকে বললেন, ওই ছেলে মেয়েরা আবর্জনার স্তুপ ঘেটে যেসব জিনিস বের করছে সেগুলো তারা ভাঙ্গাড়ির দোকানে অল্প পয়সায় বিক্রি করে। ওই দোকানদার কিছু লাভে আবার সেগুলো বিক্রি করে দেয়। বাসায় ফেরার পথে খেয়াল করলাম, আব্বার চোখে পানি।

আমি আব্বাকে বললাম, 'আব্বা তোমার স্কুলে ওদের ফ্রি ভর্তি করিয়ে নাও।' তিনি শুনে হাসলেন। আমি আর আম্মা সব সময়ই কিছু ছাত্রীকে ফ্রি ভর্তি করানোর জন্য আব্বাকে বলতাম।

আম্মা শিক্ষিতা না হলেও তিনিই ছিলেন পরিবারের কাজের লোক। আব্বা ছিলেন বক্তা, আর আম্মাকে নিজের হাতে সব কিছু করতে হতো। লোকজনকে সাহায্য করতে আব্বাকে সব সময়ই বাইরে বাইরে থাকতে হতো। দুপুরে লাঞ্চটাইমে বাড়ি ফিরে আব্বা ভারী গলায় হাঁক দিতেন, 'তোরপেকাই, আমি বাসায় এসেছি।' যদি দেখতেন আম্মা ঘরে নেই এবং তার দুপুরে কোনো খাওয়াও নেই তাহলে তিনি মাঝে মাঝে ভীষণ চটে যেতেন। যখন দেখতেন আম্মা অসুস্থ কাউকে দেখতে হাসপাতালে, কিংবা বিপদে পড়া কোনো প্রতিবেশীকে সাহায্য করতে গেছেন তখন তিনি আর কিছু বলতেন না। মাঝে মাঝে চীনা বাজারে আম্মা শপিং করতে যেতেন; সেটা অবশ্য ভিন্ন কথা।

আমরা যেখানেই থেকেছি সেখানেই আম্মা লোকজন এনে ঘর ভরে ফেলেছেন। আমার রুমে আমার সঙ্গে থাকতো আমার চাচাতো বোন আনিসা। শহরের স্কুলে পড়ার জন্য গ্রাম থেকে সে আমাদের বাসায় এসেছিল। সুলতানা নামের একজন

www.pathagar.com

মহিলা আমাদের বাসায় কাজ করতেন তাঁর মেয়ে শেহনাজও আমার রুমে থাকতো। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে ফেলে শেহনাজের বাবা মারা যান। এরপর তাকে আর তার ছোটবোনকে আবর্জনার স্তূপে কাগজ-প্লাস্টিক টোকাতে হয়েছে। শেহনাজের একটা ভাই ছিল। তার মাথায় দোষ ছিল। ঘরের জামাকাপড়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার মতো অদ্ভুত সব কাণ্ড করতো সে। আমরা তাদের একটা ইলেকট্রিক ফ্যান দিয়েছিলাম। একদিন ছেলেটা ঘরের ওই ফ্যান খুলে বেচে দিয়েছিল। সুলতানা খিটখিটে মেজাজের মহিলা ছিলেন। আম্মা তাঁকে কাজে রাখতে চাননি। কিন্তু তাঁকে যৎসামান্য বেতনের বিনিময়ে বাড়ির কাজে নিয়োগ দেন আর শেহনাজ ও তার ভাইদের বিনা বেতনে স্কুলে ভর্তি করে নেন। শেহনাজ কখনও স্কুলে যায়নি। ফলে আমার চেয়ে বয়সে দুই বছরের বড় হওয়া সত্ত্বেও আমার চেয়ে দুই ক্লাস নিচে তাকে ভর্তি করা হয়। আমি যাতে তাকে পড়ালেখায় সাহায্য করতে পারি সেজন্য তাকে আমার সঙ্গে থাকার ব্যবস্থা করা হয়।

এছাড়া নূরীয়া এবং আলিশপা নামের দুই ছাত্রী আমাদের বাসায় থাকতো। নূরীয়ার মা খারু আমাদের বাসায় ধোয়া মোছার কাজ করতেন। অন্যদিকে আলিশপার মা খালিদা রান্নাবান্নায় আম্মাকে সাহায্য করতেন। খালিদাকে এক অর্থে তার পরিবারের লোকজন বেচে দিয়েছিলেন। অর্থকড়ি নিয়ে এক বুড়োর সঙ্গে খালিদার বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। লোকটা তাকে বেদম মারপিট করতো। একদিন সে তিন শিশু কন্যাকে নিয়ে স্বামীর ঘর ছেড়ে পালিয়ে চলে আসে। বাপের বাড়িতে আসার পর বাবা ও ভাইয়েরা তাঁকে জায়গা দেয়নি। কারণ আমাদের ওখানকার বেশিরভাগ মানুষ মনে করে স্বামীর বাড়ি থেকে কোনো নারী পালিয়ে এলে তা তার বাবার মান-সম্মানের জন্য মারাত্মক হানিকর ব্যাপার। বাবা মায়ের সংসারে ঠাঁই না পেয়ে খালিদা অকূল পাথারে পড়েন। ক্ষুধার তাড়নায় তার শিশুদের শেষ পর্যন্ত আবর্জনা ঘেঁটে কাগজ তুলে বিক্রি করতে হয়। উপন্যাসের কাহিনীর মতোই বেদনাবিধুর খালিদার জীবন।

যে সময়ের কথা বলছি তখন আব্বার স্কুল অনেক বড় হয়ে উঠেছে। স্কুলে তিনটি ভবন ছিল। লান্দিকান এলাকায় যে ভবনে স্কুলের যাত্রা শুরু হয়েছিল সেখানে চলত প্রাইমারি স্কুলের কার্যক্রম। ইয়াহিয়া স্ট্রিটের ভবনে ছিল মেয়েদের উচ্চ বিদ্যালয় এবং বৌদ্ধ মন্দিরের কাছে বিশাল ফুলের বাগান ঘেরা ভবনে ছিল ছেলেদের উচ্চ বিদ্যালয়। সব মিলিয়ে স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় আটশ জন। স্কুলের আয় খুব ভালো না হলেও আমার আব্বা প্রায় একশ জনকে বিনা বেতনে ভর্তি করিয়ে নেন। এদের মধ্যে একটি ছেলে ছিল যার বাবা শরাফত আলী আব্বাকে তার কপর্দকশূন্য কলেজ জীবনে সাহায্য করেছিলেন। তার গ্রামের জীবন থেকেই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। শরাফত আলী একটা ইলেকট্রিক কোম্পানিতে চাকরি করতেন। ছেলের পড়াশুনার খরচাপাতি হিসেবে যখন যা পারতেন তখন তাই আব্বার হাতে দিয়ে যেতেন। বন্ধুর উপকারের প্রতিদান দিতে পেরেই আব্বা খুব খুশি ছিলেন।

www.pathagar.com

আমার ক্লাসে বিনা বেতনে পড়তো কাওছার নামের একটি মেয়ে। তার বাবা শাল ও কাপড়ে এমব্রয়ডারির কাজ করতেন। পাহাড় পরিদর্শনের জন্য যখন স্কুল থেকে সফরে যাওয়া হতো তখন বুঝতে পারতাম ওই সফরে যেতে যে ফি দিতে হবে তা কাওছারের হাতে নেই। আমি হাত খরচের পয়সা দিয়ে তার যাওয়ার ফি দিয়ে দিতাম।

গরীব ছেলেমেয়েকে বিনা বেতনে ভর্তি করার মানে এই নয় যে আব্বাকে শুধু তাদের বেতনের অর্থ থেকে বঞ্চিত হতে হচ্ছে। এমন কিছু ধনী অভিভাবক দেখলেন তাদের বাড়িতে কাজ করে, কাপড়চোপড় ধোয়ামোছা করে এমন ঝি-চাকরদের ছেলেমেয়ে একই ক্লাসে তাদের ছেলে-মেয়ের সঙ্গে পড়াশুনা করছে তখন তারা তাদের ছেলেমেয়েকে এই স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে অন্য স্কুলে ভর্তি করতে লাগলেন। তারা মনে করতেন, গরীব পরিবারের সন্তানদের মেলামেশা করা তাদের সন্তানদের জন্য রীতিমতো অপমানজনক। আম্মা বলতেন, গরীব ঘরের যেসব ছেলেমেয়ে দু'বেলা দুমুঠো খেতে পায় না তাদের পক্ষে লেখাপড়া শেখা প্রচণ্ড কঠিন। এই রকমের অনেক গরীব মেয়ে আমাদের বাসায় প্রায়ই সকালের নাস্তা খেতে আসতো। আব্বা ঠাট্টা করে বলতেন, আমাদের বাড়িটা একেবারে বোর্ডিং হাউস হয়ে গেছে।

একই ঘরে এত মানুষের মধ্যে পড়াশুনা করা খুবই কঠিন। আমার জন্য আলাদা রুম রাখায় আমি খুবই খুশি হয়েছিলাম, এমনকি আব্বা আমার ব্যবহারের জন্য সেখানে একটা ড্রেসিং টেবিলও দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন দেখি আমাকে সেখানে আরও দুটো মেয়ের সঙ্গে থাকতে হচ্ছে। 'আমার একটু খোলামেলা জায়গা দরকার!'–আমি প্রায় কেঁদে ফেলি। কিন্তু পরক্ষণেই যখন বুঝতে পারি আমরা অনেক সৌভাগ্যবান তখন নিজেকে অপরাধী মনে হয়। আবর্জনার স্তূপে ভাঙ্গাড়ি কুড়ানো শিশুদের কথা আমার মনে পড়ে যায়। ভাগাড়ের মতো জঞ্জালের ঢিবিতে সারাগায়ে ময়লা মাখানো মেয়েটার মুখ আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আমি নিকেজে সংযত করি, আব্বাকে বিনা বেতনে তাদের ভর্তি করার জন্য আবার চাপ দিতে থাকি।

আব্বা আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন, ওরাই এই কাজ করে পরিবারের অন্ন জোটায়। ওদের যদি তিনি ফ্রি ভর্তি করেও নেন তাহলে পুরো পরিবারকে উপোস থাকতে হবে। যাহোক, হঠাৎ করে আজাদী খান নামের একজন ধনী সমাজসেবকের সঙ্গে আব্বার পরিচয় হয়। ওই ভদ্রলোকের আর্থিক সহায়তায় আব্বা একটা লিফলেট ছাপান। তাতে লেখা ছিল, 'কিয়া কাসুলে এলেম ইন বাচ্চুকা হাক্ব নাহি?' (শিক্ষা কি শিশুদের অধিকার নয়?)। আব্বা এই লিফলেট কয়েক হাজার কপি ছাপিয়ে স্থানীয় বিভিন্ন জনসভায় ও শহরের নানা জায়গায় বিলি করতে থাকেন।

তখন থেকেই আব্বা সোয়াতে সুপরিচিত হয়ে উঠতে থাকেন। যদিও তিনি কোনো 'খান' বা ধনীলোক ছিলেন না; তবু লোকজন তাঁর কথা শুনতো।

www.pathagar.com

লোকজন জানতো, তার বক্তব্যে আগ্রহোদ্দীপক বিষয় আছে। তিনি সরকার এমনকি তখন দেশ চালাচ্ছিল যে সেনাবাহিনী তাদেরও কঠোর সমালোচনা করতেন। তিনি সেনাবাহিনীর কাছেও ক্রমশ পরিচিত মুখ হয়ে উঠছিলেন এবং আব্বার বন্ধুরা তাঁকে জানিয়েছিলেন একজন স্থানীয় সামরিক কমান্ডার নাকি আব্বাকে সবার সামনে 'মারাত্মক' বলে উল্লেখ করেছেন। একথার মাধ্যমে ওই ব্রিগেডিয়ার ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছেন তা আব্বা বুঝতে পারেননি। তবে আমাদের দেশে, যেখানে সেনাবাহিনী প্রচণ্ড দাপটশালী–সেখানে তাঁর ওই বক্তব্য কোনো ভালো ইঙ্গিতবাহী নয়।

আব্বার কাছে অন্যতম ঘৃণ্যবস্তু ছিল 'ভূতুড়ে স্কুল'। প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রভাবশালী লোকজন নিজ নিজ এলাকায় স্কুল করার জন্য সরকারি বরাদ্দ তুলতো। তারা যে স্কুল ভবন বানাতো সেগুলোতে কোনোদিন ছাত্র-ছাত্রীর পা পড়তো না। স্কুলের নামে ভবন তুলে সেটিকে তারা হুজরা বা বৈঠকখানা হিসেবে ব্যবহার করতো। এমনকি অনেকে সেটিকে গোয়ালঘর হিসেবে ব্যবহার করতো। এমন ভুয়া শিক্ষকের কথা জানা গেছে যিনি অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক হিসেবে মাসে মাসে পেনশন তুলে খাচ্ছেন যিনি জীবনে একদিনের জন্যও শিক্ষকতা করেননি। দুর্নীতি ও কুশাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকার পাশাপাশি আব্বা আরও যে বিষয় নিয়ে কাজ করতেন সেটি হলো পরিবেশ।

ওই সময় মিঙ্গোরার জনবসতি দ্রুত বাড়ছিল। প্রায় ১ লাখ ৭৫ হাজার লোক এখন এ শহরটিকে তাদের নিজের শহর হিসেবে ভাবে। এই ঘনবসতির কারণে আমাদের অতি প্রসিদ্ধ নির্মল বায়ূ এখন যানবাহন আর রান্না ঘরের চিমনির ধোঁয়ায় দ্রুত দূষিত হয়ে পড়ছে। কাঠের অভাব পূরণ করতে পাহাড় আর টিলার সবুজ বৃক্ষ নিধন করা হচ্ছে। আব্বা বলতেন, শহরের মাত্র অর্ধেক লোক নিরাপদ পানি পায়; বাকি অর্ধেক আমাদের মতো পয়ঃপ্রণালী সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এ কারণে আব্বা ও তাঁর বন্ধুরা মিলে 'গ্লোবাল পিস কাউন্সিল' নামের একটা সংগঠন গড়ে তোলেন। নামের মধ্যে বৈশ্বিক চেতনার কথা থাকলেও তাদের মূল কার্যক্রম ছিল একেবারেই স্থানিক।

সংগঠনটির নাম স্পষ্টতই শ্লেষাত্মক এবং আব্বা নিজেও নামটি নিয়ে হাসাহাসি করতেন; তবে সংগঠনটির উদ্দেশ্য ছিল খুবই মহৎ ও গুরুত্ববহ। এর মূল লক্ষ্য ছিল সোয়াতের প্রাকৃতিক পরিবেশকে সব ধরনের হুমকি থেকে বাঁচানো এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে শিক্ষা ও শান্তির প্রসার ঘটানো।

আব্বার কবিতাও লিখতে ভালোবাসতেন। কখনও কখনও ভালোবাসা নিয়ে কবিতা লিখলেও সচরাচর লিখতেন অনার কিলিং এবং নারী অধিকারের মতো বিতর্কিত বিষয়কে প্রতিপাদ্য করে। একবার আফগানিস্তানের কাবুল ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে আয়োজিত এক কবিতা উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। সেখানে তিনি শান্তি নিয়ে লেখা স্বরচিত কবিতা পড়েন।

www.pathagar.com

উৎসবের সমাপনী ভাষণে কবিতাটিকে শান্তিতে উজ্জীবিত করার প্রেরণা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। অনেক দর্শক কবিতাটি আবার আবৃত্তি করার অনুরোধ করেন। আব্বা আবার কবিতাটি পড়েন। বিশেষ বিশেষ যে লাইনগুলো দর্শক-শ্রোতাকে মুগ্ধ করেছিল সেগুলো পড়ামাত্রই 'বাহ! বাহ!' ধ্বনি ওঠে। আব্বার কবিতা শুনে আমার দাদাজানও গর্ব নিয়ে বলতেন, 'বেটা, তুমিতো দেখছি জ্ঞানের আকাশের জ্বলজ্বলে তারা।'

আব্বাকে নিয়ে আমাদেরও গর্বের শেষ নেই; কিন্তু তিনি বড় বড় কাজে যুক্ত থাকার কারণে তাকে আমরা খুব বেশি কাছে পেতাম না। আমাদের সংস্কৃতিতে, বিশেষ করে আমাদের মতো যারা গ্রাম থেকে শহরে আসা পরিবার তাদের মধ্যে পুরুষদের সঙ্গে ছাড়া মহিলাদের বাইরে যাওয়া ভালো চোখে দেখা হয় না। কিন্তু আম্মাই আমাদের কাপড় চোপড় কেনাকাটা করা; অসুস্থ হলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ করতেন। আব্বা যেদিন বাড়িতে থাকতেন সেদিন তিনি ছাদের ওপর বন্ধুদের নিয়ে রাজনৈতিক আলোচনার বিরামহীন আড্ডা জমাতেন। তখন তাঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল একটাই–নাইন ইলেভেন। ওই ঘটনা হয়তো গোটা দুনিয়াকেই বদলে দিয়েছে, কিন্তু আমরা যেখানে বাস করছিলাম সেটাই ছিল তখনকার সমস্ত আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে যখন হামলা হয় তখন আল-কায়েদা প্রধান ওসামা বিন লাদেন কান্দাহারে তালেবানের আশ্রয়ে ছিলেন। হামলার পরপরই আমেরিকানরা লাদেনকে ধরতে এবং তালেবান সরকারকে উৎখাত করতে হাজার হাজার সেনা পাঠায়।

ঠিক ওই সময় আমরা এক নায়কের শাসনাধীন। কিন্তু তখন আমাদের সাহায্যের দরকার পড়লো যুক্তরাষ্ট্রের, যেমন করে ১৯৮০'র দশকে আফগানিস্তানে রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই চালানোর সময় আমাদের সাহায্যের দরকার পড়েছিল। আফগানিস্তানে রাশিয়ার অভিযান শুরু হওয়ার পরপরই জেনারেল জিয়ার ভাগ্য খুলে গিয়েছিল। ঠিক একইভাবে নাইন ইলেভেন আন্তর্জাতিকভাবে অবাঞ্ছিত জেনারেল মোশাররফকে রাতারাতি বদলে দিল। জর্জ ডব্লিউ বুশের পক্ষ থেকে হোয়াইট হাউসে আর টনি ব্লেয়ারের পক্ষ থেকে ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে দাওয়াত করা হলো। তবে বড় সমস্যাটা রয়েই গেল। আমাদের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই দৃশ্যত তালেবানের জন্ম দিয়েছে। আইএসআইয়ের বহু কর্মকর্তা তালেবান নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং তালেবানের বিশ্বাস আদর্শকে অনেকে গ্রহণও করেছিলেন। আইএসআইয়ের কর্নেল ইমাম একবার প্রকাশ্যে দম্ভের সঙ্গে বলেছিলেন, তিনি ৯০ হাজার তালেবান যোদ্ধাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন এবং আফগানিস্তানে তালেবান শাসনামলে তিনি হেরাতে পাকিস্তানের কনসাল জেনারেল ছিলেন।

আমরা যখনই জেনেছি তালেবান যোদ্ধারা গার্লস স্কুল ধ্বংস করছে এবং বামিয়ানের বৌদ্ধমূর্তি উড়িয়ে দিয়েছে তখন থেকেই আমরা তালেবানের ভক্ত ছিলাম না। আমাদের এলাকায় অসংখ্য প্রাচীন বৌদ্ধ মূর্তি আছে যা নিয়ে আমরা গর্ব করি। তবে তালেবানকে পছন্দ না করলেও বহু পশতুন আফগানিস্তানে

www.pathagar.com

বোমা বর্ষণ কিংবা পাকিস্তান যে পদ্ধতিতে আমেরিকাকে সাহায্য করছিল তা কোনোভাবেই পছন্দ করেনি। আমাদের আকাশসীমা অতিক্রম করতে দেওয়া তারা পছন্দ করেনি। আমরা তখনও জানতাম না মোশাররফ তখন আমেরিকাকে আমাদের আকাশপথ ব্যবহারের পুরো স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছে।

আমাদের ওখানকার বহু ধর্মীয় আলেম ওসামা বিন লাদেনকে নায়ক বা বীর বলে মনে করতো। সে সময় বাজারে সাদা ঘোড়ার ওপর বসা লাদেনের ছবি পোস্টার হিসেবে বিক্রি হতো। এমনকি মিষ্টির বাক্সের ওপরও লাদেনের ছবি দেখা যেতো। এইসব আলেম বলতেন, যুক্তরাষ্ট্র সারা পৃথিবীতে যে উৎপীড়ন চালিয়েছে তারই মোক্ষম প্রতিশোধ হলো নাইন ইলেভেনের হামলা। কিন্তু ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে থাকা মানুষগুলো যে নির্দোষ ছিল, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গে তাদের যে কোনো সম্পর্ক ছিল না; পবিত্র কোরানে যে স্পষ্ট বলা হয়েছে হত্যা করা পাপ–এসব কথা তারা এড়িয়ে যান। আমাদের লোকেরা সব কিছুর পেছনে ষড়যন্ত্র দেখে এবং অনেকেই বলে থাকে মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে আমেরিকাকে যুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়ার জন্য ইহুদিরা এই হামলা চালিয়েছিল। আমাদের অনেক সংবাদপত্রে বলা হয়েছিল হামলার দিন ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে কোনো ইহুদি ছিল না। আমার আব্বা বলেন, এসবই ফালতু কথা।

মোশাররফ জনগণকে বললেন, আমেরিকাকে আফগানিস্তানে অভিযান চালানোর ব্যাপারে সাহায্য করা ছাড়া তার সামনে কোনো পথ খোলা ছিল না। তিনি বললেন, আমেরিকানরা তাকে বলেছে, 'হয় তুমি আমাদের সঙ্গে নয়তো সন্ত্রাসীদের সঙ্গে' এবং 'আমাদের ওপর বোমা ফেলে আমাদের প্রস্তরযুগে' পাঠানোর হুমকি দিয়েছে। কিন্তু তখনও আমরা আমেরিকাকে প্রকৃত অর্থে সহায়তা করছিলাম না। কারণ তখনও আইএসআই তালেবান যোদ্ধাদের মদদ দিয়ে যাচ্ছিল এবং কোয়েটায় তালেবান নেতাদের আশ্রয় দেওয়া হচ্ছিল। আইএসআই প্রধান আমেরিকানদের বলছিলেন, তিনি কান্দাহারে গিয়ে মোল্লা ওমরকে অনুরোধ করবেন তিনি যেন বিন লাদেনকে আমেরিকার হাতে তুলে দেন। তিনি কান্দাহারে না যাওয়া পর্যন্ত আমেরিকানদের হামলা স্থগিত রাখতে অনুরোধ করেছিলেন।

আমাদের প্রদেশে মাওলানা সুফি মোহাম্মদ নামের একজন ধর্মীয় নেতা, যিনি আফগানিস্তানে রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিলেন। আমাদের পূর্বপুরুষেরা ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে যেখানে লড়েছিলেন, সেই মালাকান্দে মাওলানা সুফি মোহাম্মদ বিশাল এক জনসভার আয়োজন করেন। পাকিস্তান সরকার তাঁকে থামায়নি। আমাদের প্রদেশের গভর্নর এক বিবৃতিতে বললেন, আফগানিস্তানে ন্যাটো বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে যে কেউ যেতে চাইলে সে স্বাধীনভাবে যেতে পারবে। শুধু সোয়াত থেকেই ১২০০০ তরুণ ওই যুদ্ধে যোগ দিতে আফগানিস্তান চলে যায়। তাদের অনেকেই আর ফিরে আসেনি। হয়তো তারা মারা গিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু যেহেতু তাদের মৃত্যু নিশ্চিত করার পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই, সেহেতু তাদের স্ত্রীদের

www.pathagar.com

বিধবাও ঘোষণা করা যাচ্ছে না। এটা ওই নারীদের জন্য অসম্ভব কষ্টের ব্যাপার। আমার আব্বার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ওয়াহিদ জামানের এক ভাই ও এক শ্যালকও অনেকের মতো তালেবানের পক্ষে যুদ্ধে গিয়েছিলেন। তাদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা এখনও তাদের ফেরার আশায় পথ চেয়ে বসে আছে। তাদের দেখতে গিয়ে তাদের স্বজন ফিরে পাওয়ার যে আশা দেখেছিলাম তা আমার বেশ মনে পড়ে। এই বেদনাদায়ক পরিস্থিতির সঙ্গে আমাদের এই শান্তিপূর্ণ উপত্যকার পরিবেশের ছিল যোজন দূরত্ব। আমাদের ওখান থেকে আফগানিস্তানের দূরত্ব ছিল একশ মাইলেরও কম। কিন্তু সেখানে যেতে হলে আপনাকে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী বাজাউর উপজাতীয় এলাকা দিয়ে যেতে হবে।

পূর্ব আফগানিস্তানের তোরা বোরা পর্বতের শ্বেত পাহাড়ে বিন লাদেন তাঁর দলবল নিয় পালিয়ে গিয়েছিলেন। রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় সেখানে তিনি একটি সুড়ঙ্গ নেটওয়ার্ক তৈরি করেছিলেন। এই সুড়ঙ্গ দিয়ে তিনি পালিয়ে যান। পরে সেখান থেকে পাহাড়ের মধ্য দিয়ে আরেক উপজাতীয় এলাকা খুররমে চলে যান। তখন আমরা সেটা জানতাম না, সেটা হলো লাদেন সোয়াত উপত্যকার একটা প্রত্যন্ত গ্রামে এসেছিলেন এবং পশতুনওয়ালী আতিথিয়েতার ঐতিহ্যের সুযোগ নিয়ে সেখানে একটি বাড়িতে প্রায় এক বছর কাটিয়েছিলেন।

যে কেউ বুঝতে পারছিল, মোশাররফ ডাবল ডিলিং করছেন। একদিকে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছিলেন, অন্যদিকে জিহাদিদের (যারা আইএসআইর ভাষায় পাকিস্তানের 'কৌশলগত সম্পদ') মদদ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমেরিকানরা বলে থাকে তারা আল কায়েদা বিরোধী প্রচারণা চালানোর জন্য পাকিস্তানকে শত শত কোটি ডলার দিয়েছে। কিন্তু আমরা সেই সহায়তার একটি কানাকড়িও চোখে দেখিনি। অন্যদিকে মোশাররফ রাওয়াল লেকের পাড়ে প্রাসাদোপম বাড়ি বানিয়েছেন। লন্ডনে বিলাসবহুল ফ্ল্যাট কিনেছেন। সে সময় যখনই কোনো আমেরিকান কর্মকর্তা অভিযোগ করতেন যে, আমরা তাদের যথেষ্ট সাহায্য করছি না, তখনই হঠাৎ করে কোনো না কোনো রাঘব বোয়াল ধরা পড়তো।

নাইন ইলেভেনের অন্যতম পরিকল্পক খালিদ শেখ মোহাম্মাদকে রাওয়ালপিণ্ডিতে অবস্থিত সেনাপ্রধানের সরকারি বাসভবনের মাইলখানেক দূরের একটি বাড়ি থেকে আটক করা হয়। কিন্তু প্রেসিডেন্ট বুশ মোশাররফকে প্রশংসা করা চালিয়ে যান। বুশ তাঁকে ওয়াশিংটনে আমন্ত্রণ জানান এবং বন্ধু বলে সম্বোধন করেন। আমার আব্বা ও তাঁর বন্ধুরা এতে ভীষণ বিরক্ত হন। তাঁরা বলতেন আমেরিকানরা সব সময়ই পাকিস্তানের একনায়কদের সঙ্গে ওঠাবসা করতে পছন্দ করেন।

খুব ছোটবেলা থেকেই আমি রাজনীতির ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠি। আব্বা ও তাঁর বন্ধুরা যখন রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতেন, তখন আমি আব্বার পায়ের কাছে বসে তাদের কথা মন দিয়ে শুনতাম। তবে আমাদের ঘরের চারপাশের,

www.pathagar.com

বিশেষ করে আমাদের সড়কের আশপাশের বিষয়ে আমি বেশি মনযোগী ছিলাম। স্কুলে আমি আমার বন্ধুদের কাছে আবর্জনার স্তূপে কাজ করা শিশুদের কথা বলেছি। তাদের বলেছি ওই শিশুদের সাহায্য করা দরকার। কিন্তু প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত ছিল না। অনেকে বলছিল, ওই ছেলেমেয়েরা নোংরা; কেউ কেউ হয়তো রোগাক্রান্ত এবং তাদের বাবা-মায়েরাই চাবে না তারা স্কুলে যাক। তারা আমাকে বললো, এইসব সমস্যা খুঁজে খুঁজে বের করা নাকি আমাদের দায়িত্ব নয়। আমি তাদের সঙ্গে একমত ছিলাম না। আমি বললাম, 'আমরা বসে থাকতে পারি না। আমরা আশা করি সরকার তাদের সাহায্য করবে। কিন্তু সরকার তা করে না। আমি যদি এক বা দুইজনকে সাহায্য করি; আমার মতো অন্য পরিবারগুলোও যদি এক-দুইজনকে সাহায্য করে তাহলে আমরা সবাইকে সাহায্য করতে পারবো।'

আমি ভালো করে জানতাম মোশাররফ সরকারের কাছে এসব চেয়ে আবেদন জানানো বৃথা চেষ্টা ছাড়া কিছু হবে না। আমার দিক থেকে আমি আব্বাকে অনুরোধ জানাতে পারি। আব্বা যদি ওই শিশুদের জন্য কিছু করতে না পারে, তখন আমার সামনে একটাই বিকল্প থাকবে। এবং শেষ পর্যন্ত আমি সেই বিকল্পের আশ্রয় নিলাম এবং আল্লাহর কাছে একটা চিঠি লিখলাম—

'প্রিয় আল্লাহ, আমি জানি তুমি সবকিছু দেখছো। কিন্তু অসংখ্য বিষয়ের মধ্যে হয়তো আফগানিস্তানে বোমাবর্ষণের মতো কিছু ব্যাপার তোমার দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হয় আমাদের বাড়ির কাছে ডাস্টবিনের ময়লা তোলে যে শিশুরা তাদের দেখে তুমি খুশি হতে পারবে না। আল্লাহ, শক্তি আর সাহস দিয়ে আমাকে সম্পন্ন মানুষ করে তোলো, কারণ আমি এই পৃথিবীকে সম্পন্ন পৃথিবী হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। মালালা।'

সমস্যা হল, এই চিঠি আল্লাহর কাছে কীভাবে পৌঁছানো যাবে তা আমার জানা ছিল না। কোনো কারণে প্রথমে আমার মনে হলো, মাটিতে গভীর গর্ত খুড়ে সেখানে চিঠিটা ফেললে তা আল্লাহর কাছে পৌঁছে যাবে। এই ভেবে আমি বাগানে একটা গর্ত খুড়লাম। হঠাৎ মনে হলো, মাটিতে চিঠি রাখলে তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এ কারণে বিঠিটাকে প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরলাম। কিন্তু তাতেও মনে হলো এতে হয়তো কাজ হবে না। সব শেষে মনে হল, আমরা তো ছিড়ে যাওয়া ধর্মীয় বইপত্র স্রোতস্বিনী নদীতে ফেলি। ঠিক একইভাবে চিঠিভরা ওই প্লাস্টিক ব্যাগটাকে একটা কাঠের সঙ্গে শক্ত করে বেধে তা খালে ফেলে দিলাম। সেটা স্রোতে ভেসে সোয়াত নদীতে গিয়ে পড়বে এবং শেষমেষ তা আল্লাহর হাতে গিয়ে পৌঁছবে।

www.pathagar.com

৭

যে মুফতি আমাদের স্কুল বন্ধ করতে চেয়েছিলেন

আমার যেখানে জন্ম, সেই খুশালস্ট্রিটে অবস্থিত আমাদের স্কুলের সামনেই লম্বা ও সুশ্রী একজন মোল্লা তাঁর পরিবার নিয়ে থাকতেন। তাঁর নাম গোলামুল্লাহ। তিনি নিজেকে একজন মুফতি বা ইসলামী আলেম বা শরীয়া আইনের ফয়সালা দানকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে পরিচয় দিতেন। অবশ্য আমার আব্বার অভিযোগ, মাথায় টুপি পরা যে কেউ নিজেদের মাওলানা বা মুফতি বলে চালিয়ে দিতে পারেন। স্কুলটা ভালো চলছিল। বয়েজ হাইস্কুলে প্রচুর সংখ্যক ছাত্র ভর্তি হচ্ছিল এবং আব্বার গ্রহণযোগ্যতাও বাড়ছিল। আমার আম্মা প্রথমবারের মতো ভালো কাপড় চোপড় কিনতে, এমনকি গ্রামের বাড়িতে খাবার দাবার কিনে পাঠাতে পারছিলেন। কিন্তু মুফতি সব সময় আমাদের ওপর নজরদারি করছিলেন। প্রতিদিন গার্লস স্কুলে মেয়েদের ঢুকতে ও বের হতে দেখে, বিশেষ করে কিশোরী মেয়েদের আসা যাওয়া করতে দেখে মুফতির রাগ হতো। একদিন আব্বা বললেন, 'আমাদের ওপর ওই মাওলানার বদ নজর আছে।' তাঁর কথাই ঠিক ছিল।

কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল, ওই মুফতি যে ভবন ভাড়া নিয়ে স্কুল চলছিল, সেই ভবনের মালকিনের কাছে গিয়ে বললেন, 'আপনার ভবনে জিয়াউদ্দিন হারাম স্কুল চালাচ্ছে এবং মহল্লাবাসীর জন্য লজ্জাজনক কাজ করছে। মেয়েদের অবশ্যই পর্দা মেনে চলা উচিত।' মুফতি তাঁকে বললেন, 'আপনি তাঁর কাছ থেকে বিল্ডিং ফিরিয়ে নিন; আমি এটা ভাড়া নিয়ে মাদ্রাসা করি। আপনি এটা করলে দুনিয়া এবং আখেরাতে পুরস্কৃত হবেন।'

ভদ্রমহিলা মুফতির কথায় রাজি হলেন না। একদিন তাঁর ছেলে আব্বাকে গোপনে বললেন, 'এই মাওলানা কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে বদনাম রটানো শুরু করেছে। আমরা তাকে বিল্ডিংটা ভাড়া দেবো না, কিন্তু আপনি সতর্ক থাকবেন।'

আব্বা খুবই রেগে গেলেন। আমরা যেমন বলে থাকি 'নিম হাকিম খাতরাইজান (হাফ ডাক্তার রোগীর জন্য বিপদজনক)' তেমন আব্বা বললেন, 'নিম মোল্লা খাতরাই ঈমান (আধা মোল্লা ঈমানের জন্য ভয়ঙ্কর)।'

বিশ্বে প্রথমবারের মতো মুসলমানদের দেশ হিসেবে আমাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে আমি গর্ববোধ করি। কিন্তু আদতে যে অর্থে এই মুসলমান রাষ্ট্র

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আমরা মোটেও তার সঙ্গে একমত নই। পবিত্র কোরানে 'সবর' বা ধৈর্য্যের শিক্ষা দেয়, কিন্তু প্রায়ই আমাদের মনে হয় আমরা বাকি দুনিয়ার কথা ভুলে বসে আছি। আমরা ভাবি, ইসলাম অর্থ মেয়েদের ঘরে থাকতে হবে কিংবা বোরখায় মুখ ঢেকে চলতে হবে এবং পুরুষদের জিহাদ করতে হবে। পাকিস্তানে ইসলামের বহু মত-পথের ধারা দেখা যায়। আমাদের দেশের স্থপতি জিন্নাহ চেয়েছিলেন ভারতবর্ষে মুসলমানদের অধিকার মেনে নেওয়া হবে। কিন্তু ভারতের অধিকাংশ মানুষ ছিল হিন্দু। তখনকার অবস্থা ছিল কলহরত দুইভাইয়ের মতো যারা নিজেরাই আলাদা বাড়িতে থাকার জন্য রাজি হয়েছিল। সেই মতে, ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে ভারতবর্ষ দুইভাগে ভাগ হয়ে যায় এবং স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের জন্ম হয়। এর মধ্যদিয়েই ভয়ঙ্কর রক্তপাতের সূচনা হয়। লাখ লাখ মুসলমান ভারত থেকে সীমান্ত পার হয়ে পাকিস্তানে, আর পাকিস্তান থেকে ভারতে একইভাবে হিন্দুরা আসতে থাকে। নতুন সীমান্ত অতিক্রম করার সময় সাম্প্রদায়িক হামলার শিকার হয়ে অন্তত দুই লাখ লোক নিহত হয়।

দিল্লি থেকে ছেড়ে লাহোরে আসা ট্রেনে বহু মানুষকে জবাই করা হয়। একইভাবে দিল্লিতে যাওয়া ট্রেনের মধ্যেও রক্তগঙ্গা বইয়ে দেয়া হয়। আমার দাদাজান তখন দিল্লিতে পড়াশুনা করতেন। দেশভাগের সময় তিনি দিল্লি থেকে ট্রেনে আসার সময় যাত্রীরা হিন্দুদের হামলার মুখে পড়েন। দাদাজান কোনোরকমে সে যাত্রায় বেঁচে যান।

এখন আমাদের দেশে ১৮ কোটির বেশি মানুষের বাস এবং তাদের ৯৬ শতাংশের বেশি লোকই মুসলিম। এছাড়া এখানে প্রায় ২০ লাখ খ্রিস্টান এবং ২০ লাখের বেশি আহমাদিয়া সম্প্রদায়ের লোক বাস করে। আহমাদিয়ারা নিজেদের মুসলমান হিসেবে দাবি করলেও সরকার তাদের মুসলমান বলে স্বীকার করে না। দুঃখজনকভাবে এই সংখ্যালঘুরা প্রায়ই হামলার শিকার হয়।

তরুণ বয়সে জিন্নাহ লন্ডনে ছিলেন এবং সেখানে ব্যারিস্টার হিসেবে আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেন। তিনি চেয়েছিলেন একটা সহিষ্ণুতার ভূ-খণ্ড গড়ে তুলতে। স্বাধীনতা লাভের মাত্র কয়েকদিন আগে জিন্নাহর দেওয়া ঐতিহাসিক ভাষণের একটি অংশ আমাদের লোকেরা প্রায়ই উদ্ধৃত করে, 'পাকিস্তানে মন্দিরে যাওয়ার ব্যাপারে তোমরা স্বাধীন, মসজিদে যাওয়ার ব্যাপারে স্বাধীন, অথবা যার যার উপাসনালয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন। তোমরা যার যার ধর্ম কিংবা মতাদর্শ অনুসরণ করতে পারো, এ ব্যাপারে রাষ্ট্রের কোনো হস্তক্ষেপ থাকবে না।' আমার আব্বা বলেন, সমস্যাটা হলো জিন্নাহ প্রকৃতপক্ষে আমাদের আবাসনের জন্য এক টুকরো ভূ-খণ্ডের জন্য সমঝোতা করেছিলেন, প্রকৃত রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য নয়। পাকিস্তান সৃষ্টির এক বছর পরই যক্ষ্মা রোগের কারণে জিন্নাহর মৃত্যু হয়। এবং তখন থেকে এ পর্যন্ত আমরা হানাহানি বন্ধ করতে

www.pathagar.com

পারিনি। এ পর্যন্ত ভারতের সঙ্গে আমাদের তিন তিনবার যুদ্ধ হয়েছে এবং আমাদের দেশের ভেতরে জাতিতে জাতিতে গোত্রে গোত্রে সীমাহীনভাবে হত্যাকাণ্ড ঘটে চলেছে।

আমরা মুসলমানেরা শিয়া এবং সুন্নি–এই দুইভাগে বিভক্ত। মৌলিক জায়গায় আমাদের বিশ্বাস অভিন্ন। আমরা অভিন্ন কোরানেরই অনুসারী। তবে সপ্তদশ শতকে মহানবী (সা.)-এর ওফাতের পর খেলাফতের আসল দাবিদার কে তাই নিয়ে আমাদের এই দুই সম্প্রদায়ের মতভেদ রয়েছে। মহানবী (সা.)-কে ওফাতের পর তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সাহাবী আবু বকর (রা.)-কে ইসলামের প্রথম খলিফা নির্বাচিত করা হয়–তাঁকে খেলাফত দেওয়ার কারণ হিসেবে বলা হয়, মহানবী (সা.) যখন মৃত্যুশয্যায় তখন আবু বকরকে (রা.)-কে তিনিই নামাজে ইমামতি করতে বলেছিলেন। আরবী শব্দ সুন্নীর অর্থ হলো, রাসূল (সা.)-এর জীবনাদর্শ বা সুন্নাহের অনুসারী। তবে একদল লোক দাবি করেছিলেন, খেলাফত রাসূল (সা.)-এর পরিবারের মধ্য থেকে কাউকে দেওয়া উচিত এবং সে হিসেবে আবু বকর (রা.) কে খলিফা না বানিয়ে রাসূল (সা.)-এর বংশের লোক ও একইসঙ্গে নিজের জামাতা আলী (রা.) কে খেলাফত দেওয়া উচিত ছিল। এই মতের অনুসারীদের বলা হয় 'শিয়া-ত-আলী' বা আলীর দল। সংক্ষেপে শিয়া নামে এরা পরিচিত।

১৯৮০ সালে কারবালার প্রান্তরে রাসুল (সা.) এর নাতি হুসেইন ইবনে আলী শত্রুর হাতে নির্মমভাবে শাহাদত বরণ করেন। ওই দিনটিকে শিয়ারা উৎসবমুখর ভাবে পালন করে যা মুহররম নামে পরিচিত। ইমাম হুসেইনের শাহাদাতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে এই দিনটিতে শিয়ারা রাস্তায় বেরিয়ে আসে। লোহার শেকলে পাতলা ছুরি বেধে তারা নিজের শরীরে পেটাতে পেটাতে মাতম করতে থাকে। রক্তে রাজপথ রঞ্জিত না হওয়া পর্যন্ত তারা উন্মত্ততায় নিজের শরীরকে বিক্ষত করতে থাকে। আমার আব্বার এক শিয়া বন্ধু আছেন। কারবালায় হুসেইনের মৃত্যুর কথা বলতে গিয়ে তিনি ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেন। কারবালার সেই হৃদয়বিদারক ঘটনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে এতটাই ভেঙে পড়েন যে তাঁকে দেখে মনে হবে কারবালার সেই ঘটনা ১৩শ' বছরের বেশি সময় আগের নয়' যেন গতকাল রাতেই এই বিয়োগান্তক ঘটনা ঘটেছে। আমাদের দেশের যিনি স্থপতি সেই জিন্নাহ নিজে একজন শিয়া ছিলেন। বেনজির ভুট্টোর মাও ছিলেন ইরানের এক শিয়া পরিবারের সন্তান।

পাকিস্তানের বেশিরভাগ লোক আমাদের মতো সুন্নি সম্প্রদায়ের। দেশটির ৮০ শতাংশের বেশি লোকই সুন্নী। কিন্তু আমাদের এই সুন্নীদের মধ্যেও বহু মতের বহু গ্রুপ আছে। সবচেয়ে বড় গ্রুপ হলো বেরেলভীরা। ভারতের উত্তর প্রদেশের বারিলিতে উনিশ শতকে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার নামানুসারে এই মতাবলম্বীদের নাম বেরেলভী। এরপরের বড় গ্রুপটির নাম দেওবন্দী। এরাও ভারতের উত্তর প্রদেশে অবস্থিত আরেকটি গ্রাম দেওবন্দে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার নামানুসারে

www.pathagar.com

দেওবন্দী নামে পরিচিত। দেওবন্দীরা সাংঘাতিক রক্ষণশীল এবং আমাদের দেশের বেশিরভাগ মাদ্রাসাই দেওবন্দী ধারার। আমাদের এখানে আহলে হাদীস নামে একদল সালাফীপন্থিও বাস করে।

এরা অন্য দেশের সালাফি মতবাদীদের চেয়ে অনেক বেশি আরব প্রভাবিত এবং অনেক বেশি রক্ষণশীল। পশ্চিমারা এদের ফান্ডামেন্টালিস্ট বা মৌলবাদী বলে থাকে। এরা মাজার, পীর-সাধক–এসব মানে না। পাকিস্তানের বহু লোক আছে ত্বরিকতপন্থি যারা সুফিবাদী দর্শনের অনুসারী। তারা বিভিন্ন মাজারে ওরসে মিলিত হয়ে নেচে গেয়ে প্রার্থনা করে। এই শতধা বিভক্ত দলগুলোর আবার নানারকম উপদল রয়েছে।

খুশাল স্ট্রিটের মুফতি ছিলেন তাবলীগ জামাতের একজন সাথী। তাবলীগ জামাত দেওবন্দীদেরই একটি গ্রুপ। প্রতিবছর লাহোরের কাছে রাইবিন্দ এলাকায় তাদের প্রধান মসজিদে তাবলীগ জামাতের লাখ লাখ সদস্য সমাবেশে মিলিত হয়। আমাদের সর্বশেষ এক নায়ক জেনারেল জিয়া সেখানে যেতেন এবং ১৯৮০'র দশকে তার শাসনামলে তাবলীগীরা মারাত্মক শক্তিধর হয়ে ওঠে। ওই সময় তাবলীগের বহু সদস্য আর্মি ব্যারাকের মসজিদগুলোতে ইমাম হিসেবে নিয়োগ করা হয় এবং সেনা কর্মকর্তারা তখন প্রায়ই ছুটি নিয়ে তাবলীগ জামাতের সঙ্গে দাওয়াতের কাজে চিল্লায় যেতেন।

স্কুলের জন্য নেওয়া ভবনের ভাড়া-চুক্তি বাতিল করতে ব্যর্থ হয়ে একদিন রাতের বেলায় সেই মুফতি এলাকার কয়েকজন প্রভাবশালী লোক ও মহল্লার মুরব্বী সঙ্গে নিয়ে আমাদের বাড়িতে আসলেন। তাবলীগ জামাতের কয়েকজন মুরুব্বী, স্থানীয় মসজিদের একজন মুয়াজ্জিন, একজন সাবেক জিহাদী, একজন মুদি দোকানদার সব মিলিয়ে সাতজন লোক আমাদের ঘরে এসে উঠলেন। আমাদের ছোট্ট ঘরটা লোকজনকে ভরে গেল।

আব্বাকে বিচলিত মনে হলো এবং তিনি আমাদের সবাইকে পাশের ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু বাসা এত ছোট ছিল যে, আমরা পাশের ঘর থেকে প্রত্যেকটি শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম। মোল্লা গোলামুল্লাহ্ আব্বাকে বললেন, 'আমি উলেমা ও তাবলীগ এবং তালেবানের একজন প্রতিনিধি।' নিজের গুরুত্ব ভারি করার জন্য তিনি নিজেকে মুসলিম আলেমদের একটি নয় বরং দুটো সংগঠনের প্রতিনিধি হিসেবে পরিচয় দিলেন।

তিনি বলতে লাগলেন, 'আমি ভালো মুসলমানদের একজন প্রতিনিধি এবং আমরা সবাই মনে করি আপনার গার্লস স্কুলটা চালানো হারাম ও ইসলাম বিরোধী। এটা আপনাকে বন্ধ করতে হবে। মেয়েদের স্কুলে যাওয়া মোটেও উচিত নয়।' তিনি বলতে লাগলেন, 'একটা মেয়েকে আল্লাহ্পাক এত পবিত্র করে তৈরি করেছেন তাকে পর্দায় থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নারীরা এতটাই অন্তরালের যে আল্লাহ নিজে তাদের নাম উচ্চারণ করতে চাননি বলে কোরানের কোথাও কোনো নারীর নাম আসেনি।'

www.pathagar.com

আব্বা আর শুনতে পারলেন না। তিনি তাঁকে বললেন, 'কোরানে মরিয়মের নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি কি একজন নারী এবং একই সঙ্গে একজন ভালো নারী ছিলেন?'

মোল্লা তখন বললেন, 'না, আসলে ঈসা (যীশু) যে আল্লাহর সন্তান নয়, তিনি যে মরিয়মেরই সন্তান, একমাত্র সেটা প্রমাণের জন্যই মরিয়মের নাম এসেছে।'

আব্বা বললেন, 'সেটা হয়তো হতে পারে। কিন্তু আমি বলছি কোরানে মরিয়মের নাম এসেছে।'

মুফতি আব্বার কথায় পাল্টা যুক্তি দিতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু আব্বা ভাবলেন, যথেষ্ট হয়েছে। মোল্লার সঙ্গে যারা এসেছিলেন তাদের সবাইকে উদ্দেশ করে আব্বা বললেন, 'রাস্তায় যখন এই ভদ্রলোকের (মুফতি) সঙ্গে আমার দেখা হয় তখন আমি তাঁর দিকে চেয়ে সালাম দেই, কিন্তু তিনি সালামের জবাব দেন না, খালি মাথা কাত করে চলে যান।'

আব্বার কথায় মোল্লা বিব্রত হয়ে পড়লেন, কারণ ইসলামে সঠিকভাবে সালাম দেওয়া নেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আব্বার কথার জবাবে তিনি বললেন, 'আপনি হারাম স্কুল চালান, এই জন্যে আমি আপনার সঙ্গে সালাম-কালাম করতে চাই না।'

এরপরই আগতদের মধ্য থেকে একজন বললেন, 'শুনেছি আপনি নাকি একজন নাস্তিক। কিন্তু আপনার রুমে তো দেখছি কোরান শরীফ।'

অবশ্যই আমার বাসায় কোরান থাকার কথা!'—ঈমান নিয়ে প্রশ্ন তোলায় আব্বা ক্ষেপে গিয়ে বললেন, 'আমি একজন মুসলমান।'

আলাপের বিষয়বস্তু নিজের দিকে যাচ্ছে না দেখে মুফতি বললেন, 'বাদ দিন, স্কুল প্রসংগে আসুন।' তিনি বললেন, 'যে পথ দিয়ে মেয়েদের স্কুলে ঢুকতে হয় সেখানে পুরুষ লোকেরা থাকে। তাদের সামনে দিয়ে এভাবে মেয়েদের যাওয়া আসাটা খুবই খারাপ।'

আব্বা বললেন, 'আমার কাছে একটা সমাধান আছে। স্কুলের পেছন দিকটায় আরেকটি গেট আছে। মেয়েরা যদি ওই গেট দিয়ে স্কুলে ঢোকে তাহলে আর তাদের বাইরের লোকজনের সামনে দিয়ে আসতে হবে না।

মোল্লার উদ্দেশ্য ছিল স্কুলটাকে পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া। একারণে আব্বার একথা তাঁর ভালো লাগেনি। কিন্তু মোল্লার সঙ্গে আসা মুরব্বীরা আব্বার কথায় আশ্বস্ত হলেন এবং তাঁরা চলে গেলেন।

আব্বার সন্দেহ হচ্ছিল এখানেই ব্যাপারটার সুরাহা হবে না। একটা বিষয় আমরা জানতাম কিন্তু তারা কেউ জানতেন না। সেটা হলো মুফতির এক ভাতিজি গোপনে আমাদের স্কুলে পড়তো। কয়েকদিন পর আব্বা মুফতির বড় ভাই অর্থাৎ যার মেয়ে স্কুলে ভর্তি হয়েছিল তাঁকে ডাকলেন।

www.pathagar.com

আব্বা তাঁকে বললেন, 'দেখেন ভাই সাহেব, আমি তো আপনার ভাইয়ের যন্ত্রনায় হাপিয়ে উঠছি। উনি কেমন ধরনের মোল্লা? তাঁর কারণে আমরা তো পাগল হয়ে যাচ্ছি। উনি যাতে আমাদের পিছে আর না লাগেন সেজন্য আপনি কি কিছু করতে পারেন?'

সে ভদ্রলোক বললেন, 'জিয়াউদ্দিন, আমি লজ্জিত হচ্ছি এজন্য যে আমি আসলে আপনাকে সাহায্য করতে পারবো না।' তিনি বললেন, 'তাঁকে নিয়ে আমি নিজেই সমস্যায় আছি। সে আমাদের সঙ্গেই থাকে। সে তার বউকে পর্দায় থাকতে বলেছে। তার বউ যেন আমাদের সামনেও পর্দা মেনে চলে এবং আমাদের অন্য ভাইদের বউরাও যেন একইভাবে চলে সেজন্য সে কড়া হুকুম দিয়েছে। ছোট বাড়ির মধ্যে পর্দার এত বাড়াবাড়িতে অতিষ্ট হয়ে উঠেছি। আমাদের স্ত্রীরা তার কাছে বোনের মতো, তার স্ত্রীও আমাদের কাছে বোনের মতো। কিন্তু এই পাগলা পুরো বাড়িটাকে নরক বানিয়ে ছেড়েছে। আমি দুঃখিত, আপনাকে আমি একেবারেই সাহায্য করতে পারছি না।'

মোল্লা এত সহজে ছেড়ে দেবে না বলে আব্বা যে সন্দেহ করেছিলেন সেটাই ঠিক ছিল।

জেনারেল জিয়ার শাসনামলে শুরু হওয়া ইসলামীকরণ প্রচার প্রোগাগান্ডা থেকেই মোল্লারা অনেক শক্তিধর হয়ে ওঠে।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে জেনারেল জিয়া থেকে জেনারেল মোশাররফ খুবই আলাদা ছিলেন। মোশাররফ সাধারণত উর্দি পরলেও, বিশেষ উপলক্ষে পশ্চিমা সাহেবদের মতে স্যুট পরতেন এবং নিজেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক না বলে প্রধান নির্বাহী বলতেন। তিনি কুকুর পুষতেন, যেটাকে আমরা মুসলমানেরা নাপাক বলে মনে করি। জেনারেল জিয়ার ইসলামীকরণ প্রচারণার বদলে তিনি তাঁর ভাষায় আলোকিত প্রগতিশীলতা' বাড়ানোর উদ্যোগ নেন। তিনি আমাদের গণমাধ্যম খুলে দেন। নতুন নতুন প্রাইভেট টিভি চ্যানেলের অনুমোন দেন এবং টেলিভিশনে নাচগান পরিবেশন করার ও মহিলাদের খবর পড়ার অনুমতি দেন। ভ্যালেন্টাইনস ডে কিংবা ইংরেজি নববর্ষের মতো পশ্চিমা দিবস উদ্‌যাপনের অনুমতি দেন। এমনকি তিনি স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে পপ কনসার্টের আয়োজন করেন যা টেলিভিশনে পুরো জাতিকে দেখানো হয়েছিল। তিনি এমন কিছু করেছেন যা গণতান্ত্রিক শাসকেরা, এমন কি বেনজিরও করেন। ধর্ষণের শিকার হওয়া প্রমাণ করার শর্ত হিসেবে চারজন পুরুষ সাক্ষী হাজির করার বিধান রেখে যে আইন ছিল তা তিনিই রদ করেন। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রথম নারী গভর্নর তিনিই নিয়োগ.করেন। এছাড়া তার আমলেই কোস্টগার্ড ও বিমানের পাইলট হিসেবে নারীরা অংশ গ্রহণের সুযোগ পায়। মোশাররফ এ ঘোষণাও দিয়েছিলেন যে, করাচিতে জিন্নাহর সমাধিতে নারী প্রহরী রাখা হবে।

অবশ্য উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় সীমান্ত প্রদেশে পশতুনদের ব্যাপার বরাবরই আলাদা। ২০০২ সালে মোশাররফ 'নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র' জারি রাখতে নির্বাচন

www.pathagar.com

দিলেন। সেটা ছিল অদ্ভুত নির্বাচন, কারণ দেশের দুই প্রধান দলের নেতারা বেনজির ভুট্টো ও নওয়াজ শরীফ দুজনই তখন নির্বাসনে। আমাদের প্রদেশে এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যে সরকার গঠিত হলো সেটাকে আমরা ঠাট্টা করে 'মোল্লা সরকার' বলতাম। মুত্তাহিদা মজলিশে আমল (এমএমএ) নামের ইসলামী জোট প্রাদেশিক সরকারে এলো। পাঁচটি ইসলামী দল মিলে এই জোট গঠিত হয়। এদের মধ্যে তালেবান যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এমন সব মাদ্রাসা যারা চালাতো, সেই জমিয়তে উলামায়ে ইসলামও (জেইউআই) ছিল। লোকজন মজা করে এমএমও জোটকে মোল্লা মিলিটারি অ্যালায়েন্স বলতো। তারা বলতো, মোশাররফের সমর্থন পেয়েই তারা এই প্রদেশে সরকার গঠন করেছিল। কিন্তু এটাও ঠিক, তালেবানকে ক্ষমতা থেকে ফেলে দেওয়ার এবং আফগানিস্তানে হামলা চালানোর জন্য ধর্মভীরু হিসেবে পরিচিত পশতুনরা ক্ষুব্ধ ছিল। এ কারণে তারা এমএমএ জোটকে ভোট দিয়েছিল।

পাকিস্তানের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে আমাদের এলাকা বরাবরই অনেক বেশি রক্ষণশীল। আফগান জিহাদ চলাকালে সেখানে বহু মাদ্রাসা গড়ে ওঠে। এর বেশির ভাগের নির্মাণ ব্যয় দিয়েছিল সৌদি আরব। লেখাপড়ার খরচ দিতে হতো না বলে সেখান থেকে অসংখ্য তরুণ এসব মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে পাশ করতো। পাকিস্তানে আব্বার ভাষায় 'অ্যারাবাইজেশন' এর শুরু হয় যেখান থেকেই এরপর নাইন ইলেভেন এই জঙ্গিবাদকে আরও বেশি মূলধারায় নিয়ে আসে। রাস্তা দিয়ে যখন একা হেঁটে যেতাম তখন দেয়ালে চক দিয়ে লেখা অনেক বিজ্ঞপ্তি চোখে পড়তো। সেখানে লেখা থাকতো, 'জিহাদী প্রশিক্ষণের জন্য যোগাযোগ করুন'—পাশে ফোন নম্বর দেওয়া থাকতো। ওই সময় জিহাদী গ্রুপগুলো তাদের যা ইচ্ছে তাই করতে পারতো। প্রকাশ্যে তখন তাদের চাঁদা তুলতে এবং দলে লোক নিতে দেখা যেতো। শাংলা গ্রামের একজন হেডমাস্টার প্রায়ই গর্ব করে বলতেন কাশ্মিরে জিহাদে গ্রেড নাইনে তিনি তার দশজন ছাত্রকে প্রশিক্ষণ নিতে পাঠাতে পেরেছেন, এটা তার জীবনের একটা বড় সাফল্য।

এমএমএ সরকার সিডি ও ডিভিডির দোকান নিষিদ্ধ করেছিল এবং আফগান তালেবান যেভাবে মোরালিটি পুলিশ বাহিনী গঠন করেছিল ঠিক সেই ধরনের একটি বাহিনী তৈরি করতে চেয়েছিল। তারা যে ধরনের আইন করতে যাচ্ছিল তাতে কোনো মহিলাকে বাজার ঘাট করতে যেতে হলে অবশ্যই তার সঙ্গে একজন পুরুষ লোক থাকতে হবে এবং মোরালিটি পুলিশের কাছে প্রমাণ করতে হবে লোকটি তাঁর ঘনিষ্ঠ স্বজন। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের সুপ্রিম কোর্ট তাদের সেই উদ্যোগ বন্ধ করে দেন। এরপর এমএমএ কর্মীরা সিনেমা হলগুলোতে হামলা চালাতে শুরু করে। নারী মডেলদের ছবি সম্বলিত বিলবোর্ড ভেঙে ফেলা অথবা কালি দিয়ে ছবি ঢেকে দেওয়া শুরু করে। এমনকি পোশাকের দোকানে রাখা প্রমাণ সাইজের কৃত্রিম নারী মূর্তির মডেল ফেলে দেওয়া শুরু করে। যেসব ছেলেরা স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী পাজামা-পাঞ্জাবীর বদলে পশ্চিমা ধাচের জামা প্যান্ট পরতো এবং যে নারীরা মাথা না ঢেকে বাইরে বের হতো তাদের তারা চরম

www.pathagar.com

হেনস্থা করতো। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল তারা প্রকাশ্য জীবনযাপন থেকে নারীদের নাম-নিশানা মুছে ফেলার মিশনে নেমেছিল।

আব্বার হাই স্কুল চালু হয় ২০০৩ সালে। প্রথম বছর ছেলে-মেয়েরা এক সঙ্গে পড়তো। কিন্তু ২০০৪ সালে পরিবেশ পরিস্থিতি এতটাই পাল্টে যায় যে ছেলে-মেয়ে এক সঙ্গে ক্লাস করার কথা চিন্তায় আনাও সম্ভব ছিল না। এই পরিবর্তনই গোলামুল্লাহকে বেপরোয়া করে তোলে। স্কুলের একজন কেরানী একদিন আব্বার কাছে এসে বললেন, মুফতি মাঝে মাঝে স্কুলে আসেন এবং তাদের জিজ্ঞেস করেন স্কুলে যাওয়া-আসার জন্য এখনও কেন সদর ফটক ব্যবহার করা হচ্ছে? তিনি আব্বাকে জানান, একদিন একজন শিক্ষক একজন শিক্ষিকাকে রিকশা ঠিক করে দেওয়ার জন্য তাঁর সঙ্গে সদর গেট দিয়ে বাইরে আসেন। তাঁরা চলে যাওয়ার পর মুফতি ওই কেরানীর কাছে জিজ্ঞেস করেন মহিলার সঙ্গে যে লোকটি ছিল সে কি তাঁর ভাই?

কেরানী বললেন, 'না, উনি তার সহকর্মী।'

মুফতি বললেন, 'এটা ঠিক না। মোটেও ঠিক না।'

আব্বা ওই কেরানীকে এরপর যখনই মাওলানার সঙ্গে তাঁর দেখা হবে তখনই তাঁকে আব্বার সঙ্গে দেখা করতে বললেন। কেরানী মুফতিকে গিয়ে বললেন। তিনিও চলে এলেন। আব্বা এবং ইসলামিক স্টাডিজের এক শিক্ষক তাকে মোকাবিলা করার জন্য স্কুলের বাইরে বেরিয়ে এলেন।

আব্বা ক্ষেপে গিয়ে তাঁকে বললেন, 'মাওলানা তুমি আমাকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে দেয়ালে এনে ঠেকিয়েছো। তুমি কোথাকার কে? তুমি তো পুরো উন্মাদ। তোমায় অবশ্যই ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত। তুমি কি মনে করো আমি স্কুলে ঢুকে আমার গা থেকে সব জামাকাপড় খুলে ফেলি? একটা ছেলে আর একটা মেয়েকে এক জায়গায় দেখলেই তোমার মনে হয় নাজায়েজ কিছু হচ্ছে। তারা তো স্কুলে পড়া বাচ্চা মানুষ। আমার মনে হয় তোমার এক্ষুণি ডাক্তার হায়দার আলীকে দেখানো উচিত।'

ডা. হায়দার আলী আমাদের এলাকায় একজন নামকরা মনোচিকিৎসক। পাগলের ডাক্তার।

আব্বার কথা শুনে মুফতি চুপ মেরে গেলেন। তিনি আস্তে তাঁর মাথার পাগড়ি খুলে আব্বার কোলের ওপর রাখলেন। আমাদের কাছে পাগড়ি একইসঙ্গে পশতুন ঐতিহ্য ও সম্ভ্রমের প্রতীক এবং পাগড়ি হারানো অত্যন্ত সম্ভ্রমহানীর প্রতীক। তবে খানিক বাদেই মুফতি আবার বলা শুরু করতে যাচ্ছিলেন, 'না, আমি আপনার কেরানীকে এ ধরনের কথা বলিনি। সে মিথ্যে বলছে।' ...

আব্বা তার কথা আর শুনলেন না। তিনি মনে করলেন যথেষ্ট হয়েছে। আব্বা তাঁকে বললেন, 'এখানে তোমার কোনো কাজ নাই।' তিনি তাঁকে ধমক দিয়ে বললেন, 'যাও! ভাগো।!'

www.pathagar.com

মুফতি আমাদের স্কুলটা বন্ধ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের দেশে যে কী ভয়ঙ্কর পরিবর্তন আসছিল তাঁর তৎপরতা সেটারই আভাস দিচ্ছিল। আব্বা তখন খুব বিচলিত বোধ করছিলেন। তিনিও তাঁর পরিবেশবাদী কর্মীরা পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট নিয়ে একের পর এক মিটিং করে যাচ্ছিলেন।

তবে এবারের মিটিংগুলোতে শুধু গাছ কাটা থেকে লোকজনকে বিরত রাখার বিষয়ই ছিল না; শিক্ষা ও গণতন্ত্রও তাদের আন্দোলনের বিষয় হয়ে উঠছিল।

ওয়াশিংটন থেকে প্রায় দুই থেকে আড়াই বছর ধরে ক্রমাগত চাপ আসার পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৪ সালে জেনারেল মোশাররফ ফেডারেলি অ্যাডমিনিস্ট্রেটেড ট্রাইবাল এরিয়াস বা ফাটা অঞ্চলে সেনাবাহিনী পাঠান। আফগান সীমান্তবর্তী এই এলাকায় সরকারের নিয়ন্ত্রণ খুব কমই ছিল। সেখানে সাতটি এজেন্সি বা নিযুক্ত স্থান রয়েছে।

আমেরিকানরা দাবি করলো, আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্র বোমা হামলা চালানোর পর সেখানকার তালেবান জঙ্গিরা এই এলাকায় চলে আসে এবং পশতুনদের আতিথিয়েতার স্বভাবের সুযোগ নিয়ে সেখানে নিরাপদ আশ্রয় নেয়। এখানে থেকেই তারা প্রশিক্ষণ শিবির চালাচ্ছিল এবং মাঝে মাঝে সীমান্ত পার হয়ে ন্যাটো সেনাদের ওপর হামলা চালাচ্ছিল। আমাদের সোয়াত থেকে এই এলাকা খুবই কাছে। সোয়াতের পাশেই বাজাউর নামের একটি এজেন্সি। ফাটা এলাকায় যাদের বাস তাদের সবাই আমাদের ইউসাফজাই গোষ্ঠীর মতো পশতুন উপজাতীয় মানুষ। আফগান সীমান্তের দুই পাশেই এই উপজাতীয়দের বাস।

তৎকালীন ভারতবর্ষ ও আফগানিস্তানের মাঝামাঝি এই সীমান্ত এলাকাটিতে বাফার জোন হিসেবে উপজাতীয় এজেন্সিগুলোর সৃষ্টি করেছিল সে সময়ের ব্রিটিশ সরকার। ঠিক সেই সময়ের মতো এখনও সেখানে মালিক হিসেবে পরিচিত উপজাতীয় প্রধান বা সর্দারদের শাসন জারি আছে।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই 'মালিকরা' সমাজে সামান্যই পরিবর্তন আনতে পেরেছেন। সত্যি বলতে, আদিবাসী এলাকায় সরকারের শাসন একেবারেই নেই। সরকারি নজরদারির বইরে থাকা পাথুরে এই উপত্যকার মানুষগুলো শুধুমাত্র চোরাচালানের ওপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করে। (তাদের গড় বার্ষিক আয় মাত্র আড়াইশ ডলার যা পাকিস্তানের গড় মাথাপিছু আয়ের অর্ধেক) সেখানে হাতে গোনা অল্প কয়েকটি হাসপাতাল ও স্কুল আছে; বিশেষত মেয়েদের স্কুল একেবারেই কম এবং এখন পর্যন্ত সেখানে রাজনৈতিক দলগুলোকে সেখানে কার্যক্রম চালাতে দেওয়া হয় না। এখানে খুব কম সংখ্যক মেয়ে বা নারী পাওয়া যাবে যারা পড়তে পারে। এখানকার লোকজন তাদের স্বাধীনতাবোধ ও দুর্ধর্ষ সাহসিকতার জন্য বিখ্যাত। প্রাচীন ব্রিটিশ তথ্য উপাত্ত ঘেঁটে দেখলে এর প্রমাণ পাবেন।

ফাটা অঞ্চলে ইতিপূর্বে আমাদের সেনাবাহিনী কখনও অভিযানে যায়নি। সেখানে না গিয়ে ব্রিটিশ শাসকদের কায়দায় পরোক্ষভাবে সেখানকার নিয়ন্ত্রণ ধরে

www.pathagar.com

রাখতে চেয়েছে। এর জন্য নিয়মিত সেনা সেখানে মোতায়েন না করে স্থানীয় পশতুন সীমান্তরক্ষীদের ওপর এলাকা নিয়ন্ত্রণের ভার ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে নিয়মিত সেনা পাঠানো ছিল খুবই দুরূহ কাজ। সেখানকার কিছু জঙ্গি নেতার সঙ্গে আমাদের সেনাবাহিনী ও আইএসআইয়ের বরাবরই যোগাযোগ ছিল। তাছাড়া সেখানে সেনা পাঠানোয় মানে হলো, আমাদের সেনাবাহিনীকে সেখানে তাদের নিজেদের পশতুন ভাইদের ওপর গুলি চালাতে হবে। এ কারণে সেখানে সেনা মোতায়েন শক্ত ছিল।

২০০৪ সালের মার্চ মাসে সেনাবাহিনী প্রথম যে আদিবাসী এলাকায় ঢোকে সেটি হলো দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তান। যথারীতি স্থানীয় লোকজন এটাকে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ওপর হামলা বলে গণ্য করলো। সেখানকার প্রত্যেক বাসিন্দা অস্ত্র বহন করেন। তারা সেনাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো এবং তাদের হামলায় কয়েকশ সেনা প্রাণ হারালো।

সেনাবাহিনী বড় ধরনের ধাক্কা খেল। কেউ কেউ সেখানে গিয়ে লড়াই করতে অস্বীকৃতি জানালো। তারা নিজেদের লোকের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে চাইছিল না। তবে ১২ দিন পর সেনাবাহিনী আবার সেখানে যায় এবং নেক মোহাম্মদের মতো কয়েকজন জঙ্গিনেতার সঙ্গে কথা বলে সেনাবাহিনী তাদের ভাষায় একটা 'আপোষমূলক শান্তি সমঝোতায়' পৌঁছাতে সক্ষম হয়। সমঝোতার শর্ত হিসেবে জঙ্গি হামলা বন্ধ করতে এবং বিদেশি যোদ্ধাদের সেখান থেকে বের করে দিতে সেনাবাহিনীকে তাদের মোটা অংকের ঘুষ দিতে হয়। এই অর্থ দিয়ে খুব স্বাভাবিকভাবেই জঙ্গিরা আরও অস্ত্র কেনে এবং তাদের তৎপরতা চালিয়ে যেতে থাকে। কয়েক মাস পর পাকিস্তানে প্রথমবারের মতো ড্রোন হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র।

২০০৪ সালের ১৭ জুন, দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে দলবল সঙ্গে নিয়ে নেক মোহাম্মাদ টেলিফোনে সাক্ষাৎকার দিচ্ছিলেন। এমন সময় চালক বিহীন একটি মার্কিন ড্রোন তার ওপর হেলফায়ার সিমাইল ছুড়ে মারে। ঘটনাস্থলেই নেক মোহাম্মদ ও তার আশপাশে থাকা সবাই মারা পড়েন। ঘটনাটা কীভাবে ঘটতে পারে সে ব্যাপারে স্থানীয় লোকজনের কোনো ধারণাই ছিল না আমেরিকানরা যে এমন কিছু করতে পারে তা এ ঘটনার আগে আমরা জানতাম না।

নেক মোহাম্মাদ সম্পর্কে আপনার যে ধারণাই থাকুক না কেন, বাস্তবতা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ চলছিল না এবং আকাশপথে আমাদের মাটিতে তাদের হামলা চালানো আমাদের সাংঘাতিকভাবে মর্মাহত করে। এ ঘটনার পর সমস্ত আদিবাসী এলাকার মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং অনেকে জঙ্গি গ্রুপে যোগ দেয় অথবা নিজেরাই 'লস্কর' নামে স্থানীয় মিলিশিয়া বাহিনী গড়ে তোলে।

এরপর আরও হামলা চলতে থাকে। আমেরিকানরা বললো, বিন লাদেনের ডেপুটি আইমন আল জাওয়াহিরি তাঁর এক স্ত্রীকে নিয়ে বাজাউর এলাকায় আত্মগোপন করে আছেন। ২০০৬ সালের জানুয়ারি মাসে ডামাডোলা নামের এক গ্রামে জাওয়াহিরির কথিত অবস্থান লক্ষ্য করে ড্রোন হামলা চালানো হয়।

www.pathagar.com

এতে তিনটি বাড়ি পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয় এবং ১৮ জন লোক মারা যায়। আমেরিকানদের পক্ষ থেকে বলা হয়, হামলার অল্প কিছুক্ষণ আগেই জাওয়াহিরি সেখান থেকে সটকে পড়েন। ওই বছরের ৩০ অক্টোবর খার শহরে পাহাড়ের ওপরে প্রতিষ্ঠিত একটা মাদ্রাসায় আরেকটি মার্কিন ড্রোন থেকে বোমা ফেলা হয়। এতে ৮২ জন মারা যায় যাদের অনেকেই ছিল শিশু কিশোর। হামলার পর আমেরিকানদের পক্ষ থেকে বলা হয়, ওই মাদ্রাসা জঙ্গি প্রশিক্ষণ শিবির হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এখান থেকে জঙ্গি গ্রুপগুলো তাদের ভিডিও চিত্র ধারণ করতো এবং পাহাড়ের নিচ দিয়ে অসংখ্য সুড়ঙ্গ কেটে তাঁরা সেখানে অস্ত্র মোতায়েন করেছিল। এই হামলার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ওই মাদ্রাসার মোহতামিম যিনি স্থানীয়ভাবে অত্যন্ত প্রভাবশালী ধর্মীয় নেতা ছিলেন, তিনি ঘোষণা দিলেন মাদ্রাসা ছাত্রদের ওপর চালানো এই হত্যাযজ্ঞের প্রতিশোধ নেওয়া হবে। অচিরেই পাকিস্তানি সেনাদের ওপর আত্মঘাতী হামলা চালিয়ে এর বদলা নেওয়া হবে।

আমার আব্বা এবং তাঁর বন্ধুরা খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা স্থানীয় মুরুব্বীদের শান্তি আলোচনার জন্য ডাকলেন। জানুয়ারির প্রচণ্ড ঠাণ্ডার রাতেও প্রায় দেড়শ লোক শান্তি বৈঠকে মিলিত হয়।

আব্বা ওই বৈঠকে সবাইকে হুশিয়ার করে দিয়ে বলেন, 'ওটা আমাদের দিকে আসছে। আগুন এই উপত্যকার দিকে ধেয়ে আসছে। ওই আগুন এখানে পৌঁছানোর আগেই আমাদের এখানে জ্বলতে থাকা জঙ্গিবাদের শিখা নিভিয়ে ফেলতে হবে।' আব্বার কথায় কেউ গুরুত্ব দিলো না। সামনের সারিতে বসা একজন স্থানীয় রাজনীতিকসহ অনেকে হেসেও ফেললেন।

আব্বা ওই নেতাকে বললেন, 'খান সাহেব, আফগানিস্তানের লোকজনের কী দশা হয়েছে তা আপনি জানেন। সেখানকার মানুষগুলো এখন দেশ ছেড়ে আমাদের এখানে এসে উদ্বাস্তুর জীবন যাপন করছে। এখন ঠিক একই ঘটনা ঘটছে বাজউরে। আর কয়দিন পর, একই অবস্থায় পড়তে হবে আমাদেরও। আমার কথা মনে রাখুন। আমাদের এখানে এমনটা হলে আমরা কিন্তু পালানোর জন্য কোন আশ্রয় ও খুঁজে পাবো না।'

কিন্তু আব্বার কথায় লোকটির মুখের অভিব্যক্তিতে স্পষ্ট বিদ্রূপ ফুটে উঠলো। মনে হচ্ছিল তিনি বলতে চাইছিলেন, 'আমি একজন খান। এই এলাকা থেকে আমাকে তাড়াবে এমন বুকের পাটা কার আছে?'

সভা থেকে খুব মন খারাপ করে আব্বা বাসায় ফিরলেন। হতাশ হয়ে বললেন, 'আমার একটা স্কুল আছে, কিন্তু আমি না একজন খান, না একজন রাজনৈতিক নেতা। আমার কোনো প্লাটফর্ম নেই। আমি অতি নগণ্য মানুষ।'

www.pathagar.com

৮

শরৎকালের ভূমিকম্প

আমি তখন প্রাইমারি স্কুলে পড়ি। অক্টোবরের এক সুন্দর সকালে আমরা ক্লাসে বসে আছি। হঠাৎ আমাদের পড়ার টেবিল দুলতে এবং ঝাকুনি খেতে লাগলো। নানা বয়সী ছেলে-মেয়ে ক্লাসে বসতাম। ঝাকুনি শুরু হওয়ায় আমরা সবাই কেঁপে উঠলাম। 'ভূমিকম্প! বলে চিৎকার করতে করতে সবাই বাইরে বেরিয়ে এলাম। ভয় পেয়ে মুরগির বাচ্চারা যেভাবে তাদের মায়ের চারপাশে গুটিসুটি মেরে থাকে সেখানে আমরা আমাদের শিক্ষকদের কাছে জড়ো হয়ে দাঁড়ালাম।

ভূ-তাত্ত্বিক ফল্ট লাইনের ওপর সোয়াতের অবস্থান বলে আমাদের এখানে প্রায়ই ভূমিকম্প হতো; তবে এবারের অনুভূতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। আমাদের চারপাশের বিল্ডিংগুলো মনে হচ্ছিল ভয়ানকভাবে কাঁপছে, দুলুনি যেন থামছেই না। আমাদের বেশিরভাগ ছাত্র-ছাত্রী ভয়ে কাঁদছিলাম এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা দোয়া-দুরুদ পড়ছিলেন। আমার অতিপ্রিয় শিক্ষিকা মিস রুবি আমাদের সবাইকে কান্না থামিয়ে শান্ত হতে বললেন এবং শিগগিরই সব ঠিক হয়ে যাবে বলে সান্ত্বনা দিলেন।

ভবনের দুলুনি থামলে আমাদের সবাইকে বাসায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো। বাসায় ফিরে দেখি আম্মা একটা চেয়ারে বসে। হাতে কোরান শরীফ। অবিরাম দোয়া পড়ছেন। যখনই মানুষ বড় কোনো বিপদে পড়ে তখনই অনেক এবাদত বন্দেগি করে। আম্মা আমাদের দেখে স্বস্তিবোধ করলেন এবং দুহাতে আমি আর আমার ছোট দুইভাইকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর চোখ বেয়ে তখন পানি পড়ছিল। কিন্তু ভূমিকম্প পরবর্তী মৃদু কম্পন পুরো বিকেল জুড়েই ছিল এবং আমরা প্রচণ্ড আতঙ্কে ছিলাম।

আতঙ্কে আবার আমরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। এভাবে আমরা মোট সাতবার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলাম। আমরা একটা দোতলা বিল্ডিংয়ে থাকতাম। বিল্ডিংয়ের ওপর বিরাট একটা পানির ট্যাংক ছিল। আম্মার ভয় হচ্ছিল ছাদটা যে কোনো সময় আমাদের মাথার ওপর ভেঙে পড়বে। এ কারণে আমরা বারবার ঘর ছেড়ে বাইরে চলে আসছিলাম। আব্বা তার অন্যান্য স্কুল ভবনগুলো ঠিক আছে কিনা তা ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন। এ কারণে বিকেল গড়িয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি বাসায় ফিরতে পারলেন না।

www.pathagar.com

রাত নামলো। তখন মৃদু কম্পন অনুভূত হচ্ছিল। আম্মা আতঙ্কে শিউরে উঠেছিলেন। যখনই কম্পন হচ্ছিল তখনই আমাদের মনে হচ্ছিল এই বুঝি রোজ কেয়ামত শুরু হয়ে গেল। আম্মা কেঁদে উঠে বলছিলেন, 'খাটের ওপরই বুঝি আমাদের কবর হয়ে যাবে গো!' আম্মা বারবার ঘর ছেড়ে বাইরে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করছিলেন। কিন্তু আব্বা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং আমরা মুসলমানেরা বিশ্বাস করি আল্লাহ মানুষের নসিব আগেই লিখে রেখেছেন। এ কারণে আব্বা আমাকে, খুশালকে এবং একেবারে শিশু অবস্থায় থাকা ছোটভাই অটলকে খাটের ওপর শুইয়ে দিলেন।

আব্বা আমাদের চাচাতো বোন এবং আম্মাকে বললেন, 'তোমরা যেখানে খুশি যেতে পারো। আমি এখানেই থাকবো। আর যদি আল্লাহকে বিশ্বাস করো তাহলে এখানেই থাকো।' আমার মনে হয় যখন আমরা কোনো দুর্যোগের মুখে পড়ি অথবা আমাদের জীবন বিপন্ন হয়ে ওঠে তখন আমাদের নিজেদের গুনাহের কথা মনে হয় এবং আমরা চিন্তা করতে থাকি কীভাবে আল্লহর সাথে দেখা হবে, হাশরের ময়দানে নাজাত পাবো কি না এইসব ভাবতে থাকি। কিন্তু আল্লাহপাক আমাদের দ্রুত ভুলে যাওয়ারও ক্ষমতা দিয়েছেন। হয়তো সে কারণেই বিপদ কেটে যাওয়ার পর আমরা আবার স্বাভাবিক ও সহজাত চিন্তায় ফিরে আসি। আব্বার বিশ্বাসের ওপর আমার যেমন আস্থা ছিল তেমনি আম্মার বাস্তব উদ্বেগও আমাকে নাড়া দিচ্ছিল।

২০০৫ সালের ৮ অক্টোবরের ওই ভূমিকম্প ইতিহাসের ভয়ালতম ভূমিকম্পে রূপ নেয়। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৭.৬। কাবুল ও দিল্লির মতো দূরবর্তী স্থানেও এর কম্পন অনুভূত হয়েছিল। এই বিপর্যয় থেকে আমাদের মিঙ্গোরা শহর বেঁচে গিয়েছিল। এখানে অল্প কয়েকটা ভবন ধ্বসে গিয়েছিল। কিন্তু পার্শ্ববর্তী কাশ্মির এবং পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলীয় এলাকায় ভূমিকম্প ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল। এমনকি ইসলামাবাদেও বহু ভবন ভেঙে পড়েছিল।

ভূমিকম্পটি যে কত ভয়ানক ছোবল হেনেছিল তা বুঝতে আমাদের কিছুটা সময় লেগেছিল। টেলিভিশনের খবরে যখন ধ্বংস স্তূপের ছবি দেখানো শুরু হলো তখন বুঝতে পারলাম, কীভাবে গ্রামের পর গ্রাম ধুলোয় মিশে গেছে। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে ভূমিধ্বসের কারণে যাতায়াত ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায় বিদ্যুত ও টেলিফোনের লাইন ছিড়ে যায়। ভূমিকম্পের প্রায় ৩০ হাজার বর্গকিলোমিটার বা যুক্তরাষ্ট্রের কানেটিকাট অঙ্গরাজ্যের সমান বিস্তীর্ণ এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। হতাহতের সংখ্যা ছিল অবিশ্বাস্য। ৭৩ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়। আহত হয় ১ লাখ ২৮ হাজার। তাদের অনেকেই চিরকালের জন্য পঙ্গু হয়ে যায়। প্রায় সাড়ে ৩ লাখ লোক গৃহহীন হয়ে পড়ে। রাস্তাঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট, নষ্ট হয়ে যায়। বিদ্যুৎ-পানির চরম সংকট দেখা দেয়। বালাকোটের মতো কিছু জায়গায় পরিদর্শন করে দেখেছি সেখানকার সব কিছু ধ্বংস হয়ে গেছে। আমার মতো বহু শিশু সেদিন স্কুলে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে। সেদিনের ভূমিকম্পে সব মিলিয়ে ৬,৪০০ স্কুল গুড়িয়ে যায় এবং ১৮ হাজার শিশু শিক্ষার্থী ভবনের নিচে চাপা পড়ে মারা যায়।

www.pathagar.com

ওই দিন সকালে আমরা কত বড় বাচা বেচে গেছি তা মাথায় রেখেই দুর্গতদের জন্য স্কুলে অর্থ সংগ্রহ শুরু করলাম। প্রত্যেকে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সহায়তা নিয়ে এলো। আব্বা যাদের চিনতেন তাদের প্রত্যেকের কাছে খাবার, কাপড় ও নগদ অর্থ-সহায়তা চাইলেন। আমি কম্বল সংগ্রহের ব্যাপারে আম্মাকে সাহায্য করতে লাগলাম। আব্বা সোয়াত অ্যাসোসিয়েশন অব প্রাইভেট স্কুলস এবং গ্লোবাল পিস কাউন্সেল থেকেও তহবিল সংগ্রহ করে স্কুলের তোলা ত্রাণ তহবিলের সঙ্গে তা যোগ করলেন। সব মিলিয়ে দশ লক্ষাধিক রুপির তহবিল হলো।

লাহোরের একটি প্রকাশনা কোম্পানী আমাদের স্কুলের পাঠ্যবই ছাপতো। তারা পাঁচ ট্রাক খাবার ও অন্যান্য সামগ্রী পাঠালো।

দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ এলাকায় অবস্থিত শাংলা গ্রামে আমাদের পরিবারের লোকজনের ব্যাপারে চরম উৎকণ্ঠায় ছিলাম। শেষ পর্যন্ত এক চাচাতো ভাইয়ের কাছ থেকে তাদের খবর পাই। আব্বার ছোট্ট গ্রামে আটজন নিহত হয়েছিল। বহু বাড়িঘর ভেঙে পড়েছিল। এগুলোর মধ্যে একটি ছিল স্থানীয় মাওলানা খাদিমের। তার বাড়ি ধ্বসে তাঁর ফুটফুটে চারটি মেয়ে মারা যায়। ত্রাণবাহী ট্রাকে করে আমি আব্বার সঙ্গে সেখানে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আব্বা বললেন, এটা খুব বিপজ্জনক কাজ হবে।

কয়েকদিন পর যখন আব্বা ফিরলেন তখন তার চেহারা একেবারে পাংশুবর্ণ ধারণ করেছিল। তিনি বললেন, তাদের ত্রাণযাত্রার শেষ অংশ ছিল খুবই কঠিন। বেশিরভাগ রাস্তা ধ্বসে নদীতে পড়েছে। কোথাও কোথাও বিশাল বিশাল খাম্বা পড়ে রাস্তা বন্ধ হয়ে আছে। আমাদের আত্মীয় স্বজনেরা বলেছেন, তাদের মনে হয়েছিল এটাই পৃথিবীর শেষ দিন। তারা বলেছেন, পাহাড় থেকে বিশাল বিশাল পাথরের চাঁই গর্জন করতে করতে জনবসতির দিকে ছুটে আসছিল। সবাই কোরানের আয়াত পড়তে পড়তে দিগ্বিদিক হয়ে ঘর থেকে ছুটে আসছিল। তারা বর্ণনা করছিলেন, কীভাবে মড়মড় করে ভেঙে পড়া ছাদের তলে পড়ে ছাগল-মহিষ কীভাবে মর্মন্তুদ চিৎকার করছিল। ভূমিকম্প পরবর্তী কম্পন অনুভূত হতে থাকায়-তারা সারাদিন খোলা আকাশের নিচে ছিল। পাহাড়ি এলাকায় প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়া সত্ত্বেও তারা রাতে একের সঙ্গে অন্যে জড়াজড়ি করে সেখানেই বসেছিল।

বিদেশি সহায়তা এজেন্সির স্থানীয় কয়েকজন উদ্ধারকর্মী তেহরিক-ই-নিফাজ-ই-মোহাম্মদী (টিএনএসএম) বা ইসলামী আইন বাস্তবায়ন আন্দোলন নামের একটি গ্রুপের স্বেচ্ছাসেবীরা সীমিত পরিসরে উদ্ধারকাজ শুরু করে। সুফি মোহাম্মদ নামের একজন ধর্মীয় নেতা টিএনএসএম নামের গ্রুপটি গড়ে তোলেন। গ্রুপের স্বেচ্ছাসেবকদের তিনি আফগানিস্তানে যুদ্ধ করতে পাঠিয়েছিলেন। আমেরিকার চাপে পড়ে মোশাররফ ২০০২ সালে যে কয়জন জঙ্গি নেতাকে গ্রেপ্তার করেছিলেন সুফি মোহাম্মদ ছিলেন তাদের একজন। তিনি জেলে থাকলেও তার জামাতা মাওলানা ফজলুল্লাহর নেতৃত্বে সংগঠনের কার্যক্রম চালু ছিল। শাংলার মতো দুর্গম গ্রামে সরকারি কর্তৃপক্ষের পক্ষে পৌঁছানো খুবই দুরূহ ছিল, কারণ

www.pathagar.com

সেখানে যাওয়ার পথের বেশিরভাগ রাস্তা ও সেতু ভেঙে পড়েছিল এবং পুরো এলাকায় স্থানীয় সরকারও কার্যক্রম অনেক আগেই গুটিয়ে নিয়েছিল। আমরা জাতিসংঘের একজন কর্মকর্তাকে টেলিভিশনে বলতে শুনলাম, 'এযাবতকালের সবচেয়ে খারাপ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক দুঃস্বপ্ন জাতিসংঘকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে।'

জেনারেল মোশাররফ এই দুর্যোগকে জাতির 'এক কঠিন পরীক্ষা' বলে অভিহিত করলেন এবং ঘোষণা করলেন সেনাবাহিনী 'অপারেশন লাইফলাইন' নামের একটি অভিযান প্রস্তুত করেছে। খবরে খাবার ও তাঁবু বোঝাই করা বহু হেলিকপ্টারের ছবি দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু ছোট ছোট অনেক উপত্যকায় হেলিকপ্টারগুলো ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে নামতে পারছিল না। বাধ্য হয়ে তারা ত্রাণের বস্তা ওপর থেকে ফেলছিল এবং সেগুলো গড়িয়ে নদীতে পড়ে যাচ্ছিল। কোথাও কোথাও হেলিকপ্টার যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে পালে পালে লোক জড়ো হচ্ছিল; এতে সেনাবাহিনী ত্রাণসামগ্রী ঠিকমতো নামাতে পারছিল না।

তবে কিছু সাহায্য শেষ পর্যন্ত পৌঁছেছিল। যুক্তরাষ্ট্রের হাজার হাজার সেনা ও শত শত হেলিকপ্টার আফগানিস্তানে থাকায় তারা দ্রুত সেখানে পৌঁছতে পেরেছিল। বিপদের সময় তারা যে আমাদের সাহায্য করে তা প্রমাণের সেটা একটা বড় সুযোগ ছিল। তবে সম্ভাব্য হামলার আশংকায় তাঁদের হেলিকপ্টারকে কাভার দিতে অন্য সেনারা নিচে প্রস্তুত ছিল। প্রত্যন্ত এলাকায় বহু লোক এই সুবাদে জীবনে প্রথমবারের মতো বিদেশিদের সামনাসামনি দেখার সুযোগ পায়।

উদ্ধার ও ত্রাণকাজে যত স্বেচ্ছাসেবক কাজ করেছিল তার বেশিরভাগ এসেছিল বিভিন্ন ইসলামী দাতব্য সংস্থা কিংবা সংগঠন থেকে। তবে তাদের মধ্যে কিছু লোক ছিল সরাসরি জঙ্গি গ্রুপ থেকে আসা। যাদের কার্যক্রম সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান ছিল তারা হলো জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈয়বার (এলইটি) সমাজকল্যাণমূলক শাখা জামাতুল দাওয়া (জেইউডি)। এলইটির সঙ্গে আইএসআই'র বরাবরই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। কাশ্মিরকে ভারত থেকে মুক্ত করার জন্য এলইটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। আমরা পাকিস্তানিরা মনে করি, কাশ্মিরের বেশিরভাগ লোক যেহেতু মুসলমান; যেহেতু দেশভাগের শর্ত মোতাবেক কাশ্মির পাকিস্তানের অংশ; ভারতের অংশ নয়। হাফিজ সাঈদ নামে লাহোরের একজন দোর্দণ্ড প্রতাপশালী অধ্যাপক এলইটির নেতাকে প্রায়ই টেলিভিশনে বক্তৃতা দিতে দেখা যায়। ওই বক্তৃতায় তিনি জনগণকে ভারতে হামলা চালানোর আহ্বান জানিয়ে থাকেন। ভূমিকম্পের পর যখন দেখা গেল সরকার খুবই কম ভূমিকা পালন করতে পারছে; তখন জেইউডি ত্রাণ শিবির গড়ে তোলে। শিবিরগুলো চৌকি দেওয়ার জন্য কালাশনিকোভ রাইফেল ও ওয়াকিটকি হাতে সেখানে জেইউডির কর্মীদের দেখা যায়। প্রত্যেকেই জানতো এরা এলইটির সদস্য এবং শিগগিরই আড়াআড়ি ভাবে রাখা তলোয়ারের ছবি সম্বলিত তাদের সাদাকালো পতাকা স্থানীয় বিভিন্ন পাহাড়ে পতপত করে উড়তে দেখা গেল।

আজাদ কাশ্মিরের মুজাফ্ফরাবাদে শহরে জেইউডি বিশাল একটা হাসপাতাল পর্যন্ত গড়ে তুলেছে যেখানে এক্স-রে মেশিন, অপারেশন থিয়েটার, যথেষ্ট ওষুধ

www.pathagar.com

বোঝাই ফার্মেসি ও দন্ত্য বিভাগ রয়েছে। হাজার হাজার তরুণ স্বেচ্ছাসেবকদের পাশাপাশি ডাক্তার ও সার্জনেরা জেইউডির হয়ে কাজ করেন।

ভূমিকম্প দুর্গতরা জেইউডির স্বেচ্ছাসেবকদের এই ত্যাগ তিতিক্ষার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছিল। এই স্বেচ্ছাসেবক তরুণেরা দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে পাহাড়ের ওপর উঠে কিংবা পাহাড় থেকে ঢালু এলাকায় নেমে জরুরি চিকিৎসা সেবা দিয়েছে এবং এসব কাজে তারা কখনো বিরক্ত হয়নি। তারা ধ্বংসস্তূপ সরানো এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রামগুলো পূর্ণগঠনে সাহায্য করা থেকে শুরু করে নামাজে ইমামতি করা ও লাশ দাফন–সব কাজে সর্বাত্মক সহায়তা করেছিল। এমনকি আজও যখন প্রায় সব বিদেশি দাতা সংস্থাগুলো তাদের কার্যক্রম গুটিয়ে চলে গেছে; রাস্তার পাশে এখনও ভেঙে যাওয়া বাড়িঘর পড়ে আছে এবং সরকারের নতুন বাড়ি করে দেবে বলে প্রতীক্ষায় বসে আছে, তখন জেইউডির ব্যানার এবং সহায়তাকর্মী সেখানে নিয়োজিত আছে। যুক্তরাজ্যে আমার এক ভাই পড়াশুনা করেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন সেখানে যেসব পাকিস্তানি বাস করেন তাদের কাছ থেকে তিনি বহু অর্থ ভূমিকম্প দুর্গতদের সহায়তা হিসেবে তুলেছিলেন। পরে লোকজনকে বলতে শুনেছি ত্রাণ তহবিলের একটা অংশ নাকি ব্রিটেন থেকে যুক্তরাষ্ট্রগামী প্লেনে বোমা হামলা চালানোর পরিকল্পনায় ব্যবহার করা হয়।

এই বিশাল সংখ্যক লোক নিহত হওয়ায় বহু শিশু এতিম হয়ে পড়ে–তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১১ হাজার। আমাদের সমাজে এতিম শিশুদের বর্ধিত পরিবারেই মানুষ করা হয়। কিন্তু ভূমিকম্পটা এতই ভয়ানক ছিল যে কোনো কোনো পরিবারের প্রায় সবাই মারা গিয়েছিল, সবকিছু হারিয়ে কোনো কোনো পরিবার পথে বসে গিয়েছিল। ফলে তাদের পক্ষে এতিম শিশুদের লালন পালনের ভার নেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, এইসব এতিমদের সবাইকে সরকারি তত্ত্বাবধানে লালন পালন করা হবে। কিন্তু সরকারের প্রায় সব প্রতিশ্রুতির মতো এটাও বাকসর্বস্ব বলে সবাই ধরে নিল। আব্বা শুনেছেন, এই সব এতিমদের অনেকে জেইউডি তুলে নিয়ে তাদের মাদ্রাসায় আশ্রয় দিয়েছে। পাকিস্তানে মাদ্রাসাকে সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখা হয়; কারণ বাচ্চাদের জন্য বিনা পয়সায় থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। তবে সেখানকার পাঠদানের সাধারণ পাঠ্যক্রম মানা হয় না। সেখানে বাচ্চারা সামনে পেছনে মাথা দুলিয়ে কোরান হেফজ করে। তাদের সেখানে শেখানো হয় বিজ্ঞান ও সাহিত্য বলে কিছু নেই, কোনো কালেই ডাইনোসর বলে কিছু ছিল না এবং মানুষ কখনো চাঁদে যায়নি।

যাহোক, ভূমিকম্পের দীর্ঘদিন পর পর্যন্ত পুরো জাতি শোকে স্তব্ধ হয়েগিয়েছিল। টিএনএসএম এর কর্মীরা বয়ানে বলছিলেন, ভূমিকম্প হলো আল্লাহর দেওয়া হুঁশিয়ারি। আমরা যদি আমাদের চালচলন না পাল্টাই এবং শরীয়া কায়েম না করি তাহলে এর চেয়ে অনেক বড় গজব আমাদের ওপর নাজিল হবে।

www.pathagar.com

অধ্যায় দুই

মৃত্যু উপত্যকা

[illegible]

রাবাব মাঙ্গিয়া ওয়াক্ত দে তির শো
দা কলিখাওয়া তা তালেবান রাঘালি দেনা

'সঙ্গীত, তোমাকে বিদায়! মধুরতম হলেও তোমার সুরেরা এখন স্তব্ধ
গাঁয়ের প্রান্তে থাকা তালেবান তাবৎ সুরেলা চঞ্চু দিয়েছে চুপসে'।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

৯

রেডিও মোল্লা

আমাদের উপত্যকায় যখন তালেবান আসে তখন আমার বয়স দশ বছর। মনিবা আর আমি তখন টুইলিটের বই পড়তাম এবং রক্ত চোষা ভ্যাম্পায়ার হতে চাইতাম। তখন আমাদের মনে হতো ভ্যাম্পায়ারদের মতোই তালেবান আমাদের এখানে রাতের আঁধারে এসে হানা দিয়েছে। কালাশনিকোভ রাইফেল আর ছোরা হাতে দল বেধে আসলো। সোয়াতের উঁচু এলাকায়, অর্থাৎ মাত্তার পাহাড়ি এলাকায় সর্বপ্রথম তারা উদয় হয়। প্রথম দিকে তারা নিজেদের তালেবান বলে পরিচয় দিতো না এবং ছবিতে পাগড়ি পরা কালো বৃত্তাকৃত্তির চোখ ওয়ালা যে আফগান তালেবান আমরা দেখেছি তাদের সঙ্গে এদের চেহারার মিল ছিল না।

লম্বা বাবরি চুল ও দাড়িওয়ালা অদ্ভুত দেখতে এই লোকগুলো পা পর্যন্ত লম্বা জোব্বা পরতো। পায়ে থাকতো জগিং সু কিংবা সস্তা প্লাস্টিকের স্যান্ডেল। মাঝে মাঝে পাগড়ির প্রান্ত দিয়ে নোংরা ভঙ্গিমায় নাক ঝাড়তো। তারা এক ধরনের কালো ব্যাজ পরতো। তাতে লেখা থাকতো, 'শরীয়া ইয় শাহাদাত' অর্থাৎ 'হয় শরীয়া আইন অথবা শাহাদাত'। মাঝে মাঝে তাদের কালো পাগড়ি পরা অবস্থায় দেখা যেতো। এ কারণে লোকে তাদের 'তোর পাতকি' বা কালো পাগড়ি বাহিনী' বলতো। ওদের দেখতে এত কালো ও নোংরা লাগতো যে আব্বার এক বন্ধু তাদের 'গোসল আর নাপিত বঞ্চিত' লোক বলে অভিহিত করেছিলেন।

এই তালেবান জঙ্গিদের নেতা ছিলেন মাওলানা ফজলুল্লাহ। ২৮ বছর বয়সী ফজলুল্লাহ সোয়াতনদী পার হতে টানা চেয়ার ব্যবহার করতেন। ছোট বেলায় পোলিও আক্রান্ত হওয়ার কারণে ডান পা খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাঁটতেন। টিএনএসএম এর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা সুফি মোহাম্মাদের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় তিনি পড়াশুনা করেছিলেন এবং পরে সুফি মোহাম্মাদের মেয়েকে তিনি বিয়ে করেন। ২০০২ সালে জঙ্গি নেতাদের ধরপাকড় করার অভিযান চলাকালে সুফি মোহাম্মদ ধরা পড়েন এবং ফজলুল্লাহ তাদের আন্দোলনের প্রধান নেতৃত্বে চলে আসেন। ভূমিকম্পের অল্প কিছুদিন আগে মিঙ্গোরা শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে সোয়াত নদীর উল্টো পাশে অবস্থিত ইমাম ডেরি গ্রামে ফজলুল্লাহ প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। যেখানে তিনি তাঁর অবৈধ রেডিও স্টেশন গড়ে তোলেন।

www.pathagar.com

আমাদের উপত্যকায় আমরা বেশিরভাগ তথ্য পেতাম রেডিও থেকে কারণ তখনও টেলিভিশন এত সহজলভ্য হয়ে ওঠেনি এবং স্থানীয় বেশিরভাগ লোকই অক্ষরজ্ঞানহীন। শিগগিরই ফজলুল্লাহর এই রেডিও স্টেশনটি সবার আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। রেডিওটি দ্রুতই সবার কাছে 'মোল্লা এফএম' হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠে এবং ফজলুল্লাহকে সবাই 'রেডিও মোল্লা' বলতে থাকে। প্রতিদিন রাত আটটা থেকে দশটা এবং সকাল সাতটা থেকে সকাল ৯টা পর্যন্ত এই রেডিও থেকে সম্প্রচার চালানো হতো।

শুরুর দিকে ফজলুল্লাহ খুবই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি নিজেকে প্রথমদিকে একজন ইসলামী সংস্কারক এবং মুফাচ্ছিরে কোরান বা কোরান তাফসীরাপরী হিসেবে পরিচয় দিতেন। আম্মার আম্মা খুবই ধর্মভীরু স্বভাবের মহিলা এবং তিনি ফজলুল্লাহর কথাবার্তা পছন্দ করতে শুরু করেন। তিনি রেডিও বক্তৃতার সৎ কাজে উৎসাহিত করা এবং তাঁর ভাষায় যেগুলো অসৎ বা খারাপ কাজ তা পরিত্যাগ করার আহ্বান জানাতেন। তিনি বলতেন, পুরুষদের দাড়ি রাখা উচিত। সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দেওয়া উচিত। তামাক ধূমায়িত না করে চাইলে চিবিয়ে (পানের সঙ্গে) খাওয়া যেতে পারে। তিনি বলতেন, মানুষকে হেরোইন ও চরস বা হাশিল ছাড়তে হবে। তিনি ওজু করার সঠিক পদ্ধতি বর্ণনা করতেন। দেহের কোন কোন অংশ ওজুর সময় ধুতে হবে তা শ্রোতাদের ভালো করে বোঝাতেন। এমনকি কীভাবে গোপনাঙ্গ পরিষ্কার করতে হয় তাও তিনি শেখাতেন।

মাঝে মাঝে ফজলুল্লাহর খুব যৌক্তিকভাবে তার বয়ান উপস্থাপন করতেন। ছোটরা যখন কোনো কাজ করতে রাজি হয় না, তখন তাদের তা করতে রাজি করানোর জন্য বড়রা যেমন গলা নরম করে, আদর করে অনুরোধ করে; এতে কাজ না হলে ধমক দিয়ে ভয় দেখায়, ঠিক একই কায়দায় ফজলুল্লাহ বয়ান করতেন। ইসলামের প্রতি তাঁর দরদ প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি ঝরঝর করে কেঁদে ফেলতেন। তিনি অল্প সময় বয়ান করতেন। তাঁর বক্তব্য শেষ হলে তাঁর ডেপুটি শাহ দুরান বয়ান শুরু করতেন। শাহ দুরান বাজারে একটা তিন চাকার ভ্যান গাড়িতে করে রুটি-বিস্কুট বেচতেন। ফজলুল্লাহ এবং শাহ দুরান দুজনই মানুষকে গান-বাজনা শোনা, নাটক সিনেমা দেখা এবং নাচা থেকে বিরত থাকার জন্য নসিহত করতেন। ফজলুল্লাহ হুঙ্কার দিয়ে বলতেন, এইসব বে শরিয়তী কাজের জন্যই ভূমিকম্প হয়েছে এবং এসব যদি বন্ধ না হয় তাহলে এর চেয়ে ভয়াবহ আল্লাহর গজব নেমে আসবে। আমাদের দেশের সাধারণ মুসলমানেরা মূল আরবী বোঝে না। সে কারণে মাওলানারা প্রায়ই কোরান-হাদীসের অপব্যাখ্যা করেন। ফজলুল্লাহ সাধারণ মানুষের এই অজ্ঞতার সুযোগ নিচ্ছিলেন।

আমি আব্বাকে বলি, 'হুজুর যা বললেন তা কি ঠিক আব্বা?' আমার সামনে ভূমিকম্পের ভয়াবহতা ভেসে ওঠে।

আব্বা বলেন, 'না জানি, সে সবাইকে ধোকা দিচ্ছে।'

www.pathagar.com

আব্বা বলতেন, রেডিও স্টেশনটা টক অব দ্য স্টাফরুম হয়ে দাড়িয়েছিল। তখন আমাদের স্কুলে মোট ৭০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং প্রায় ৪০ জন পুরুষ ও ৩০ জন মহিলা কর্মচারি ছিলেন। কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষিকা ফজলুল্লাহ বিরোধী ছিলেন। তবে বেশিরভাগই তাঁকে সমর্থন করতেন। সাধারণ মানুষ তাঁকে কোরানের একজন চৌকস তাফসীরকারক মনে করতেন এবং তাঁর বয়ানের মহিমার প্রশংসা করতেন। ফজলুল্লাহ শরিয়ার শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার যে প্রত্যয় ব্যক্ত করতেন তা তাঁরা পছন্দ করতেন কারণ পাকিস্তানের মূল ধারায় আমাদের জুড়ে দেওয়ার পর এখানে যে বিচার ব্যবস্থা চালু হয়েছে তাতে তারা তিতিবিরক্ত হয়ে পড়েছিলেন। জমাজমি নিয়ে বিবাদ এখানকার খুব সাধারণ ঘটনা। আগে দ্রুতই এসব বিবাদের মিমাংসা হয়ে যেতো। কিন্তু আমাদের এখানে পাকিস্তানের বিচার ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর এসব মামলা নিষ্পত্তিতে দশ বছর লেগে যায়। সবাই এই উপত্যকায় পাঠানো দুর্নীতিবাজ সরকারি কর্মকর্তাদের প্রত্যাহার দেখতে চাইছিল। এটা প্রায় সবারই মনে হচ্ছিল, প্রাচীন রাজতন্ত্রের ধারার এখানে ওয়ালিদের যে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল, ফজলুল্লাহ হয়তো সেরকমই সুশাসন এখানে প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন।

ছয় মাসের মধ্যেই লোকজন তাঁদের ঘর থেকে টিভি, ডিভিডি, সিডি সব সরিয়ে ফেললো। ফজলুল্লাহর লোকজন সেগুলো এক জায়গায় জড়ো করে আগুন ধরিয়ে দিলো। সিডি, ডিভিডি পোড়া কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশে মিলিয়ে গেল। শত শত সিডি-ডিভিডির দোকান মালিক নিজেরাই তাঁদের দোকান বন্ধ করে দিলেন এবং তালেবানের পক্ষ থেকে তাঁদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হলো। আমি এবং আমার ছোট দুইভাই আমাদের টেলিভিশন নিয়ে খুব চিন্তায় পড়ে গেলাম; কিন্তু আব্বা আশ্বস্ত করে বললেন, আমাদের টেলিভিশন ফেলে দেওয়া হবে না। টেলিভিশনটাকে বাঁচাতে সেটাকে আমরা কাপবোর্ডের ভেতর লুকিয়ে ফেললাম। যখন টিভি দেখতাম, তখন ভলিউম একেবারে কমিয়ে রাখতাম। তালেবান সদস্যরা দরজায় কান পেতে প্রথমে টিভি আছে কিনা তা বুঝে নিতো। শব্দ শুনে যদি বুঝতে পারতো ঘরে টিভি আছে, তাহলে তারা জোর করে ঘরে ঢুকতো এবং সেটা বের করে রাস্তায় নিয়ে আছড়ে ভেঙে ফেলতো। আমরা বলিউড মুভি দেখতে ভালোবাসতাম। কিন্তু ফজলুল্লাহ এসব ছবি ঘৃণা করতেন এবং এগুলো দেখা নাজায়েজ বলে অবজ্ঞা করতেন। এই এলাকায় শুধুমাত্র রেডিও শুনতে দেওয়া হতো এবং তালেবানের ধর্মীয় সংগীত ছাড়া সব ধরনের গানবাজনা হারাম হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

একদিন আব্বা তাঁর এক বন্ধুকে দেখতে হাসপাতালে গিয়ে দেখেন অনেক রোগী ফজলুল্লাহর ওয়াজের ক্যাসেট শুনছেন। তাঁরা আব্বাকে বললেন, 'আপনার অবশ্যই মাওলানা ফজলুল্লাহর সঙ্গে দেখা করা উচিত। উনি মস্তবড় আলেম।' আব্বা তাঁদের বললেন, 'সে হাইস্কুল থেকে ঝরে পড়া একজন অর্ধশিক্ষিত লোক। 'ফজলুল্লাহ তাঁর আসল নাম নয়।' কিন্তু লোকজন তাঁর কথা কানে তুললো না। আব্বা ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়ছিলেন, কারণ লোকজন ফজলুল্লাহর

ওয়াজের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ছিল এবং তাঁর ধর্মীয় উন্মাদনাকে আঁকড়ে ধরছিল। আব্বা বলতেন, 'এটা ভয়ানক পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। এইসব কথিত আলেমরা সমাজে অজ্ঞতা ছড়িয়ে দিচ্ছে।'

ভূমিকম্পের পর যেসব এলাকায় সরকারের দেখা পাওয়া যায়নি কিন্তু টিএনএসএম'এর স্বেচ্ছাসেবকেরা রাতদিন লোকজনকে সহায়তা করেছে; যেসব প্রত্যন্ত এলাকায় ফজলুল্লাহ তুমুল জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। কিছু কিছু মসজিদের মাইকে এলাকাবাসী রেডিওর সংযোগ দিয়ে দেয় যাতে গ্রামে ও মাঠে কাজ করতে থাকা সবাই শুনতে পায়। সবচেয়ে জনপ্রিয়তা পেয়েছিল যে অনুষ্ঠান সেটি সক লে প্রচারিত হতো। ওই অনুষ্ঠানে ফজলুল্লাহ বিভিন্ন জনের নাম পড়ে শোনাতেন। তিনি বলতেন, 'অমুক অমুক ভাই চরস খেতেন কিন্তু গুনাহ বলে তিনি তা ছেড়ে দিয়েছেন।' অথবা 'জনাব, অমুক দাড়ি রেখেছেন, আমি তাঁকে অভিবাদন জানাই' অথবা, 'জনাব অমুক তাঁর সিডির দোকান বন্ধ করে দিয়েছেন।' তিনি বলতেন, আখিরাতে অবশ্যই তাঁরা এর প্রতিদান পাবে। লোকজন রেডিওতে নাম প্রচারিত হওয়ার বিষয়টি পছন্দ করতো। এই সঙ্গে তাদের কোনো প্রতিবেশী পাপ কাজে লিপ্ত তাদেরও নাম শুনতে তাদের ভালো লাগতো। রেডিওতে প্রতিবেশীর তথ্য জেনে একজন আরেকজনকে বলতেন, 'শুনেছেন অমুকের ব্যাপারে কি বলেছে?' এই নিয়ে তাদের মধ্যে গল্পগুজব শুরু হয়ে যেতো।

সেনাবাহিনী নিয়েও মোল্লা এফএম ঠাট্টা মশকরা করতো। ফজলুল্লাহ পাকিস্তান সরকারের কর্মকর্তাদের 'কাফের' আখ্যায়িত করে তাদের তীব্র সমালোচনা করতেন এবং বলতেন সরকার শরীয়া আইন বাস্তবায়নের ঘোরবিরোধী। তিনি বলতেন, সরকার যদি শরিয়া আইন বাস্তবায়ন না করে তাহলে তাঁর লোকজন এটা 'বাস্তবায়িত করবে এবং তাদের (সরকারি কর্মকর্তাদের) ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলা হবে।' ফজলুল্লাহ যেসব বিষয় নিয়ে কথা বলতে ভালোবাসতেন তার মধ্যে অন্যতম হলো, খানদের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যায় অবিচার। খানরা তাদের অন্যায় অবিচারের সাজা পাচ্ছে গরীব লোকদের এটা দেখে স্বাভাবিকভাবেই ভালো লাগতো। তারা ফজলুল্লাহকে রবিন হুডের মতো একজন গরীব দরদী মনে করতো। তাদের আশা ছিল ফজলুল্লাহ যখন প্রশাসনিক ক্ষমতা নেবেন তখন খানদের অঢেল সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে তাদের মধ্যে বিলিয়ে দেবেন। ফজলুল্লাহর ভয়ে কয়েকজন খান এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যান। আমার আব্বা 'খানবাদ' পছন্দ করতেন না কিন্তু তিনি বলতেন, খানদের চাইতে তালেবান অনেক বেশি খারাপ।

পেশোয়ারে হেদায়েতুল্লাহ নামে আব্বার এক সরকারি কর্মকর্তা বন্ধু ছিলেন। তিনি আমাদের সতর্ক করে বলেছিলেন, 'জঙ্গিরা এভাবেই কাজ করে। তারা প্রথমে স্থানীয় লোকজনের মন জয় করার চেষ্টা করে। এর জন্য তারা প্রথমে স্থানীয় লোকজনের প্রধান সমস্যাগুলো খুঁজে বের করে এবং এর জন্য যারা দায়ী তাদের টার্গেট করে শাস্তি দেয়। এতে তারা নীরব সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের সমর্থন

www.pathagar.com

পেয়ে যায়। ওয়াজিরিস্তানে ঠিক এই নীতি অনুসরণ করে তারা স্থানীয় অপহরণকারী ও ডাকাতদের শাস্তি দিয়েছিল। কিন্তু যখনই তারা ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে যায়, তখন তারা নিজেরাই অপরাধীদের মতো আচরণ করা শুরু করে।'

ফজলুল্লাহর রেডিও মাঝে মাঝে মহিলাদের লক্ষ্য করে প্রচার চালাতো। তাঁর ভালো করেই জানা ছিল, আমাদের এখানকার বহু পুরুষ লোক দক্ষিণে গিয়ে কয়লার খনিতে অথবা উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোতে আবাসন নির্মাণের কাজ করতে যেতো।

ফজলুল্লাহ কখনও কখনও বলতেন, 'পুরুষ লোকেরা এখন এলাকার বাইরে। আমি নারীদের উদ্দেশে বলছি।' এরপর বলতেন, 'নারীরা ঘরের ভেতরে তাদের দায়িত্ব পালন করবেন। শুধুমাত্র জরুরি দরকার পড়লে তারা বাইরে যাবেন। তবে অবশ্যই সে সময় তাদের বোরখা পরতে হবে।' মাঝে মাঝে ফজলুল্লাহর লোকজন রংচংয়া কাপড় চোপড় দেখিয়ে বলতো, সেগুলো তারা 'বেশরম মহিলাদের' শরম দিতে তাদের কাছ থেকে নিয়ে এসেছে।

আমার স্কুলের বন্ধুরা বলতো, তাদের মায়েরা নিয়মিত রেডিও মোল্লা শোনে, যদিও আমাদের প্রধান শিক্ষিকা মরিয়ম আপা আমাদের সেটা না শুনতে বলেছিলেন। আমাদের বাসায় দাদাজানের একটা ভাঙা রেডিও পড়েছিল। তবে আম্মার বান্ধবীরা সবাই রেডিও মোল্লা শুনতেন এবং আম্মাকে শুনতে বলতেন। তারা ফজলুল্লাহর প্রশংসা করতেন এবং তাঁর লম্বা চুল দেখতে কত সুন্দর তাই বলাবলি করতেন। রাস্তা দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যখন ফজলুল্লাহ যেতেন তখন তাঁর ভাবভঙ্গি ছিল নবী রাসূলদের মতো। মহিলারা তাদের সমস্যা ও মনোবাসনার কথা তাঁকে বলতেন আর তিনি তাঁদের জন্য দোয়া করতেন। বান্ধবীদের কাছে এসব কথা শুনে আম্মার ভালোই লাগতো। কিন্তু আব্বা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়তেন।

ফজলুল্লাহর ওয়াজ শুনে আমি মাঝে মাঝে খুবই বিভ্রান্ত হয়ে পড়তাম। পবিত্র কোরানের কোথাও লেখা নেই পুরুষেরা বাইরে থাকবে আর মহিলারা সারাদিন ঘরের মধ্যে বসে কাজ করবে। স্কুলে ইসলামী শিক্ষার ক্লাসে 'নবীজির জীবনযাপন' শিরোনামে আমাদের প্রবন্ধ লিখতে হতো। সেখানে আমরা জেনেছি মহানবী (সা.) এর প্রথম স্ত্রী খাদিজা (রা.) একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। নবীজির চেয়ে ১৫ বছরের বড় ছিলেন খাদিজা (রা.)। খাদিজা (রা.) এর বয়স ছিল ৪০ বছর। এর আগেও তাঁর বিয়ে হয়েছিল। এরপরও মহানবী (সা.) তাঁকে বিয়ে করেছিলেন। আমি আম্মাকে দেখেও বুঝতাম পশতুন মহিলারা খুব শক্তিশালী এবং দৃঢ় মানসিকতার। একটা দুর্ঘটনায় আমার নানার মেরুদণ্ডের হাড় ভেঙে যাওয়ায় দীর্ঘ আট বছর তিনি বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেননি। ওই সময় আমার নানী একা আট সন্তানকে লালন পালন করেছেন।

একজন পুরুষ কাজ করতে বাইরে যায়, পয়সা রোজগার করে, বাড়িতে আসে, খায়, ঘুমায়–এই হলো তার কাজ। আমাদের পুরুষেরা মনে করে অর্থ রোজগার

www.pathagar.com

করা এবং চারপাশের সবাইকে শাসনে রাখার মধ্যেই ক্ষমতা নিহিত। তারা ভেবে দেখে না যে মহিলা সারাদিনরাত সবার দেখভাল করে এবং পুরুষের ঔরসজাত সন্তানের জন্ম দেয় তাদের হাতেই মূল শক্তি, আসল ক্ষমতা। আমাদের বাড়িতে আম্মাই পরিবারের সব কিছু সামলানোর কারণে আম্মাকে প্রচণ্ড ব্যস্ত থাকতে হয়। আম্মাকে খুব ভোরে উঠতে হয়। বিছানা ছেড়ে আমাদের জামাকাপড় ইস্ত্রি করতে হয়, নাশতা বানাতে হয়। সারাদিন কাজ কর্মের আমাদের আদব কায়দাও তিনিই শিক্ষা দেন। আম্মাই বাজারে যান, কেনাকাটা করেন এবং রান্না করেন। বলা যায় সংসারের সব কাজ তিনি একাই করেন।

তালেবান আসার প্রথম বছরই আমার শরীরে দুটো অপারেশন করতে হয়েছিল। একটা করতে হয় অ্যাপেন্ডিকসের জন্য, অন্যটা টনসিল কেটে বাদ দেওয়ার জন্য। খুশালেরও অ্যাপেন্ডিকসে অপারেশন করা হয়। আম্মাই আমাদের হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন; আব্বা শুধু আমাদের হাসপাতালে দেখতে যেতেন এবং আইসক্রিম কিনে দিয়ে আসতেন। আম্মা তখনও ভাবতেন, পবিত্র কোরানে লেখা আছে মহিলাদের বাড়ির বাইরে যাওয়ার এবং যাদের বিয়ে করা যাবে না এমন পুরুষ আত্মীয় স্বজন ছাড়া অন্য কোনো পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলার অনুমতি নেই। আব্বা তাঁকে বলতেন, 'পেকাই, শুধু বোরখার মধ্যেই পর্দা সীমাবদ্ধ নয়, মনের মধ্যেও পর্দা আছে।'

বহু মহিলা, বিশেষ করে গ্রামের গরীব মহিলারা যাদের স্বামী বাইরে থাকে, তারা ফজলুল্লাহর বয়ানে মোহমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা তাঁকে নগদ অর্থ ও গয়না উপহার দেওয়া শুরু করেছিলেন। দান গ্রহণের জন্য টেবিল পাতা হতো। সেখানে মহিলারা তাঁদের বিয়ের গয়না নিজে গিয়ে অথবা ছেলেদের হাতে পাঠিয়ে দিতেন। আল্লাহ রাজি-খুশি হবেন–এই বিশ্বাস থেকে অনেকে তাদের সারাজীবনের সঞ্চয় ফজলুল্লাহর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। এই অর্থ দিয়ে তিনি ইমাম দেড়িতে লাল ইটের বিশাল মসজিদ ও তার সঙ্গে মাদ্রাসা নির্মাণ করা শুরু করলেন। সোয়াত নদীর ভাঙনে যাতে মসজিদ মাদ্রাসা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য নদী শাসনের বাধ নির্মাণও শুরু হলো। সিমেন্ট আর রড তিনি কোত্থেকে যোগাড় করেছিলেন কেউ বলতে পারেনি; তবে নির্মাণকর্মী ছিল স্থানীয় জনগণ। এটা নির্মাণের জন্য প্রত্যেক গ্রাম থেকে রোজ পালা করে কর্মী বাহিনী সরবরাহ করা হতো। একদিন আমাদের উর্দু শিক্ষক নওয়াব আলী আব্বাকে বললেন, 'আগামীকাল স্কুলে আসতে পারবো না।' আব্বা জিজ্ঞেস করলেন, কেন? উত্তরে তিনি বললেন, ফজলুল্লাহর মসজিদ নির্মাণের কর্মী-সরবরাহের জন্য আগামী দিনটি তাঁদের গ্রামের জন্য নির্ধারিত ছিল। তিনি সেখানে কাজ করতে যাবেন।

আব্বা বললেন, 'আপনার প্রধান দায়িত্ব তো ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়া।'

নওয়াব আলী বললেন, 'না, আমাকে সেখানে যেতেই হবে।'

আব্বা মন খারাপ করে বাড়ি চলে এলেন। তিনি বললেন, 'যদি মানুষ ঠিক এমনিভাবে স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে রাস্তাঘাট, স্কুল কলেজ নির্মাণ, এমনকি নদী থেকে

www.pathagar.com

প্লাস্টিকের বর্জ্য অপসারণ করতো তাহলে আল্লাহর কসম, এক বছরের মধ্যেই পাকিস্তান জান্নাত বনে যেতো।' তিনি বললেন, 'মসজিদ এবং মাদ্রাসা কেবলমাত্র এই দুই জায়গাতেই তারা দান খয়রাত করতে জানে। অন্য কোথাও নয়।'

কয়েক সপ্তাহ পরে সেই নওয়াব আলী আব্বাকে এসে বললেন, তিনি আর মেয়েদের পড়াতে পারবেন না কারণ মাওলানার এটি পছন্দ নয়। আব্বা তাঁর মত বদলানোর চেষ্টা করলেন। আব্বা তাঁকে বললেন, 'আমি আপনার সাথে একমত যে মেয়েদের মহিলা শিক্ষক দিয়ে পাঠদান করা উচিত, কিন্তু আগে তো আমাদের মেয়েদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে তাতে যারা শিক্ষিকা হয়ে উঠতে পারে।'

সুফি মোহাম্মদ একদিন জেলখানা থেকেই ঘোষণা দিলেন মেয়েদের লেখাপড়া করা যাবে না, এমনকি মেয়েদের মাদ্রাসাও চালানো যাবে না। তিনি বললেন, 'ইসলাম মেয়েদের মাদ্রাসার অনুমোদন দিয়েছে বলে ইতিহাসের কোথাও কোনো দৃষ্টান্ত যদি কেউ তাঁকে দেখাতে পারে তাহলে সে তাঁর দাড়িতে পেশাব করে দিতে পারবে।' এরপরই রেডিও মোল্লা স্কুলগুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা শুরু করলো। রেডিও মোল্লা থেকে স্কুল পরিচালক ও প্রশাসকদের বিরুদ্ধে বয়ান শুরু হলো। যে মেয়েরা স্বেচ্ছায় স্কুল ছেড়েছে নাম ধরে ধরে তাদের অভিবাদন জানানো হল। জফলুল্লাহ বলতেন, 'মিস অমুক স্কুলে যাওয়া বন্ধ করেছেন, সে জান্নাতবাসী হবে।' অথবা বলতেন, 'অমুক গ্রামের মিস অমুক ক্লাস ফাইভ থেকে পড়ালেখা বাদ দিয়েছে। তার প্রতি আমার মোবারকবাদ রইল।' আমার মতো যারা তখনও স্কুলে যাচ্ছিল তাদের ওই রেডিও থেকে মাদি মহিষ আর বকরি বলে উপহাস করা হতো।

আমি এবং আমার বন্ধুরা বুঝতে পারতাম না মেয়েরা স্কুলে গেলে সমস্যাটা কোথায়। একদিন আব্বাকে বললাম, 'ওরা মেয়েদের স্কুলে যেতে দিতে চায় না কেন?'

আব্বা বললেন, 'তারা কলমকে ভয় পায়, সে জন্য'।'

আরেকদিন লম্বা বাবরি চুলওয়ালা একজন অংকের শিক্ষক মেয়েদের পড়াতে পারবেন না বলে জানালেন। আব্বা তাঁকে বরখাস্ত করলেন। অন্য শিক্ষকেরা এটা শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন এবং তাঁরা আব্বার অফিসে একদল প্রতিনিধি পাঠালেন। তাঁরা বিনীতভাবে বললেন, 'স্যার তাঁকে বরখাস্ত করবেন না। সময় খুবই খারাপ যাচ্ছে। তাঁকে চাকরিতে বহাল রাখুন, তাঁর ক্লাসগুলো আমরা চালিয়ে নেব।'

তখন প্রতিদিন নতুন নতুন ডিক্রি জারি হতো। ফজলুল্লাহ আমাদের ওখানকার বিউটি পার্লারগুলো বন্ধ করে দিলেন এবং পুরুষদের দাড়ি কামানো নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। ক্ষৌরকারদের কাজ প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। আব্বার মুখে শুধু গোঁফ ছিল, কিন্তু তিনি বললেন, তালেবানের ভয়ে তিনি কিছুতেই দাড়ি রাখবেন

www.pathagar.com

না। তালেবান মহিলাদের বাজারে যেতে নিষেধ করলো। চীনা বাজারে না যেতে পারায় আমার মন খারাপ হলো না। আমাদের অনেক পয়সা কড়ি না থাকলেও সুন্দর সুন্দর জামাকাপড় কিনতে আম্মার ভালো লাগতো। কিন্তু আমি কেনাকাটা তেমন একটা উপভোগ করতাম না। আম্মা সব সময় বলতেন, 'মুখ ঢাকো, লোকজন তোমাকে দেখছে।'

আমি বলতাম, 'তাতে কি, আমিও তো তাদের দেখছি।' এতে তিনি ভীষণ দুঃখ পেতেন।

শপিং করতে যেতে না পেরে আম্মা এবং তাঁর বান্ধবীদের সাংঘাতিক মন খারাপ হচ্ছিল। বিশেষকরে ঈদের আগের ছুটির দিনগুলোতে আমরা সাধ্যমতো সাজগোজ করতাম এবং আলোকসজ্জিত স্টলগুলোতে ঘুরে ঘুরে রঙিন চুড়ি ও হেনা কিনতাম। তালেবানের কারণে সব বন্ধ হয়ে গেল। মহিলারা বাজারে গেলে তাদের ওপর হামলা করা হতো না, তবে তালেবান কর্মীরা তাদের ধমক দিতো এবং বাড়িতে না ফেরা পর্যন্ত নানারকম হুমকি দিতো।

একজন তালেব পুরো একটা গ্রামকে আতঙ্কগ্রস্ত করে ফেলতে পারতো। আমরা শিশুরাও তাদের খবরদারি থেকে রেহাই পেতাম না। সাধারণ ছুটির দিনেই নতুন নতুন ছবি মুক্তি পায়। কিন্তু ফজলুল্লাহ ডিভিডির দোকান বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এই সময়ে, বিশেষ করে ফজলুল্লাহ যখন লেখাপড়ার বিরুদ্ধে ওয়াজ করা শুরু করলেন এবং বলতে লাগলেন যেসব মেয়ে পড়াশুনা করবে তারা জাহান্নামে যাবে–তখন আম্মাও তাঁর ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়লেন।

এরপরই ফজলুল্লাহ 'শুরা' বা স্থানীয় আদালত চালু করলেন। পাকিস্তানের আদালতগুলোয় মামলা করে বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে এবং শুনানি শুরু করতে ঘুষ দিতে হয়। কিন্তু শুরার বিচারকাজ দ্রুত শেষ হতো। ফলে এটি মানুষের পছন্দ হয়। মানুষ ব্যবসায়িক বিষয় থেকে শুরু করে ব্যক্তি পর্যায়ের বিবাদ–সবিকছুর মিমাংসার জন্য ফজলুল্লাহ ও তাঁর লোকজনের কাছে যেতে থাকে। এক লোক একদিন আব্বাকে বললেন, 'আমার ৩০ বছরের একটা পুরনো সমস্যা একবার তাঁর কাছে যাওয়ার পরই সমাধান হয়ে গেছে।'

ফজলুল্লাহর শুরা যেসব শাস্তির বিধান রেখেছিল তার মধ্যে জনসমক্ষে দোররা মারাও ছিল, যা ইতিপূর্বে আমি কখনো স্বচক্ষে দেখিনি। আব্বার এক বন্ধু তাঁকে বলেছিলেন, তিনি দেখেছেন দুই নারীকে অপহরণ করার অভিযোগ শুরায় প্রমাণিত হওয়ার পর তিন ব্যক্তিকে প্রকাশ্যে নির্দয়ভাবে চাবুকপেটা করা হচ্ছে। ফজলুল্লাহর আস্তানার কাছেই একটি বিচারমঞ্চ বানানো হয়েছিল। তাঁর কাছে নালিশ জানানোর পর তিনি জুম্মার নামাজের পর শুনানি গ্রহণ করতেন। ওইদিন চাবকানোর দৃশ্য দেখার জন্য শত শত লোক সেখানে জড়ো হতো। প্রত্যেকবার চাবুক মারার সময় তাঁরা সমস্বরে 'আল্লাহু আকবর' বলে উঠতো। কালো একটি ঘোড়ায় চেপে মাঝে মাঝে ফজলুল্লাহকে সেখানে যেতে দেখা যেতো।

www.pathagar.com

ফজলুল্লাহর লোকজন স্বাস্থ্যকর্মীদের পোটিও টিকা খাওয়ানো কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছিল। তারা বলতো সোয়াতের লোকজন যাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় সেজন্য সেখানকার মেয়েদের বাজা বা বন্ধ্যা করে দেওয়ার চক্রান্ত করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এর অংশ হিসেবে টিকাদানের নামে কন্যা শিশুদের তারা আগেভাগেই ওষুধ প্রয়োগ করে বন্ধ্যা করে দিচ্ছে। ফজলুল্লাহ্ রেডিওতে বলতেন, 'সোয়াতের কোথাও একটি শিশুকেও এক ফোঁটা টিকাও খাওয়াতে দেওয়া হবে না।' তিনি বলতেন, 'রোগ হওয়ার আগেই দাওয়া দেওয়া শরীয়া সম্মত নয়।'

আফগানিস্তানে নীতিরক্ষীবাহিনী বা মোরালিটি পুলিশ সবখানে টহল দিয়ে বেড়ায় বলে আমরা যেমনটা শুনেছিলাম এখানেও তেমনটা দেখলাম। ফজলুল্লাহর হুকুম কেউ বরখেলাপ করছে কিনা তা তদারক করতে রাস্তায় তার লোকজনকে টহল দিতে দেখা যেতো। তাঁরা 'ফ্যালকন কমান্ডো' নামের একটি স্বেচ্ছাসেবী ট্রাফিক পুলিশ বাহিনী গড়ে তুলেছিল। তারা পিক-আপ ট্রাকের ওপর মেশিনগান পেতে রাস্তায় অনবরত টহল দিতো।

তালেবানের কাজ কারবার দেখে কিছু লোক খুশি হয়েছিল। একদিন আব্বা তাঁর ব্যাংক ম্যানেজারকে বললেন, 'ফজলুল্লাহ একটা কাজ বেশ ভালোই করেছে। সেটা হলো, মহিলাদের চীনা বাজারে যাওয়া বন্ধ করেছে। এতে আমাদের পুরুষদের খরচাপাতি অনেক কমে গেছে। কি বলেন?' এ নিয়ে খুব অল্প সংখ্য লোকই মুখ খুলতো। আব্বার অভিযোগ ছিল, আমাদের বেশিরভাগ লোকের অবস্থা হয়েছিল কাজ হারানো স্থানীয় সেই নাপিতের মতো। ওই নাপিত আব্বাকে একদিন দুঃখ করে বলছিলেন, সেদিন সব মিলিয়ে তাঁর উপার্জন হয়েছিল মাত্র ৮০ রুপি যা অন্যদিনের উপার্জনের দশভাগের মাত্র একভাগ। অথচ এই লোকটি মাত্র একদিন আগেও এক সাংবাদিককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, তালেবান কর্মীরা ভালো মুসলমান।

মোল্লা এফএম বছরখানেক সম্প্রচার চালিয়ে যাওয়ার পর ফজলুল্লাহ আরও বেশি মারমুখী হয়ে উঠলেন। ২০০৬ সালের অক্টোবরের শেষ দিকে বাজাউরে একটি মাদ্রাসায় মার্কিন ড্রোন থেকে বোমা হামলা চালানো হয়। সেখানে যারা নিহত হয় তাদের মধ্যে ফজলুল্লাহর ভাই মাওলানা লিয়াকত এবং লিয়াকতের তিন ছেলেও ছিলেন। ওই হামলায় ১২ বছর বয়সী পর্যন্ত কমবয়সী শিশুরাসহ মোট ৮০ জন লোক মারা যায়। এদের মধ্যে সোয়াত থেকে যাওয়া লোকজনও ছিল। এই হামলায় আমরা সবাই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ি এবং স্থানীয় মানুষ প্রতিশোধ নেওয়ার শপথ নেয়। এর দশদিন পর ইসলামাবাদ থেকে সোয়াতে যাওয়ার পথে দারগাই সেনা ঘাটিতে একজন আত্মঘাতী নিজের দেহে বাধা বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে হামলা চালায়। এই আত্মঘাতী হামলায় ৪২ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। ওই সময় পাকিস্তানে আত্মঘাতী হামলা সচরাচর হতো না। সে বছর সব মিলিয়ে ছয়টি আত্মঘাতী হামলার ঘটনা ঘটে। দারগাই ঘাঁটির ওই হামলা ছিল পাকিস্তানি জঙ্গিদের চালানো সবচেয়ে বড় হামলা।

www.pathagar.com

ঈদের দিন আমরা সাধারণত ছাগল কিংবা ভেড়া জাতীয় পশু কোরবানি করি। কিন্তু ফজলুল্লাহ্ বললেন, 'এই ঈদে দু পেয়ে পশু জবাই করা হবে।' শিগগিরই আমরা তাঁর কথার মানে বুঝতে পারলাম। তাঁর লোকজন খানদের এবং ইহ্জাগতিক ও জাতীয়তাবাদী দলগুলোর বিশেষ করে আওয়ামী ন্যাশনাল পার্টির (এএনপি) নেতাকর্মীদের হত্যা করা শুরু করলো। ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসে আব্বার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে প্রায় ৮০ জন মুখোশ পরা বন্দুকধারী অপহরণ করে নিয়ে যায়। তাঁর নাম ছিল মালেক বখত্ বাইদার। ধনী খান পরিবারের সন্তান মালেক বখত্ ছিলেন স্থানীয় এএনপির সহ-সভাপতি। পরে তাঁর দেহ তাঁর পৈতৃক কবরস্থানে পূর্বপুরুষদের কবরে পাওয়া যায়। তাঁর হাত-পা সব ভেঙে ফেলা হয়েছিল। এটিই ছিল সোয়াতের প্রথম টার্গেটেড কিলিং। লোকজন বলাবলি করছিল তালেবান আস্তানা খুঁজতে সেনাবাহিনীকে সহায়তা করার কারণে তাঁকে এই পরিণতি বরণ করতে হয়েছিল।

তালেবানের কাজ কারবার দেখেও কর্তৃপক্ষ চোখ বন্ধ করেছিল। আমাদের প্রাদেশিক সরকার তখন মাওলানাদের দলগুলোর দখলে। ইসলামের জন্য যেই জিহাদ করার কথা বলতো, কর্তৃপক্ষ আর তাদের সমালোচনা করতো না। প্রথমে ভেবেছিলাম, সোয়াতের সবচেয়ে বড় শহর মিঙ্গোরায় বাস করার কারণে আমরা নিরাপদেই আছি। কিন্তু ফজলুল্লাহর হেডকোয়ার্টার ছিল অল্প কয়েক মাইল দূরেই। আমাদের বাড়ির কাছে তালেবান কর্মীদের দেখা না গেলেও মার্কেট, রাস্তাঘাট এবং পাহাড়ে তাদের সব সময়ই ঘোরাঘুরি করতে দেখা যেতো। বিপদ ক্রমশ এগিয়ে আসছিল।

ঈদের সময় প্রতিবারের মতো সেবারও আমরা গ্রামের বাড়ি যাচ্ছিলাম। আমরা চাচাতো ভাইয়ের গাড়িতে করে যাচ্ছিলাম। রাস্তা ধ্বসে পড়ায় একটা মরা নদীর ওপর দিয়ে গাড়ি যাচ্ছিল। একটা তালেবান তল্লাশি চৌকি সামনে পড়লো। পেছনের সিটে আম্মার সঙ্গে আমি বসেছিলাম। আমার চাচাতো ভাই তাঁর গানের ক্যাসেট দ্রুত আমার হাতব্যাগের মধ্যে লুকিয়ে ফেললো। কালো পোশাকে থাকা তালেবান সদস্যদের হাতে কালাশনিকোভ দেখা যাচ্ছিল। তারা কাছে এসে বললো, 'বোনেরা, আপনারা লজ্জাজনক কাজ করছেন। আপনাদের অবশ্যই বোরখা পরা দরকার।'

ঈদের ছুটি শেষে আমরা স্কুলে ফিরে দেখি মূল ফটকে কেউ একটা চিঠি টেপ দিয়ে লাগিয়ে রেখে গেছে। চিঠিতে লেখা, 'মুহতারাম, পশ্চিমা-কাফেরদের তুরিকায় আপনারা স্কুল চালাচ্ছেন। আপনারা মেয়েদের পড়াচ্ছেন এবং ছেলেমেয়েদের বে-ইসলামী স্কুল ড্রেস পরাচ্ছেন। এসব বন্ধ করুন, নয়তো বিপদে পড়বেন এবং আপনার পরিণতির জন্য আপনার বাল-বাচ্চাদের সীমাহীন কান্নাকাটি করতে হবে।' বার্তা প্রেরকের স্থলে লেখা ছিল 'ফেদাইন অব ইসলাম।'

www.pathagar.com

আব্বা ছেলেদের ইউনিফর্ম শার্ট-প্যান্ট থেকে সালোয়ার-কামিজ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। আমাদের মেয়েদের রয়েল ব্লু সালোয়ার-কামিজের সঙ্গে মাথায় পরার জন্য সাদা দোপাট্টা বা হেডস্কার্ফ আগের মতোই বহাল থাকলো। স্কুলে যাওয়া-আসার সময় আমাদের মাথা ভালোভাবে ঢেকে রাখার জন্য বলে দেওয়া হলো।

আব্বার বন্ধু হেদায়েতুল্লাহ আব্বাকে দৃঢ় থাকার পরামর্শ দিলেন। তিনি বললেন, 'জিয়াউদ্দিন, তোমার নিজের অসাধারণ ক্যারিশমা আছে। তুমি চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারো। এই ক্ষমতা দিয়েই তুমি তাদের বিরুদ্ধে লোকজনকে সংগঠিত করতে পারো।'

তিনি বললেন, 'অক্সিজেন টানলাম আর কার্বন-ডাইঅক্সাইড বাতাসে ছেড়ে দিলাম–এটাতো জীবন হতে পারে না। এখানে তুমি তালেবানের সব কিছু মেনে নিয়ে চরম আপোষকামী হয়ে যেমন থাকতে পারো, তেমনি আবার তাদের রুখে দাঁড়াতেও পারো।'

আব্বা আমাদের কাছে হেদায়েতুল্লাহর কথাগুলো বললেন। এরপর তিনি স্থানীয় দৈনিক পত্রিকা ডেইলি আজাদীতে একটা চিঠি লিখলেন। 'ফেদাইন অব ইসলাম (ইসলামী আত্মবিসর্জনকারী), ইসলাম কায়েমের সঠিক পন্থা এটি নয়।' আব্বা লিখলেন, 'আমার ছেলেমেয়েদের কোনো ক্ষতি করবেন না। কারণ আপনারা যে আল্লাহতে বিশ্বাসী, তারাও রোজ সেই আল্লার ইবাদত করে। আপনারা আমার জীবন নিন। কিন্তু আমার ছাত্র-ছাত্রীদের হত্যা করবেন না।' পত্রিকা খুলে আব্বার মন খারাপ হয়ে গেল। চিঠিটা ভেতরের পাতায় ছাপা হয়েছে। পাশাপাশি সম্পাদক আব্বার অনুমতি না নিয়েই চিঠির লেখক হিসেবে তাঁর নাম এবং স্কুলের পূর্ণ ঠিকানা ছাপিয়ে দিয়েছেন। তবে বহু লোক ওই চিঠি পড়ে আব্বাকে অভিনন্দন জানান। তাঁরা বলেছিলেন, 'স্থির পানির ওপর তরঙ্গ তোলার জন্য আপনিই প্রথম ঢিলটি ছুড়েছেন। এখন আমরা সবাই মুখ খোলার সাহস পাবো।'

www.pathagar.com

১০

টফি, টেনিস বল আর সোয়াতের বুদ্ধ

তালেবান প্রথমে কেড়েছে আমাদের সঙ্গীত, তারপর বৌদ্ধমূর্তি এবং তারপর আমাদের ইতিহাস। আমাদের অন্যতম প্রিয় বিষয় ছিল স্কুল থেকে ভ্রমণে যাওয়া। আমরা এদিক থেকে সৌভাগ্যবান ছিলাম যে, জান্নাতের মতো সোয়াতে আমরা বাস করতাম যেখানে ঘুরে ঘুরে দেখার মতো বহু সুন্দর জায়গা ছিল। জলপ্রপাত, লেক, স্কি রিসোর্ট, ওয়ালিদের প্রাসাদ, বিভিন্ন স্থানের বুদ্ধমূর্তি, সোয়াতের আখান্দের সমাধি-ইত্যাদি স্থান ছিল নয়নাভিরাম। এসব স্থানের সবগুলোই আমাদের বিশেষ বিশেষ গল্প শোনাতো। বেড়াতে যাওয়ার কয়েক সপ্তাহ আগে থেকে কোথায় কিভাবে যাবো তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করতাম। শেষে বহু প্রত্যাশিত দিনটি এলে আমরা যার যার সবচেয়ে ভালো কাপড় চোপড় পরে হুড়মুড় করে বাসে উঠতাম। বনভোজনের জন্য বাসের ভেতর বড় বড় ডেকচিতে চাল-ডাল-মুরগী বোঝাই করা হতো। আমাদের অনেকের সঙ্গে ক্যামেরা থাকতো। তারা ফটাফট ছবি তুলতে থাকতো। বনভোজনে সারাদিন কাটানোর পর বাড়ি ফেরার আগে আব্বা আমাদের সবাইকে এক জায়গায় জড়ো করতেন। তারপর একটা পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে সারাদিন যা যা দেখলাম তা এক এক করে সবাইকে বলতে হতো। ফজলুল্লাহ আসার পর স্কুল ট্রিপ বন্ধ হয়ে গেল। কারণ তখন মেয়েদের বাইরে চেহারা প্রদর্শন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল।

তালেবান হাজার হাজার বছর ধরে টিকে থাকা বুদ্ধ মূর্তি ও স্টুপাগুলো ধ্বংস করে ফেলেছিল। আমরা এখানে এসে লুকোচুরি খেলতাম। খুশান রাজবংশের সময়কার আমাদের ইতিহাসের অংশ ছিল এই মূর্তি ও স্টুপাগুলো। তালেবান বিশ্বাস করতো, যে কোনো ধরনের প্রাণী মূর্তি বা প্রাণীর ছবি বানানো বা আঁকা সম্পূর্ণ হারাম। মিঙ্গোরা থেকে গাড়ি চালিয়ে আধাঘন্টার দূরত্বে ছিল জেহানাবাদ বুদ্ধমূর্তি। পাহাড় খোদাই করে প্রাচীনকালে ২৩ ফুট উঁচু এই মূর্তিটি বানানো হয়েছিল। একদিন তালেবান সদস্যরা ডিনামাইটের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মূর্তিটির মুখাবয়ব উড়িয়ে দেয়। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা বলেন, আফগান তালেবান বামিয়ানের যে মূর্তি ধ্বংস করেছিল, প্রত্নতাত্ত্বিক বিচারে সেটির মতোই এই মূর্তিটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। দুইবার চেষ্টা করার পর জেহানাবাদ বুদ্ধ মূর্তি নষ্ট করা সম্ভব হয়।

www.pathagar.com

প্রথমবার তারা ড্রিল দিয়ে পাথর কেটের তৈরি করে তার ভেতরে ডিনামাইট ঢুকিয়ে বিস্ফোরণ ঘটায়। কিন্তু তাতে কাজ হয়নি। কয়েক সপ্তাহ পরে ২০০৭ সালের ৮ অক্টোবর তারা আবার চেষ্টা চালায়। এই দফায় তারা বুদ্ধের পাথুরে মুখাবয়ব পুরোপুরি নষ্ট করে ফেলে। সপ্তদশ শতক থেকে যে মূর্তিটির মুখ উপত্যকাবাসীর নজর কাড়তো তা একেবারে বিকৃত হয়ে যায়। তালেবান শিল্পকলা, সংস্কৃতি ও আমাদের ইতিহাসের ঘোরশত্রু হিসেবে আবির্ভূত হয়। ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সোয়াত জাদুঘরের সংগ্রহ সামগ্রী সরিয়ে ফেলা হয়। তারা পুরনো সবকিছু গুড়িয়ে দিলেও নতুন কিছুই দিতে পারেনি। তালেবান মূল্যবান পান্না পাথর সমৃদ্ধ পাহাড়ের দখল নিয়ে সেখানকার খনি থেকে পান্না বের করতে থাকে। অপূর্ণ সুন্দর এই পাথর বিক্রি করে তারা সেই অর্থে তাদের কুৎসিত অস্ত্র কিনতে থাকে। কাঠের জন্য যারা আমাদের পাহাড়ের গাছ কেটে সাবাড় করতো তাদের কাছ থেকে তারা পয়সা নিতো। ওই কাঠের ট্রাক যখন রাস্তা দিয়ে গন্তব্যে যেতো তখন আবারও তারা কাঠ ব্যবসায়ীদের কাছে অর্থ দাবি করতো।

পুরো উপত্যকা এবং আশপাশের জেলাগুলো থেকে তালেবানের রেডিও শোনা যেত। তখন আমাদের ঘরে টেলিভিশন থাকলেও তারা ক্যাবল চ্যানেলের সুইচ অফ করে দিয়েছিল। মানিবা আর আমি আমাদের প্রিয় বলিউড শো 'শারারাত' এর মতো অনুষ্ঠানগুলো আর দেখতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল তালেবান আমাদের কিছুই করতে দিতে চাইছিল না। এমন কি আমাদের অতিপ্রিয় ক্যারাম খেলাও নিষিদ্ধ করেছিল। শুনেছি বাচ্চাদের হাসাহাসির শব্দ শুনে তালেবান সদস্যরা যদি টের পেত যে ঘরের মধ্যে ক্যারাম খেলা হচ্ছে, তাহলে তারা ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকে ক্যারাম বোর্ড ভেঙেচুরে তছনছ করে দিয়ে যেতো। আমাদের মনে হচ্ছিল তারা আমাদের হাতের পুতুল মনে করতো এবং কী করতে, কী পরতে হবে তা বাৎলে দিতো। আমার মনে হতো আল্লাহ যদি এমনটাই চাইতেন তাহলে তিনি আমাদের সবাইকে ভিন্ন ভিন্নভাবে সৃষ্টি করতেন না।

একদিন আমাদের শিক্ষিকা হামিদা আপাকে রীতিমতো অশ্রুসাগরে ভাসতে দেখলাম। পার্শ্ববর্তী ছোট্ট মাত্তা শহরে তাঁর স্বামী পুলিশের চাকরি করতেন। ফজলুল্লাহর লোকজন হানা দেওয়ায় সেখানে কয়েকজন পুলিশ সদস্য নিহত হন। তাঁদের মধ্যে হামিদা আপার স্বামীও ছিলেন। আমাদের উপত্যকায় সেটিই ছিল পুলিশের ওপর তালেবানের প্রথম হামলা। খুব শিগগিরই তারা অনেকগুলো গ্রাম দখল করে নেয়। বিভিন্ন পুলিশ স্টেশনে ফজলুল্লাহর টিএনএসএম'এর সাদা-কালো পতাকা উড়তে শুরু করে। জঙ্গিরা মেগাফোন (দূরের লোককে শোনানোর জন্য যে চোঙে মুখ রেখে কথা বলা হয়) নিয়ে গ্রামে ঢুকতো এবং ভয়ে পুলিশ পালিয়ে যেতো। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তারা ৫৯টি গ্রাম দখল করে সেখানে তাদের নিজস্ব প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করে ফেলে। পুলিশ সদস্যরা প্রাণের ভয়ে এতটাই ভীত হয়ে পড়েছিল যে তারা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে

www.pathagar.com

বাহিনী থেকে নিজেদের পদত্যাগের কথা প্রচার করতো। এতসব যখন ঘটছে তখন কেউ কিছুই করছিল না। মনে হচ্ছিল যেন সবাই গর্তে সেঁধিয়ে গেছে। আব্বা বলতেন, ফজলুল্লাহ লোকজনকে লোভ-লালসার জালে আটকে ফেলেছিলেন। একটু ভালোভাবে থাকার আশায় অনেকে তাঁর বাহিনীতে যোগ দিচ্ছিল। আব্বা তাদের অপপ্রচার প্রতিহত করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এটা সত্যিই দুঃসাধ্য ছিল। তিনি অতি দুঃখে ঠাট্টা করে বলতেন, 'আমার জঙ্গিও নাই, এফএম রেডিও'ও নাই।' এরপরও আব্বা খোদ রেডিও মোল্লার গ্রামে একটা স্কুলে বক্তব্য দিতে যাওয়ার সাহস করেছিলেন। ওই গ্রামে ঢোকার জন্য সাকোর ওপর দিয়ে হেঁটে নদী পার হলেন। পথে চলতে চলতে দূর থেকে দেখলেন প্রচণ্ড কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকাতে পাকাতে প্রায় মেঘের কাছে উঠে গেছে। আব্বা বলেন, এত কালো ধোঁয়া এর আগে তিনি কখনও দেখেননি। দূর থেকে আব্বা ভেবেছিলেন ওটা হয়তো কোনো ইটের ভাটা। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখলেন দাড়ি ও পাগড়িওয়ালা কিছু লোক টেলিভিশন ও কম্পিউটার স্তূপ করে তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

ওই স্কুলে পৌঁছে আব্বা সেখানকার লোকদের বললেন, 'আসার পথে দেখলাম গ্রামের কিছু লোক টিভি-কম্পিউটার পুড়িয়ে দিচ্ছে। এতে একমাত্র যাদের লাভ হবে তারা হলো জাপানের কিছু ইলেকট্রনিকস কোম্পানি, যারা আরও বেশি উৎপাদন করবে–বিষয়টি কি আপনারা বুঝতে পারছেন না?' আব্বার কথা শুনে কয়েকজন তাঁর কাছে এসে কানে কানে বললেন, 'এভাবে বলবেন না। এটা খুবই রিস্কি।' বিষয়টি নিয়ে বেশিরভাগ লোকের মতো সরকারের তরফ থেকেও কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছিল পুরো দেশটাই যন উন্মাদ হয়ে যাচ্ছিল। পাকিস্তানের বাকি অংশও কোনো না কোনোভাবে দখলপূর্ব অবস্থার দিকে চলে যাচ্ছিল। তালেবান সরাসরি আমাদের রাজধানী ইসলামাবাদের প্রাণ কেন্দ্রে ঢুকে পড়েছিল। খবরে আমরা দেখেছি, ইসলামাবাদের প্রাণ কেন্দ্রের বাজারগুলোতে সিডি ও ডিভিডির দোকানে কীভাবে বোরখা পরা তরুণী ও আমার বয়সী মেয়েরা লাঠি নিয়ে হামলা চালিয়েছে। এই নারী জঙ্গিদের সবাই 'বোরখা ব্রিগেড' বলতো। এই 'বোরখা বিগেডের সদস্যরা পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় মহিলা মাদ্রাসা জামিয়া হাফসা থেকে এসেছিল। মাদ্রাসাটি ইসলামাবাদের বিখ্যাত লাল মসজিদের অংশ। ১৯৬৫ সালে মসজিদটি নির্মিত হয়। দেওয়ালের রং লাল বলে মসজিদটিকে সবাই লাল মসজিদ বলে ডাকে। পার্লামেন্ট ভবন এবং আইএসআইয়ের সদর দপ্তর থেকে কয়েকটি ব্লক দূরেই মসজিদটি। বহু সরকারি ও সেনা কর্মকর্তা মসজিদটিতে নামাজ পড়তেন। মসজিদটির সাথে দুটি মাদ্রাসা রয়েছে। একটি ছেলেদের এবং একটি মেয়েদের। আফগানিস্তান ও কাশ্মিরে পাঠানোর জন্য বছরের পর বছর ধরে এখানে স্বেচ্ছাসেবক জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। মসজিদটি চালাতেন আব্দুল আজিজ এবং আব্দুল রশিদ নামের দুই সহোদর। ওসামা বিন লাদেনের পক্ষে প্রচারণা চালানোর মূল কেন্দ্রবিন্দু

www.pathagar.com

হয়ে উঠেছিল মসজিদটি। কান্দাহারে মোল্লা ওমরের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে বিন লাদেনের সঙ্গে আব্দুল রশিদের পরিচয় হয়েছিল। এই দুই ভাই তাঁদের জ্বালাময়ী ওয়াজের মাধ্যমে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন এবং বিশেষ করে নাইন ইলেভেনের হামলার পর হাজার হাজার মুসল্লি তাঁদের একনিষ্ঠ ভক্ত হয়ে ওঠেন। প্রেসিডেন্ট মোশাররফ আমেরিকাকে 'সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধে' সহযোগিতা করতে রাজি হওয়ামাত্রই সামরিক বাহিনীর সঙ্গে লাল মসজিদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়। সরকারবিরোধী বিক্ষোভের কেন্দ্র হয়ে ওঠে মসজিদটি। আব্দুল রহমানের বিরুদ্ধে ২০০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে রাওয়ালপিণ্ডিতে প্রেসিডেন্ট মোশাররফের গাড়িবহর উড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনায় জড়িত থাকারও অভিযোগ ছিল।

তদন্ত কর্মকর্তারা বলেছিলেন, মোশাররফকে হত্যার চেষ্টায় যে বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়েছিল তা প্রথমে লাল মসজিদে এনে রাখা হয়েছিল। তবে কয়েক মাস পর আব্দুল রশিদ এই মামলা থেকে খালাস পেয়ে যান।

মোশাররফ ২০০৪ সালে ওয়াজিরিস্তানে সেনা পাঠানোর মাধ্যমে যখন ফাটা এলাকায় সামরিক অভিযান শুরু করেন তখন আব্দুল আজিজ ও আব্দুল রশিদ এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। তাঁরা সেখানে চালানো সেনা অভিযানকে অনৈসলামিক বলে ঘোষণা দেন। তাঁদের নিজেদের ওয়েবসাইট ছিল। ফজলুল্লাহর মতো নকল এফএম রেডিও স্টেশনও ছিল।

সোয়াত উপত্যকায় যখন তালেবানের উদয় হয় ঠিক একই সময় লাল মসজিদের মেয়েরা ইসলামাবাদের রাজপথে তাণ্ডব চালাতে শুরু করে। ম্যাসাজ সেন্টার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে–এমন অভিযোগ তুলে কিছু বাড়িতে তারা তল্লাশি চালায়, পতিতাবৃত্তির অভিযোগে কিছু মহিলাকে অপহরণ করে এবং ডিভিডির দোকানগুলো বন্ধ করে দিয়ে তারা সিডি ও ডিভিডি স্তুপ করে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। তালেবান এসব সমর্থন করে বলে তারা তখন বলতে থাকে মহিলারাও কথা বলতে পারে। তারাও বাইরে যেতে পারে। ওই মহিলা মাদ্রাসার প্রধান ছিলেন বড় ভাই আব্দুল আজিজের স্ত্রী উম্মে হাসান। তিনি প্রকাশ্যেই গর্ব করে বলতেন, বহু মেয়েকে তিনি আত্মঘাতী হামলার জন্য প্রশিক্ষিত করেছেন। সরকার শরীয়া আইন বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়েছে–এমন কথা বলে মসজিদের ভেতরে শরীয়া আদালত বসানো হয়। তাদের জঙ্গিরা পুলিশদের অপহরণ করা শুরু করে এবং সরকারি ভবনগুলোতে ঢুকে সবকিছু তছনছ করতে থাকে।

মোশাররফ সরকার বুঝে উঠতে পারছিল না এসব বন্ধে কী করা যায়। সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তারা মসজিদটির সঙ্গে খুব বেশি জড়িয়ে পড়েছিলেন বলেই হয়তো কঠোর কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যাচ্ছিল না। কিন্তু ২০০৭ সালের মাঝামাঝিতে পরিস্থিতি এতটাই খারাপের দিকে যাচ্ছিল যে, জঙ্গিরা শেষ পর্যন্ত রাজধানীর দখল নিয়ে নেয় কিনা জনগণের মধ্যে সেই ভয় ঢুকতে শুরু করেছিল। অথচ এটা ছিল রীতিমতো অবিশ্বাস্য ব্যাপার–কারণ ইসলামাবাদ

www.pathagar.com

বরাবরই শান্ত ও শৃঙ্খলাপূর্ণ শহর ছিল। দেশের বাকি অংশের চেয়ে এই শহর ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। অবশেষে ৩ জুলাই ট্যাংক ও ভারী অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে কমান্ডোরা পুরো মসজিদ ঘিরে ফেলে। সেখানকার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়। সন্ধ্যা নামতেই সেখানে গুলি ও বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া যায়। সেনাবাহিনী গোলা দিয়ে মসজিদ চত্বরের দেওয়ালের বিভিন্ন অংশ ভেঙে ফেলে মর্টার হামলা চালাতে থাকে। মাথার ওপর হেলিকপ্টার গানশিপ চক্কর দিতে থাকে। লাউড স্পিকারে মাদ্রাসার মেয়েদের আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

লাল মসজিদের বহু জঙ্গির আফগানিস্তান ও কাশ্মিরে লড়াই করার অভিজ্ঞতা ছিল। তারা মাদ্রাসার ভেতরে ব্যারিকেড তৈরি করে এবং বালির বস্তা দিয়ে বাংকার বানিয়ে ফেলে। মসজিদের বাইরে দাঁড়িয়ে আতঙ্কগ্রস্ত অভিভাবকেরা মোবাইল ফোনে তাঁদের মেয়েদের ভেতর থেকে বাইরে চলে আসতে বলেন। মেয়েদের অনেকেই বের হতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা বলে, তাদের শিক্ষকেরা তাদের এই শিক্ষা দিয়েছেন যে শহীদী মৃত্যুর মতো মর্যাদার মৃত্যু আর নেই।

পরের দিন সন্ধ্যায় মেয়েদের একটা ছোট দল বেরিয়ে আসে। তাদের সঙ্গে মেয়েকে নিয়ে বোরখায় মুখ ঢেকে আব্দুল আজিজও বেরিয়ে আসেন। কিন্তু তার ছোটভাই ও স্ত্রী বহু ছাত্রীর সঙ্গে ভেতরে থেকে যান। প্রতিদিনই মসজিদের ভেতরে থাকা জঙ্গি এবং মসজিদ চত্বরের বাইরে থাকা সেনাবাহিনীর মধ্যে ব্যাপক বন্দুক যুদ্ধ চলতে থাকে। জঙ্গিদের কাছে স্প্রাইটের বোতলে বানানো পেট্রল বোমা এবং বিস্ফোরকও ছিল। ৯ জুলাই মধ্যরাত পর্যন্ত পুরো এলাকা ঘেরাও অবস্থায় ছিল। কিন্তু যখনই লুকিয়ে থাকা কোনো এক জঙ্গির গুলিতে বাইরে থাকা স্পেশাল কোর্সের কমান্ডার নিহত হলেন, তখন সেনাবাহিনী আর ধৈর্য্য রাখতে পারলো না এবং ভেতরে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ শুরু করলো।

অভিযানের নাম 'অপারেশন সাইলেন্স' হলেও এতে গগনবিদারী আওয়াজ হয়েছিল। আমাদের রাজধানীর একেবারে প্রাণ কেন্দ্রে এমন লড়াই এর আগে কেউ কখনো দেখেনি। কমান্ডোরা গুলি করতে করতে মাদ্রাসার প্রতিটি কক্ষে তল্লাশি চালাচ্ছিল। অবশেষে ভূ-গর্ভস্থ তলায় বেশ কয়েকজন সহযোগিসহ আব্দুল রশিদকে খুঁজে পায় এবং সেখানেই তাঁকে হত্যা করা হয়। ১০ জুলাই রাত নাগাদ এই নাটকের সমাপ্তি ঘটে এবং এ ঘটনায় কয়েকজন সেনা সদস্য ও বেশকিছু শিশুসহ প্রায় একশ জনের প্রাণহানি হয়। টেলিভিশনের খবরে ধ্বংসলীলার ভয়াবহ ছবি দেখানো হচ্ছিল। এখানে সেখানে রক্ত আর ভাঙা কাঁচের মধ্যে লাশগুলো পড়ে আছে। এসব দেখে আমরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম। সোয়াতের কয়েকজন শিক্ষার্থী এই দুটি মাদ্রাসায় পড়তো। আমরা এই ভেবে স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছিলাম, কীভাবে আমাদের রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রের একটা মসজিদের মধ্যে এমন নারকীয় ঘটনা ঘটতে পারে? মসজিদ তো আমাদের পবিত্রতম জায়গাগুলোর একটি।

লাল মসজিদে অভিযানের পর সোয়াতের তালেবান বদলে গেল। ১২ জুলাই আমার জন্মদিন হওয়ায় দিনটির কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। ওইদিন ফজলুল্লাহ রেডিওতে যে ভাষণ দিলেন তা ছিল তার এর আগের দেওয়া সব ভাষণ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। লাল মসজিদে আক্রমণের ঘটনায় তিনি ক্ষোভে ফেটে পড়লেন এবং আব্দুল রশিদের হত্যার বদলা নেওয়ার ঘোষণা দিলেন। এক পর্যায়ে তিনি সরাসরি পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিলেন।

আসল মুসিবতের শুরু এখান থেকেই। ফজলুল্লাহ এখন লাল মসজিদের নামে সরকারকে হুমকি দিতে এবং তালেবানের পক্ষে সমর্থন দেওয়ার জন্য সবাইকে আহ্বান জানাতে থাকেন। এর কয়েকদিন পরই সোয়াতের দিকে যাওয়ার সময় সেনাবাহিনীর একটি সাজোয়া বহরের ওপর তারা অতর্কিত হামলা চালায় এবং এতে ১৩ জন সেনা নিহত হয়। সোয়াতেই যে শুধু এই ধরনের চোরাগোপ্তা হামলা হচ্ছিল তা নয়। বাজাউরের আদিবাসীর লালমসজিদের ঘটনায় প্রচণ্ড বিক্ষোভ করে এবং দেশব্যাপী আত্মঘাতী হামলা চলতে থাকে। তখন সবার সামনে একটাই আশার আলো। সেটা হলো বেনজির ভুট্টো দেশে ফিরছেন। যুক্তরাষ্ট্র ভেবেছিল, মোশাররফ এতটাই অজনপ্রিয় হয়ে পড়েছিলেন যে তার পক্ষে হয়তো তালেবানকে সামাল দেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। এ কারণে তারা ক্ষমতা ভাগাভাগির একটি অস্বাভাবিক চুক্তিতে মধ্যস্থতা করলো। চুক্তিতে ঠিক হয়, মোশাররফ সামরিক উর্দি ছেড়ে বেসামরিক প্রেসিডেন্ট হবেন। তাতে বেনজির ভুট্টোর দল সমর্থন দেবে। তার বদলে মোশাররফ বেনজির ভুট্টো ও তাঁর স্বামী আসিফ আলি জারদারির বিরুদ্ধে করা সব মামলা প্রত্যাহার করে নেবেন এবং সধারণ নির্বাচন দেবেন। তবে বেনজির ও মোশাররফ একে অন্যকে প্রচণ্ড ঘৃণা করায় এই চুক্তি শেষ পর্যন্ত কার্যকর হবে বলে কেউ বিশ্বাস করেনি।

আমার যখন দুই বছর বয়স তখন থেকেই বেনজির নির্বাসনে। তবে আব্বার কাছ থেকে বহুবার তাঁর কথা শুনেছি। তিনি দেশে আসবেন এবং আমরা আবার একজন নারীকে নেত্রী হিসেবে পাবো–এটা ভেবে আমি খুবই উচ্ছ্বসিত ছিলাম, কারণ বেনজিরের কারণেই আমার মতো মেয়েরা কথা বলতে ও রাজনীতি করার কথা ভাবতে পারতো। তিনি আমাদের রোল মডেল ছিলেন। তিনি আমাদের কাছে ছিলেন একনায়কত্বের অবসান ও গণতন্ত্রের নবযাত্রার প্রতীক। একইসঙ্গে বাকি বিশ্বে আমাদের আশা ও শক্তির বার্তা তার আসার খবরের মধ্য দিয়ে পৌঁছে যাচ্ছিল। তিনিই আমাদের একমাত্র বেসামরিক নেত্রী ছিলেন যিনি জঙ্গিবাদের কঠোর সমালোচনা করতেন এবং পাকিস্তানের সীমান্ত এলাকা থেকে লাদেনকে খুঁজে বের করার জন্য আমেরিকান সেনাদের সহায়তা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু লোক অবশ্য তাঁর এই বিষয়টি পছন্দ করেনি।

২০০৭ সালের ১৮ অক্টোবর। তিনি করাচিতে বিমানের সিঁড়ি দিয়ে পাকিস্তানের মাটিতে নামছিলেন, আমরা সবাই টেলিভিশনের সামনে বসে সে দৃশ্য দেখছিলাম। প্রায় নয় বছর নির্বাসনে থাকার পর দেশের মাটিতে পা রেখে তিনি কেঁদে ফেললেন। তিনি যখন একটা খোলা বাসে করে রাস্তা দিয়ে এগোচ্ছিলেন,

www.pathagar.com

তখন লাখ লাখ মানুষ তাঁকে দেখার জন্য রাস্তার দুপাশে জড়ো হয়েছিল। সেখানে সারাদেশ থেকে লোক এসেছিল। অনেকে তাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরও সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। তাদের মধ্যে অনেকে শান্তির প্রতীক সাদা কবুতর মুক্ত করে দিয়েছিল। যেগুলোর একটি বেনজিরের কাধের ওপর গিয়ে বসে পড়েছিল। সেখানে এত বেশি সংখ্যক লোকজমায়েত হয়েছিল যে বেনজিরকে বহনকারী বাসটি সামনে এগোতেই পারছিল না। বেনজিরের এই প্রত্যাবর্তন যাত্রা শেষ হতে কয়েক ঘণ্টা লেগে যাবে বুঝতে পেরে আমরা টেলিভিশনে সেই দৃশ্য দেখা বন্ধ করলাম। এর পরই আমি ঘুমিয়ে পড়ি।

মধ্যরাতের অল্প কিছুক্ষণ আগে জঙ্গিরা বেনজিরের গাড়িবহরে হামলা চালায়। কমলা রংয়ের কয়েকটি আগুনের শিখা বিকট শব্দে বেনজিরের গাড়িকে প্রায় উড়িয়ে ফেলে। পরদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে আব্বার কাছ থেকে এ খবর শুনি। আব্বা ও তাঁর বন্ধুরা এ ঘটনায় এতটাই হতবিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, সে রাতে তাঁরা আর ঘুমাতে যাননি। তবে সৌভাগ্যক্রমে তিনি সেদিন বেঁচে যান। বোমাটি বিস্ফোরণের কয়েক মুহূর্ত আগে তিনি পা দুটিকে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম দিতে বাস থেকে নেমে একটা সাজোয়া কম্পার্টমেন্টে গিয়ে বসেছিলেন। তবে বেনজির অক্ষত থাকলেও এই বোমা হামলায় দেড়শ মানুষ মারা যায়। তখন পর্যন্ত আমাদের দেশে যত বড় বোমা বিস্ফোরিত হয়েছিল এটি ছিল তার মধ্যে সবচেয়ে বড়। নিহতদের বেশিরভাগই ছিল ছাত্র। তারা বেনজিরের গাড়ির চারপাশে মানব শৃঙ্খল হিসেবে দাঁড়িয়েছিল। স্কুলে যারা বেনজিরের বিপক্ষে ছিল তারাও সেদিন দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। আমরাও বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিলাম। তবে এই ভেবে স্বস্তিবোধ করছিলাম যে তাঁর প্রাণ রক্ষা পেয়েছে।

এর সপ্তাহখানেক পরে জিপ আর হেলিকপ্টারের বিকট শব্দ নিয়ে সোয়াতে সেনাবাহিনী আসে। কপ্টারগুলো যখন প্রথম আসে তখন আমরা সবাই স্কুলে ছিলাম। সেগুলো দেখে আমরা আনন্দে উচ্ছসিত হয়ে উঠেছিলাম। হেলিকপ্টার দেখে আমরা ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলাম। তারা ওপর থেকে আমাদের দিকে টফি আর টেনিসবল ছুড়ে দিতে লাগলো। সেগুলো কুড়ানোর জন্য আমাদের মধ্যে রীতিমতো হুড়োহুড়ি লেগে গেল। সোয়াতে হেলিকপ্টার কদাচিতই দেখা যেতো। তবে আমাদের বাড়িটা স্থানীয় সেনা সদর দপ্তরের খুব কাছাকাছি ছিল বলে আমাদের বাড়ির ওপর দিয়েই মাঝে মাঝে হেলিকপ্টার উড়তে দেখতাম।

একদিন রাস্তায় এক লোক এসে বললেন, মসজিদ থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে আগামীকাল কারফিউ। কারফিউ কি জিনিস তা আমরা জানতাম না, তবে তাঁর কথায় আমরা খুব ভাবনায় পড়ে গেলাম। আমাদের প্রতিবেশী সাফিনাদের বাড়ি ও আমাদের বাড়ির মাঝখানের দেওয়ালে একটা ফুটো ছিল। আমরা দুই পরিবারের লোকজন ওই ফুটো দিয়ে কথা বলতাম। আমরা দেওয়ালে শব্দ করলে তারা ওই ফুটোর কাছে এসে দাঁড়াতো। ফুটোর সামনে গিয়ে তাদের বললাম, 'কারফিউ দিলে কি হয়?' তারা যখন কারফিউ দিলে কী কী হয় তা বোঝালো, আমরা তখন খুব খারাপ কিছু ঘটতে পারে এমনটা ভেবে রুম থেকেই বের হলাম না।

www.pathagar.com

শুনলাম, মোশাররফ তালেবান দমনের জন্য আমাদের উপত্যকায় ৩ হাজার সেনা পাঠিয়েছেন। কৌশলগত গুরুত্বের কথা বিবেচনায় রেখে তারা সমস্ত সরকারি বেসরকারি ভবনের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। এর আগে পর্যন্ত মনে হচ্ছিল, সোয়াতে যা হচ্ছিল পাকিস্তানের বাকি অংশ তা গুরুত্ব দিচ্ছিল না। সেনা মোতায়েনের পরের দিনই সোয়াতে আরেকটি আর্মি ট্রাকে এক আত্মঘাতী হামলা চালায়। এতে ১৭ জন সেনা ও ১৩ জন বেসামরিক লোক নিহত হয়। ওইদিন সমস্ত রাত ভারী অস্ত্র ও মেশিনগানের গুলিতে পাহাড়গুলো প্রকম্পিত হচ্ছিল। সেই রাতে ঘুমানো খুব কঠিন হয়ে পড়েছিল।

পরের দিন টেলিভিশনের খবরে শুনলাম উত্তর দিকের পাহাড়ে প্রচণ্ড লড়াই হয়েছে। আমাদের স্কুল বন্ধ রইল। আমরাও ঘর থেকে বের হলাম না। ঘটনা কোন দিকে যাচ্ছে তা বুঝতে চেষ্টা করছিলাম। মিঙ্গোরার বাইরে লড়াই হচ্ছিল। কিন্তু আমরা এখান থেকে স্পষ্টভাবে গুলির শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে বলা হলো তারা শতাধিক তালেবান যোদ্ধাকে হত্যা করেছে। কিন্তু নভেম্বর মাসের প্রথম দিনেই প্রায় সাতশ তালেবান সদস্য খাজাখেলার একটি সেনা অবস্থান দখল করে নেয়। সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর প্রায় ৫০ জন সেনা পালিয়ে যায় এবং ৪৮ জন তালেবানের হাতে ধরা পড়ে। তালেবান যোদ্ধারা তাদের কাছ থেকে তাদের ইউনিফর্ম ও হাতিয়ার কেড়ে নেওয়ার পর তাদের চরম অপমান অপদস্ত করে। পরে তাদের প্রত্যেকের হাতে পাঁচশ রুপি করে ধরিয়ে দিয়ে তাদের বাড়ি ফিরে যেতে বলে। এরপর তালেবান খাজাখেলার দুটো পুলিশ স্টেশন দখল করে এবং সেখান থেকে ময়দানের দিকে অগ্রসর হয়। ময়দানেও আরও পুলিশ অফিসার তাদের কাছে অস্ত্র সমর্পণ করে। মিঙ্গোরার বাইরে সোয়াতের বেশিরভাগ এলাকা খুব কম সময়ের মধ্যে তালেবানের হাতে চলে যায়।

১২ নভেম্বর মোশাররফ অতিরিক্ত হেলিকপ্টার গানশিপসহ আরও ১০ হাজার সেনা আমাদের উপত্যকায় পাঠানোর নির্দেশ দেন। অচিরেই এখানকার সর্বত্র সেনা উপস্থিতি দেখা গেল। পাহাড়ের পাদদেশে তারা বড় বড় বন্দুক তাক করে পাহারা দিচ্ছিল। এরপরই তারা ফজলুল্লাহর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অভিযান শুরু করে পরবর্তীতে এই অভিযান সোয়াতের প্রথম লড়াই হিসেবে পরিচিতি পায়। এই প্রথমবারের মতো ফাটার বাইরে সেনাবাহিনী স্বজাতির বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে। সোয়াতে সেনা অভিযান চলাকালে একবার এক ওয়াজ মাহফিল থেকে পুলিশ ফজলুল্লাহকে প্রায় ধরে ফেলেছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই প্রচণ্ড বালুঝড় শুরু হয়ে চারপাশ ধোয়াশাচ্ছন্ন হয়ে যায়। এর মধ্যে দিয়ে ফজলুল্লাহ নিশ্চিন্তে সটকে পড়েন। ফজলুল্লাহর আধ্যাত্মিক কেরামতির গল্প আগে থেকে লোকের মুখে মুখে ছড়াচ্ছিল। তার সঙ্গে এটি তাঁর বিরাট কেরামতি হিসেবে যুক্ত হলো।

ব্যাপক সেনাঅভিযানের পরও তারেবান পিছু তো হটলোই না বরং পূর্বের দিকে অগ্রসর হলো। ১৬ নভেম্বর শাংলার প্রধান শহর-আলপুরি ঘিরে ফেললো। কোনোরকম লড়াই ছাড়াই স্থানীয় পুলিশ পালিয়ে গেল। সেখানকার লোকজন বলেছে, হানা দেওয়া তালেবান যোদ্ধাদের মধ্যে কিছু বেচেন ও উজবেক

www.pathagar.com

যোদ্ধাদেরও দেখা গেছে। শাংলায় আমাদের গ্রামের বাড়ির লোকজনকে নিয়ে আমরা খুব চিন্তায় ছিলাম। তবে আব্বা বলেছিলেন, আমাদের গ্রামটা এত প্রত্যন্ত এলাকায় যে সেখানে তালেবান হয়তো থেকে চাইবে না। তাছাড়া স্থানীয় লোকজন তালেবান যোদ্ধারা যাতে সেখানে ঢুকতে না পারে সে ব্যাপারটা প্রায় নিশ্চিত করে ফেলেছিল।

প্রচুর সংখ্যক সেনা সদস্য মোতায়েন করায় এবং তাদের হাতে ভারী অস্ত্র থাকায় তারা দ্রুতই উপত্যকার দখল ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হলো। ফজলুল্লাহর সদর দপ্তর যেখানে, সেই ইমামদেড়ির দখল সেনাবাহিনীর হাতে চলে এলো। তালেবান যোদ্ধারা জঙ্গলের দিকে পালিয়ে গেল এবং ডিসেম্বরের প্রথম দিকে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে বলা হলো তারা প্রায় পুরো এলাকা তালেবানমুক্ত করে ফেলেছে। ফজলুল্লাহ পাহাড়ে আত্মগোপন করেছেন। তবে আব্বা বললেন, 'এই অবস্থা বেশিদিন থাকবে না। তারা তালেবানকে তাড়াতে পারেনি।'

কেবলমাত্র ফজলুল্লাহর জঙ্গি গ্রুপই যে সক্রিয় ছিল তা নয়। পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় এলাকায় বিভিন্ন আদিবাসী গোত্রের লোকদের নেতৃত্বে ভিন্ন ভিন্ন জঙ্গি গ্রুপ গড়ে উঠেছিল। সোয়াতের লড়াইয়ের সপ্তাহখানেক পরে আমাদের এই প্রদেশের চল্লিশজন তালেবান নেতা ওয়াজিরিস্তানে বৈঠক করলেন। সেখানে সম্মিলিতভাবে তারা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। সেখানে তারা তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি) বা পাকিস্তান তালেবান নামে একটি জঙ্গি মোর্চা গঠন করেন। তারা দাবি করেন, এই মোর্চার অধীনে চল্লিশ হাজার সশস্ত্র যোদ্ধা সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবে। টিটিপির নেতা হিসেবে তারা বায়তুল্লাহ মেহসুদকে নির্বাচন করেন। মেহসুদের বয়স ৩০ এর কোঠায়। আফগানিস্তানের যুদ্ধে তাঁর জঙ্গি গ্রুপগুলোকে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতা ছিল। অন্যদিকে, সোয়াত এলাকার টিটিপি প্রধান বানানো হলো ফজলুল্লাহকে।

সেনাবাহিনী আসার পর ভেবেছিলাম, এবার এখানে বন্দুকবাজির অবসান হবে। কিন্তু আমাদের ধারণা ভুল ছিল। আরও অনেক কিছু তখনও হওয়ার বাকি। তালেবান তখন বেছে বেছে শুধু রাজনীতিক, পার্লামেন্ট সদস্য, কিংবা পুলিশের ওপরই হামলা চালাচ্ছিল না, যারা পর্দানশীল ছিল না, শরিয়া মোতাবেক যারা দাড়ি রাখছিল না বা পাজামা-পাঞ্জাবী পরছিল না, তারাও তালেবানের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হচ্ছিল।

রাওয়ালপিণ্ডির লিয়াকত বাগে, যে উদ্যানে আমাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলীকে গুলি করে হত্যা করা হয়, সেখানে ২৭ ডিসেম্বর এক সমাবেশে বক্তব্য দেন বেনজির ভুট্টো। উল্লসিত জনতার উদ্দেশে তিনি বলেন, 'জনতার শক্তি দিয়েই আমরা উগ্রবাদ ও জঙ্গিবাদকে প্রতিহত করবো।' সমাবেশ শেষে একটা বুলেটপ্রুফ টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার গাড়িতে করে তিনি উদ্যান থেকে বের হচ্ছিলেন। গাড়ির ছাদের সানরুফ সরিয়ে সেখান দিয়ে মাথা বের করে তিনি সমর্থকদের উদ্দেশে হাত নাড়ছিলেন। হঠাৎ করেই গুলির আওয়াজ শোনা গেল। এরপরই বেনজিরের গাড়ির পাশে থাকা আত্মঘাতী হামলাকারী নিজের দেহে

www.pathagar.com

রাখা বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নিজেকে উড়িয়ে দিল। বেনজির গাড়ির সিটে পড়ে গেলেন। পরে মোশাররফ সরকার বলেছিল, বেনজিরের মাথায় সানরুফের বাড়ি লেগেছিল, তবে অন্যরা বলেছিল তাঁর মাথায় গুলি লেগেছিল।

খবর শোনার জন্য আমরা টেলিভিশনের সামনে বসেছিলাম। আমার নানী বললেন, 'মনে হচ্ছে বেনজির শহীদ হতে যাচ্ছেন।' আমরা কান্নাকাটি শুরু করে দিলাম এবং তাঁর জন্য দোয়া করতে থাকলাম। যখন শুনলাম তিনি মারা গেছেন, তখন মনে হলো আমার হৃদয় যেন আমাকে বলছে, 'কেন সেখানে যাচ্ছো না, নারীর অধিকার নিয়ে তুমি কেন লড়ছো না?' আমরা সবেমাত্র পুনরায় গণতন্ত্রের পথে যাচ্ছিলাম। কিন্তু লোকজন বলছিল, 'যেখানে বেনজিরকে হত্যা করা হয়। সেখানে আর কেউই নিরাপদ নয়।' তখন মনে হচ্ছিল আমার দেশের সামনে থেকে সব আশাই যেন উবে যাচ্ছে।

বেনজির হত্যার জন্য মোশাররফ টিটিপি নেতা বায়তুল্লাহ মেহসুদকে দায়ি করলেন এবং আড়ি পেতে ধারণ করা একটি ফোন কলের অডিও প্রকাশ করলেন। সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হলো, সেটি বায়তুল্লাহ মেহসুদের সঙ্গে তাঁর একজন সহযোগীর কথোপকথন। তাতে মেহসুদ তার সহযোগীকে হামলার ব্যাপারে দিকনির্দেশনা দিচ্ছিলেন। তবে তালেবানের সাধারণ ও স্বাভাবিক চরিত্রের ব্যতয় ঘটিয়ে বায়তুল্লাহ মেহসুদ এই হামলার দায় পুরোপুরি অস্বীকার করেন।

ক্বারী সাহেবদের বাড়িতে এনে আমার ও স্থানীয় অন্যান্য ছেলেমেয়েদের কোরান শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তালেবান আসার সময় আমি যখন কোরান খতম (প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করা) করলাম তখন আমার আলেম দাদাজান খুবই খুশি হলেন। আমরা কোরানের আরবী আয়াত তেলাওয়াত করি ঠিকই কিন্তু বেশিরভাগ লোকই এর অর্থ জানি না। কিন্তু আমি তখন কোরানের তরজমা-তাফসীর পড়া শুরু করেছিলাম। ওই সময় একদিন এক ক্বারী সাহেবের কথা শুনে রীতিমতো আঁতকে উঠেছিলাম। বেনজিরকে হত্যা করা ঠিক ছিল–তিনি এমনটাই বলার চেষ্টা করছিলেন। তিনি বলছিলেন, 'সে মরেছে। ভালো হয়েছে। বেঁচে থাকতে সে তো অপদার্থ ছিল। ঠিকমতো ইসলাম মানতো না। সে বেঁচে থাকলে আরও অনেক বেশি ফিৎনা ফ্যাসাদ হতো।'

আমি ক্বারী সাহেবের কথা আব্বাকে বললাম। আব্বা বললেন, 'আমাদের সামনে তো অন্য পথ নেই। কোরান শিক্ষার জন্য এই আলেমদের ওপরই আমাদের ভরসা করতে হয়।' আব্বা বললেন, 'কোরানের কেবলমাত্র আক্ষরিক অর্থ বোঝার জন্য তাঁকে (ক্বারী সাহেবকে) কাজে লাগাও। কিন্তু তিনি কোরানের যে ব্যাখ্যা দেবেন তা মানবে না। আল্লাহ যা বলেছেন শুধু সেটার আক্ষরিক অর্থ তাঁর কাছ থেকে শেখ। আল্লাহর কালাম হলো, জান্নাতি পয়গাম যেটা তাফসির করার ক্ষেত্রে তুমি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র।'

www.pathagar.com

১১

বুদ্ধিমতিদের ক্লাস

ওই দুর্বিসহ অন্ধকার দিনগুলোতেও আমি স্কুলে যাওয়া অব্যাহত রেখেছিলাম। স্কুলে যাওয়ার পথে যে কেউ আমাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় তাকে আমার তালেব বলে মনে হতো। যাওয়ার সময় স্কুল ব্যাগ ও বইপত্র ওড়নার নিচে লুকিয়ে রাখতাম। আব্বা বলতেন, শিশুরা ইউনিফর্ম পরে স্কুলে যাচ্ছে– এটি যে কোনো গ্রামের ভোরবেলার সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য। অথচ এখন আমাদের সেই ইউনিফর্ম পরতেই ভয় করছে।

আমরা প্রাথমিক স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে হাইস্কুলে সবে উঠেছি। প্রধান শিক্ষয়ত্রী মরিয়ম আপা বলতেন, আমরা নাকি এতো বেশি প্রশ্ন করি যে, কোনো শিক্ষক আমাদের ক্লাস নিতে রাজি হচ্ছিলেন না। নিজেদের বুদ্ধিমতি হিসেবে তুলে ধরতে আমাদের খুব ভালো লাগতো। ছুটির দিনে অথবা কোনো বিয়ের অনুষ্ঠানে গেলে আমরা হাতে মেহেদী লাগাতাম। মেহেদী দিয়ে ফুল কিংবা প্রজাপতি আঁকার বদলে সেখানে ক্যালকুলাস ও রসায়নের ফর্মুলা আকতাম। মালকায়ে নূরের সঙ্গে আমার প্রতিদ্বন্দ্বীতা চলছিলই। আমাকে হারিয়ে সে প্রথম হয়ে যাওয়ার পর আমি আগের চেয়ে অনেক বেশি পরিশ্রম করতে শুরু করি এবং আবার আমার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করে প্রথম হই। এরপর থেকে বরাবরই মালকায়ে নূর দ্বিতীয় এবং মনিবা তৃতীয় হতো। শিক্ষক-শিক্ষিকারা আমাদের বলতেন, তাঁরা প্রথমে দেখতেন পরীক্ষার খাতায় আমরা কতটুকু লিখেছি। এরপর লেখার উপস্থাপনার দিকে নজর বুলাতেন। আমাদের তিনজনের মধ্যে মনিবার হাতের লেখা এবং উপস্থাপনা সবচেয়ে ভালো ছিল। আমি তাকে বিষয়টি বহুবার বলেছি, কিন্তু তার নিজের ওপর ততটা আস্থা ছিল না। সে এই ভয়ে রাতদিন পড়াশুনা করতো যে, পরীক্ষায় ভালো ফল না হলে তার পরিবারের পুরুষ সদস্যরা তাকে ফল খারাপ করার অজুহাতে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে আনতে পারে। গণিতে আমি সবচেয়ে কাঁচা ছিলাম। একবার তাতে শূন্য পেয়েছিলাম। কিন্তু আমি অংক রপ্ত করার জন্য কঠোর সাধনা শুরু করলাম। আমাদের রসায়নের শিক্ষক ওবায়দুল্লাহ স্যার বলতেন, আমি নাকি জন্মগতভাবেই রাজনীতিক; কারণ মৌখিক পরীক্ষার শুরুতেই আমি সব সময় পরীক্ষককে বলতাম, 'স্যার, আপনিই আমাদের স্কুলের সেরা শিক্ষক। আপনার ক্লাসই আমার সবচেয়ে প্রিয়।'

www.pathagar.com

অনেক ছাত্র-ছাত্রীর বাবা মায়ের অভিযোগ ছিল, আব্বা স্কুলের মালিক বলে শিক্ষকেরা পক্ষপাতিত্ব করে আমাকে ফার্স্ট বানিয়ে দিতেন। কিন্তু সবাই যখন দেখতো আমাদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা থাকার পরও আমরা সবাই খুব ভালো বন্ধু এবং আমরা কেউ কারও প্রতি ঈর্ষান্বিত নই; তখন তারা খুব অবাক হতো। বোর্ড পরীক্ষাতেও আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতো। এই পরীক্ষার মাধ্যমে জেলার বেসরকারী স্কুলগুলোর সেরা শিক্ষার্থীদের নির্বাচন করা হতো। একবার এই পরীক্ষায় আমি আর মালকায়ে নূর দুজনে একই নম্বর পেয়েছিলাম। আমাদের দুজনের মধ্যে কে পুরস্কার পাবে তা নির্ধারণ করতে বোর্ড থেকে ভিন্ন প্রশ্নপত্রে আবার পরীক্ষা নেওয়া হলো, এবং মজার ব্যাপার হলো আমরা দুজন আবার একই নম্বর পেলাম। আমাকে যে স্কুলের মালিকের মেয়ে বলে আলাদা সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না তখন তা সবাই মেনে নিল। আব্বা এবার তাঁর বন্ধু আহমদ শাহর মালিকানাধীন আরেকটা স্কুলে আমাদের পরীক্ষা নেওয়ার ব্যাবস্থা করলেন। সেখানেও দুজনের নম্বর এক হলো। এবার কর্তৃপক্ষ দুজনকেই সেরা ছাত্রী ঘোষণা করলো। দুজনকেই পুরস্কার দেওয়া হলো।

স্কুলে লেখাপড়ার বাইরেও অনেক কিছু করার ছিল। আমরা স্কুলে নাটক মঞ্চস্থ করে তাতে অভিনয় করতে ভালোবাসতাম। একবার 'রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট' নাটক অবলম্বনে দুর্নীতির ওপর একটা নাটিকা লিখেছিলাম। তাতে রোমিও নামের এক সরকারি আমলা ছিল প্রধান চরিত্র। আমি রোমিওর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলাম। নাটিকায় দেখা যায় রোমিও চাকরি প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন। প্রথম প্রার্থী ছিল একটি মেয়ে। মেয়েটি খুব সুন্দরী বলে রোমিও তাকে পানির মতো সহজ প্রশ্ন করতে থাকেন। যেমন : 'বলুন তো, একটা সাইকেলে কয়টা চাকা থাকে?' মেয়েটি যখন উত্তর দিলো, 'দুটো', তখন রোমিও আহ্লাদে গদগদ হয়ে বললেন, 'বাপরে! আপনি এত মেধাবী!' পরের প্রার্থী পুরুষ হওয়ায় তাকে যেসব প্রশ্নের জবাব দেওয়া প্রায় অসম্ভব সেসব প্রশ্ন করতে লাগলেন। যেমন : 'আপনি আপনার চেয়ার ছেড়ে না উঠে আমাদের মাথার ওপরের ওই ফ্যানটা চালাবেন কীভাবে?' প্রার্থী যখন বললেন, 'এটা আমার পক্ষে বলা কিভাবে সম্ভব?'

রোমিও বললেন, 'আপনি বলছেন, আপনি একজন পিএচডি ডিগ্রিধারী। আর এই সহজ ব্যাপারটা জানেন না!' অতঃপর রোমিও মেয়েটিকেই চাকরি দেবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন।

মেয়ে প্রার্থীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিল মনিবা। আমার সহকারীর ভূমিকায় ছিল আতিয়া নামের আরেক সহপাঠী। আতিয়া একটু টক-ঝাল-মিষ্টি ভাঁড়ামি করেছিল। নাটিকাটি দেখে সবাই খুব হেসেছিল। আমি লোকজনের কথা বলা ও বডি ল্যাঙ্গুয়েজ নকল করতে ভালোবাসতাম। ক্লাসের বিরতির সময় বন্ধুরা আমাকে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের; বিশেষ করে ওবায়দুল্লাহ স্যারের কথা বলার ভঙ্গি নকল করে দেখানোর জন্য অনুরোধ করতো। নানা সমস্যায় জর্জরিত সেই গুমোট সময়টাতে একটু প্রাণ খুলে হাসার জন্য ছোট ছোট উপলক্ষ্য খুব প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল।

www.pathagar.com

২০০৭ সালের শেষ দিকের সেনা তৎপরতা সহসাই আমাদের তালেবানের কবল থেকে মুক্তি দিতে পারেনি। সোয়াতে সেনাবাহিনী অবস্থান নিয়েছিল এবং সারা শহর জুড়ে তারা সার্বক্ষণিক টহল দিচ্ছিল। এরপরও ফজলুল্লাহ প্রতিদিনই রেডিওতে যথারীতি ওয়াজ করে যাচ্ছিলেন। ২০০৮ সালের পুরোটা সময় জুড়ে হত্যা ও বোমা বিস্ফোরণের ভেতর দিয়ে পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে চলে যায়। ওই সময় সর্বক্ষণ আমরা সেনাবাহিনী ও তালেবান নিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলতাম এবং তখন আমাদের মনে হচ্ছিল আমরা এই দুইপক্ষের মাঝখানে পড়ে অহর্নিশ পিষ্ট হচ্ছি। আতিয়া আমাকে ক্ষেপানোর জন্য বলতো, 'তালেবান ভালো, সেনাবাহিনী ভালো নয়।' আমি তখন তাকে বলতাম, 'একটা সাপ আর একটা সিংহ যদি আমাদের মারতে আসে, তখন আমরা কাকে ভালো বলবো? সাপকে না সিংহকে?

বাইরে যে ভীতিকর ছমছমে পরিবেশ ছিল সে তুলনায় স্কুল আমাদের কাছে ছিল জান্নাতের মতো। আমি ছাড়া আমার ক্লাসের প্রায় সবার ইচ্ছা ছিল ডাক্তার হওয়ার। কিন্তু আমি ভাবতাম আমি ভবিষ্যতে একজন আবিষ্কারক হবো। আমি তালেবান বিধ্বংসী এমন মেশিন আবিষ্কার করবো যা দিয়ে তাদের বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্র নিমিশেই ধ্বংস করে ফেলা যাবে। স্কুলের মধ্যে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ থাকলেও অবশ্যই স্কুলও তালেবান হামলার হুমকির মধ্যে ছিল। ভয়ে আমাদের অনেকে স্কুলে আসা বন্ধ করেও দিয়েছিল। ফজলুল্লাহ ছাত্রীদের স্কুলে না গিয়ে বাড়িতে থাকার জন্য রেডিওতে ঘোষণা দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর লোকজন কারফিউয়ের মধ্যে রাতে যখন ছেলে মেয়েরা স্কুলে থাকতো না তখন স্কুলগুলো উড়িয়ে দেওয়া শুরু করেছিল।

তালেবান সর্বপ্রথম যে স্কুলভবনটি উড়িয়ে দিয়েছিল সেটি ছিল মাত্তা এলাকার। সাওয়ার জঙ্গি নামের স্কুলটি ছিল একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। কেউ এমন কাজ করতে পারে আমরা তা বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না। এরপর প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও বোমা বিস্ফোরিত হতো। এমনকি মিঙ্গোরাতেও বিস্ফোরণ হতো। একদিন আমি রান্নাঘরে কাজ করছি। হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে পরপর দুটো বোমার বিস্ফোরণ হলো। বোমা দুটি এত কাছে ফেটেছিল যে আমাদের পুরো বাড়ি কেঁপে উঠেছিল এবং জানালার ওপরের বায়ু নিষ্কাষণের ফ্যান খুলে নিচে পড়ে গিয়েছিল। আমি ভয়ে রান্নাঘর থেকে বের হয়ে এখানে ওখানে ছোটাছুটি করছিলাম।

২০০৮ সালে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষদিনে আমি যখন রান্নাঘরে কাজ করছি; হঠাৎ আবার বিকট বিস্ফোরণের শব্দ পেলাম। এটা ছিল একেবারেই কানে তালা লেগে যাওয়ার মত শব্দ এবং খুব কাছেই বোমাটি ফেটেছিল। বোমা ফাটলে আমরা সব সময় যা করি, তাই করছিলাম। দৌড়াদৌড়ি করে একে আরেকজনের খোঁজ নিচ্ছিলাম। দেখছিলাম সবাই ঠিক আছে কি না। 'খাইস্তা, পিশো, ভাবি, খুশাল, অটল!'– সবাই সবাইকে ভয়ার্ত কণ্ঠে ডাকছিলাম। একটু পরেই একের পর এক অ্যাম্বুলেন্সের শব্দ। মনে হলো মিঙ্গোরার সব অ্যাম্বুলেন্স

www.pathagar.com

আমাদের বাসার কাছ দিয়ে যাচ্ছে। হাজিবাবা হাইস্কুলের বাস্কেটবল কোর্টে ওইদিন এক জঙ্গি আত্মঘাতি হামলা চালায়। স্থানীয় জনপ্রিয় পুলিশ কর্মকর্তা জাভিদ ইকবাল প্রত্যন্ত এলাকা থেকে তালেবানের হাত থেকে পালানোর সময় এক আত্মঘাতী হামলায় নিহত হয়েছিলেন। জাভিদ ইকবালের জন্মস্থান মিঙ্গোরা হওয়ায় লাশ বাস্কেটবল কোর্টে আনা হয় পুলিশ স্যালুট দেওয়ার এবং জানাজার জন্য। জানাজার প্রস্তুতিকালে তালেবান সেখানে আবার আত্মঘাতি হামলা চালায়। নিহত জাভিদ ইকবালের শিশুসন্তানসহ ৫৫ জনের বেশি মানুষ মারা যায়। নিহতদের অনেককেই আমি চিনতাম। মনিবাদের পরিবারের ডজনাদশেক সদস্য সেখানে ছিল। তাদের কেউ নিহত, কেউ আহত হয়েছিল। মনিবা একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল এবং পুরো মিঙ্গোরা এক শোকের নগরে পরিণত হয়েছিল। প্রত্যেক মসজিদে শোক প্রকাশ করে নিহতদের জন্য বিশেষ দোয়া করা হয়েছিল।

এ ঘটনার পর আমি আব্বাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'তুমি কি এখন ভয় পেয়েছো?' আব্বা আমাকে বলেছিলেন, 'জানি, রাতে আমাদের ভয় বেড়ে যায় এটা ঠিক। কিন্তু ভোর হলে, আলো আসলে আমরা আবার সাহস খুঁজে পাই।' আমার পরিবারের জন্য এটা খুবই সত্যি কথা ছিল। আমরা ভয় পেতাম; কিন্তু আমাদের সাহসের শক্তিমত্তার মতো ভয় অতটা জোরালো হয়ে উঠতে পারতো না। আব্বা বললেন, 'আমাদের এই উপত্যকাকে অবশ্যই তালেবানমুক্ত করতে হবে এবং এজন্য এই ভয়ভীতিকে কিছুতেই পাত্তা দেওয়া যাবে না।

সংকটকাল সামনে চলে এলে আমরা পশতুনরা পুরনো আস্থাশীল পথেই নিজেদের সংগঠিত করি। ঠিক সেই মতে ২০০৮ সালে ফজলুল্লাহকে প্রতিহত করতে সোয়াতের গন্যমান্য মুরুব্বীরা ক্বওমী জিরগা নামের একটি পরিষদ গঠন করেন। মুখতার খান ইউসুফজাই, খুরশিদ কাকাজি এবং জাহিদ খান– সর্বজন শ্রদ্ধেয় এই তিনজন প্রবীন ব্যক্তি হুজরা থেকে হুজরায় গিয়ে সবাইকে একতাবদ্ধ হতে বললেন। তাদের মধ্যে শুভ্র শশ্রুমণ্ডিত ৭২ বছর বয়সী আবদুল খান খালিকও ছিলেন। ব্রিটেনের রানী সোয়াতে এসে আমাদের ওয়ালির সাথে যখন ছিলেন তখন রানীর দেহরক্ষি ছিলেন খালিক। আব্বা না ছিলেন একজন খান; না তাঁর বয়স ছিল বেশি। তা সত্ত্বেও তিনি যেহেতু কথা বলতে ভয় পেতেন না, সেহেতু তাঁকে এই পরিষদের মুখপাত্র করা হয়। আব্বা পশতু ভাষায় খুব কাব্যিকভাবে বক্তব্য দিতেন। তবে আমাদের জাতীয় ভাষা উর্দু এবং ইংরেজিতেও অনর্গল বলতে পারতেন। অর্থাৎ সোয়াত এবং সোয়াতের বাইরে সবার সঙ্গে যোগাযোগ করার মতো একজন কার্যকর মুখপাত্র ছিলেন আব্বা।

আব্বা আমাকে বলতেন, 'যে সংগঠনই শান্তির জন্য কাজ করবে আমি তাতে যোগ দেব। তুমি যদি কোনো কোন্দল মিমাংসা করতে চাও, কিংবা সংঘাত থেকে বেরিয়ে আসতে চাও তাহলে প্রথমেই তোমাকে সত্য বলতে হবে।

www.pathagar.com

তোমার যদি মাথাব্যথা হয়, আর তুমি যদি ডাক্তারকে বলো পেটে ব্যথা হচ্ছে, তাহলে কীভাবে ডাক্তার তোমাকে সাহায্য করবেন। তোমাকে অবশ্যই সত্য বলতে হবে। এই সত্যই ভয়কে নিশ্চিহ্ন করে দেবে।'

আব্বা যখন তাঁর সহযোদ্ধাদের সঙ্গে, বিশেষ করে তাঁর পুরনো বন্ধু আহমদ শাহ, মোহাম্মদ ফারুক এবং জাহিদ খানের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন তখন তাঁর সঙ্গে আমিও যেতাম। আহমদ শাহেরও একটা স্কুল ছিল। সেখানে মোহাম্মদ ফারুক চাকরি করতেন। মাঝে মাঝে তাঁরা আহমদ শাহের বাড়ির লনে বসে গল্প করতেন। জাহিদ খান ছিলেন একজন হোটেল মালিক। তার হুজরা ছিল অনেক বড়। তাঁরা যখন আমাদের বাসায় আসতেন, তখন আমি তাদের জন্য চা বানিয়ে আনতাম। তাদের আলোচনা চুপচাপ বসে শুনতাম। তঁরা বলতেন, 'মালালা শুধু জিয়াউদ্দিনের মেয়ে নয়, সে আমাদের সবার মেয়ে।'

তারা সবাই পালা করে ইসলামাবাদ ও পেশোয়ারে যাওয়া আসা করতেন। তারা সেখানে গণমাধ্যমে, বিশেষ করে ভয়েস অব আমেরিকা এবং বিবিসির রেডিওতে তারা প্রচুর সাক্ষাৎকার দিতেন। তারা এমনভাবে পালা করে সেখানে যেতেন যাতে সব সময় একজন না একজন যাতে সেখানে হাজির থাকা যায়। তারা মিডিয়াকে বলতেন, সোয়াতে যা হচ্ছে তার সঙ্গে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। আব্বা বলতেন, সেনাবাহিনীর কোনো একটি অংশ এবং আমলাতান্ত্রিক সহায়তা ছাড়া সোয়াতে তালেবান উপস্থিতি সম্ভব ছিল না।

নাগরিকদের অধিকার রক্ষা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। কিন্তু আপনি যখন রাষ্ট্র এবং অ-রাষ্ট্রের পার্থক্য খুঁজে পাবেন না এবং অ-রাষ্ট্রের হাত থেকে রাষ্ট্র আপনাকে রক্ষা করবে– এই আস্থা রাখতে পারবেন না তখন বুঝতে হবে পরিস্থিতি কতটা জটিল।

আমাদের সেনাবাহিনী এবং আইএসআই খুবই শক্তিধর। আমাদের বেশিরভাগ লোকই তাদের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে ভয় পায়। কিন্তু আব্বা ও তাঁর বন্ধুরা তাদের ভয় পাননি। তারা সেনাবাহিনী ও আইএসআইদের উদ্দেশে বলতেন, 'আপনারা যা করছেন তা আমাদের জনগণ ও পাকিস্তানের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাচ্ছে।' তাঁরা বলতেন, 'তালেবানীকরণে সমর্থন দেবেন না। এটা অমানবিক। আমরা শুনেছি, পাকিস্তানের নামে সোয়াতকে বিসর্জন দেওয়া হচ্ছে; কিন্তু রাষ্ট্রের জন্য কাউকে বা কিছুকেই বিসর্জন দেওয়া যেতে পারে না। রাষ্ট্র হচ্ছে মায়ের মতো। মা কখনও তার সন্তানকে ত্যাগ করতে বা সন্তানের সঙ্গে প্রতারণা করতে পারে না।' বেশিরভাগ লোকই মুখ খুলছে না– এই বিষয়টাকে আব্বা সাংঘাতিক ঘৃণা করতেন। আব্বা তাঁর পকেটে নাৎসী জার্মানিতে বসবাসকারী কবি মার্টিন নিয়েমায়েলারের লেখা একটি কবিতা রাখতেন।

প্রথমে তারা কমিউনিস্টদের ধরতে এল
আমি কিছু বললাম না, কারণ আমি কমিউনিস্ট নই।
এরপর তারা ধরতে এল সোশালিস্টদের

www.pathagar.com

আমি কিছু বললাম না, কারণ আমি সোশালিস্ট নই।
তারপর তারা ধরতে এল ট্রেড ইউনিয়নিস্টদের
আমি কিছু বললাম না, কারণ আমি ট্রেড ইউনিয়নিস্ট নই।
তারপর তারা ইহুদিদের মারতে এল
আমি কিছু বললাম না, কারণ আমি ইহুদি নই।
তারপর তারা ক্যাথলিকদের মারতে এল
আমি কিছু বললাম না, কারণ আমি ক্যাথলিক নই।
তারপর তারা আমাকে ধরতে এল
তখন আর বাকি নেই কেউ
যে আমাকে বাঁচাতে আসতে পারে ছুটে।

আমি জানতাম আব্বা ঠিক পথেই ছিলেন। জনগণ যদি চুপ মেরে থাকে তাহলে কিছুই পরিবর্তন করা সম্ভব না।

স্কুলে আব্বা একটি শান্তি মিছিলের আয়োজন করেন এবং যা ঘটছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে আমাদের উৎসাহিত করতেন। মনিবা বিষয়টিকে খুব ভালোভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিল। সে বলতো, 'আমরা পশতুনরা ধর্মভীরু মানুষ। তালেবানের কারণে সারা পৃথিবী আমাদের সন্ত্রাসী মনে করছে। কিন্তু এটা আসল সত্য নয়। আমরা শান্তিপ্রিয়। আমাদের পাহাড়, বৃক্ষ, স্কুল– সবই শান্তির প্রতিনিধিত্ব করে।' জঙ্গিবাদের কারণে স্কুল থেকে মেয়েদের ঝরে পড়া নিয়ে পশতুন ভাষার একমাত্র বেসরকারী টেলিভিশন এটিভি খাইবার একটি অনুষ্ঠান করেছিল। টেলিভিশনটি আমাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছিল। শিক্ষকেরা আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন কীভাবে সাক্ষাৎকারের সময় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। আমি একা নই আমার অনেক বন্ধুই সেখানে কথা বলেছিল। আমাদের বয়স যখন এগারো বা বারো বছর তখন আমরা একসঙ্গে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতাম। কিন্তু বয়স তেরো বা চৌদ্দ বছর হওয়ার পর আমার বান্ধবীদের তাদের বাবা ও ভাইয়েরা আর মিডিয়ায় কথা বলতে দিতেন না। তাঁরা মনে করতেন তাঁদের মেয়েরা বা বোনেরা পর্দার আওতায় আসার মতো বালেগ হয়ে গেছে। তাছাড়া বান্ধবীদের অনেকে ভয়ও পেত।

একদিন আমি আমাদের দেশের অন্যতম বড় টেলিভিশন চ্যানেল জিও টিভির অফিসে গিয়েছিলাম। সেখানে পুরো একটা দেওয়াল জুড়ে দেখলাম অসংখ্য টেলিভিশন স্ক্রিন। একসঙ্গে এতগুলো চ্যানেল দেখে আমি তাজ্জব বনে গেলাম। তখন ভাবলাম, মিডিয়ার ইন্টারভিউ দরকার। তারা কোনো একটি স্কুল পড়ুয়া মেয়ের সাক্ষাৎকার নিতে চায়। কিন্তু মেয়েরা সেই সাক্ষাৎকার দিতে ভয় পাচ্ছে। আবার কোনো মেয়ে যদি ভয় নাও পায় তাহলে তার বাবা মা তাকে অনুমতি দিচ্ছে না। কিন্তু আমার আব্বা মোটেও ভয় পেতেন না। তিনি বরাবরই আমার পাশে দাঁড়িয়েছেন। তিনি বলতেন, 'তুমি একজন শিশু। কথা বলার অধিকার তোমারও আছে।' আমি যত বেশি সাক্ষাৎকার দিয়েছি তত বেশি নিজেকে শক্ত

www.pathagar.com

মনে হয়েছে; তত বেশি মানুষের সমর্থন পেয়েছি। আমার বয়স ১১ বছর হলেও আমাকে আরেকটু বয়সী মনে হতো এবং মনে হচ্ছিল মিডিয়া ছোট্ট ছোট্ট মেয়েদের কথা শুনতে চাইছিল।

এক সাংবাদিক আমার নাম দিয়েছিলেন 'তাকরা জেনাই'– অর্থাৎ 'উজ্জল মেধাবী তরুণী'। আরেক সাংবাদিক আমাকে বলেছিলেন, 'পাখা জেনাই'– অর্থাৎ জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তায় যে নিজের বয়েসকে অতিক্রম করেছে। আমার মনে সব সময় দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আল্লাহ্ আমার সহায় আছেন। আমি যদি আমার অধিকার নিয়ে; মেয়েদের অধিকার নিয়ে কথা বলে থাকি তাহলে আমি কোনো ভুল করিনি। বরং এটাকেই আমি আমার কর্তব্য মনে করেছি। এরকম সংকটময় মুহূর্তে আমাদের কার কী আচরণ তা নিশ্চয়ই আল্লাহ দেখতে চান। কুরআনে বলা হয়েছে, 'মিথ্যা অপসারিত হবে এবং সত্য অবশ্যই উদ্ভাসিত হবে।' আমি ভাবতাম, ফজলুল্লাহর মতো একজন মানুষ যদি সব কিছু ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে তাহলে আমার মতো একজন কেন সব পরিবর্তন করতে পারবে না? প্রতি রাতে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করতাম তিনি যেন আমাকে আরও শক্তি দেন।

সোয়াতের মিডিয়া তালেবানের খবর ইতিবাচকভাবে পরিবেশনের জন্য বরাবরই চাপে ছিল। তালেবান যখন একের পর এক স্কুল গুড়িয়ে দিচ্ছিল তখন কিছু মিডিয়া তালেবানের মুখপাত্র মুসলিম খানকে সম্মানসূচকভাবে 'স্কুল দাদা' হিসেবে উল্লেখ করত। তবে স্থানীয় অনেক সাংবাদিকই তালেবান এই উপত্যকায় যা করছিল তার জন্য অসন্তুষ্ট ছিল এবং তাঁরা আমাদের অনেক শক্তিশালী প্লাটফর্ম দিয়েছিলেন।

আমাদের নিজেদের গাড়ি ছিল না। তাই মিডিয়ায় কথা বলতে আমরা রিকশাতেই যেতাম। অনেক আব্বার বন্ধুরা আমাদের এসে নিয়ে যেত। বিখ্যাত কলামিস্ট ওয়াসাতুল্লাহ্ খানের সঞ্চালনায় বিবিসি উর্দুর টক শোতে যোগ দিতে আব্বা আর আমি একদিন পেশোয়ারে গিয়েছিলাম। আব্বার বন্ধু ফজল মাওলা এবং তাঁর মেয়ের সঙ্গে আমরা সেখানে গিয়েছিলাম। দুই বাবার সঙ্গে দুই মেয়ে। ওই টকশোতে তালেবানের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন তাদের মুখপাত্র মুসলিম খান। তবে মুসলিম খান স্টুডিওতে ছিলেন না। আমি কিছুটা নার্ভাস ছিলাম। তবে বুঝতে পারছিলাম টক শোটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ পুরো পাকিস্তানের অগণিত শ্রোতা সেটি শুনবে। শো' শুরু হলে আমি বললাম, 'তালেবানের এত সাহস কি করে হলো যে তারা আমার শিক্ষার মতো মৌলিক অধিকার কেড়ে নেয়?' আমার এই প্রশ্নের জবাব মুসলিম খানের দিক থেকে এলো না কারণ মোবাইল ফোনে তাঁর যে সাক্ষাৎকারটি নেওয়া হয়েছিল তা ছিল আগে ধারণ করা। আগে ধারণ করা রেকর্ড দিয়ে কি সরাসরি অনুষ্ঠানের প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায়?

অনুষ্ঠান শেষে সবাই আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। আমার আব্বা খুব হেসেছিলেন এবং আমাকে রাজনীতিতে নাম লেখাতে বলেছিলেন। আব্বা ঠাট্টা করে বলেছিলেন, 'পুঁচকে মেয়ে হলেও তুমি তো ঝানু রাজনীতিকের মতো কথা

www.pathagar.com

বলে গেছ?' তবে আমি নিজে কখনো আমার সাক্ষাৎকার শুনে দেখিনি। আমি জানতাম, তালেবানের মতো এত বড় শক্তির সামনে এগুলো খুবই নগন্য পদক্ষেপ।

আমরা বলে যাচ্ছিলাম আর আমাদের কথাগুলো ইউক্যালিপটাস ফুলের রেণুর মতো বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছিল। অন্য দিকে তালেবানের স্কুল ধ্বংস চলছিলই। ২০০৮ সালের ৭ অক্টোবর রাতে বহু দূর থেকে পর পর কয়েকটি বিস্ফোরণের শব্দ পেলাম। পরের দিন সকালে জানলাম, মুখোশধারী জঙ্গিরা মেয়েদের সাঙ্গোতা কনভেন্ট স্কুল এবং ছেলেদের এক্সেলসোর কলেজ উচ্চমাত্রার বিস্ফোরক (ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইসেস বা আইইডিএস) দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে। আগাম হুমকি পেয়ে শিক্ষকেরা আগেই সেখান থেকে সরে গিয়েছিলেন। এই দুটি স্কুল ছিল খুবই বিখ্যাত। বিশেষ করে সাঙ্গোতা স্কুলটি আমাদের সর্বশেষ ওয়ালির আমল থেকেই শিক্ষাদানের দিক থেকে খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। শিক্ষার্থীর সংখ্যার দিক থেকেও স্কুল দুটি অনেক বড় ছিল। এক্সেলসোর কলেজে দুই হাজার ছাত্র এবং সাঙ্গোতায় এক হাজার ছাত্রী পড়তো। বোমা বিস্ফোরণের পর আব্বা ওই এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে দেখেন স্কুল দুটির ভবনগুলো সম্পূর্ণ গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। চুরমার হওয়া ইট পাথরের ওপর দাড়িয়ে আব্বা কয়েকটি টেলিভিশনের সাংবাদিকদের সাক্ষাতকার দিলেন। এরপর তিনি নিজে বিধ্বস্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরলেন। আব্বা বললেন, 'সেখানে এখন শুধু ইট-পাটকেলই অবশিষ্ট আছে।'

এরপরও আব্বা আশাবাদী ছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, এমন দিন আসবে যখন এই ধ্বংসযজ্ঞের অবসান হবে। যেটি তাঁকে সবচেয়ে বেশি পীড়া দিত, সেটি হলো ধ্বংস করা স্কুল ভবনের মালামাল লুট। তালেবান বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ভবন ধ্বসিয়ে দেওয়ার পর পরই স্থানীয় লোকজন চেয়ার টেবিল, বই-পত্র, কম্পিউটার– সব লুটপাট করে নিত। এসব শুনে আব্বা রাগে চিৎকার করে বলতেন, 'এরা সব মড়ার ওপর বসা ঘৃণ্য শকুন।'

পরের দিন ভয়েস অব আমেরিকার একটি লাইভ অনুষ্ঠানে আব্বা ক্রুদ্ধভাবে এই হামলার নিন্দা জানান। তালেবান মুখপাত্র মুসলিম খানও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। আব্বা তাঁকে বললেন, 'স্কুল দুটোতে এমন কী হচ্ছিল যে আপনারা সেগুলোকে বোমা মেরে উড়িয়ে দিলেন?' মুসলিম খান বললেন, 'সাঙ্গোতা একটা কনভেন্ট স্কুল; সেখানে খ্রিস্টান ধর্মের প্রচার চলছিল। অন্যদিকে, এক্সেলসোরে সহশিক্ষা ব্যবস্থা ছিল, ছেলে মেয়েদের একসাথে পড়ানো হতো।' আব্বা বললেন, 'এই দুটো কথাই মিথ্যা।' আব্বা বললেন, ১৯৬০ এর দশক থেকে সাঙ্গোতা স্কুল তাদের কার্যক্রম চালাচ্ছে। এ পর্যন্ত তারা একজন লোককেও খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করেনি, উল্টো তাঁদের কয়েকজন ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। তাছাড়া এক্সেলসোর স্কুলে শুধুমাত্র প্রাথমিক শাখায় ছেলে মেয়েদের একসঙ্গে পাঠদান করা হতো।' আব্বার এই কথায় মুসলিম খান

www.pathagar.com

কোনো জবাব দিলেন না। আমি আব্বাকে বললাম, 'তাঁদের নিজেদের মেয়েদের কী অবস্থা? তাঁরা কি চান না তাঁদের মেয়েরাও পড়াশুনা শিখুক?'

আমাদের মরিয়ম ম্যাডাম সাঙ্গোতায় পড়াশুনা করেছেন। তাঁর ছোট বোন আয়েশা তখন ওই স্কুলে পড়ছিল। এই ঘটনার পর আয়েশা ও তার কয়েকজন সহপাঠী আমাদের স্কুলে চলে আসে। তালেবানের ভয়ে ইতিমধ্যে অনেক ছাত্রী স্কুল ছেড়ে চলে গেছে। তাদের কাছ থেকে মাসিক বেতন হিসেবে স্কুলের যে আয় হচ্ছিল তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ওই ক্ষতি আর কাটিয়ে ওঠা কখনও হবে না। সুতরাং অন্য স্কুল থেকে আসা ছাত্রীদের স্কুল ফি সাদরে গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু আব্বা খুব মানসিক কষ্টে ছিলেন। ধ্বংস হওয়া স্কুল দুটো পুনর্গঠনের দাবিতে তিনি সম্ভাব্য সব জায়গায় গিয়েছিলেন। আব্বা একবার একটা বড় সভায় বক্তব্য দিচ্ছিলেন। বক্তব্যের মাঝখানে তিনি একজন দর্শকের সঙ্গে আসা তাঁর বাচ্চা মেয়েটিকে সবার সামনে এনে বললেন, 'এই মেয়েটা আমাদের ভবিষ্যত। সে অশিক্ষিত-অজ্ঞ থাকুক তাকি আমরা চাই?' উপস্থিত জনতা আব্বার সঙ্গে একমত হয়ে বললো, তারা তাদের মেয়েদের লেখাপড়া ছাড়ানোর আগে নিজেরা শহীদ হতেও প্রস্তুত আছে। সাঙ্গোতা থেকে আমাদের স্কুলে নতুন ভর্তি হওয়া মেয়েদের কাছ থেকে ভয়ানক সব ঘটনার কথা জানলাম। আয়েশা বলেছিল, সাঙ্গোতা থেকে বাসায় ফেরার পথে সে একদিন দেখে একজন তালেব একজন পুলিশের কাটামুণ্ডু হাতে নিয়ে যাচ্ছে। মুণ্ডুটার চুল মুঠোয় ধরে সেটি ঝোলাতে ঝোলাতে সে যাচ্ছে। কাটা ঘাড়ের কাছ থেকে রক্ত ফোটায় ফোটায় রাস্তায় পড়ছে। সাঙ্গোতার মেয়ে অনেক বেশি মেধাবী ও প্রতিদ্বন্দ্বি প্রবণ ছিল। তাদের মধ্যে রিদা নামের একটি মেয়ে ভারি সুন্দর বক্তব্য দিত। সে আমার আর মনিবার দুজনেরই ভালো বন্ধু হয়ে উঠেছিল। মনিবা প্রায়ই স্কুলে খাবার নিয়ে আসতো। অল্প খানিক খাবার প্যাকেট থেকে যখন সে খুলতো, তখন তাকে বলতাম, 'তুমি আমার নাকি রিদার বান্ধবী?' মনিবা হাসতে হাসতে বলতো, 'আমরা তিনজনই খুব ভালো বন্ধু।'

২০০৮ সালের শেষ নাগাদ তালেবান প্রায় চারশ স্কুল ধ্বংস করে ফেলে। নিহত বেনজির ভুট্টোর স্বামী প্রেসিডেন্ট আসিফ জারদারির নতুন সরকার ক্ষমতা নেয়। কিন্তু সোয়াতে কী হচ্ছে না হচ্ছে তা নিয়ে তার সরকারেরও তেমন কোনো আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় নি। আমি লোকজনেক তখন বলতাম, জারদারির নিজের মেয়ে যদি সোয়াতের স্কুলে পড়ত তাহলে এখানকার অবস্থা অন্যরকম হতো। অবশ্য সারাদেশেই তখন আত্মঘাতী বোমা ফাটানো হচ্ছিল। এমনকি ইসলামাবাদে ম্যারিয়ট হোটেল পর্যন্ত উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

সোয়াতের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে আমাদের এই শহরটা কিছুটা নিরাপদ ছিল এবং এ কারণে গ্রামের বাড়ি থেকে অনেকেই আমাদের বাসায় থাকতে চলে এসেছিলেন। এমনিতেই চাচাতো মামাতো ভাইবোন থাকায় আমাদের ছোট্ট বাসাটায় থাকতে কষ্ট হতো। কিন্তু তার ওপর আরও আত্মীয় স্বজন আসায় ঘরটা একেবারে গিজগিজ করত। বাড়িতে বসে বসে করার মতো কিছুই ছিল না।

www.pathagar.com

আগে রাস্তায় বা বাড়ির ছাদে আমরা ছেলে মেয়েরা ক্রিকেট খেলতাম। এখন সেটা আর পারি না। এ কারণে উঠোনেই বারবার মার্বেল খেলতে হয়। অনবরত খুশালের সঙ্গে আমার মারামারি চলতে থাকে এবং সে কাঁদতে কাঁদতে যথারীতি আম্মার কাছে নালিশ করে। আসলে খুশালের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের কোনো ইতিহাসই নেই।

আমি ভিন্ন ভিন্ন স্টাইলে চুল বাধতে পছন্দ করতাম। সিনেমার বিভিন্ন চরিত্রের অনুকরণে চুল বাঁধার জন্য বাথরুমে আয়নার সামনে দীর্ঘ সময় কাটাতাম। আমার মাথায় শাল জড়ালে চুলে জট পাকিয়ে যেত, তাছাড়া উকুনের ভয়ও ছিল– এই দুই বিপদ থেকে মুক্তির জন্য আম্মা আমার চুল আট নয় বছর বয়স পর্যন্ত আমার ভাইদের মতো ছোট করে ছেটে দিতেন। তবে শেষ পর্যন্ত চুলগুলো কাঁধ পর্যন্ত রাখার অনুমতি আদায় করতে পেরেছিলাম। মনিবার মতো আমার চুল সোজা ও লম্বা ছিল না। কোকড়ানো ছিল। আমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলগুলোকে আরও কোকড়ানো করার চেষ্টা করতাম। আম্মা হাঁক দিয়ে বলতেন, 'পিশো, বাথরুমে এতক্ষণ কী করছ? মেহমানদের বাথরুমে যাওয়া দরকার। সবাই তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।'

সবচেয়ে খারাপ সময় গেছে ২০০৮ সালের রমজান মাসে। রমজান মাসে মুসলমানেরা দিনের বেলা পানাহার করে না। তালেবান পাওয়ার স্টেশন উড়িয়ে দেওয়ার কারণে বিদ্যুৎ ছিলনা। কয়েক দিন পর গ্যাসের পাইপ লাইন উড়িয়ে দেওয়ার পর গ্যাসও বন্ধ হয়ে গেল। এরপর ডাবল খরচ দিয়ে বাজার থেকে সিলিন্ডারে ভরা গ্যাস কিনতে হচ্ছিল। অত খরচ যোগাতে না পেরে আম্মাকে শেষ পর্যন্ত গ্রামের মতই কাঠের চুলায় রান্না করতে হচ্ছিল। এ নিয়ে আম্মার খুব অভিযোগ ছিল না, রান্না করতেই হবে। তিনি যেভাবে হোক রান্না চালিয়ে নিতেন। কিন্তু আমাদের সামনে আরও অনেক খারাপ দিন আসছিল। পানির লাইন বন্ধ করে দেওয়ায় বিশুদ্ধ পানি পাওয়া যাচ্ছিল না। যথারীতি কলেরা মহামারীর মতো ছড়াতে লাগল। লোকজন মরতে থাকল। হাসপাতালগুলোতে কলেরার রোগী ভর্তির জায়গা ছিল না। হাসপাতালের বাইরে বিশাল তাঁবু খাটিয়ে সেখানে তাঁদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছিল।

বাসায় আমাদের কোনো জেনারেটর ছিল না। আব্বা স্কুলে লাগানোর জন্য একটা জেনারেটর কিনেছিলেন। এছাড়া বাচ্চাদের খাওয়ার পানির জন্য পাম্প বসিয়েছিলেন। সেখান থেকে আশপাশের লোকজনও পানি সংগ্রহ করত। জগ, বোতল, ড্রাম নিয়ে প্রতিদিন সেখানে লোকজন লাইন ধরে পানি নিতে আসত। আমাদের এক প্রতিবেশি আব্বাকে বললেন, 'আপনি এটা কী করছেন? তালেবান যদি জানতে পারে, আপনি রমজান মাসে লোকজনকে পানি খাওয়াচ্ছেন, তাহলে তো তারা বোমা মারবে!' আব্বা বললেন, 'লোকজন হয় বোমাতে নয়তো তৃষ্ণায় মারা যাবে।'

www.pathagar.com

ভ্রমণ কিংবা পিকনিকে যাওয়ার দিনগুলো তখন স্বপ্নের বিষয় হয়ে দাড়িয়েছিল। সূর্যাস্তের পর কেউ ঘর থেকে বের হওয়ার সাহসই পেত না। সন্ত্রাসীরা মালাম জাব্বার সবচেয়ে বড় পর্যটন হোটেল এবং স্কি লিফট ও উড়িয়ে দিয়েছিল। সাপ্তাহিক ছুটির দিনের স্বর্গরাজ্যকে তারা রাতারাতি নরক বানিয়ে ছেড়েছিল। সেখানে কোনো পর্যটক যাওয়ার সাহস করত না।

এরপর ২০০৮ সালের শেষ দিকে ফজলুল্লাহর ডেপুটি মাওলানা শাহ দুরান রেডিওতে সব স্কুল বন্ধ করার ঘোষণা দেন। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ১৫ জানুয়ারি থেকে মেয়েরা আর স্কুলে যাবে না। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম লোকটা ঠাট্টা করছে। আমি আমার বন্ধুদের বললাম, 'তারা আমাদের স্কুলে যাওয়া ঠেকাবে কিভাবে? তারা বলছে, তারা পাহাড় উড়িয়ে দেবে। কিন্তু তারা তো একটা রাস্তাও নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনা।' অন্য মেয়েরা আমার সঙ্গে একমত ছিল না। তারা বললো, 'কারা তাদের থামাবে? তারা এ পর্যন্ত শতাধিক স্কুল উড়িয়ে দিয়েছে এবং কেউ তাদের কিছু করতে পারেনি।'

আব্বা বলতেন, একজন শিক্ষক এবং একজন ছাত্রী বেঁচে থাকা পর্যন্ত সোয়াতের মানুষ তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া চালিয়ে যাবে। আমার আব্বা-আম্মা কেউই একবারের জন্যও আমাকে স্কুলে না যাওয়ার পরামর্শ দেননি। আমরা স্কুল ভালোবাসতাম; কিন্তু তালেবান আমাদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ করার চেষ্টা করার আগমুহূর্ত পর্যন্ত শিক্ষা যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝতে পারিনি। স্কুলে যাওয়া, পড়া আর বাড়ির কাজ করা- শুধু নেহাত সময় কাটানোর বিষয় ছিল না। এটি আমাদের ভবিষ্যত নির্ধারনের নিয়ামক ছিল।

শীতের ওই মৌসুমেও অন্যান্যবারের মতো তুষার পড়েছিল। অন্যান্য বারের মতো সেবারও আমরা তুষার ভল্লুক বানিয়েছিলাম। কিন্তু আগের মতো সেই আনন্দ উপভোগ করতে পারিনি। শীতকালে তালেবান পাহাড়ে আত্মগোপন করেছিল। কিন্তু আমরা জানতাম তারা আবার ফিরে আসবে। তখন কী হবে তা জানতাম না। আমাদের বিশ্বাস ছিল স্কুলগুলো আবার চালু হবে। তালেবান আমাদের কাছ থেকে খাতা-কলম ছিনিয়ে নিতে পারে, কিন্তু আমাদের মনের ইচ্ছা ও হৃদয়ের স্বপ্ন হরণ করতে পারবে না।

www.pathagar.com

১২

রক্তাক্ত চত্বর

রাতের অন্ধকারে লাশগুলো চত্বরটিতে এনে ফেলা হতো যাতে পরদিন সকালে কাজে যাওয়ার সময় লোকজন সেগুলো দেখতে পারে। সাধারণত লাশের গায়ে চিরকুট সেঁটে দেওয়া থাকতো। 'সেনাবাহিনীর চর হওয়ার পরিণতি', 'সকাল ১১টার আগে এই লাশ কেউ ছোবেন না, ছুলে আপনি হবে পরের টার্গেট' এই ধরনের কথা চিরকুটে লেখা থাকতো। রাতে সংঘটিত এসব হত্যাকাণ্ডের সময় কোথাও কোথায় ভূমিকম্পেও লোক মারা যেতো। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে মানুষের তৈরি দুর্যোগ যুক্ত হওয়ায় আমরা আরও অনেক বেশি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে থাকতাম।

২০০৯ সালের প্রচণ্ড এক শীতের রাতে তারা শাবানাকে হত্যা করলো। আমাদের মিঙ্গোরা শহরের একটা চিপা গলিতে বানর বাজার নামের একটা জায়গা আছে। নাচ ও গানবাজনার সঙ্গে যুক্ত লোকজনের বসতিস্থান হিসেবে জায়গাটি বিখ্যাত। শাবানা এই বানর বাজারে থাকতেন। শাবানার বাবা জানালেন, রাতে একদল লোক দরজায় কড়া নাড়লো। দরজা খুলতে তারা শাবানাকে তাদের জন্য নাচতে বললো। শাবানা তাঁর নাচের পোশাক পরতে গেলেন। নাচার জন্য তিনি যখন নাচঘরে আসলেন তখন তারা লুকিয়ে রাখা বন্দুক বের করলো এবং তাকে জবাই করা হবে বলে হুমকি দিলো। কারফিউর মধ্যে রাত নয়টার পর এ ঘটনা ঘটছিল। শাবানার আকুতি পাশের ঘর থেকে সবাই শুনতে পাচ্ছিল। শাবানা তাদের বলছিলেন, 'আল্লাহর দোহাই, আমাদের ছেড়ে দিন। আমি কথা দিচ্ছি আমি জীবনে আর কোনোদিন নাচবো না। গাইবো না। আল্লাহর দোহাই, আমি একজন মুসলমান, আমি একজন নারী। আমাকে হত্যা করবেন না।' কিন্তু তারা তাঁর কোনো কথা শুনলো না। গুলি করলো। এরপর গুলিতে ঝাঝরা শাবানার দেহটা টেনে হেঁচড়ে গ্রীন চকে নিয়ে ফেললো। গ্রীন চক নামের এই চত্বরে এত বেশি লাশ এনে ফেলা হয়েছে যে চত্বরটির নাম এখন রক্তাক্ত চত্বর হয়ে গেছে।

আমরা পরের দিন সকাল বেলায়ই শাবানার মৃত্যুর কথা জানলাম। এফএম রেডিওতে মাওলানা ফজলুল্লাহ বললেন, শাবানা দুশ্চরিত্রা ছিলেন এবং এই শাস্তি তাঁর প্রাপ্য ছিল। ফজলুল্লাহ বললেন, বানর বাজারের যে নর্তকী এরপর নাচগান

www.pathagar.com

করবে তাদের সবাইকে এক এক করে হত্যা করা হবে।' সোয়েত সঙ্গীত ও শিল্পকলা নিয়ে আমরা বরাবরই গর্ব করে থাকি। কিন্তু সেখানকার অধিকাংশ শিল্পী লাহোর কিংবা দুবাই চলে গেছেন। তালেবানের ভয়ে ওই সময় শিল্পীরা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে গানবাজনা ছাড়ার এবং ধর্মীয় জীবনযাপনের ঘোষণা দেন।

শাবানার চরিত্র নিয়ে লোকজন নানা রকম কথা বলাবলি করতো। আমাদের এখানকার পুরুষ লোকেরা তাঁর নাচ দেখার জন্য পাগল ছিল। আবার তারাই আবার তাঁকে অস্পৃশ্য বলে অবজ্ঞা করতো। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় একজন খানের মেয়ে একজন নাপিতের ছেলেকে বিয়ে করতে পারে না। নাপিতের মেয়ে খানের ছেলেকে বিয়ে করতে পারে না। আমরা পশতুনরা জুতো ভালোবাসলেও নাপিতকে কাছে টানতে পারি না, আমরা চাদর-কম্বল ভালোবাসি কিন্তু তাঁতীদের সম্মান করতে পারি না। যারা কায়িক শ্রম দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে, সমাজে তাঁদের বিরাট অবদান থাকলেও তাদের কোনো স্বীকৃতি নেই। এত বিপুল সংখ্যক মানুষ তালেবানে যোগ দেওয়ার এটাই প্রধান কারণ। কেননা সমাজে যখন সে তার প্রাপ্য মর্যাদা পাচ্ছে না তখন তালেবানে যোগ দিলে মর্যাদা ও ক্ষমতা দুটোই তার হাতে ধরা দিচ্ছে।

লোকজন শাবানার নাচ দেখে ফূর্তিফার্তা করলেও তাঁকে কেউ সম্মান করতো না। এ কারণে তাঁকে যখন হত্যা করা হলো, তখন কেউ কিছু বললো না। অনেকে তালেবানের ভয়ে, অনেকে আবার তাদের পক্ষের লোক বলে শাবানাকে মেরে ফেলা ঠিক হয়েছে বলে মত দিলো। তারা বললো, 'শাবানা তো মুসলমান ছিল না। সে খারাপ মহিলা ছিল। তাকে মারা ঠিকই আছে।'

শাবানা যেদিন নিহত হলেন, শুধুমাত্র ওই দিনটাই যে খুব খারাপ ছিল তা নয়।' ওই সময় প্রতিটি দিনই ছিল নিকৃষ্টতম দিন, প্রতিটি মুহূর্তই ছিল অসহনীয়। দুঃসংবাদ তখন ছিল সর্বত্র, সব সময়। এই লোকের বাড়িতে বোমা ফুটেছে, অমুক স্কুল উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তমুককে প্রকাশ্যে দোররা মারা হচ্ছে এমন সব ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এসব ঘটনা এত ঘটতো যে তা মনে রাখাও সম্ভব হতো না। শাবানা হত্যার কয়েক সপ্তাহ বাদে মাত্তা এলাকায়, তালেবানের মতো করে পাজামা গোড়ালির ওপর রেখে না পরায় এক শিক্ষককে হত্যা করা হয়। ওই শিক্ষক তাদের বলেছিলেন, পাজামার কাপড় গোড়ালি বা টাখনুর ওপর তুলে পরতে হবে–একথা ইসলামের কোথাও বলা নেই। তালেবান তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে এবং তাঁর বাবাকে গুলি করে হত্যা করে।

তালেবান আসলে কী করতে চাইছে তা আমি বুঝতে পারছিলাম না। ওই সময় একটি সাক্ষাৎকারে আমি বলেছিলাম, 'তালেবান ইসলামের অপব্যাখ্যা দিয়ে ইসলামকে ব্যবহার করছে।' আমি বলেছিলাম, 'আমি যদি আপনার মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে বলি ইসলাম সত্য ধর্ম–তাহলে আপনি কিভাবে ইসলাম কবুল

www.pathagar.com

করবেন? যদি তারা মনে করে পৃথিবীর সব লোককেই মুসলমান হতে হবে তাহলে তারা কেন বিশ্ববাসীর কাছে নিজেদের ভালো মুসলমান হিসেবে প্রকাশ করতে পারছে না?'

পুলিশ সদস্যদের জবাই করে তাদের কাটা মুণ্ডু নিয়ে শহর জুড়ে ঘুড়ে বেড়ানোর মতো ভয়ঙ্কর কোনো না কোনো ঘটনার কথা শুনে কিংবা দেখে আব্বা বাড়ি ফিরতেন। এসব নৃশংসতা দেখে প্রথমদিকে যারা ফজলুল্লাহকে সমর্থন করেছিলেন্ এবং ফজলুল্লাহর লোকজনকে ইসলামের সত্যিকার ধারক বাহক মনে করে তাদের হাতে সোনাদানা পয়সা কড়ি তুলে দিয়েছিলেন, তারাও তার বিরুদ্ধে চলে যায়।

আব্বার কাছ থেকে এক মহিলার কথা শুনেছিলাম যার স্বামী বিদেশে থাকতেন। ইসলামের খেদমত করছেন মনে করে ভদ্রমহিলা তার সব স্বর্ণালংকার তালেবানের হাতে তুলে দেন। বিদেশ থেকে বাড়ি এসে ওই ভদ্রলোক সব শুনে স্ত্রীর ওপর ক্ষেপে যান। একরাতে ছোটখাটো একটা বিস্ফোরণ হয়ে ভয়ে মহিলাটি কাঁদতে শুরু করেন। তখন তাঁর স্বামী তাঁকে বলন, 'খবরদার কাঁদবে না! এটা হলো তোমার কানের দুল আর নাকের নথের শব্দ। একটু পর শুনবে গলার লকেট আর হাতের কাঁকনের শব্দ।'

তখনও তালেবানের বিরুদ্ধে খুব কম লোক মুখ খুলতো। আব্বার কলেজ জীবনের পুরনো রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী ইহসানুল হক হাক্কানী ইসলামাবাদে সাংবাদিকতা করেন। তিনি একবার সোয়াতের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য ইসলামাবাদে একটা সম্মেলনের আয়োজন করেন। সেখানে আলোচনার জন্য সোয়াতের কোনো আইনজীবী কিংবা শিক্ষাবিদকে ডাকা হয়নি। কেবলমাত্র আব্বা ও কয়েকজন সাংবাদিক সোয়াত থেকে সেখানে গিয়েছিলেন।

তখন অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল সোয়াতের মানুষ চাইছিল তালেবান সেখানে স্থায়ীভাবে থেকে যাক এবং তারা সেখানে থাকলে স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য মঙ্গল হবে। তখন লোকজন বলতো, 'তালেবানের মধ্যে থাকলে নিশ্চিত ধরে নেওয়া যায়, আপনি একশভাগ নিরাপত্তায় আছেন।' এ কারণে স্বেচ্ছায় তারা তাদের তরুণ ছেলেদের তালেবানে যোগ দিতে দিতো। তালেবান কালাশনিকোফ রাইফেল কেনার জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা তুলতো অথবা তারা তাদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য পরিবারগুলোর কাছে তাদের যুবক ছেলেদের চাইতো। তালেবানের ভয়ে বহু ধনী লোক আগেই সোয়াত ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। গরীবদের বাধ্য হয়ে সেখানে থাকা এবং পরিস্থিতি মেনে নেওয়া ছাড়া অন্যপথ খোলা ছিল না। আমাদের এলাকায় বিশাল সংখ্যক লোক পরিবার পরিজনকে অভিভাবকহীন করে দূরের খনি অথবা উপসাগরীয় এলাকায় কাজ করতো। ফলে তাদের ছেলেদের নিজেদের দলে ভেড়ানো তালেবানের জন্য অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিল।

হুমকি একেবারে ঘরের কাছে আসা শুরু হলো। একদিন আহমদ শাহ নামের এক ভদ্রলোককে অপরিচিত এক ব্যক্তি এসে সতর্ক করে দিয়ে গেলেন। ওই

www.pathagar.com

ব্যক্তি তাঁকে জানালেন, তালেবান তাঁকে হত্যার জন্য টার্গেট করেছে কারণ তিনি সোয়াত উপত্যকায় যা হচ্ছে তা নিয়ে কর্তৃপক্ষকে সজাগ করতে একবার ইসলামাবাদে গিয়েছিলেন। ওই সময়ের সবচেয়ে জঘন্য ব্যাপারগুলোর একটি ছিল, আমরা নিজেরা একজন আরেকজনের ব্যাপারে সন্দেহ করা শুরু করেছিলাম। এমন কি আব্বার দিকেও সন্দেহের আঙুল তোলা হয়েছিল। অনেকে অভিযোগ করতে লাগলো, 'আমাদের লোকজনকে মেরে ফেলা হচ্ছে। অথচ জিয়াউদ্দিন তালেবানের এত সমালোচনা করে এখনও সহি সালামতে বেঁচে আছে। তার মানে সে নিশ্চয়ই তালেবানের গোপন এজেন্ট।' আসলে তাঁকেও হুমকি দেওয়া হচ্ছিল কিন্তু তখন তিনি আমাদের তা বলতেন না। আব্বা পেশোয়ারে একটা সংবাদ সম্মেলনে তালেবানের তৎপরতার সমালোচনা করে সোয়াতে কঠোর সেনা অভিযানের দাবি জানিয়েছিলেন। এরপর লোকজন বলাবলি করছিল, মোল্লা এফএমে শাহ্ দৌরান তাঁর নাম ধরে তাঁকে শায়েস্তা করা হবে বলে হুমকি দিয়েছেন।

আমার আব্বা এসব হুমকি উড়িয়ে দিতেন। কিন্তু আমি খুবই বিচলিত ছিলাম। তিনি তালেবানের সমালোচনায় সবসময় মুখর ছিলেন এবং এতগুলো গ্রুপ ও কমিটিতে যুক্ত ছিলেন যে, মধ্যরাতের আগে তিনি বাসায় ফিরতে পারতেন না। তালেবান তাঁর খোঁজে বাসায় আসবে এবং আমাদের সামনে তাঁকে হত্যা করবে এমন পরিস্থিতিতে যাতে আমাদের না পড়তে হয় সেজন্য তিনি মাঝে মাঝে রাতে তাঁর এক বন্ধুর বাসায় ঘুমাতে শুরু করেছিলেন। আব্বা যতক্ষণ না বাসায় ফিরতেন এবং সদর গেটে তালা লাগাতাম ততক্ষণ পর্যন্ত আমার ঘুম আসতো না।

আব্বা যেদিন রাতে বাসায় ঘুমাতেন সেদিন আম্মা বাড়ির পেছনের দেওয়াল টপকানোর জন্য সেখানে দড়ি দিয়ে বানানো একটা মই রেখে দিতেন যাতে হঠাৎ কোনো বিপদ হলে আব্বা সেখান দিয়ে লাফিয়ে পালিয়ে যেতে পারেন। আব্বা এই আইডিয়া দেখে খুব হাসতেন। বলতেন, 'কাঠবিড়ালী অটল এটা পারতে পারে। আমার পক্ষে সম্ভব না!'

তালেবান এলে কী করা যেতে পারে সেই পরিকল্পনা তৈরি নিয়ে আম্মার চিন্তা ছিল সারাক্ষণ। তিনি বালিশের নিচে ছোরা নিয়ে ঘুমানোর কথা ভেবেছিলেন। আমি আম্মাকে বলতাম, তালেবান এলে দৌড়ে আমি বাথরুমে চলে যাবো এবং সেখান থেকে ফোনে পুলিশকে খবর দেব। এ ছাড়া আমি আর আমার দুই ভাইয়ের মাথায় তালেবানের হাত থেকে বাঁচতে সুড়ঙ্গ খোঁড়ারও বুদ্ধি এসেছিল। আরেকবার তালেবানকে উধাও করে দেওয়ার মতো জাদুর লাঠি পেতে আল্লার কাছে মুনাজাত করেছিলাম।

একদিন দেখি আমার ছোটভাই অটল বাগানে পাগলের মতো মাটি খুড়ছে। কি করছিস?' জিজ্ঞেস করতেই সে বললো, 'গোর খুরচি। কবর বানাই।' টেলিভিশন

www.pathagar.com

খুললেই আমাদের নিউজ বুলেটিন হত্যা-মৃত্যুর খবরে ভরা থাকতো। এসব ব্যাপার প্রতিদিন এত দেখানো হতো যে অটলের মাথায় কবর খোড়ার চিন্তা আসা খুবই স্বাভাবিক ছিল। লুকোচুরি কিংবা চোর-ডাকাত খেলা বন্ধ করে দিয়ে শিশুরা সেনাবাহিনী ও তালেবানের যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা খেলতে শুরু করে। গাছের বড় ডাল দিয়ে শিশুরা রকেট এবং লাঠি দিয়ে কালাশনিকোভ বানাতো, এটাই তাদের সন্ত্রাসী খেলা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

তালেবানের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করার মতো কেউ ছিল না। আমাদের এলাকার খোদ ডেপুটি কমিশনার (ডিসি) সৈয়দ জাভেদ তালেবানের মিটিংয়ে যেতেন, তাদের মসজিদে নামাজ পড়তেন এবং তাদের সভায় সভাপতিত্ব পর্যন্ত করতেন। তিনি নিজেই পুরোদস্তুর তালেবান হয়ে পড়েছিলেন। তালেবানের অন্যতম লক্ষ্যবস্তু ছিল এনজিওগুলো। তারা বলতো, এনজিওগুলো শরিয়াবিরোধী কাজ কারবার চালায়। তালেবানের পক্ষ থেকে হুমকি পেয়ে এনজিও কর্মকর্তারা যখন বিপন্ন হয়ে ডিসির কাছে যেতেন এবং তাঁর কাছে অভিযোগ করতে চাইতেন, তিনি তা শুনতেও চাইতেন না। এক সভায় আব্বা সরাসরি তাঁর প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে তাঁকে বলেছিলেন, 'আপনি কার নির্দেশ পালন করছেন? সরকারের নাকি ফজলুল্লাহর?'

আমাদের এখানে একটা আরবী প্রবাদ আছে-'রাজাকে অনুসরণ করে প্রজারা।' আমাদের স্থানীয় প্রশাসনের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ যেখানে তালেবানে যোগ দিয়েছিলেন, সেখানে তালেবানিকরণ খুব স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাঁড়ানোরই কথা।

পাকিস্তানে আমরা ষড়যন্ত্র তত্ত্ব খুব পছন্দ করি। আমাদের নানাজনের কাছে নানা ধরনের ষড়যন্ত্র তত্ত্ব আছে। অনেকের বিশ্বাস সরকার তালেবানকে সর্বাত্মকভাবে উৎসাহিত করছে। তারা মনে করেন, সেনাবাহিনী চায় সোয়াতে তালেবান থাকুক। কারণ তালেবানের উপস্থিতিকে অজুহাত হিসেবে সামনে রেখে মার্কিন বাহিনী সেখানে একটা বিমান ঘাঁটি গড়তে চায় যেখান থেকে তারা তাদের ড্রোন পরিচালনা করতে পারে।

অনেকে মনে করেন, সোয়াতে তালেবান থাকায় সরকারের সুবিধা। সরকার আমেরিকাকে বলতে পারবে আফগান যুদ্ধে আমরা তোমাদের সাহায্য করতে পারবো না কারণ আমরা নিজেরাই নিজেদের সমস্যা নিয়ে জর্জরিত। এছাড়া আমাদের সেনাবাহিনী তালেবান দমন না করে উল্টো তাদের সহায়তা করছে বলে আমেরিকানদের পক্ষ থেকে যে অভিযোগ তোলা হচ্ছিল তারও মোক্ষম জবাব দেওয়া যাবে। এখন আমাদের সরকার তাদের বলতে পারবে, 'তোমরা বলো, আমরা তোমাদের কাছ থেকে অর্থকড়ি নিয়ে সন্ত্রাসীদের সাহায্য করি। যদি তাই হয়, তাহলে তারা আমাদের ওপর হামলা চালাচ্ছে কেন?'

www.pathagar.com

আব্বা বলতেন, 'তালেবান সেনাবাহিনীর অদৃশ্য কোনো অংশের সমর্থন পাচ্ছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু যা হচ্ছে তা মোটেও সহজ ব্যাপার না। পরিস্থিতির ব্যাপারে তুমি যত বেশি জানতে চাবে দেখবে তা ততবেশি জটিল হয়ে উঠছে।'

ওই বছরই, অর্থাৎ ২০০৮ সালে সরকার টিএনএস এর প্রতিষ্ঠাতা সুফি মোহাম্মাদকেও জেল থেকে ছেড়ে দেয়। সুফি মোহাম্মাদকে তাঁর জামাতা ফজলুল্লাহর চেয়ে উদারপন্থি মনে করা হতো এবং তিনি ছাড়া পাওয়ায় সবাই আশা করেছিল, সহিংসতা থেকে আমাদের মুক্তি দিয়ে সোয়াতে শরিয়া আইন চালু করার ব্যাপারে তিনি সরকারের সঙ্গে শান্তি আলোচনায় যাবেন।

আমার আব্বাও এ ধরনের পদক্ষেপের পক্ষে ছিলেন। আমরা জানতাম, এতে তালবানের দুঃশাসনের অবসান হবে না। তবে আব্বার যুক্তি ছিল, যদি আমাদের এখানে শরিয়া আইন চালু হয় তাহলে তালেবানের সামনে লড়াই চালানোর কোনো ইস্যু থাকবে না। তখন তারা অস্ত্র নামিয়ে রেখে সাধারণ মানুষের মতো জীবনযাপন করবে। যদি তখন তারা তা না করে তাহলে বোঝা যাবে তারা আসলে কী চায়।

সেনাবাহিনী তখনও মিঙ্গোরার চারপাশের উঁচু পাহাড়ে তাদের গোলাগুলির প্রশিক্ষণ চালিয়ে যাচ্ছিল। সারারাত বুম বুম গুলি চলতে থাকতো। পাঁচ, দশ কিংবা পনেরো মিনিটের বিরাম দিয়ে আবার একটানা গুলি চলতো। এই শব্দের মধ্যে আমরা ঘুমাতে যেতাম। খানিকক্ষণ পর পর ঘুম ভেঙে যেতো। অনেক সময় কান ঢেকে অথবা বালিশের তলে মাথা গুজে আমরা ঘুমানোর চেষ্টা করতাম। কিন্তু শব্দ এত বেশি ছিল যে তাতে কোনো কাজ হতো না। সকালবেলা যথারীতি ঘুম থেকে জেগে টেলিভিশনে তালেবানের হাতে মানুষ খুন হওয়ার খবর দেখতে হতো। আমরা অবাক হয়ে ভাবতাম, সারারাত সেনাসদস্যরা তাহলে করলো টা কি? আর কেনইবা এখনও তারা মোল্লা এফএম বন্ধ করতে পারছে না?

সেনাবাহিনী এবং তালেবান উভয়েই শক্তিশালী ছিল। অনেক সময় তারা একই সড়কে আধা কিলোমিটারেরও কম ব্যবধানে তল্লাশি চৌকি বসাতো। তারা উভয়েই আমাদের থামিয়ে তল্লাশি করতো। তাদের আচরণ দেখে মনে হতো, প্রতিপক্ষ যে কাছেই তল্লাশি চৌকি বসিয়েছে তা তারা জানেই না। কিন্তু এটা বিশ্বাস করার কোনো কারণ ছিল না। আমরা কেউ বুঝতে পারছিলাম না কেন কোনো পক্ষই আমাদের রক্ষাকর্তা হিসেবে দাঁড়াচ্ছে না। লোকজন বলতে শুরু করলো সেনাবাহিনী ও তালেবান আসলে একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। আব্বা বলতেন, আমরা আমজনতা আসলে ওয়াটার মিলের দুই পাথরের মাঝখানে পড়ে চ্যাপ্টা হতে ভালোবাসি। তবে আব্বা তখনও ভীত হয়ে পড়েননি। তিনি বলতেন, আমাদের কথা বলা চালিয়ে যেতেই হবে।

www.pathagar.com

আমিও মানুষ। যখনই কানে গুলির প্রচণ্ড আওয়াজ আসতো, আমার হৃদস্পন্দনের গতি বেড়ে যেতো। মাঝে মাঝে ভয় পেয়ে যেতাম, কিন্তু কিছু বলতাম না। তবে এর মানে এই নয় যে আমি স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিতে চাচ্ছিলাম। তবে ভয় অনেক সময় সাংঘাতিক শক্তিশালী হয়ে ওঠে। যেমন তালেবান এমন এক ভয় মানুষের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল যা তাদের শাবানার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। সন্ত্রাসবাদ সাধারণ মানুষকেও নিষ্ঠুর করে তুলেছিল। তালেবান আমাদের পশতুন মূল্যবোধ ও ইসলামী মূল্যবোধ উভয়ের ওপরই বুলডোজার চালিয়েছিল।

আমি নিজেকে ভিন্ন চিন্তার দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হিসেবে স্টিফেন হকিংয়ের 'অ্যা ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম' বইটা পড়ি। কীভাবে মহাবিশ্বের সৃষ্টি হলো অথবা সময় কীভাবে চলমান হলো–এইসব বড় বড় প্রশ্নের উত্তর বইটিতে রয়েছে। মাত্র ১১ বছর বয়সে বইটা পড়েছি। তবু মনে হয়েছে বইটি আমার মধ্যে অন্যরকম ভাবনার জন্ম দিতে পেরেছে।

আমরা পশতুনরা শিখেছি প্রতিহিংসার পাথর কখনো ক্ষয় হয় না এবং ভুল কিছু করে বসলে তার জ্বালা আপনাকে সইতেই হবে। 'কিন্তু আমাদের এই জ্বালার অবসান কবে'–আমরা নিজেরা নিজেদের সব সময় এ প্রশ্নই করতাম।

www.pathagar.com

১৩

গুল মাকাইয়ের ডায়েরি

অন্ধকার ওই সময়ে পেশোয়ারে আবদুল হাই কাকার নামে আব্বার এক বন্ধু বিবিসিতে সাংবাদিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তিনি একদিন আব্বাকে ফোন করে বললেন, তিনি সোয়াতের এমন একজন শিক্ষিকা কিংবা ছাত্রী খুঁজছেন যে তালেবানের অধীনে কাটানো প্রাত্যহিক জীবন নিয়ে ডায়েরি লিখবেন। আব্বার ওই বন্ধু এর মাধ্যমে সোয়াতে তালেবানসৃষ্ট বিপর্যয়ের মানবিক দিক তুলে ধরতে চাইছিলেন। গোড়াতে মরিয়ম ম্যাডামের ছোটবোন আয়েশা লিখতে চেয়েছিল। কিন্তু তার বাবা বিষয়টি জানতে পেরে তাকে অনুমতি দেননি। তিনি বললেন, এটা সাংঘাতিক ঝুঁকিপূর্ণ হবে।

আব্বা এই নিয়ে যখন কথা বলছিলেন তখন আমি তা শুনতে পাই এবং তাঁকে বলি, 'আমি কেন লিখবো না?' আমি চাইছিলাম এখানে যা ঘটছে তা মানুষ জানুক। আমি বললাম, শিক্ষা আমাদের অধিকার। একইভাবে গান গাওয়াও আমাদের অধিকার। ইসলাম আমাদের শিক্ষার অধিকার দিয়েছে এবং ছেলেমেয়ে সবাইকে স্কুলে যাওয়ার তাগিদও দিয়েছে। কোরআন আমাদের জ্ঞান অন্বেষণ করতে বলেছে; কঠোর পড়াশুনার মাধ্যমে জগতের রহস্য সম্পর্কে জানতে বলেছে।

আমি নিজে কোনোদিন আগে ডায়েরি লিখিনি এবং কীভাবে তা লিখতে হয় তাও জানতাম না। যদিও আমাদের একটা কম্পিউটার ছিল; কিন্তু সেখানে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চলে যেত এবং খুব কম জায়গাতেই ইন্টারনেট সংযোগ ছিল। এ কারণে প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলা হাই কাকা আমার আম্মার মোবাইল ফোনে ফোন করে আমার সঙ্গে কথা বলতেন। আমাদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে তিনি নিজের মোবাইল ফোন সেট থেকে ফোন না করে তাঁর স্ত্রীর সেট থেকে ফোন করতেন, কারণ তিনি বলেছিলেন তাঁর ফোনে গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন আড়ি পাতে। তিনি আমাকে গাইড করতেন, সারাদিনে কী কী করেছি তা নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করতেন, আমার ভবিষ্যত স্বপন কী–এসব জিজ্ঞেস করতেন। আমরা আধাঘন্টা-চল্লিশ মিনিট-পয়তাল্লিশ মিনিট কথা বলতাম। আমরা দুজনেই পশতুন হলেও যেহেতু বিবিসির ব্লগটি ছিল উর্দু ভাষায়, এ কারণে আমরা উর্দুতে কথা বলতাম। তিনি চাইতেন আমার দেওয়া সব তথ্য যেন বস্তুনিষ্ঠ থাকে। এরপর তিনি আমার কথা নিজে গুছিয়ে লিখতেন এবং সপ্তাহে একদিন বিবিসির ওয়েবসাইটে সেগুলো

www.pathagar.com

প্রকাশিত হতো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসীদের ভয়ে ১৩ বছর বয়সী মেয়ে আনা ফ্রাঙ্ক আমস্টার্ডমের বাড়িতে লুকিয়ে কীভাবে প্রতিদিন ডায়েরি লিখতো তিনি আমাকে সেই গল্প শোনাতেন। খুব দুঃখের ব্যাপার হলো, এক পর্যায়ে আনাফ্রাঙ্কের পরিবারের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়। তাদের সবাইকে নাৎসী বাহিনী কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায়। ১৫ বছর বয়সে বন্দী অবস্থায় আনা ফ্রাঙ্কের মৃত্যু হয়। পরবর্তীতে আনার ডায়েরি প্রকাশিত হয় এবং এটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

হাই কাকা আমাকে বলেছিলেন, আসল নামে লেখাটা আমার জন্য খুব ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে। সেজন্য তিনি আমার ছদ্ম নাম দিলেন গুল মাকাই। গুল মাকাই মানে 'শস্য পুষ্প'। একটি পশতুন উপকথার নায়িকার নামও গুল মাকাই। গল্পটা অনেকটা শেক্সপীয়দের রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েটের গল্পের মতোই। এতে দেখা যায় নায়িকা গুল মাকাই এবং নায়ক মূসা খান স্কুলে পড়তে এসে পরস্পরের প্রেমে পড়ে। তারা ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের বলে তাদের ভালোবাসাকে ঘিরে দুই গোত্রের মধ্যে লড়াই বেধে যায়। তবে শেক্সপীয়রের নাটকের মতো এটি বিয়োগান্তক নয়। গুল মাকাই কোরান দিয়ে উভয় গোত্রের মুরুব্বীদের বুঝিয়ে দেয় যুদ্ধ করা ভালো নয়। এক পর্যায়ে তারা যুদ্ধ থামিয়ে দুইজনের ভালোবাসা ও পরিণয়কে মেনে নেয়।

২০০৯ সালের ৩ জানুয়ারি আমার লেখা প্রথম ডায়েরি প্রকাশিত হয়। 'আমি শঙ্কিত' শিরোনামের ওই ডায়েরিতে ছিল : 'সামরিক হেলিকপ্টার আর তালেবান নিয়ে গত রাতে আমি এক ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখেছি। সোয়াতে সেনাবাহিনী অভিযান শুরু করার পর থেকেই আমি এরকম ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখছি।' আমি লিখেছিলাম তালেবান আতঙ্কে স্কুলে যেতে আমার ভয় করতো। সব সময় মনে হতো আমার ঘাড়ের কাছে তারা আছে। ওই লেখায় অনেক কিছুর মধ্যে একটা ঘটনাও উল্লেখ করেছিলাম। ঘটনাটি ছিল এরকম : একদিন আমি স্কুল থেকে বাসায় ফিরছি। হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন বলে উঠলো 'আমি তোকে শেষ করে ফেলবো।' ভয় পেয়ে ঝট করে পেছনে ফিরলাম। ফিরে দেখি একটা লোক মোবাইল ফোনে কারও সঙ্গে উত্তেজিত ভাষায় কথা বলছে। আমার চেতনায় স্বস্তি নেমে এলো।'

নিজের কথা বিবিসির ওয়েবসাইটে প্রথম দেখে খুব রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম। প্রথম দিকে অনভিজ্ঞতার কারণে কিছুটা লজ্জা, কিছুটা অস্বস্তি ছিল। তবে খুব দ্রুতই বুঝে ফেললাম হাই কাকার কী কী জিনিস আমার কাছ থেকে জানতে চান, একই সঙ্গে আমার মধ্যে আত্মবিশ্বাস চলে আসে। তালেবানের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মধ্যে প্রাত্যহিক জীবনযাপনের মিশ্রচিত্র এবং আমার ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতিই তিনি জানতে চাইতেন।

আমি স্কুল নিয়ে প্রচুর লিখেছিলাম, কারণ স্কুলই ছিল আমার ও আমার সহপাঠীদের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। স্কুলে যাওয়ার সময় আমরা আমাদের রয়েল ব্লু

www.pathagar.com

রংয়ের স্কুল ড্রেস পরতে ভালোবাসতাম। কিন্তু স্কুল থেকে আমাদের ইউনিফর্ম না পরে সাধারণ পোশাক পরে আসতে বলা হতো। আসার সময় বই ওড়নার নিচে লুকিয়ে আনতে বলা হতো।

আমার একটা লেখার শিরোনাম ছিল 'রঙিন কাপড় পরো না।' তাতে আমি লিখেছিলাম, 'একদিন স্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম। ইউনিফর্ম পরতে যাবো, হঠাৎ প্রিন্সিপাল স্যারের উপদেশের কথা মনে পড়লো। আমি স্কুল ড্রেস না পরে আমার প্রিয় গোলাপী ড্রেসটা পরলাম।'

বোরখা নিয়েও আমি লিখেছিলাম। ছোটবেলা সবাই বোরখা পরার জন্য উদগ্রীব থাকে, কারণ এটা দেখতে খুব সুন্দর। কিন্তু আপনি যখন সেটা পরবেন তখন দেখবেন সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। এটা পরে হাঁটাচলা করাও কঠিন হয়ে পড়ে। আম্মা এবং চাচাতো বোনের সঙ্গে চীনাবাজারে শপিং করতে গিয়ে ছোট্ট একটা মজার ঘটনার কথা শুনেছিলাম। সেটি আমার ডায়েরিতেও লিখেছিলাম। ঘটনাটা এরকম : 'একদিন একজন মহিলা আপাদমস্তক বোরখায় শরীর ঢোকে মার্কেটে এসেছিলেন। হঠাৎ বোরখার নিচের অংশে পা জড়িয়ে পড়ায় তিনি পড়ে যান। একটা লোক তাঁকে টেনে তুলতে গেলে তিনি লোকটাকে বলেন, 'আমাকে সাহায্য করার দরকার নাই ভাই, আর কিছু না হোক, এটা ফজলুল্লাহকে তো আনন্দ দেবে!" আমরা যে দোকানে ঢুকছিলাম, সেই দোকানের মালিককে হাসতে দেখে কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। ভদ্রলোক বললেন, "আত্মঘাতী বোমাবাজরা বোরখা পরে হামলা চালতো সেজন্য আপনাদের বোরখা পরা অবস্থায় দেখে সে ধরনের কিছু মনে করেছিলাম।"

স্কুলে সবাই ডায়েরি নিয়ে কথা বলতে লাগলো। একটা মেয়ে আমার লেখা প্রিন্ট করে এনে আব্বাকে দেখালো। আব্বা সেটা দেখে বরাবরের মতো হাসি দিয়ে বললেন, 'ভেরি গুড।'

ডায়েরি যে আমারই লেখা, তা আমি সবাইকে বলতে চাইতাম। কিন্তু বিবিসির ওই সাংবাদিক আমার পরিচয় প্রকাশ করতে নিষেধ করেছিলেন এবং বলেছিলেন এতে ভয়ানক কিছু ঘটে যেতে পারে। আমি অবশ্য এতে বিপদের কিছু আছে বলে মনে করতাম না। আমি মনে করতাম, আমি নেহায়েতই শিশু। আর একজন শিশুর ওপর কে হামলা করবে? তবে আমার লেখায় যেসব ঘটনার কথা থাকতো সেগুলোর কিছু আমার ঘনিষ্ঠ বান্ধবীরা আগে থেকেই জানতো। এ কারণে তারা আমার কথা হয়তো ভাবতো। তবে একটি লেখায় আমার পরিচয় বলা যায় একেবারেই প্রকাশ পেয়ে যায়। ওই লেখাটিতে আমি লিখেছিলাম, 'আম্মা আমার গুল মাকাই ছদ্মনাম পছন্দ করেছিলেন এবং আমিও আব্বাকে ঠাট্টা করে বলেছিলাম আমার নাম বদলে ফেলা দরকার। ... আমার নিজেরও নামটা খুব পছন্দ হয়েছে কারণ আমার আসল নামের অর্থ "বেদনাহত।"

গুল মাকাইয়ের ডায়েরি আরও অনেক বড় পরিসরে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু সংবাদপত্র ডায়েরির অংশ বিশেষ ছাপতে থাকে। অন্য একটা মেয়ের কণ্ঠ

www.pathagar.com

ব্যবহার করে বিবিসি আমার লেখাগুলোর অডিও রেকর্ডও ওয়েব সাইটে যুক্ত করে দেয়। তখন আমি বুঝতে শুরু করি, মেশিনগান, ট্যাংক আর হেলিকপ্টারের চেয়ে কলম অনেক বেশি শক্তিশালী। কীভাবে সংগ্রাম করে টিকে থাকতে হয় তা আমরা কেবলমাত্র শিখতে শুরু করেছিলাম। যখন কথা বলি, যখন সোচ্চার হই, তখন আমরা কত শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারি তা তখন বুঝতে শুরু করেছিলাম।

আমাদের কিছু শিক্ষক স্কুলে আসা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। একজন বললেন, মোল্লা ফজলুল্লাহ্ তাঁকে তাঁর (ফজলুল্লাহর) ইমাম দেড়ির মসজিদ নির্মাণে সহায়তা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আরেকজন বললেন, স্কুলে আসার পথে তিনি মস্তকবিহীন একটা লাশ পড়ে থাকতে দেখেছেন, এ কারণে তিনি শিক্ষকতা করে তার জীবনকেফ ঝুকির মধ্যে ফেলে দিতে পারেন না। বহু লোকই তখন প্রাণভয়ে ভীত হয়ে পড়েছিল। আমাদের প্রতিবেশীদের কাছ থেকে শুনেছি, তালেবান বিভিন্ন মসজিদে গিয়ে যাদের মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে না, সেইসব কন্যাদায়গ্রস্থ পিতাদের মেয়েদের বিয়ে দেওয়ারও দায়িত্ব নিত। সম্ভবত জঙ্গিদের সঙ্গে তাদের বিয়ে দেওয়া হতো।

আগের বছর আমার ক্লাসে ২৭ জন ছাত্রী ছিল। কিন্তু ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে সেই সংখ্যা মাত্র ১০ জনে নেমে এল। আমার অনেক বান্ধবী লেখাপড়া করার জন্য উপত্যকা ছেড়ে পেশোয়ারে চলে গিয়েছিল। কিন্তু আমার আব্বা বললেন, আমরা কোথাও যাবো না। তিনি বললেন, 'সোয়াত আমাদের অনেক দিয়েছে। এই কঠিন দিনে এই উপত্যকার জন্য আমাদের অনেক শক্ত হতে হবে।'

এক রাতে ডা. আফজাল নামে আব্বার এক ডাক্তার বন্ধু, যার একটি হাসপাতাল ছিল, তাঁর বাড়িতে আমরা পরিবারের সবাই দাওয়াত খেতে গিয়েছিলাম। রাতের খাওয়া দাওয়া শেষ করে ডা. আফজাল নিজে গাড়ি ড্রাইভ করে আমাদের বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছিলেন। পথে দেখলাম, রাস্তার দুই পাশে মুখোশ পরা একদল তালেবান।

তাদের সবার হাতে বন্দুক। আমরা ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে গেলাম। ডা. আফজালের হাসপাতাল যে এলাকায় ছিল তালেবান সে এলাকাটি দখল করে নিয়েছিল। দিনের পর দিন সেখানে গোলাগুলি ও কারফিউ চলতে থাকায় সেখানে আর হাসপাতালটি চালানো সম্ভব হচ্ছিল না। এ কারণে তিনি হাসপাতালটি বারিকোটে সরিয়ে নেন। হাসপাতাল সরানোয় সেখানকার লোকজন ক্ষেপে যায় এবং তালেবানের মুখপাত্র মুসলিম খান ডা. আফজালের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে হাসপাতালটি আবার চালু করতে অনুরোধ করেন। ডা. আফজাল এ বিষয়ে আব্বার পরামর্শ চাইলে আব্বা বলেন, 'খারাপ লোকের ভালো কিছুও গ্রহণ করো না।' তিনি বললেন, তালেবানের নিরাপত্তা নিয়ে হাসপাতাল চালানোর আইডিয়া মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়।

ডা. আফজালের বাসা আমাদের বাসা থেকে খুব বেশি দূরে ছিল না। ফলে সে যাত্রায় আমরা নিরাপদেই বাসায় পৌঁছলাম। তবে আফজালকে আব্বা একা

www.pathagar.com

ছাড়লেন না। তালেবানের মুখে পড়তে পারেন এমন আশঙ্কা থেকে আব্বা তাঁর সঙ্গে গেলেন। ডা. আফজাল অনেকটা নার্ভাস হয়ে আব্বাকে বললেন, 'যদি তারা গাড়ি থামিয়ে নাম জিজ্ঞেস করে, তাহলে কী বলবো?'

আব্বা বললেন, 'তুমি ডা. আফজাল এবং আমি জিয়াউদ্দিন ইউসাফজাই। এগুলো সব খতরনক লোকজন। আমরা কোনো অন্যায় করিনি। অপরাধীদের মতো আমরা কেন আমাদের নাম বদলাতে যাবো?'

ভাগ্য ভালো, ফেরার পথে তাঁরা তালেবান সদস্যদের সেখানে দেখলেন না। তারা সেখান থেকে চলে গিয়েছিল। আব্বা যখন ফোন করে বললেন, তারা নিরাপদে পৌঁছেছেন, তখন আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

তালেবান গার্লস স্কুলগুলো বন্ধ করার জন্য যে সময়সীমা (১৫ জানুয়ারি, ২০০৯) বেঁধে দিয়েছিল তা ক্রমশ ঘনিয়ে আসছিল। মেয়েদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ করতে হয়েছিল। এই একুশ শতকেও কী করে তারা ৫০ হাজার মেয়ের স্কুলে যাওয়া বন্ধ করতে পারছিল? আমি তখনও আশাবাদী ছিলাম, কিছু একটা ঘটবে এবং স্কুলগুলো আবার খুলে যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তালেবানের ডেটলাইন আমাদের ওপর এসে পড়ল। আমরা এই সিদ্ধান্তে অটল ছিলাম, সোয়াতে যে স্কুলটার ঘণ্টাধ্বনি সবার শেষে বাজবে সেটা হবে খুশাল স্কুল। সোয়াতে স্থায়ীভাবে যাতে থাকা যায় সেজন্য মরিয়ম ম্যাডামও বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু দাঙ্গা-মারামারি থেকে বাঁচতে তাঁর পরিবার করাচি চলে যায়। ফলে একজন নারী হিসেবে সোয়াতে তিনি আর থাকতে পারছিলেন না।

১৪ জানুয়ারি আমাদের স্কুলটা বন্ধ হয়ে যায়। ওইদিন কাকডাকা ভোরে আমি ঘুম থেকে জেগে দেখি আমার শোবার ঘরে অনেকগুলো টিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। ইরফান আশরাফ নামের একজন টেলিভিশন সাংবাদিক আমাকে ফলো করছেন। এমনকি নামাজ পড়া এবং দাঁত ব্রাশ করার সময়ও তাঁরা আমার ছবি নিচ্ছেন।

আমি বলতে পারি ওই সময় আব্বার মেজাজ মোটেও ভালো ছিল না। তাঁর এক বন্ধু নিউ ইয়র্ক টাইমসের ওয়েবসাইটের জন্য নির্মিয়মান একটি প্রামাণ্যচিত্রে অংশ নেয়ার জন্য তাঁকে চাপাচাপি করেছিলেন। আমাদের এখানে কী ঘটছে তা বিশ্বকে দেখানোর জন্য প্রামাণ্যচিত্রটি বানানো হচ্ছিল। এর কয়েক সপ্তাহ আগে পেশোয়ারে আমরা অ্যাডাম এলিক নামের একজন মার্কিন ভিডিও সাংবাদিকের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। সেখানেই মূলত প্রামাণ্যচিত্রটি নির্মাণ নিয়ে কথা হয়। সেটা খুবই মজার একটা বৈঠক ছিল। দীর্ঘ সময় আমেরিকান ওই সাংবাদিক আব্বার সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বললেন এবং তখন একটা শব্দও উচ্চারণ করছিলাম না। আব্বার সঙ্গে কথা বলা শেষ করে তিনি আমার সঙ্গে কথা বলতে পারবেন কি না তা জানতে চাইলেন এবং পাকিস্তানি সাংবাদিক ইরফানকে

www.pathagar.com

দোভাষী হিসেবে রেখে আমাকে প্রশ্ন করতে লাগলেন। প্রায় দশ মিনিট পর তিনি আমার চোখ-মুখের অভিব্যক্তি দেখে বুঝতে পারলেন আমি তাঁর কথা সঠিকভাবে বুঝতে পারছি। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইউ স্পিক ইংলিশ?'

আমি তাঁর কথার জবাবে ইংরেজিতে বললাম, 'ইয়েস, আই ওয়াজ জাস্ট সেয়িং দেয়ার ইজ আ ফেয়ার ইন মাই হার্ট (হ্যা, আমি শুধু আপনাকে এটুকু বলছিলাম, আমার মনের মধ্যে একটা ভীতি আছে)।'

অ্যাডাম আমার মুখে পরিস্কার ইংরেজি শুনে বিস্মিত হলেন। তিনি ইরফান ও আব্বাকে বললেন, 'আপনাদের সমস্যাটা কি বলেন তো? সে আপনাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো ইংরেজি বলে, আর তাঁর কথা অনুবাদ করছেন আপনারা?' আমরা সবাই হেসে ফেললাম।

প্রামাণ্যচিত্রটির জন্য প্রথম যে আইডিয়াটি দাঁড় করানো হয়, তাতে স্কুলের শেষ দিনে আব্বা কী কী করবেন তা ধারণ করা হবে বলে ঠিক করা হয়। কিন্তু বৈঠকের শেষ ভাগে ইরফান আমাকে বললেন, 'যদি কখনও এমন সময় আসে যখন তুমি আর তোমার উপত্যকায় এবং তোমার স্কুলে আর যেতে পারছ না, তখন তুমি কী করবে?' আমি বললাম, এমনটা কখনও হবে না। কিন্তু তিনি দৃঢ়ভাবে যখন বললেন এমনটাই হবে, তখন আমি কান্নাকাটি শুরু করলাম। ধারণা করি, ঠিক এই সময়ই অ্যাডাম আমার আব্বাকে বাদ দিয়ে আমাকেই প্রামাণ্যচিত্রটিতে ফোকাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

অ্যাডাম সোয়াতে আসতে পারেননি, কারণ ওই সময় বিদেশিদের জন্য জায়গাটা ভয়ানক বিপজ্জনক ছিল। ইরফান এবং তাঁর সঙ্গে একজন ক্যামেরাম্যান যখন মিঙ্গোরায় আসেন তখন আমার এক চাচা, যিনি আমাদের সঙ্গে থাকতেন, তিনি বার বার বলছিলেন, বাসায় ক্যামেরা আনা সাংঘাতিক ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠবে। আব্বাও তাঁদের ক্যামেরা লুকিয়ে রাখতে বলেছিলেন। কিন্তু তাঁরা বহু পথ পাড়ি দিয়ে আমাদের বাসায় এসেছিলেন এবং পশতুন হিসেবে তাঁদের আতিথিয়েতা দিয়ে অস্বীকার করাও আমাদের পক্ষে খুবই কঠিন ছিল।

অন্যদিকে, আব্বাও বুঝতে পেরেছিলেন, আমাদের অবস্থা বাকি দুনিয়াকে বোঝানোর জন্য এটিই হবে মোক্ষম প্রচারযন্ত্র। আব্বার বন্ধু তাঁকে বলেছিলেন, জায়গায় জায়গায় ঘুরে ঘুরে আব্বা যে প্রচার চালাচ্ছেন তার চেয়ে এটি অনেক বেশি কার্যকর প্রভাব ফেলবে।

এই প্রামাণ্যচিত্রে অংশ নেওয়ার আগেই আমি এতো টেলিভিশন সাক্ষাৎকার দিয়েছি এবং মাইক্রোফোনে সহজভাবে এতো বক্তব্য দিয়েছি যে আমার বন্ধুরা আমাকে খেপাতো। কিন্তু এই ধরনের তথ্যচিত্রে এর আগে কোনোদিন অংশ নেইনি। ইরফান আমাকে বললেন, 'একদম স্বাভাবিক থাকবে।' আমি দিনের

www.pathagar.com

শুরু থেকে যেখানে যাচ্ছিলাম, যা যা করছিলাম তা ক্যামেরায় ধারণ করা হচ্ছিল। এমনকি আমার দাঁত মাজার ছবিও তোলা হচ্ছিল। এসব ক্যামেরার সামনে করার সময় সহজ থাকা মোটেও সহজ ব্যাপার ছিল না। আমি তাঁদের আমার ইউনিফর্ম দেখিয়ে বলেছিলাম, আমি তালেবানের ভয়ে সেগুলো পরতে পারছি না। তাঁদের বললাম, আফগানিস্তানে স্কুলে যাওয়ার কারণে মেয়েদের মুখে তালেবান অ্যাসিড ছুড়ে মারতো বলে শুনেছি। আমার ভয় হয়, একইভাবে যদি তারা আমাকেও ধরে আমার ওপর অ্যাসিড ছোড়ে।

স্কুল বন্ধ করার দিন সকালে আমাদের বিশেষ অ্যাসেম্বলি হলো। কিন্তু মাথার ওপর হেলিকপ্টার ক্রমাগত চক্কর দিচ্ছিল। ফলে অ্যাসেম্বলিতে দেওয়া বক্তব্য শুনতে সবার কষ্ট হচ্ছিল। উপত্যকায় যা হচ্ছে তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে আমাদের মধ্যে অনেকে বক্তব্য দিল। এক সময় স্কুলের শেষ ঘণ্টা বাজলো। মরিয়ম ম্যাডাম শীতকালীন ছুটি ঘোষণা করলেন। অন্যান্য বছর শীতের ছুটির সময় স্কুল খোলার তারিখ ঘোষণা করে দেওয়া হতো কিন্তু এবার সে ধরনের কোনো ঘোষণা দেওয়া হলো না। তবে অন্যবারের মতো অনেক শিক্ষক আমাদের বাড়ির কাজ দিলেন। ছুটির পর আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে বিদায়ী কোলাকুলি করলাম। আমি আমাদের অনার্স বোর্ডের দিকে তাকালাম। ভাবলাম সেখানে আর কখনও আমার নাম উঠতে দেখবো কি না। মার্চ মাসে পরীক্ষা হওয়ার কথা। কিন্তু কিভাবে হবে? পড়াশুনাই যদি না করা যায় তাহলে পরীক্ষায় প্রথম হলেই কি আর না হলেই কি। কেউ যদি আপনার কাছ থেকে কলম কেড়ে নিয়ে যায়, তখন বুঝবেন পড়াশুনা কতো গুরুত্বপূর্ণ।

স্কুল থেকে বেরিয়ে আমি গেট আটকালাম এবং ফিরে গেটের দিকে এমনভাবে তাকালাম যেন এটিই আমার স্কুল জীবনের শেষ দিন। এটিই ছিল ওই প্রামাণ্যচিত্রের প্রথম পার্টের ক্লোজিং শট বা শেষ দৃশ্য। তবে বাস্তবে আমি গেট থেকে বের হয়ে চলে যাইনি, আবার ভেতরে ঢুকেছিলাম। আমি আর আমার বন্ধুরা আরও কিছুক্ষণ স্কুলে থাকতে চাইছিলাম। আমরা সবাই দৌড়ে প্রাইমারি স্কুলে গেলাম। সেখানে একটু বেশি জায়গা থাকায় দৌড়াদৌড়ি করা যেতো বা ডাকাত-পুলিশ খেলা যেত। প্রাইমারি স্কুল চত্বরে গিয়ে আমরা কয়েক বান্ধবী ম্যাঙ্গো ম্যাঙ্গো খেলছিলাম। এই খেলায় প্রত্যেকে প্রত্যেকের হাত ধরে গোল হয়ে নাচতে হয় এবং গান গাইতে হয়। গান থামার সঙ্গে সঙ্গে নড়াচড়া বন্ধ করে মূর্তির মতো নিশ্চল হয়ে যেতে হয়। গান চলাকালে কেউ নাচতে থাকলে বা হাসলে সে বাদ পড়ে যায়।

ওইদিন বেলা গড়িয়ে গেলে আমরা বাড়ি ফিরেছিলাম। সাধারণত দুপুর একটায় আমরা বাসায় ফিরতাম। সেদিন ফিরতে তিনটা বেজে গিয়েছিল। বাসায় আসার

www.pathagar.com

খানিক আগে তুচ্ছ কোনো একটা ব্যাপার নিয়ে আমার আর মনিবার মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। কারণটা এতই তুচ্ছ ছিল যে, এখন সেটা মনে করতে পারছি না।

আমাদের মধ্যে কয়েকজন বললো, 'গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ বা বিশেষ দিন এলেই তোমাদের মধ্যে খটরমটর লাগে। এটা ভারি খারাপ।'

যাহোক আমি তথ্যচিত্র নির্মাতাকে বলেছিলাম, 'তাঁরা আমাকে ঠেকাতে পারবে না। বাড়িতে হোক, স্কুলে হোক বা অন্য কোথাও-যেখানেই হোক আমি লেখাপড়া শিখবই। বিশ্বের প্রতি আমাদের অনুরোধ-আমাদের স্কুলগুলোকে বাঁচান, আমাদের পাকিস্তানকে বাঁচান, আমাদের সোয়াতকে বাঁচান।'

বাড়িতে ফিরে আমি শুধু কাঁদতে লাগলাম। আমি কিছুতেই পড়াশুনা ছাড়তে চাচ্ছিলাম না। আমার বয়স তখন মাত্র ১১ বছর, কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন সবকিছু হারিয়ে ফেলেছি। আগে আমি আমার ক্লাসের সবাইকে বলতাম, তালেবান এভাবে এগোতে পারবে না। আমি বলতাম, 'তারা রাজনীতিকদের মতোই কথার কথা বলছে, কিন্তু কিছুই করতে পারবে না।' কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা যখন আমাদের স্কুলগুলো বন্ধ করে দিল তখন আমি ভেঙে পড়লাম। আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলাম না। আমি কাঁদছিলাম, আম্মা কাঁদছিলেন-কিন্তু আব্বা জোর গলায় বললেন, 'চিন্তা করো না। তুমি অবশ্যই স্কুলে যেতে পারবে।'

আব্বার কাছে স্কুল বন্ধ হওয়া মানে তাঁর ব্যবসায় বড় ধরনের লোকসান হওয়া। শীতকালীন ছুটির পর ছেলেদের স্কুল খুললেও মেয়েদের স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আমাদের আয় রোজগার অনেক কমে যাবে। স্কুলের অর্ধেকের বেশি ফী বাকি পড়ে গিয়েছিল। ভবন ভাড়া, আনুষঙ্গিক খরচ ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতনের অর্থ জোগাড় করতে গতকাল আব্বাকে নানা জায়গায় ধরণা দিতে হয়েছে।

ওই রাতে প্রচণ্ড গোলাগুলি হচ্ছিল। রাতে গুলির শব্দে তিনবার আমার ঘুম ভেঙে যায়। পরদিন দেখি চারপাশের সবকিছু কেমন বদলে গেছে। আমি ভাবতে লাগলাম, আমার পেশোয়ার বা অন্য কোথাও চলে যাওয়া উচিত; অথবা আফগানিস্তানে তালেবান শাসনের সময় যেভাবে অনেক গোপন স্কুল পরিচালিত হতো সেই রকম স্কুল চালানোর জন্য শিক্ষকদের অনুরোধ করা উচিত। এরপরই আমি যতগুলো টেলিভিশন চ্যানেল ও রেডিওর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব তার সবগুলোতেই যোগাযোগ করলাম। সেসব রেডিও-টেলিভিশনে বললাম, 'তারা আমাদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ করতে পারে কিন্তু আমাদের লেখাপড়া শেখা বন্ধ করতে পারবে না।' আমি আশাবাদী বক্তব্য দিলেও মনে মনে আমি খুবই

www.pathagar.com

বিচলিত ও উদ্বিগ্ন ছিলাম। আমি আর আব্বা পেশোয়ারে গিয়ে বহু মানুষকে সোয়াতে কী হচ্ছে তা জানালাম। আমি সেখানে তালেবানের ভণ্ডামির কথা বলতে গিয়ে বললাম, একদিকে তারা নারীদের শিক্ষা ও চিকিৎসা দেওয়ার জন্য নারী শিক্ষক ও নারী ডাক্তার চায়; অন্যদিকে তারা মেয়েদের স্কুলে পড়ার যোগ্য বলেই মনে করে না।

একবার মুসলিম খান বলেছিলেন, মেয়েদের স্কুলে যাওয়া এবং পশ্চিমা কায়দা কানুন শেখা ঠিক নয়। অথচ তিনিই সেই লোক যিনি কিনা বহু বছর আমেরিকায় কাটিয়েছেন! তিনি বলেছিলেন, তাঁর নিজের স্বতন্ত্র শিক্ষা পদ্ধতি আছে।

আমার আব্বার প্রশ্ন, 'স্টেথোস্কোপ ও থার্মোমিটারের বদলে তিনি কী ব্যবহার করবেন? রোগ হলে চিকিৎসা করার মতো যন্ত্র পূবের দেশগুলোর কাছে আছে?' আসলে তালেবান জঙ্গিরা শিক্ষার বিরোধী অন্য কারণে। তাঁরা মনে করে, একটা শিশু যখন বই পড়ে বা ইংরেজি শেখে তখন এর মাধ্যমে তারা পশ্চিমাস্বভাবী হয়ে যায়।

কিন্তু আমি বলেছিলাম, 'শিক্ষা তো শিক্ষাই। আমাদের সবকিছুই জানা উচিত এবং তারপর আমরা কোন পথে চলবো তা ঠিক করা উচিত।' শিক্ষা বলতে প্রাচ্যের শিক্ষা কিংবা পাশ্চাত্যের শিক্ষা বলতে কিছু নেই। শিক্ষা একটি মানবিক ব্যাপার।

আম্মা আমাকে মিডিয়ার সামনে কথা বলার সময় মুখমণ্ডল ঢেকে নিতে বলতেন কারণ তিনি বলতেন এই বয়সে আমার পর্দা অনুসরণ করা উচিত। এছাড়া আমার নিরাপত্তা নিয়েও তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন। কিন্তু তিনি কখনোই কোনোকিছু করার ব্যাপারে আমার ওপর নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দেননি। ওই সময়টা ছিল ভয় আর আতঙ্কের। লোকজন বলাবলি করতো, তালেবান হয়তো আব্বাকে হত্যা করতে পারে, কিন্তু আমাকে তারা কিছু বলবে না। তারা বলতো, 'মালালা বাচ্চা মেয়ে। তালেবান বাচ্চাদের হত্যা করে না।'

আমার নানী কিন্তু এতটা নিশ্চিন্ত ছিলেন না। যখনই তিনি আমাদের টেলিভিশনে কথা বলতে দেখতেন কিংবা বাসা থেকে বের হতে দেখতেন তখন তিনি দোয়া করতেন, 'আল্লাহ, মালালাকে বেনজির ভুট্টোর মতো বড় করো কিন্তু বেনজিরের মত কম আয়ু দিও না।'

স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর আমি ব্লগে লেখা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। গার্লস স্কুল নিষিদ্ধ করার চার দিন পর আরও পাঁচটি স্কুল ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। আমি লিখেছিলাম, 'আমি সাংঘাতিক বিস্মিত। কারণ এসব স্কুল বন্ধ করে দেওয়ার পরও সেগুলো কেন ভেঙে ফেলার দরকার পড়লো? তালেবানের বেধে দেওয়া সময়সীমার পর কেউ স্কুলে যায়নি। সেনাবাহিনী এ নিয়ে কিছুই করছে

www.pathagar.com

না। তারা পাহাড়ের ওপর বাঙ্কারের শুয়ে বসে আছে। সেখানে তারা মহা আনন্দে খাসি জবাই করে খাচ্ছে।' আমি লিখেছিলাম, মোল্লা এফএমে দোররা মারার ঘোষণা শুনে লোকজন তা দেখার জন্য শান্তিস্থলে জড়ো হচ্ছে। সেখানে পুলিশের টিকিটিও দেখা যাচ্ছে না।

একদিন আমেরিকা থেকে একটা ফোন পেলাম। যিনি ফোন করেছিলেন তিনি স্ট্যাম্পফোর্ড ইউনিভারসিটির ছাত্রী শিজা শাহিদ। পাকিস্তান থেকে সেখানে গেছেন। তিনি নিউ ইয়র্ক টাইমসের ওয়েবসাইট থেকে 'ক্লাস ডিসমিস ইন সোয়াত ভ্যালি' নামের তথ্যচিত্রটি দেখেছিলেন এবং তার সূত্র ধরে আমার নম্বর যোগাড় করেছিলেন। আমরা তখন মিডিয়ার শক্তি বুঝতে পারছিলাম। শিজা শাহিদ আমাদের একনিষ্ঠ সমর্থক হয়ে গিয়েছিলেন। পুরো তথ্যচিত্রটিতে আমার সরব উপস্থিতি দেখে আব্বা যেন গর্বে ফেটে পড়ছিলেন।

আব্বা তথ্যচিত্র নির্মাতা অ্যাডাম এলিককে বললেন, 'তাঁর (আমার) দিকে চেয়ে দেখুন; আপনার কি মনে হয় না তার মধ্যে আকাশের বিশালতা রয়েছে?'

অ্যাডাম আমাদের ইসলামাবাদে নিয়ে এলেন। এই প্রথমবারের মতো আমি ইসলামাবাদে এলাম। সোয়াতের মতো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রাচুর্য না থাকলেও বিশাল বিশাল সাদা অট্টালিকা আর প্রশস্ত রাস্তায় শহরটিকে খুব সুন্দর মনে হয়েছিল। যেখানে সেনাবাহিনী অবরোধ করে অভিযান চালিয়েছিল সেই লাল মসজিদ, পার্লামেন্ট ভবন এবং প্রেসিডেন্টের বাসভবন (যেখানে এখন জারদারি থাকেন) অভিমুখে যাওয়া বিশাল বিশাল অ্যাভিনিউ দেখে আমি মুগ্ধ হলাম।

ইসলামাবাদে আমরা শপিংয়ে গিয়েছিলাম। আমি স্কুলের পাঠ্য বই কিনলাম। অ্যাডাম আমাকে কয়েকটি ডিভিডি কিনে দিলেন। এসবের মধ্যে 'আগলি বেট্টি' নামের একটা টেলিভিশন অনুষ্ঠানের ডিভিডি ছিল। অনুষ্ঠানটি ছিল দৃঢ় ও বিরাট হৃদয়ের একটি মেয়েকে ঘিরে। অনুষ্ঠানটি খুব ভালো লেগেছিল এবং আমার মনে বাসনা তৈরি হয়েছিল যে একদিন আমিও মেয়েটির মতো নিউইয়র্কে গিয়ে সেখানে একটি ম্যাগাজিনে তার মতো কাজ করব। আমরা ইসলামাবাদের লোক ভিরসা জাদুঘরেও ঘুরতে গিয়েছিলাম। সেখানে আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য আরও একবার উপভোগ করার সুযোগ মিলল। আমাদের সোয়াতের জাদুঘর বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

ইসলামাবাদের এই জাদুঘরের বাইরে একজন বৃদ্ধ পপকর্ন বিক্রি করছিলেন। লোকটা আমাদের মতই একজন পশতুন। আব্বা যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর বাড়ি ইসলামাবাদেই কিনা, তখন লোকটি বললেন, 'আপনি কি মনে করেন ইসলামাবাদ কখনো-কোনোদিন আমাদের পশতুনদের নিজের লোক বলে ভেবেছে?' তিনি জানালেন, উপজাতীয় এলাকা মোহমান্দ থেকে তিনি এসেছেন।

www.pathagar.com

সেনাবাহিনী অভিযান চালানোর কারণে তাঁকে বাড়িঘর ফেলে এখানে চলে আসতে হয়েছে। দেখলাম লোকটির কথা শুনে আব্বার চোখে পানি এসে গেল।

দেখলাম বহু ভবনের চারপাশে কংক্রিটের দেওয়াল তুলে দেওয়া হয়েছে এবং আত্মঘাতী হামলা প্রতিহত করতে যানবাহন তল্লাশি করতে চৌকি বসানো হয়েছে। বাসে যাওয়ার সময় বাসটির চাকা রাস্তার মাঝখানে কোনো ছোট গর্তে পড়েছিল। এতে গাড়িটা বেশ জোরে ঝাকুনি খেল। আমার পেছনের সিটে খুশাল ঘুমাচ্ছিল। ঝাকি খেয়ে সে জেগে উঠে বললো, 'বোমা ফুটেছে নাকি?' আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এরকম ভয় ঢুকে গিয়েছিল। ছোটখাটো কোনো হইচই বা শোরগোল শুনলে বোমা বিস্ফোরণ কিংবা বন্দুক যুদ্ধ বলে মনে হতো।

ইসলামাবাদের সংক্ষিপ্ত সফরের সময় আমরা আমাদের সোয়াতের কষ্ট ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু যখন সোয়াতে ফিরে এলাম, তখন আবার যেন সেই বিপদ আর ভীতির রাজ্যে আমাদের ফিরে আসতে হলো। আবার এটাও সত্যি, সোয়াতই আমাদের বাড়িঘর এবং আমরা তাকে ছাড়তে মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না।

মিঙ্গোরাতে ফিরে আমি আমার ওয়ার্ডরোব খুলে প্রথমেই যে জিনিসগুলো ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নিলাম, সেগুলো হলো আমার ইউনিফর্ম, স্কুলব্যাগ এবং জিওমেট্রি সেট। আমার খারাপ লাগছিল। ইসলামাবাদ সফর আমার জন্য চমৎকার একটি বিনোদন বিরতি ছিল, কিন্তু এখন আমি আবার কঠিন বাস্তবতায় ফিরে এসেছি।

www.pathagar.com

১৪

হাস্যকর শান্তিচুক্তি

শীতকালীন ছুটি শেষে আবার আমাদের ভাইদের স্কুল খুললো। কিন্তু খুশাল স্কুলে যেতে চাইল না। সে বলল, আমার মতো সেও বাড়িতে থাকবে। তার কথায় আমি খুব চটে গেলাম। আমি তাঁকে বললাম, 'তুমি যে কত ভাগ্যবান তা তুমি বুঝতে পারছ না!' স্কুল না থাকাটা খুব অদ্ভুত মনে হচ্ছিল। বাসায় একটা টেলিভিশন সেটও ছিল না। আমরা ইসলামাবাদে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি আব্বার বাড়িতে ঢোকার 'গোপন সিড়ি' ব্যবহার করে কে বা কারা আমাদের টেলিভিশনটা চুরি করে নিয়ে গেছে।

যখন সারাটা সময় বাধ্য হয়ে আমাকে বাড়িতে কাটাতে হচ্ছিল; তখন কেউ একজন আমাকে পাওলো কোয়েলহোর লেখা দ্য অ্যালকেমিস্ট বইটা উপহার দিয়েছিল। গুপ্তধনের খোঁজে পিরামিডের মধ্যে অভিযান চালানো এক মেষপালকের উপকথা নিয়ে বইটির গল্প। এই বইয়ের এক জায়াগায় বলা আছে, 'তুমি যখন কিছু করতে চাবে, তখন পুরো পৃথিবী তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে, আর তোমার লক্ষ্যে পৌঁছতে সেই ষড়যন্ত্রটাই সাহায্য করবে। অবশ্য তালেবান বা আমাদের অপদার্থ রাজনীতিকদের সঙ্গে পাওলো কোয়েলহোর দেখা হয়েছিল বলে আমার মনে হয় না।

হাই কাকার যে ফজলুল্লাহ এবং তাঁর সাথীদের সঙ্গে গোপন আলোচনা চালাচ্ছিলেন তা প্রথমে জানতাম না। সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় হাই কাকার মেয়েদের লেখাপড়া নিষিদ্ধের ঘোষণা প্রত্যাহার করার বিষয়টি বিবেচনা করতে তাদের অনুরোধ করেছিলেন।

ফজলুল্লাহকে হাই কাকার বলেছিলেন, 'দেখুন মাওলানা, আপনি লোকজনকে খুন করেছেন, অনেককে জবাই করেছেন, অনেকের শিরোচ্ছেদ করেছেন, বহু স্কুল ওড়িয়ে দিয়েছেন– তখন পর্যন্ত পাকিস্তানে আপনাদের বিরুদ্ধে কোনো বিক্ষোভ হয়নি। কিন্তু যখন আপনি মেয়েদের লেখাপড়া নিষিদ্ধ করলেন তখন কিন্তু লোকে মুখ খুলতে শুরু করে। মেয়েদের শিক্ষা নিষিদ্ধ করার আগ পর্যন্ত পাকিস্তানের অধিকাংশ গণমাধ্যম আপনাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। কিন্তু তারাও এখন আপনাদের বিরুদ্ধে খেপে গেছে।'

www.pathagar.com

সারা দেশ থেকে চাপ আসায় ফজলুল্লাহ দশ বছর বয়স পর্যন্ত মেয়েদের লেখাপড়া করতে দিতে রাজী হলেন। অর্থাৎ চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞার আওতামুক্ত রাখা হলো। আমি তখন পঞ্চম শ্রেণিতে। ফলে আমি এবং আমার মতো আরও অনেকে নিজেদের বয়স কম দেখিয়ে আবার স্কুলে যাওয়া শুরু করলাম। স্কুল ড্রেস না পরে সাধারণ পোশাক পরে এবং শালের নিচে বই লুকিয়ে আমরা স্কুলে যেতাম। এটা ঝুঁকিপূর্ণ ছিল; কিন্তু স্কুলে যাওয়াটাই তখন আমার জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিষয় ছিল। আমরা এত ভাগ্যবান ছিলাম যে, মরিয়ম ম্যাডাম অনেক সাহসী ছিলেন এবং কাজ ছেড়ে দেওয়ার জন্য মাথার ওপর হুমকি থাকার পরও তিনি এর প্রতিবাদ করে যাচ্ছিলেন। দশ বছর বয়স থেকে মরিয়ম ম্যাডাম আব্বাকে চিনতেন। পরস্পরের প্রতি তাঁদের সম্পূর্ণ আস্থা ছিল। আব্বা লম্বা বক্তৃতা দিতে থাকলে (যেটা তিনি প্রায়ই করতেন) মরিয়ম ম্যাডাম তাঁকে ইঙ্গিত দিয়ে বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করতে বলতেন।

মরিয়ম ম্যাডাম বলতেন, 'গোপন স্কুলই আমাদের নীরব প্রতিবাদ।'

আমি আমার ডায়েরিতে গোপন ক্লাস সম্পর্কে কিছু লিখিনি। তারা যদি জানতে পারতো তাহলে তারা আমাদের ধরে প্রকাশ্যে চাবুক মারত অথবা শাবানার মতো আমাদেরও হত্যা করত। অনেকে ভূতের ভয় পায়। অনেকের ভয় সাপে, অনেকের মাকড়সায়। কিন্তু ওই সময় আমরা আমাদের নিজেদের মানুষের ভয়েই আতঙ্কিত হয়ে থাকতাম।

স্কুলে যাওয়ার পথে কখনো কখনো মাথায় টুপি পরা বড় বড় চুলওয়ালা তালেবানকর্মীদের দেখতাম। বেশিরভাগ সময়ই তারা তাদের মুখ ঢেকে রাখতো। তাদের চোখ মুখে নিষ্ঠুরতা ও ভয়াবহতার ছাপ ছিল। আমাদের উপত্যকার প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক ভয়ে পালিয়ে চলে যাওয়ায় মিঙ্গোরার রাস্তাঘাট তখন প্রায় ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। আব্বা বলতেন, এলাকা ছাড়ার জন্য লোকদের দোষ দিয়ে লাভ নেই; কেননা এখানে সরকারের কোনো ক্ষমতাই নেই। ট্যাংক, হেলিকপ্টার ও আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত ১২ হাজার সেনা এখানে মোতায়েন করা হয়েছিল যারা তালেবান যোদ্ধাদের চেয়ে সংখ্যায় চারগুণ বেশি। কিন্তু তারপরও সোয়াতের ৭০ শতাংশ এলাকা তালেবানের কব্জায় ছিল।

স্কুলে ফেরার এক সপ্তাহ পরে, ২০০৯ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি রাতে অবিরাম গুলিবর্ষণের শব্দে আমাদের ঘুম ভেঙে গেল। আমাদের এখানকার ঐতিহ্য অনুযায়ী সন্তানাদীর জন্ম হলে বা বিয়ের অনুষ্ঠানে ফাঁকা গুলি করে উল্লাস প্রকাশ করা হয়। কিন্তু তালেবানের দখলদারিত্বের পর সেটাও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এ কারণে গুলির শব্দে প্রথমেই আমরা ধরে নিয়েছিলাম, আমরা বিপদের মধ্যে পড়েছি। পরে আসল খবর পেলাম। জানলাম, এটা সত্যিই আনন্দসূচক ফাকা গুলি বর্ষণ। শুনলাম, তালেবান এবং প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে একটা শান্তি চুক্তি হয়েছে। প্রাদেশিক সরকারে তখন এএনপি; মোল্লার নন। তালেবান জঙ্গিদের হামলা বন্ধের শর্তে সরকার সোয়াতে শরিয়া আইন চালু করতে রাজি

www.pathagar.com

হয়েছিল। তালেবান দশ দিনের অস্ত্র বিরতিতে রাজি হন এবং শান্তি উদ্যোগের চিহ্ন হিসেবে তারা ছয়মাস আগে অপহরণ করা এক চাইনিজ টেলিফোন ইঞ্জিনিয়ারকে মুক্তি দিল।

আমরাও খুব খুশি হয়েছিলাম– আব্বা আর আমি শান্তি চুক্তির পক্ষে প্রায় কথা বলতাম। তবে এই চুক্তি কীভাবে কাজ করবে সেটাই ছিল আমাদের বড় প্রশ্ন। সাধারণ মানুষের আশা ছিল শান্তিচুক্তি হলে তালেবান স্থির অবস্থানে আসবে। তাদের যোদ্ধারা ঘরে ফিরে যাবে এবং সাধারণ নাগরিকদের মতো শান্তিতে বসবাস করবে। সাধারণ মানুষ নিজেদের এই বলে শান্ত্বনা দিচ্ছিল সোয়াতে শরিয়া আইন চালু হলেও আফগানিস্তান থেকে এটি আলাদা ধরণের হবে। যেমন, আমাদের এখানে মেয়েদের পড়াশুনার জন্য স্কুলগুলো চালু থাকবে এবং আফগানিস্তানের মতো নীতি রক্ষী পুলিশও থাকবে না। সোয়াত সোয়াতই থাকবে– শুধু বিচার ব্যবস্থাটা একটু ভিন্ন ধরণের হবে। আমিও এমনটা বিশ্বাস করতে চেয়েছিলাম। তবে আমার উদ্বেগও ছিল। আমি ভাবছিলাম শরিয়া আইন কীভাবে চলবে তা নির্ভর করবে যারা এই আইনের ওপর নজরদারি করবে, অর্থাৎ সব কিছুই নির্ভর করবে তালেবানের ওপর।

এটা বিশ্বাস করা কঠিন ছিল যে, সব কিছুর অবসান হয়ে গেছে। ইতিমধ্যেই সহস্রাধিক সাধারণ মানুষ ও পুলিশকে হত্যা করা হয়েছে। মহিলাদের পর্দায় থাকতে বাধ্য করা হয়েছে, স্কুল ও ব্রিজ উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, ব্যবসাপাতি বন্ধ হয়ে গেছে। দিনের পর দিন আমরা বর্বরোচিত প্রকাশ্য শালিশ বিচার, শাসনের নামে উন্মত্ততাপূর্ণ এক ভীতিকর পরিবেশে ছিলাম। এই চুক্তির কারণে এখন সবকিছুর সমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে।

ভোরে নাশতা খাওয়ার সময় আমি আমার দুই ভাইকে বললাম, আমরা এখন থেকে শুধু শান্তি নিয়ে কথা বলব; যুদ্ধ নিয়ে নয়। বরাবরের মতোই তাঁরা আমার কথা শুনলো না এবং যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা শুরু করে দিলো। খুশালের একটা খেলনা হেলিকপ্টার এবং অটলের কাগজ দিয়ে বানানো একটা পিস্তল ছিল। খেলার সময় একজন চিৎকার করে বলতে লাগল, 'ফায়ার!' অন্যজন বলছিল, 'টেক পজিশন।' আমি আর এ নিয়ে মাথা ঘামালাম না। ঘরে গিয়ে নিজের ইউনিফর্মের দিকে তাকালাম। ভালো লাগছিল এই ভেবে যে খুব শিগগিরই আমি আবার এটা সবার সামনে পরতে পারব। আমাদের হেড মিসট্রেসের কাছ থেকে বার্তা এল, মার্চের প্রথম সপ্তাহেই আমাদের পরীক্ষা শুরু হবে। আমাদের এই খুশি বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। মাত্র দুইদিন পরই আমি তাজমহল হোটেলের ছাদে বসে বিখ্যাত সাংবাদিক হামিদ মিরকে যখন শান্তিচুক্তি নিয়ে সাক্ষাৎকার দিচ্ছি ঠিক সেই মুহূর্তে খবর পেলাম আমাদের পরিচিত আরেকজন টিভি রিপোর্টার নিহত হয়েছেন। ওই সাংবাদিকের নাম মূসা খান খেল। তিনি প্রায়ই আব্বার

www.pathagar.com

সাক্ষাতকার নিতেন। ওইদিন সুফি মোহাম্মদের নেতৃত্বে একটি শান্তিমিছিল হচ্ছিল। মূসা খান খেল নিউজটি কাভার করছিলেন। এটা আসলে সেই অর্থে মিছিল ছিল না। এটা ছিল অনেকগুলো গাড়ির বহর নিয়ে শো ডাউন। বহরটির শো ডাউনের পরপরই সেখানে মূসা খানের মৃত দেহ পাওয়া যায়। তাঁর দেহে বেশ কয়েকটি গুলি বিঁধেছিল। গলা ছিল আংশিক কাটা। মাত্র আঠাশ বছর বয়স ছিল মূসা খানের। আমাদের কাছ থেকে মূসার মৃত্যুর কথা শোনার পর আম্মা বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি শোবার ঘরে গিয়ে অনেকক্ষণ কেঁদেছিলেন। শান্তি চুক্তির পর এত তাড়াতাড়ি সহিংসতা ফিরে আসায় তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। তাহলে এই চুক্তি কি স্রেফ ভাওতাবাজি ছিল? আম্মার বিস্ময়ের শেষ ছিল না।

এর কয়েকদিন পর ২২ ফেব্রুয়ারি ডেপুটি কমিশনার সৈয়দ জাভিদ মিঙ্গোরায় সোয়াত প্রেসক্লাবে একটি 'স্থায়ী অস্ত্রবিরতি'র ঘোষণা দেন। তিনি সব সোয়াতিকে নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে আসার আহ্বান জানান। এরপরই তালেবান মুখপাত্র মুসলিম খান নিশ্চিত করে বলেন, তাঁদের সঙ্গে সরকারের অনির্দিষ্টকালের জন্য অস্ত্র বিরতি হয়েছে। প্রেসিডেন্ট জারদারি শান্তিচুক্তিতে সই করে এটিকে আইনের রূপ দেবেন। যেসব পরিবার সহিংসতার শিকার হয়েছে তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলেও সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়।

সোয়াতের সবাই উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। কিন্তু আমি খুব বেশি খুশি হয়েছিলাম কারণ এই চুক্তির ফলে স্কুল আগের মতো খুলতে পারবে। তালেবানের পক্ষ থেকে বলা হলো, চুক্তি সাক্ষরের পর মেয়েরা স্কুলে যেতে পারবে, তবে অবশ্যই তাদের মুখমণ্ডল ঢেকে যেতে হবে। আমরা বললাম, ঠিক আছে যতদিন পারি আমরা তোমাদের ইচ্ছামতোই চলব। তবে প্রত্যেকেই এই চুক্তির ব্যাপারে সন্তুষ্ট ছিল না।

আমাদের মার্কিন মিত্ররা খুব ক্ষেপে গেলেন। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন বললেন, 'আমার মনে হয় পাকিস্তান সরকার প্রকারান্তরে তালেবান ও উগ্রপন্থিদের ছাড় দিচ্ছে।' আমেরিকানদের উদ্বেগ ছিল এর মাধ্যমে পাকিস্তান আত্মসমর্পন করছে। পাকিস্তানের সংবাদপত্র ডন তার সম্পাদকীয়তে লিখল, এই চুক্তি এমন এক ধ্বংসাত্মক সংকেত দিল যে, 'আপনি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সামরিকভাবে লড়াই চালান, রাষ্ট্র আপনাকে কিছুর বিনিময় ছাড়াই আপনি যা চান তাই দেবে।'

কিন্তু যারা এসব কথা বলছিলেন তাদের কেউই সেখানে বাস করছিলেন না। আমাদের দরকার ছিল শান্তি; তা সে যেই আনুক। আমাদের ক্ষেত্রে যিনি শান্তি এনেছিলেন, তিনি হলেন সাদা দাড়িওয়ালা বর্ষীয়ান জঙ্গি নেতা সুফি মোহাম্মাদ। তিনি দির এলাকায় 'শান্তি শিবির' প্রতিষ্ঠা করেন এবং আমাদের প্রিয়ভূমির ত্রাতার মতো সেখানকার বিখ্যাত মসজিদ তাবলীগ মারকাজে অবস্থান নেন।

www.pathagar.com

তালেবান তাদের অস্ত্র নামিয়ে রাখবে এবং উপত্যকায় শান্তি ফিরে আসবে– এটার নিশ্চয়তা বিধানকারী তিনিই ছিলেন। লোকজন যুদ্ধ এবং আত্মঘাতী হামলা দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল; এ কারণে তারা শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়ায় সুফি মোহাম্মাদের কাছে গিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছিল। তাঁর হাতে চুমু খাচ্ছিল।

মার্চ মাসে আমি আমার ব্লগ লেখা বন্ধ করে দিলাম। কারণ হাই কাকার মনে করছিলেন এখনকি আর বেশি কিছু বলার আছে। কিন্তু আমাদের ভয়ের বিষয়গুলো একেবারে বদলে যায়নি। এমন কি কিছু বিষয়ে তালেবান আগের চেয়ে বেশি বর্বর হয়ে উঠেছিল। তারা এখন রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত সন্ত্রাসী হয়ে উঠেছে। আমরা একইসঙ্গে বিভ্রান্ত এবং গভীর চিন্তান্বিত হয়ে পড়েছিলাম। শান্তি চুক্তি শেষ পর্যন্ত বৃথা মায়া মরিচিকায় রূপ নিয়েছিল। এক রাতে দেখলাম, আমাদের সড়কের কাছে তালেবান সদস্যরা পতাকা মিছিল বের করেছে। সেনাবাহিনীর মতো তারা হাতে রাইফেল ও লাঠি নিয়ে রাস্তায় টহল দিচ্ছে।

তারা তখনও চীনা বাজারে টহল দিচ্ছিল। আমার খালাতো বোনের বিয়ে ঠিক হওয়ায় বিয়ের জন্য কিছু জিনিসপত্র কিনতে আম্মা তাকে নিয়ে একদিন চীনা বাজারে গিয়েছিলেন। একজন তালেব তাদের দিকে এগিয়ে এসে তাদের সেখানে ঢুকতে বাধা দিল। সে বললো, 'ভবিষ্যতে যদি দেখি বোরখা না পরে শুধু স্কার্ফ পরে আপনারা এসেছেন, তাহলে কিন্তু আমি আপনাদের পেটাব।' আম্মা সন্ত্রস্ত্র না হয়ে তাকে স্বাভাবিকভাবে বললেন, 'ঠিক আছে, আমরা পরে যখন আসব, তখন বোরখা পরেই আসব।' আম্মা সব সময় মাথায় কাপড় দিতেন। কিন্তু পশতুন ঐতিহ্যে বোরখা পরার রেওয়াজ ছিল না।

ওই সময় শুনলাম তালেবান এক দোকানদারকে বেধড়ক পিটিয়েছে। দোকানদারের অপরাধ, পুরুষ সঙ্গী ছাড়াই একটি মেয়ে তার দোকানে এসে লিপস্টিক দেখছিল। তারা দোকানদারকে বলল, 'মার্কেটে টানানো ব্যানারে স্পষ্ট করে লেখা আছে সঙ্গে পুরুষ আত্মীয় স্বজন ছাড়া কোনো মেয়েকে দোকানে ঢুকতে দেওয়া যাবে না। তুমি আমাদের কথা মাননি।' তারা লোকটাকে অমানুষিকভাবে মারল। কেউ ঠেকাতে আসল না।

একদিন দেখলাম, আব্বা তাঁর এক বন্ধুকে নিয়ে তাঁর মোবাইল ফোনে একটা ভিডিও ক্লিপ দেখছেন। সে একেবারে আঁতকে ওঠার মতো দৃশ্য। লাল সালোয়ার ও কালো বোরখা পরা এক তরুণীকে রাস্তার ওপর উপুড় করে একটা লোক চাবুক মারছে। লোকটার মাথায় কালো পাগড়ি, মুখে দাড়ি। মেয়েটা গোঙাচ্ছে। প্রত্যেক চাবুক মারার পর মেয়েটা বলছে, 'দয়া করে আর মারবেন না। আল্লাহর দোহাই, আমি মারা যাচ্ছি। আর মারবেন না।' এক তালেব চিৎকার করে বলছে, 'ওকে শুইয়ে রাখ" হাত ঠেসে ধর।' এক পর্যায়ে মেয়েটার

www.pathagar.com

বোরখা মুখ থেকে সরে গিয়েছিল। তারা বোরখাটা আবার ঠিক মতো ঘিরে দেওয়ার জন্য দোররা মারা কয়েক মুহূর্তের জন্য থামাল। মোট ৩৪ বার তাকে চাবুকটি মারা হয়। চারপাশে অসংখ্য লোক ঘিরে ছিল; কিন্তু কেউ কিছু তো করেই নি; বরং মেয়েটার এক স্বজন নিজে তাঁকে চাবকানোর সময় মাটির সাথে ঠেসে রেখেছিল।

কয়েকদিন পর সবখানেই ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়ল। ইসলামাবাদের এক নারী চলচ্চিত্র নির্মাতা এটি ধারণ করেছিলেন। পাকিস্তান টিভিতে ভিডিওটি বারবার দেখানো হচ্ছিল; সেই সঙ্গে সারা পৃথিবীতে এটি ছড়িয়ে পড়েছিল। মানুষ এটি দেখে যথার্থই ক্ষুব্ধ হয়েছিল। কিন্তু তাদের এই ক্ষুব্ধতা আমাদের কাছে অনেকটাই ভালো লাগেনি এই ভেবে যে, তাদের এই প্রতিক্রিয়ায় বোঝা যাচ্ছিল আমাদের উপত্যকায় প্রতিনিয়ত কী ঘটছে তারা তার খবরই রাখেনা। মেয়েদের শিক্ষার ওপর তালেবানের নিষেধাজ্ঞার বিষয়টিও যাতে মানুষের ক্ষোভের কারণের মধ্যে যুক্ত হয় আমি সেটাই চাচ্ছিলাম। প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ রাজা গিলানি তরুণীকে দোররা মারার ঘটনা তদন্ত করার নির্দেশ দিলেন এবং এ ঘটনা ইসলামের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচরণ। তিনি বললেন, 'ইসলাম নারীর সঙ্গে সদাচারণ করার শিক্ষা দেয়।' অনেকে ভিডিওটিকে ভুয়া দাবি করলেন। অনেকে বললেন, ভিডিওটি আসল, এটা ঠিক। তবে এটি শান্তিচুক্তি হওয়ার আগের ঘটনা। শান্তি নষ্ট করার উদ্দেশে অন্তর্ঘাতমূলক কাজ হিসেবে এটি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মুসলিম খান শেষ পর্যন্ত এটিকে আসল ভিডিও বলে নিশ্চিত করলেন। তিনি বললেন, 'মেয়েটা স্বামী ছাড়া বেগানা পুরুষের সঙ্গে ঘরের বাইরে গিয়েছিল; এ কারণে তাকে আমাদের শাস্তি দিতে হয়েছে।' তিনি বললেন, 'কিছু অনুশাসন কিছুতেই লংঘন করা যাবে না।'

ওই সময় এপ্রিলের শুরুতে আরেক বিখ্যাত সাংবাদিক জাহিদ হুসাইন সোয়াতে আসেন। তিনি স্থানীয় ডিসির সঙ্গে দেখা করতে তাঁর সরকারি বাসভবনে যান। সেখানে দেখেন ডিসি সাহেব তালেবানের ক্ষমতা দখলের উৎসব উদযাপনের ব্যবস্থা করেছেন। সেখানে তার আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে তালেবান মুখপাত্র মুসলিম খান, এমনকি ফকির মোহাম্মদকেও ভারী অস্ত্রে সজ্জিত দেহরক্ষি পরিবেষ্টিত অবস্থায় দেখা গেল। ফকির মোহাম্মাদ হলেন, বাজাউরের কুখ্যাত জঙ্গি নেতা যার নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর সঙ্গে তালেবানের একাধিক রক্তক্ষয়ী লড়াই হয়েছে। ফকিরকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য দুই লাখ ডলার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। জাহিদ হোসাইন তাঁকে সরকারী কর্মকর্তাদের সঙ্গে নৈশভোজ করতে দেখলেন। আমরা এমনটাও শুনেছি, ফজলুল্লাহর ইমামতিতে একজন ব্রিগেডিয়ার নাকি নামাজ পড়েছেন।

আবার বন্ধুরা বলতে লাগলেন, 'এক খাপে দুই তলোয়ার থাকতে পারে না। আমাদের পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে আমাদের কে চালাচ্ছে? সরকার নাকি

www.pathagar.com

ফজলুল্লাহ?' তবে আমরা তখনও শান্তিতে বিশ্বাসী ছিলাম। সোয়াতের মানুষের উদ্দেশে সুফি মোহাম্মাদের ভাষণ শুনতে সবাই ২০ এপ্রিলের জনসভার দিকে দৃষ্টি রাখছিল। সেদিন সকালে আমরা সবাই বাসায় ছিলাম। আব্বা আমার ছোট দুইভাইকে নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন। এ সময় কয়েকজন তালেবান জঙ্গি তাদের পাশ দিয়ে মোবাইল ফোনে বিজয়ের গান বাজাতে বাজাতে যাচ্ছিল। খুশাল বললো, 'আব্বা, আমার কাছে যদি কালাসনিকোভ থাকত তাহলে এদের সব কটাকে গুলি করে মারতাম।'

এটা যথার্থই একটা বসন্তকালীন দিন ছিল। সবাই খুব উচ্ছসিত ছিল; তাদের আশা ছিল সুফি মোহাম্মাদ শান্তি ও বিজয়ের ঘোষণা দেবেন। একই সঙ্গে তিনি তালেবানকে অস্ত্র সম্বরণ করতে বলবেন। আব্বা সরাসরি সমাবেশে যাননি। তিনি তাঁর বন্ধু আহমদ শাহর স্কুল সারস একাডেমির ছাদ থেকে সমাবেশ পর্যবেক্ষণ করছিলেন। এই ছাদে প্রায়ই সন্ধ্যায় তিনি ও তাঁর বন্ধুরা আড্ডা দিতেন। ছাদ থেকে মঞ্চের দৃশ্য খুব ভালো দেখা যাচ্ছিল। এ কারণে মিডিয়ার ক্যামেরা সেখানে বসানো হয়েছিল।

এটি ছিল তিরিশ-চল্লিশ হাজার লোকের বিশাল সমাবেশ। উপস্থিত লোকদের মাথায় পাগড়ি ছিল। তারা তালেবানি ও জিহাদী গান গাইছিল। আব্বা বলছিলেন, 'পুরো সভাজুড়ে তালেবানিকরণ ঐকতান ছড়িয়ে পড়েছিল।' আব্বার মতো উদার প্রগতিশীল লোকেরা তালেবানের এই উচ্ছ্বাস সংগীত ও স্লোগান পছন্দ করেননি। তারা বিশেষত এই সময়ে এই জিহাদী গানকে সংঘাত উসকে দেওয়ার মতো বিষাক্ত জিনিস বলে ধরে নিয়েছিলেন।

সুফি মোহাম্মাদ মঞ্চে বসেছিলেন। লোকজন লম্বা লাইন ধরে তাঁর কাছে এসে দোয়া নিয়ে যাচ্ছিল। কোরআনের বিজয়সূচক একটি সূরা তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে সভা শুরু হলো। এরপর আমাদের পাঁচটি জেলা; কোহিস্তান, মালাকান্দ, শাংলা, আপার দির ও লোয়ায় দিরের তালেবান নেতারা একের পর এক বক্তব্য দিলেন। তাদের সবাইকে খুব উচ্ছ্বসিত মনে হচ্ছিল। কারণ তাঁদের আশা ছিল, শরিয়া আইন বলবৎ হওয়ার পর নিজ নিজ জেলার প্রধান অধিকর্তা হিসেবে তারাই প্রশাসনিক প্রধান হতে পারবেন। পরে হয়তো তারা নিহত হতে পারেন কিংবা জেলে যেতে পারেন। কিন্তু তার আগে ক্ষমতার স্বাদ তো নিতে পারবেন। মহানবী (স.) এর মক্কা বিজয়ের পর যেভাবে আনন্দ প্রকাশ করা হয়েছিল সেভাবে তাঁরা কর্তৃত্বপূর্ণ বক্তৃতার মধ্য দিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছিলেন; যদিও মহানবী (স.) এর বিজয় ভাষণে ছিল ক্ষমার কথা, হিংসার কথা নয়।

সবশেষে সুফি মোহাম্মাদ বক্তব্য দিতে এলেন। এমনিতে তিনি বক্তা হিসেবে ভালো ছিলেন না। তিনি অতিশয় বৃদ্ধ ছিলেন। শরীর একেবারেই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তবু তিনি ৪৫ মিনিট ধরে বক্তৃতা করলেন। তিনি এমন সব কথা

www.pathagar.com

বললেন যা কেউ আশা করেনি। মনে হচ্ছিল তাঁর মুখ দিয়ে তিনি নন, অন্য কেউ কথা বলছে। তিনি পাকিস্তানের আদালতকে অনৈসলামিক আখ্যায়িত করে বললেন, 'আমি মনে করি কাফের মুশরিকরা আমাদের ওপর পশ্চিমা গণতন্ত্র চাপিয়ে দিয়েছে। ইসলাম কখনোই গণতন্ত্র কিংবা নির্বাচনকে সমর্থন করেনা।'

সুফি মোহাম্মদ শিক্ষা নিয়ে কিছুই বললেন না। তিনি তালেবান যোদ্ধাদের অস্ত্র ফেলে দিয়ে আবার হুজরায় ফিরে যাওয়ার নির্দেশ তো দিলেন না; উল্টো পুরো জাতিকে তিনি হুমকি দিলেন। তিনি ধমক দিয়ে বললেন, 'একটু সবুর করুন, আমরা ইসলামাবাদে আসছি।'

সুফি মোহাম্মাদের এই কথায় আমরা যারপরনাই ধাক্কা খেলাম। জলন্ত আগুনে পানি ঢেলে দিলে তা দপ করে যেমন নিভে যায়, তেমনি সুফি মোহাম্মাদের কথায় আমাদের আশাগুলো এক মুহূর্তে মরে গেল। মানুষ ভীষণরকম হতাশ হয়ে পড়ল এবং তাঁকে গালিগালাজ করতে লাগল। তারা বলতে লাগল, 'শয়তানটা বলে কি? সে তো শান্তি চায় না; সে আরও হত্যাকাণ্ড ঘটাতে যাচ্ছে।' আম্মা বললেন, 'তার সামনে মহানায়ক হওয়ার একটা বড় সুযোগ এসেছিল; কিন্তু সেটা সে নিল না। যতখানি ফুরফুরে মন নিয়ে আমরা সভায় গিয়েছিলাম, ঠিক ততখানি বেজার মনে আমাদের বাড়ি ফিরতে হলো।

ওই রাতে জিও টেলিভিশনে আব্বা কামরান খানকে বললেন, মানুষের অনেক আশা ছিল কিন্তু তারা হতাশ হয়েছে। সুফি মোহাম্মাদের যা করা উচিত ছিল তা তিনি করেননি। সমঝোতার আহবান জানিয়ে বক্তৃতা দেওয়ার মাধ্যমে শান্তি চুক্তিতে তাঁর সিলমোহর লাগিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তিনি হিংসা দিয়েই ভাষণ শেষ করলেন।

যা হলো, তা নিয়ে জনগণের মধ্যে নানাধরনের ষড়যন্ত্র তত্ত্ব ছিল। কেউ বলছিলেন, সুফি মোহাম্মাদ পাগল হয়ে গেছেন। অনেকে বলছিলেন, সুফি মোহাম্মাদকে এই বক্তৃতা দিতে বাধ্য করা হয়েছিল। একটা পক্ষ থেকে তাঁকে বলা হয়েছিল, 'আপনি এটা না বললে চার-পাঁচজন আত্মঘাতী দিয়ে আপনাকে এবং আপনার পাশে থাকা সবাইকে উড়িয়ে দেওয়া হবে।' লোকজন বলছিল, বক্তৃতা দিতে ওঠার আগে মঞ্চে তাকে অস্বাভাবিক মনে হচ্ছিল। গুঞ্জন চলছিল, অদৃশ্য শক্তি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে। আমার কথা হলো, 'তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে? তাহলে যা দাঁড়াচ্ছে তা হলো আমরা এখন তালেবান রাষ্ট্রে অবস্থান করছি।

আব্বা আবার সভা-সেমিনারে তালেবান নিয়ে আমরা কী সমস্যায় আছি, তা বলতে শুরু করলেন। একটা সেমিনারে আমাদের প্রাদেশিক তথ্যমন্ত্রী বললেন, জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং প্রথমে রুশদের ও পরে আমেরিকানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রশিক্ষিত জঙ্গিদের আফগানিস্তানে পাঠানোর ভুল সিদ্ধান্তের

www.pathagar.com

পরিণাম হলো তালেবানি আধিপত্য। তিনি বললেন, 'বিদেশিদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য মাদ্রাসা ছাত্রদের হাতে যদি আমরা অস্ত্র তুলে না দিতাম তাহলে সোয়াত ও অন্যান্য উপজাতীয় এলাকায় আমাদের এই রক্তস্নানের মুখোমুখি হতে হতোনা।'

শিগগিরই এটা স্পষ্ট হলো, শান্তি চুক্তির ব্যাপারে আমেরিকানদের দেওয়া পূর্বাভাসই ঠিক ছিল। তালেবানের বিশ্বাস ছিল পাকিস্তান সরকার তাদের হাতে কর্তৃত্ব তুলে দেবে এবং তারা যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে। শিগগিরই তারা সোয়াতের দক্ষিণ-পূর্ব দিকের (ইসলামাবাদ থেকে ৬৫ মাইল দূরে অবস্থিত) বুনের জেলার দিকে ধাবিত হলো। বুনেরের মানুষ সব সময়ই তালেবান জঙ্গিদের প্রতিরোধ করে এসেছে। কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ লোকজনকে তালেবানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ না করতে নির্দেশ দিল। বন্দুক ও আরপিজি নিয়ে তালেবান যোদ্ধারা যখন বুনেরে প্রবেশ করল তখন কোনোরকম প্রতিরোধ না করেই পুলিশ থানা ছেড়ে পালিয়ে গেল। পুলিশ বললো, জঙ্গিদের হাতে অনেক 'উন্নত অস্ত্র' আছে। পুলিশকে পালাতে দেখে স্থানীয় লোকজনও প্রাণভয়ে পালিয়ে গেল।

সোয়াতে যা করে এসেছে, এখানেও তারা তাই করল। টেলিভিশন সেট, ছবি, ডিভিডি, টেপ সব পুড়িয়ে দিল। এমনকি তাঁরা বিখ্যাত সুফি সাধক পীর বাবার দরগাও দখল করে নিল। আধ্যাত্মিক দিক নির্দেশনা পেতে, মনের অশান্তি দূর করতে এমনকি সন্তানাদির ভালো বিয়ে হওয়া মনোবাসনা পূরণ হওয়ার আশায় এখানে লোকজন আসত। তালেবান সেখানে তালা লাগিয়ে দিল।

তালেবান রাজধানীর দিকে অগ্রসর হওয়ায় নিম্নাঞ্চলীয় জেলাগুলোর বাসিন্দারা বিচলিত হয়ে পড়ল। কালো বোরখা পড়া তরুণীকে চাবুক মারার দৃশ্যটা মনে হচ্ছিল সবাই দেখে ফেলেছিল। সবাই বলাবলি করছিল, 'আমরা কি পাকিস্তানে এই জিনিস চেয়েছি?' জঙ্গিরা বেনজিরকে হত্যা করেছে, দেশের সবচেয়ে বড় ও পরিচিত হোটেল উড়িয়ে দিয়েছে, আত্মঘাতি বোমা হামলা ও শিরোচ্ছেদ করে হাজার হাজার মানুষ মেরেছে এবং শত শত স্কুল গুড়িয়ে দিয়েছে। সরকার ও সেনাবাহিনী যদি তাদের প্রতিরোধ করে তাহলে এর চেয়ে বেশি কী এমন ক্ষতি হবে?

ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট ওবামা তালেবানের সঙ্গে লড়াই করার জন্য আফগানিস্তানে আরও ২১ হাজার সেনা পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন তাদের আফগানিস্তানের চেয়ে পাকিস্তানের ব্যাপারেই বেশি উদ্বিগ্ন ও সতর্ক বলে মনে হচ্ছে। আমি এবং আমার স্কুলের জন্য যে যুক্তরাষ্ট্রের এই উদ্বেগ ছিল তা নয়; আমাদের দেশটির কাছে দুইশর বেশি পারমাণবিক ওয়ারহেড আছে। সেগুলোর নিয়ন্ত্রণ কাদের হাতে চলে যেতে পারে, সেটাই আমেরিকানদের প্রধান মাথা ব্যাথার বিষয়। তারা শত শত কোটি ডলারের ত্রাণ সহায়তা বন্ধের এবং তার বদলে সেনা পাঠানোর হুমকি দিচ্ছিল।

www.pathagar.com

সোয়াত থেকে তালেবান বিতাড়িত করতে সেনাবাহিনী মে মাসের শুরুতে 'ট্রু পাথ' নামের একটি অভিযান চালায়। শুনেছি, উত্তর দিকের পাহাড়ে হেলিকপ্টার থেকে শত শত কমান্ডো নেমেছিল। মিঙ্গোরায় যোগ হয়েছিল আরও সেনা। এইবার তারা পুরো শহর তালেবানমুক্ত করতে যাচ্ছিল। স্থানীয় বাসিন্দাদের মাইকে ঘোষণা দিয়ে সরে যেতে বলা হয়।

আব্বা বললেন, আমরা কোথাও যাব না। বাড়িতেই থাকব। তবে ওই সময় বন্দুকযুদ্ধের শব্দ আমাদের সারারাত জাগিয়ে রাখত। সবাই ধারাবাহিক উদ্বেগের মধ্য দিয়ে সময় পার করছিলাম। একদিন রাতে তীক্ষ্ণ ক্যাচ ক্যাচ শব্দে আমাদের সবার ঘুম ভেঙে গেল। তখন আমাদের বাসায় তিনটে সাদা মুরগীর সঙ্গে একটা সাদা খরগোশ যোগ হয়েছে। খুশালের এক বন্ধু তাকে খরগোশটা দিয়েছিল। ঘরের চারপাশ দিয়ে সেটা দৌড়াদৌড়ি করত। অটলের বয়স তখন মাত্র পাঁচ বছর এবং এটাকে সে খুব ভালোবাসত। এ কারণে অটল আব্বা আম্মার সঙ্গে যে খাটে ঘুমাতো তার নিচে এটাকে রাখা হয়েছিল। কিন্তু খরগোশটা এখানে সেখানে বিষ্ঠা ত্যাগ করায় সেই রাতে সেটাকে ঘরের বাইরে রেখে আসা হয়েছিল। মধ্যরাতের দিকে খরগোশটাকে একটা বিড়াল কামড়ে মেরে ফেলে। আমরা সবাই খরগোশটার গোঙানি শুনতে পাচ্ছিলাম। অটলের কান্না থামছিল না। সে কাঁদতে কাঁদতে বলছিল, 'সূর্যটা খালি উঠতে দে, তারপর দ্যাখ সকালে বিড়ালটাকে আমি কী শিক্ষা দিই। আমি ওকে মেরেই ফেলব।' এটাকে খারাপ ভবিষ্যতের পূর্বলক্ষণের মতো মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল সামনে হয়তো আরও খারাপ দিন আসছে।

www.pathagar.com

১৫

উপত্যকা ছেড়ে যাওয়া

এই ছোট্ট জীবনে আমাকে যত কিছু বেদনাদায়ক ও কষ্টকর বিষয় মোকাবিলা করতে হয়েছে তার কোনো কিছুই উপত্যকা ছেড়ে যাওয়ার মতো কষ্টকর ছিল না। উপত্যকা ছাড়ার সময় আমার নানী যে ট্যাপাটি (প্রচলিত পশতুন ছড়া) বলতেন তা মনে পড়ে গিয়েছিল: 'অভাবে অথবা প্রেমে পড়া ছাড়া কোনো পশতুন খুশি মনে তার নিজের ভিটে ছাড়তে চায় না।' এই দুই কারণের বাইরে তৃতীয় এমন এক কারণে এখন আমাদের ভিটেমাটি ছাড়তে হচ্ছে যে কারণটির কথা ওই ট্যাপার মূল লেখক কস্মিনকালে কল্পনাও করতে পারেননি। সেই তৃতীয় কারণটি হলো তালেবান।

বাড়ি ছাড়ার সময় মনে হচ্ছিল আমার বুক ফুড়ে কলিজাটা বের হয়ে আসছে। বাড়ি ছাড়ার আগে আমি ছাদে দাড়িয়ে একবার পাহাড়গুলোর দিকে চাইলাম। আলেকজান্ডার যে পর্বতে উঠে জুপিটার দেবতার কাছে পৌছে গিয়েছিলেন সেই তুষার ঢাকা মাউন্ট ইলামের দিকে চাইলাম। দেখলাম চারপাশের গাছগুলো থেকে নতুন পত্রপল্লব জন্ম নিচ্ছে। আমাদের বাড়ির পাশের আখরোট গাছটার ফল এ বছর হয়তো অন্য কেউ খেয়ে যাবে। সবকিছুই যেন চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল। চারদিকে ছিল পিনপতন নিরবতা। এমনকি পাখিগুলোও সেদিন কেন জানি কিচিরমিচির বন্ধ করে দিয়েছিল।

আমার কান্না পাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল আমি হয়ত এই বাড়িতে আর কোনোদিন ফিরে নাও আসতে পারি। প্রামান্যচিত্র নির্মাতারা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যদি আমাকে সোয়াত ছাড়তে হয়, যদি আর কোনোদিন এখানে আর ফিরতে না পারি তাহলে আমার কেমন লাগবে? আমি তখন ভেবেছিলাম এসব নির্বোধের মতো প্রশ্ন। কিন্তু এখন আমি দেখতে পাচ্ছি যা ঘটতে পারে বলে আমি কল্পনাও করতে পারিনি তাই একের পর এক ঘটে চলেছে। আমি ভেবেছিলাম আমার স্কুল কখনো বন্ধ হবে না, কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে। আমি ভেবেছিলাম আমাদের কখনোই সোয়াত ছেড়ে যেতে হবে না; কিন্তু এখন যেতেই হচ্ছে। আমি ভেবেছিলাম, একদিন সোয়াত তালেবানমুক্ত হবে এবং

www.pathagar.com

আমরা আবার আনন্দে মেতে উঠতে পারব। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সেটা আর কোনোদিন নাও হতে পারে। আমি কাঁদতে লাগলাম। আমার চাচাতো ভাইয়ের স্ত্রী হানি কাঁদতে শুরু করলেন। এরপরই আমরা সবাই একসঙ্গে কান্নায় ভেঙে পড়লাম। কিন্তু আম্মা এই পরিস্থিতিতেও খুব শক্ত এবং সাহসী ছিলেন।

আমি আমার স্কুলব্যাগে সব নোটবই এবং পাঠ্যবই ভরলাম। অন্য একটা ব্যাগে জামাকাপড় ভরলাম। আমি কিছুই সহজভাবে ভাবতে পারছিলাম না। আমি আমার পোশাকের এক সেটের মধ্য থেকে পাজামা অন্য সেট থেকে জামা গায়ে দিলাম। জামা-পাজামা ম্যাচ করল না। অন্য আরেক লোকের গাড়িতে করে আমাদের যেতে হবে এবং গাড়ির ভেতর জায়গা অনেক কম– এই চিন্তা থেকে আমি আমার স্কুল থেকে পাওয়া পুরস্কারের ট্রফি এবং ব্যক্তিগত জিনিসপত্র নিলাম না। ল্যাপটপ কিংবা দামি গয়নাগাটি আমাদের ছিল না। ঘরে দামি জিনিসপত্র বলতে যা ছিল তা হলো, একটা টেলিভিশন সেট, একটা ফ্রিজ আর একটা ওয়াশিং মেশিন। আমরা মোটেও বিলাসী জীবন যাপন করতাম না। আমরা পশতুনরা চেয়ারের চেয়ে মেঝেতে বসতে পছন্দ করি। আমাদের ঘরের দেওয়ালে প্রচুর ফুটোফাটা ছিল। এমনকি আমাদের থালা বাটি ও কাপ ছিল ফাটাফাটা দাগে ভরা।

শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আব্বা বাড়ি না ছাড়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু একদিন আব্বার বন্ধুদের মধ্যে একজনের এক আত্মীয় গুলিতে মারা গেলে আব্বা আম্মা ওই পরিবারটিকে শান্ত্বনা দিতে যান। তাঁদের আহাজারি দেখে আম্মা মিঙ্গোরা ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি আব্বাকে বললেন, 'তোমার আসতে হবে না। কিন্তু আমি আমার বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে শাংলা চলে যাচ্ছি। আম্মা জানতেন আব্বা আমাদের ছেড়ে একা মিঙ্গোরা থাকতে পারবেন না। আম্মা গোলাগুলি দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলে। তিনি ডা. আফজালকে ডেকে অনুনয় করে বললেন তিনি যেন আব্বাকে শাংলা যেতে অনুরোধ করেন। ডা. আফজালের পরিবারও যাচ্ছিল। সে কারণে তাঁরা আমাদেরও যেতে বললেন। আমাদের নিজেদের গাড়ি ছিল না। ভাগ্য ভালো একই দিনে ডা. আফজাল এবং আমাদের প্রতিবেশি সাফিনারা গ্রামে যাচ্ছিল। এই দুই পরিবারের দুই গাড়িতে আমরা ভাগাভাগি করে যেতে পারছিলাম।

২০০৯ সালের ৫ মে আমরা আইডিপিএসে পরিণত হলাম। ইন্টারন্যাশনাল ডিসপ্লেসড্ পারসনস্। এই নামের মধ্যে কেমন একটা মহামারির মতো গন্ধ আছে।

এই যাত্রায় যে আমাদের পরিবারের পাঁচজন ছিলাম তা নয়। আমাদের সঙ্গে ছিলেন আমার নানী, আমার চাচাতো ভাই, তাঁর স্ত্রী হানি এবং তাঁদের শিশুসন্তান। আমার ভাইয়েরা তাদের পোষা মুরগী সঙ্গে নিতে চাইছিল। আমার

www.pathagar.com

মুরগিটাকে শীতের মধ্যে গোসল করিয়েছিলাম বলে সেটা ঠাণ্ডা লেগে মরে গিয়েছিল। মুরগিটাকে উষ্ণ করার জন্য আমি সেটাকে জুতোর বাক্সে রেখেছিলাম। প্রতিবেশিদের বলেছিলাম তাঁরা যেন একটু দোয়া করে যাতে আমার মুরগিটা বেঁচে যায়।

যাইহোক আম্মা মুরগি আনতে দিলেন না। তিনি বললেন, গাড়ির মধ্যে যদি মুরগি ঝামেলা করে, পায়খানা করে গাড়ি নষ্ট করে? অটল বলল, ছোট্ট বাচ্চারা যে ন্যাপি ব্যবহার করে মুরগির জন্য মাঝপথে তাই কিনে নেবে। অবশেষে প্রচুর পানি ও খুদকুঁড়ো রেখে মুরগিগুলোকে ঘরের মধ্যে রেখে এলাম। আম্মা আমাকে বললেন, গাড়িতে জায়গা এত কম যে আমাকে অবশ্যই স্কুলব্যাগও রেখে আসতে হবে। বাড়িতে বইগুলো রেখে গেলে সেগুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এই আশঙ্কা থেকে বইগুলোর ওপর কোরআনের আয়াত লিখে রেখে এলাম যাতে কেউ তা নষ্ট না করে।

অবশেষে যাত্রার জন্য সবাই তৈরি হলো। আব্বা, আম্মা, নানী, চাচাতো ভাইয়ের স্ত্রী, তাঁর বাচ্চা এবং আমার দুই ভাই ডা. আফজালের ভ্যানের পেছনের সিটে গাদাগাদি করে বসল। ওই গাড়িতে ডা. আফজাল এবং তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েও ছিলেন। বড়দের কোলে বসেছিল ছেলেমেয়েরা। বড়দের কোলে বসে থাকা ছেলেমেয়েদের কোলে আবার বসেছিল তাদের চেয়ে ছোট বাচ্চারা। অন্যদের চেয়ে আমার ভাগ্য ভালো ছিল। সাফিনাদের গাড়িতে লোক ছিল কম। কিন্তু স্কুলব্যাগ হারিয়ে আমি ভেঙে পড়েছিলাম। কারণ আমার বইগুলো আমি আলাদা করে প্যাক করেছিলাম। তার সবগুলোই আমাকে ফেলে আসতে হয়েছে।

আমাদের বাড়িঘর এবং স্কুল যাতে অক্ষত থাকে সেজন্য সবাই কোরআন তেলাওয়াত করলাম এবং বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করলাম। এরপর সাফিনার আব্বা প্যাডেলে পা রাখলেন। আমরা আমাদের অতিপ্রিয় শান্তির বাসাটি ছেড়ে ধীরে ধীরে এক অনিশ্চিত ও নিরাপত্তাহীন ভবিষ্যতের পথে যাত্রা শুরু করলাম। এই প্রিয় শহরে আর কোনোদিন ফেরা হবে কি না তা আমরা কেউই জানতাম না। যাওয়ার পথে দেখলাম বাজাউরে জঙ্গিবিরোধী অভিযান চালানোর সময় সেনাবাহিনী কীভাবে বাড়িঘর মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। ভাবছিলাম আমাদের পরিচিত অন্য সবকিছুও ধ্বংস হয়ে গিয়ে থাকতে পারে।

রাস্তায় অস্বাভাবিক যানজট ছিল। আমি এই সড়ককে আগে কোনোদিন এত ব্যস্ততা দেখিনি। সবখানেই গাড়ি, রিকশা, খচ্চরের টানা গাড়ি এবং ট্রাকের ভিড়। এসব যানে আমাদেরই মতো ঘর ছেড়ে অনিশ্চিত গন্তব্যের দিকে যাওয়া মানুষ ও মালপত্র একাকার হয়ে গাদাগাদি করে যাচ্ছে। এমনকি মোটরসাইকেলে পুরো পরিবার চাপিয়েও কেউ কেউ ছুটে চলেছে। হাজার হাজার

www.pathagar.com

মানুষ এক কাপড়ে প্রাণভয়ে পালাচ্ছে। মনে হচ্ছিল যেন পুরো উপত্যকাটাই অন্য কোথাও চলে যাচ্ছে। অনেকের বিশ্বাস, পশতুনদের পূর্বপুরুষেরা ইসরায়েলের হারিয়ে যাওয়া কোনো গোত্রের মানুষ ছিলেন। পশতুনদের সোয়াত ছেড়ে যাওয়া নিয়ে আব্বা বলেছিলেন, 'এটা যেন ইসরায়েলিদের মিশর ছেড়ে যাওয়ার মতো ব্যাপার। তফাৎটা হলো, ইসরায়েলিদের পথ দেখানোর জন্য মূসা নবী সঙ্গে ছিলেন আর আমাদের সঙ্গে মূসার মতো কেউ ছিলেন না। খুব কমসংখ্যক লোকই তাদের গন্তব্য কোথায় তা জানতেন। বাকিদের কেউ জানতেন না। তাঁরা শুধু জানতেন তাঁদের এলাকা ছাড়তে হবে। পশতুন ইতিহাসে এক সঙ্গে এত লোকের বহিঃনিষ্ক্রমণ আর নেই।

মিঙ্গোরা থেকে বের হওয়ার বেশ কয়েকটা পথ ছিল। কিন্তু তালেবান বিশাল বিশাল আপেল গাছ কেটে সেগুলোর গুড়ি ফেলে রাস্তা আটকে দিয়েছিল। এ কারণে সবাইকে একটি পথই ব্যবহার করতে হচ্ছিল। আমরা এক জনসমুদ্রের মতো শহর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম। তালেবান যোদ্ধারা রাইফেল হাতে সড়কে টহল দিচ্ছিল এবং ছাদ থেকে আমাদের ওপর নজর রাখছিল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে তারা গাড়িগুলো নিয়ন্ত্রণ করছিল। তবে বাঁশি দিয়ে নয় রাইফেল দিয়ে। নিজেদের চাঙ্গা রাখতে আমরা মশকরা করে বলছিলাম, 'ট্রাফিক তালেবান।' একই পথে যাওয়ার সময় আমরা কিছুদূর পর পর তালেবান ও সেনাবাহিনীর তল্লাশি চৌকির মুখে পড়ছিলাম। তারপরও সেনাবাহিনীর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল তারা তালেবানের উপস্থিতি সম্পর্কে কিছু জানে না।

আমরা হাসতে হাসতে বলছিলাম, 'হয়তো সেনা সদস্যরা চোখে কম দেখে। এই জন্য তালেবান তাদের চোখে পড়ছে না।' যানবাহনে সড়ক একেবারে ঠাসাঠাসি অবস্থায় চলে গিয়েছিল। এটা ছিল ধীরগতির লম্বা যাত্রা। গাড়ির মধ্যে গাদাগাদি করে বসার কারণে সবার গা থেকে দর দর করে ঘাম ঝরছিল। আমরা ছোট ছেলেমেয়েরা গাড়িতে করে দূরের ভ্রমণের সুযোগ কমই পাই। এ কারণে দূরের পথে গাড়ির জার্নিকে আমরা অ্যাডভেঞ্চার হিসেবে উপভোগ করি। কিন্তু এ সময় আমরা সবই ছিলাম ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত।

ডা. আফজালের গাড়ির মধ্যে বসেই আব্বা মিডিয়ার এক সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। উপত্যকা থেকে বেরিয়ে যাওয়া জনস্রোত নিয়ে সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরা আব্বার সাক্ষাৎকার নিচ্ছিল। আম্মা আব্বাকে নিচু স্বরে কথা বলতে বলছিলেন। তাঁর ভয় ছিল তালেবানের লোকজন আব্বার কথা শুনে ফেলতে পারে। আব্বা এমনিতে এত চড়া গলায় কথা বলেন যে, আম্মা ঠাট্টা করে বলেন, আব্বার ফোন করার দরকার হয় না। চাইলে তিনি চেঁচিয়ে কিছু বললে যে কোনো জায়গা থেকে তাঁর কথা শোনা যায়।

www.pathagar.com

অবশেষ আমরা মালাকান্দের গিরিপথ পর্যন্ত এলাম এবং সোয়াতকে পেছনে ফেলে সামনে বাড়লাম। গড়িয়ে পড়া বিকেল নাগাদ আমরা মরদান শহরে পৌছালাম। শহরটি বেশ ব্যস্ত এবং এলাকাটি খুবই উষ্ণ।

আব্বা সবাইকে বোঝাচ্ছিলেন, 'কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা আবার ফিরে যাব। সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।' তবে আমরা সবাই জানতাম তাঁর কথা সত্যি নয়।

আফগান শরনার্থীদের জন্য পেশোয়ারে যেভাবে ইউএনএইচসিআর সাদা তাঁবু খাঁটিয়ে শরণার্থী শিবির বানিয়েছিল, এসে দেখি মারদানেও একই রকম তাঁবু খাঁটিয়ে শিবির বানানো হয়েছে। আমরা শিবিরে থাকার চিন্তা তখনও করিনি কারণ এটি হচ্ছে অস্তিত্ব বাঁচানোর একেবারের সর্বশেষ উপায়। প্রায় ২০ লাখ লোক সোয়াত ছেড়েছে এবং আপনি ২০ লাখ লোকের সবাইকে এ ধরণের আশ্রয় শিবিরে জায়গা দিতে পারবেন না। এমনকি আমাদের জন্য যদি এখানকার একটা তাঁবু বরাদ্দ দেওয়াও হয় তাহলেও সেখানে থাকা একেবারেই অসম্ভব; কারণ এর ভেতরে অসহনীয় গরম। শোনা যাচ্ছিল, কলেরা নাকি ইতিমধ্যেই মহামারী আকারে এই শিবিরে ছড়িয়ে পড়া শুরু করেছে। আব্বা বলছিলেন, তিনি এমন গুজবও শুনেছেন যে তালেবান জঙ্গিরা এই শিবিরেও ঢুকে পড়েছে এবং তাঁরা এখানকার মহিলাদের নানাভাবে হয়রানি করছে।

যারা পারছিল তারা স্থানীয় লোকজন বা আত্মীয় স্বজনের বাসায় আশ্রয় নিয়েছিল। আশ্চর্যজনকভাবে দুই তৃতীয়াংশ বাস্তুহারা লোককে মারদান এবং পার্শ্ববর্তী শহর সোয়াবির বাসিন্দারা ঠাঁই দিয়েছিল। তারা বাস্তুহারাদের জন্য নিজেদের ঘরবাড়ি, স্কুল, মসজিদ ছেড়ে দিয়েছিল। আমাদের সমাজে অনাত্মীয় পুরুষলোকের সঙ্গে মহিলারা একগৃহে থাকে না। আশ্রয় নেওয়া মহিলাদের পর্দা রক্ষার্থে আশ্রয়দানকারী পরিবারের পুরুষ লোকেরা নিজেদের ঘর ছেড়ে অন্যত্র ঘুমাচ্ছিল। আইডিপিএসদের আশ্রয় দিতে গিয়ে তারা নিজেরা স্বেচ্ছায় আইডিপিএস হয়ে গিয়েছিল। এটাই আমাদের পশতুনদের আতিথিয়েতার বিরল নিদর্শন। আমরা বুঝতে পারছিলাম, কেবলমাত্র সরকারি উদ্যোগে যদি বাস্তুহারাদের থাকাখাওয়ার ব্যবস্থা করা হতো তাহলে আরও বহু সংখ্যক লোককে ক্ষুধায় ও রোগে ভুগে মরতে হতো।

মারদান শহরে আমাদের কোনো আত্মীয় স্বজন ছিল না। এ কারণে আমরা আমাদের গ্রামের বাড়ি শাংলায় যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলাম। যেহেতু সোয়াত থেকে বের হওয়ার একটি মাত্র রাস্তা খোলা ছিল এ কারণে আমাদের শাংলা যাওয়ার সহজ পথ ছেড়ে উল্টোপথে রওনা হতে হয়েছিল।

প্রথম রাতটি আমাদের ডা. আফজালের বাসায় কাটাতে হলো। মিঙ্গোরায় কী ঘটছে তা মানুষকে জানানোর জন্য আব্বা ডা. আফজালের বাসায় রেখে

www.pathagar.com

পেশোয়ারে চলে গেলেন। আব্বা কথা দিলেন, শিগগিরই তিনি শাংলায় গিয়ে আমাদের সঙ্গে মিলিত হবেন। আম্মা আব্বাকে আমাদের সঙ্গে গ্রামে যাওয়ার জন্য অনেক চাপাচাপি করেছিলেন। কিন্তু আব্বা কিছুতেই আমাদের সঙ্গে সেখানে যেতে রাজি হলেন না। আইডিশিএসরা মানবেতর জীবন কাটাচ্ছে এবং সেনাবাহিনী কিছুই করছে না–এ বিষয়টি পেশোয়ার ও ইসলামাবাদের মানুষকে তিনি যত দ্রুত সম্ভব জানাতে চাইছিলেন। আমরা তাঁকে বিদায় জানালাম। আমাদের ভীষণ ভয় হচ্ছিল, হয়তো আর কোনোদিন আব্বার সঙ্গে আমাদের আর দেখা হবে না।

পরেরদিন আমরা অ্যাবোটাবাদে গেলাম। সেখানে আমার নানীর পরিবার থাকে। সেখানে গিয়ে আমার চাচাতো ভাই খানজির সঙ্গে দেখা হলো। তিনিও আমাদের মতো উত্তরে যাচ্ছিলেন। সোয়াতে তিনি একটা ছাত্রাবাস চালাতেন। একটা কোচে করে তিনি সাত আটজন ছেলেকে কোহিস্তান নিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখান থেকে তাঁর বেশাম যাওয়ার কথা। ঠিক হলো, তিনি আমাদের বেশাম পর্যন্ত পৌছে দেবেন। এরপর অন্য কারও সহায়তায় আমাদের শাংলা পৌছতে হবে।

রাস্তাগুলো আটকে রাখার কারণে বেশা পর্যন্ত পৌছতেই আমাদের রাত হয়ে গেল। আমার চাচাতো ভাই আমাদের শাংলায় পৌছে দেওয়ার জন্য একটা ভ্যান ঠিক করার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু আমরা রাতে আর এগোতে চাইলাম না। রাতটা পার করতে একটা নোংরা সস্তা হোটেলে উঠলাম। একটা লোক আম্মার কাছে এসে অসভ্যতা করতে যাচ্ছিল। আম্মা তাঁর পায়ের স্যান্ডেল খুলে লোকটাকে প্রচন্ড জোরে একটা বাড়ি মারলেন। সে কিছু বুঝে ওঠার আগেই আরেকটা মারলেন। লোকটা ভয়ে দৌড়ে পালিয়ে বাঁচল। বাড়িগুলো এত জোরেদিয়েছিন যে স্যান্ডেলটা ভেঙে গিয়েছিল। আম্মাকে খুব শক্ত ও জাদরেল মহিলা হিসেবে জানতাম। কিন্তু সেদিন তাঁর প্রতি নতুন ধরণের শ্রদ্ধার চোখে চেয়েছিলাম।

বেশাম থেকে আমাদের গ্রামে যাওয়া খুব সহজ ছিল না। এখান থেকে আমাদের টুকটাক মাল সামানাসহ পঁচিশ কিলোমিটার পথ হাঁটতে হয়েছিল। মাঝপথে একবার সেনাবাহিনী আমাদের থামাল। তারা বলল, সামনে যাওয়া যাবে না। আমাদের অবশ্যই ফিরে যেতে হবে। আমরা অনুনয় করে বললাম, 'শাংলায় আমাদের বাড়ি। আমরা যাব কোথায়?' আমার নানি কান্নাকটি শুরু করলেন। বললেন, তিনি তাঁর জীবনে এমন বিপদে আর কখনো পড়েননি। অবশেষে তাদের মন গলল। তারা আমাদের যেতে দিল। সর্বত্রই সেনাবাহিনী এবং তাদের মেশিনগান চোখে পড়ছিল। কারফিউ চলছিল এবং কিছুদূর পরপরই ছিল তল্লাশি

www.pathagar.com

চৌকি। এ কারণে সেনাবাহিনীর গাড়ি ছাড়া রাস্তায় অন্য কোনো যানবাহন ছিল না। আমাদের ভয় ছিল, আমরা কারা তা না জেনে সেনাবাহিনী হুট করে আমাদের ওপর গুলি ছুড়ে বসতে পারে।

গ্রামে পৌছানোর পর আত্মীয় স্বজন আমাদের দেখে চমকে উঠল। সবারই বিশ্বাস ছিল তালেবান শাংলায় ফিরে আসবে। এ কারণে আমরা কেন মারদানে থেকে গেলাম না তা তারা বুঝতে পারছিল না। আমরা আম্মার গ্রাম কারশাতে গিয়ে সেখানে আমার মামা ফয়েজ মোহাম্মাদের বাড়িতে উঠলাম। সঙ্গে করে বেশি জামাকাপড় আনতে পারিনি বলে আত্মীয়দের কাছ থেকে কাপড়চোপড় ধার করে পরতে হলো। বয়সে আমার চেয়ে এক বছরের বড় মামাতো বোন সুম্বুলকে পেয়ে আমার খুব ভালো লাগছিল। সেখানে অস্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করার পর সুম্বুলের সঙ্গে আমি স্কুলে যাওয়া শুরু করলাম। আমি ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়লেও সুম্বুলের সঙ্গে সপ্তম শ্রেণির ক্লাসে যাওয়া শুরু করলাম। ওই ক্লাসে মাত্র তিনজন ছাত্রী ছিল। এখানকার মেয়েরা এই বয়সে আসার আগেই স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। ফলে ছাত্রীদের সংখ্যা হয় খুবই নগন্য। আর মাত্র তিনজন ছাত্রীর জন্য আলাদা করে ক্লাস নেওয়ার মতো শিক্ষক ও জায়গা না থাকায় তাদের ছেলেদের সঙ্গেই ক্লাস করতে হয়। আমি ক্লাসের অন্য মেয়েদের চেয়ে একটু আলাদা ছিলাম। তারা মুখে কাপড় দিলেও আমি মুখ ঢেকে রাখতাম না। প্রায় প্রত্যেক শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলতাম এবং তাদের নানা ধরণের প্রশ্ন করতাম। তবে সব সময়ই 'ইয়েস স্যার' বলে শিক্ষকদের প্রতি আনুগত্য দেখাতাম। ভদ্র থাকার চেষ্টা করতাম।

স্কুলে হেঁটে যেতে আধঘন্টা লাগত। আমি বরাবরই ঘুম থেকে দেরিতে উঠতে অভ্যস্ত বলে পরের দিন আমাদের স্কুলে যেতে দেরি হয়ে গেল। দেরি করার জন্য যখন শিক্ষক আমাকে বেত দিয়ে হাতের ওপর পেটালেন তখন খুব কষ্ট পেয়েছিলাম। পরে যখন ভাবলাম নিদেনপক্ষে তাঁরা আমাকে ছাত্রী হিসেবে মেনে নিয়েছেন এবং অন্যদের চেয়ে আলাদা করে দেখছেন না তখন আর খারাপ লাগল না। আমার মামা স্কুলে কিছু কিনে খাওয়ার জন্য আমাকে খুচরো পয়সা দিতেন। তাই দিয়ে শশা আর তরমুজ কিনে খেতাম। অবশ্য এখানকার তরমুজ মিঙ্গোরার মতো মিষ্টি ছিল না।

একদিন স্কুলে প্যারেন্ট'স ডে ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ছিল। ছেলেদের সবাইকে বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য শিক্ষকেরা উৎসাহ দিচ্ছিলেন। অবশ্য কয়েকজন মেয়েও বক্তৃতা দিয়েছিল; তবে সবার সামনে দাড়িয়ে নয়। মেয়েরা ক্লাসে বসে বক্তৃতা দিচ্ছিল। মাইক্রোফোনে তাদের কথা প্রধান হলরুমে শোনানো হচ্ছিল। কিন্তু আমি জনসমক্ষে বক্তৃতা দিতে অভ্যস্ত ছিলাম। আমি সবার সামনে এসে ছেলেদের পাশাপাশি এসে মহানবী (সা.) এর

শানে লেখা একটি নাত আবৃত্তি করে শোনালাম। আমি চাইলে আরও আবৃত্তি করতে পারি কি না তা শিক্ষকদের কাছে জানতে চাইলাম। অনুমতি মেলার পর অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য কঠোর পরিশ্রমের অপরিহার্যতা নিয়ে লেখা একটি কবিতা আবৃত্তি করলাম। কবিতার শুরুটা এরকম ঃ 'ছোট্ট গয়না বানাতে গেলে একটা হিরাকে বহুবার কাটতে হয়।' আবৃত্তি শেষ করে আমি আমার নামের অর্থ বোঝাতে গিয়ে মালালা অব মেইবান্দের কথা বললাম। বললাম, মালালাই এমন এক মহীয়সী ছিলেন, যাঁর শক্তি ও ক্ষমতা ছিল লাখ লাখ বীর যোদ্ধার সমান, কেননা তাঁর কবিতার কয়েকটি লাইন সবকিছু এমনভাবে বদলে দিয়েছিল যে ব্রিটিশরা পরাজিত হয়ে পালিয়েছিল।

দর্শকদের মধ্য থেকে অনেকে আমার আবৃত্তি শুনে চমকে গিয়েছিল। অনেকের চোখে বিস্ময় দেখে মনে হয়েছিল, তারা ভাবছিল আমি কেন ঘোমটা দিয়ে আসিনি। আমি কেন সবার সামনে মুখ খুলে এভাবে কথা বলছি।

মামাতো ভাইবোনের সঙ্গে আমার ভালোই দিন কাটছিল। কিন্তু আমি আমার বইপত্রগুলোকে খুব মিস করছিলাম। আমার ভাবনার মধ্যে ছিল বাড়িতে রেখে আসা স্কুল ব্যাগ যার মধ্যে অলিভার টুইস্ট এবং রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট রেখে এসেছি। শেলফে রেখে আসা আগলি বেট্টির ডিভিডির কথা মনে পড়ছিল। কিন্তু আসলেতো আমরা তখন নিজেরাই নিজেদের নাটকের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছি। আমরা এক সময় খুব সুখী ছিলাম, এরপরই চরম দুর্দশা আমাদের গ্রাস করেছে। তাই এখন অপেক্ষা করছিলাম কবে এই দুঃখের দিন শেষ হবে। আমি যখন আমার বই নিয়ে হা-পিত্যেশ করছি তখন আমার ভাইয়েরা তাদের মুরগির চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠেছে।

একদিন রেডিওর ঘোষণায় শুনলাম, সেনাবাহিনী মিঙ্গোরায় তালেবানের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অভিযান শুরু করেছে। দুই পক্ষের লড়াই চলছে। অসংখ্য ছত্রীসেনা মিঙ্গোরায় নেমে রাস্তায় হাতে হাতে লড়াই চালাচ্ছে। তালেবান যোদ্ধারা হোটেল ও সরকারি ভবনগুলো বাঙ্কার হিসেবে ব্যবহার করছে। চারদিনের মাথায় সেনাবাহিনী তিনটি চত্বরের দখল নিতে সক্ষম হয়। এই তিনটি চত্বরের মধ্যে গ্রিন চৌকও আছে। তালেবান তাদের হামলার শিকার হওয়া লোকদের মৃতদেহ এই চত্বরে লোকজনকে দেখানোর জন্য ফেলে রাখত। এরপরই সেনাবাহিনী বিমানবন্দরের দখল নেয়। এক সপ্তাহের মধ্যেই পুরো শহর তারা পুনরুদ্ধার করে ফেলে।

আব্বাকে নিয়ে আমাদের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা কমছিলই না। শাংলা থেকে মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক পাওয়া খুবই কঠিন ছিল। সিগন্যাল পাওয়ার জন্য আমরা অনেক উঁচু একটা পাহাড়ের ফাঁকা জায়গায় গিয়ে ফোন করতাম। কিন্তু সেখান থেকেও খুব কমই নেটওয়ার্কের একটার বেশি সিগন্যাল বার পাওয়া গেছে।

www.pathagar.com

ফলে তাঁর সঙ্গে কথা বলা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছিল। তবে শাংলায় তিন সপ্তাহ কাটানোর পর একদিন আব্বা জানালেন, পেশোয়ারে তিনি তাঁর তিন বন্ধুর সঙ্গে একটা রুমে জড়াজড়ি করে থাকছেন। তিনি জানালেন আমরা চাইলে এখন পেশোয়ারে যেতে পারি।

পেশোয়ারে গিয়ে আব্বাকে দেখে আমরা সবাই আবগাপ্লুত হয়ে পড়লাম। এরপর পুরো পরিবার ইসলামাবাদে চলে গেলাম। মিঙ্গোরায় থাকতে স্ট্যানফোর্ড থেকে শাইজা নামের এক তরুণী আমাদের ফোন করেছিলেন। আমরা তাঁর পরিবারে গিয়ে উঠলাম। সেখানে থাকতেই খবর পেলাম সোয়াতের সংঘাত নিয়ে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন দূত রিচার্ড হলব্রুক সেরেনা হোটেলে বৈঠক করবেন। আমি এবং আব্বা অনেক চেষ্টা করে সেখানে যাওয়ার অনুমতি পেলাম।

আমরা বৈঠকটি প্রায় মিস করে ফেলেছিলাম। আমি ঘড়িতে ঠিকমতো অ্যালার্ম সেট করতে না পারায় এই বিড়ম্বনা হয়। আব্বা আমাকে এজন্য অবশ্য খুব বকাঝকা করেছিলেন।

হলব্রুক খুব বদ মেজাজী লোক ছিলেন। তাঁর মুখটা সব সময় লাল হয়ে থাকতো। তবে লোকে বলে তিনি বসনিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠায় বড় ধরণের ভূমিকা রেখেছিলেন। আমি তাঁর পাশেই বসেছিলাম। তিনি আমাকে আমার বয়স কত তা জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, ‘আমার বয়স ১২ বছর।’ নিজেকে যতখানি সম্ভব লম্বা দেখানোর চেষ্টা করলাম। আমি তাঁকে বললাম, ‘সম্মানিত অ্যাম্বাস্যাডর, লেখাপড়া যাতে করতে পারি সে ব্যাপারে প্লিজ আপনি আমাদের মেয়েদের সহায়তা করুন।’ তিনি হাসলেন। বললেন, ‘এমনিতেই তোমাদের বহু সমস্যা, আমরা তোমাদের জন্য করছিও অনেক কিছু।’ তিনি বললেন, ‘আমরা তোমাদের জন্য শত শত কোটি ডলারের আর্থিক সহায়তা দিচ্ছি। গ্যাস, বিদ্যুৎ নিশ্চিত করতে সরকারকে সাহায্য করছি..... কিন্তু তোমাদের দেশ তো নানা সমস্যার মুখে।’

এরপরই পাওয়ার ৯৯ নামের একটা রেডিওকে আমি সাক্ষাৎকার দেই। তারা আমার সাক্ষাৎকারটি খুব পছন্দ করে। তারা বললো অ্যাবোটাবাদে তাদের একটি গেস্ট হাউস আছে। চাইলে আমরা সপরিবারে সেখানে থাকতে পারি। সেখানে আমরা সপ্তাহ খানিক ছিলাম। যখন শুনলাম মনিবা, আমাদের এক শিক্ষক এবং অন্য আরও কয়েক বন্ধু এখানে আছে খুশিতে মন ভরে গেল। আইডিপিএস হিসেবে বাড়ি ছাড়ার আগে দুজনে ঝগড়া করার পর থেকে এ পর্যন্ত মনিবার সঙ্গে আমার কথা হয়নি। আমরা দুজন একটা পার্কে দেখা করব বলে ঠিক করলাম। আমি মনিবার জন্য পেপসি আর বিস্কুট নিয়ে গিয়েছিলাম। মনিবা বলল, ‘সব দোষ তোর ছিল।’ আমি মেনে নিলাম। আমি তার কথায় কিছু

www.pathagar.com

মনে করিনি। আমি আমাদের বন্ধুত্ব অটুট রাখতে চেয়েছিলাম।

গেস্টহাউসে এক সপ্তাহ কেটে গেল। এরপর সেখান থেকে আমরা হরিপুরে গেলাম। সেখানে আমার এক খালা থাকতেন। গত দুইমাসে এটা আমাদের সফর করা চতুর্থ শহর। আমরা বুঝতে পারছিলাম, শরণার্থী শিবিরে গরম তাঁবুর নিচে বসে খাবার আর পানির জন্য ছটফট করার চেয়ে আমরা কত সুখে আছি। তবে সোয়াত উপত্যকাকে আমি প্রতিক্ষণেই মিস করছিলাম। এখানেই আমার দ্বাদশ জন্মদিন পার হলো। আমার জন্মদিনের কথা কারোই মনে ছিল না। এমনকি আব্বাও ভুলে গিয়েছিলেন। তিনি এত ব্যস্ত ছিলেন যে তা মনে রাখাও দুষ্কর হয়ে পড়েছিল। আমার খুব মন খারাপ হচ্ছিল এবং ভাবছিলাম একাদশ জন্মদিন কত আনন্দে কেটেছিল। আমি বন্ধুদের নিয়ে কেক কেটেছিলাম। চারপাশে বেলুন ছিল। তখন যে ইচ্ছা মনে মনে প্রকাশ করেছিলাম এখনও তাই করছি। তবে এবারের জন্মদিনে কেক ছিল না। কোনো মোমবাতিও জ্বলেনি। তবু আমি আরও একবার আমার জন্মভূমির জন্য দোয়া করলাম।

www.pathagar.com

অধ্যায় তিন

তিনটি মেয়ে, তিনটি গুলি

সির দে পা লোয়ারা তেগা কেগদা
    প্রাদে ওয়াতান দে পাকি নিশতা বালাখতোনা

হে পথিক! এই পাথুরে প্রান্তরে খানিক বিশ্রাম করে নাও
    এ তো ভীনদেশের মাটি– তোমার রাজার শহর নয়!

www.pathagar.com

www.pathagar.com

১৬

দুঃখের উপত্যকা

গোটা ব্যাপারটা একটা দুঃস্বপ্নের মতো। প্রায় তিন মাস নিজেদের উপত্যকা থেকে দূরে থাকার পর আমরা যখন ফিরে আসছি, স্মৃতিবহুল চার্চিলের ফাঁড়ি পেরিয়ে, পাহাড়ের গায়ে গায়ে প্রাচীন ভাঙন এবং বুদ্ধের বিরাট মূর্তিটাও পেরিয়ে এসে, আমরা দেখতে পেলাম প্রশস্ত সোয়াত নদী এবং আমার আব্বা কাঁদতে শুরু করলেন। সোয়াত সম্ভবত সম্পূর্ণভাবে সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে ছিল। এমনকী মালাকান্দ পাসের দিকে এগিয়ে যাওয়ার আগে আমাদের বাহনটিকেও একটি বিস্ফোরক চেক-পোস্ট পাড়ি দিতে হয়েছে। এক সময় আমরা অন্য পাশে পৌঁছে গেলাম এবং নেমে এলাম উপত্যকায়, দেখলাম সবখানে সেনাদের চেকপয়েন্ট। বেশির ভাগ ছাদে নিজেদের মেশিন গানের জন্য ছাউনি বানিয়ে বসেছে সৈন্যরা।

গ্রামগুলোর ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় আমরা দেখছিলাম বাড়িঘরের ধ্বংসাবশেষ আর গাড়িঘোড়ার পোড়া কঙ্কাল। আমার তখন পুরোনো যুদ্ধের সিনেমা কিংবা সেই ভিডিও গেমসের কথা মনে পড়ছিলো, আমার ছোট ভাই কুশল যে গেমস খেলতে ভালোবাসে। মিঙ্গোরায় পৌঁছে তাজ্জব বনে গেলাম আমরা। রাস্তায় রাস্তায় সংঘর্ষ হয়েছে সেনাবাহিনী আর তালেবানদের। শহরের দেয়ালে দেয়ালে গুলির দাগ। তালেবানরা আশ্রয় গেড়েছিলো যেসব ভবনে, ধূলিস্মাৎ সেসব ভবনের ইট-কাঠ, তোবড়ানো ধাতু আর থেতলানো সাইনবোর্ড ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। চারপাশে ধ্বংসের দগদগে ক্ষতচিহ্ন। অধিকাংশ দোকানের শাটার ছিলো শক্তপোক্ত, সেগুলো লুট হয়নি। শহর জুড়ে শুনসান নীরবতা। মানুষ এবং ট্রাফিকশূন্য পথঘাট– যেন শহরে কোনও মহামারী নেমে এসেছে। বাস স্টেশন দেখে তো আমরা ভীষণ অবাক। ফ্লাইং কোচ আর রিকশায় যে জায়গা গিজগিজ থাকে সারাক্ষণ, সেখানেও নিশ্ছিদ্র নির্জনতা– জনমানবশূন্য। রাস্তার ফাটলে জন্মেছে আগাছা। আমাদের শহরটাকে এমন রূপে আগে কখনও দেখিনি আমরা।

সেখানে তালেবানের কোনও চিহ্ন অন্তত ছিলো না।

২৪ জুলাই ২০০৯, এক সপ্তাহ পর আমাদের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করলেন, তালেবানদের উচ্ছেদ করা হয়েছে। তিনি কথা দিলেন, গ্যাস সরবরাহ

www.pathagar.com

পুনঃস্থাপিত হবে এবং আবার চালু হবে ব্যাংকগুলো। প্রধানমন্ত্রী সোয়াতের মানুষকে ঘরে ফেরার আহ্বান জানালেন। শেষপর্যন্ত প্রায় ১.৮ মিলিয়ন মানুষ এই উপত্যকা ছেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমরা কি দেখলাম, চলে যাওয়া মানুষেরা আশ্বস্ত হতে পারেনি প্রতিশ্রুতিতে, তাদের অধিকাংশ ফিরে আসার জন্য নিরাপদ মনে করেনি এই শহরকে।

বাড়ির যত কাছে এগিয়ে যাচ্ছিলাম আমরা, ততোই নীরবতা আঁকড়ে ধরছিলো আমাদের সকলকে, এমনকী আমার ছোট ভাই কথাবাক্স অটলও চুপটি মেরে ছিল। সেনাবাহিনীর প্রধান দপ্তর সার্কিট হাউসের কাছে আমাদের বাড়ি। আশঙ্কা করছিলাম, কোনও শেলের আঘাতে বোধহয় বাড়িটা গুড়িয়ে গেছে। শুনেছি অনেক বাড়িতে নাকি লুটপাটও হয়েছে। আব্বা যখন আমাদের বাড়ির গেটের তালা খুলছেন, আমরা সবাই তখন রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষায়। গেট খুলতেই দেখতে পেলাম আমাদের বাগান, তিন মাসের অযত্নে যা পরিণত হয়েছে জঙ্গলে।

আমার ভাইয়েরা তীব্র গতিতে ছুট লাগালো ওদের পোষা মুরগিগুলোর খোঁজে। ফিরে এলো কাঁদতে কাঁদতে। এক দলা পালক আর হাড় ছাড়া মুরগিগুলোর ছোট ছোট শরীরের আর কোনও চিহ্ন ছিল না। পালক-হাড় এমনভাবে জড়িয়ে ছিল যেন মৃত্যুর সময় মুরগীগুলো একে অন্যকে আলিঙ্গণে রেখেছিলো। ওরা খেতে না পেয়ে মারা গেছে।

ভাইদের জন্য আমারও দুঃখ হলো, কিন্তু তখন আমাকে নিজস্ব কিছু জিনিষের খোঁজ নিতে হবে। আমি অসম্ভব আনন্দের সঙ্গে আবিষ্কার করলাম, বইপত্রসহ আমার স্কুল ব্যাগটা একেবারে ঠিকঠাক আছে। আমার প্রার্থনা কবুল হয়েছে এবং বইগুলো অক্ষত আছে, আমি ধন্যবাদ জানালাম। একেকটা বই আমি নেড়েচেড়ে দেখলাম। গণিত, ফিজিক্স, উর্দু, ইংরেজি, পোশতে, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, ইসলামিয়াত, পাকিস্তান শিক্ষা। তাহলে স্কুলে যেতে আমার কোনও সমস্যাই রইল না।

আমি আমার বিছানার কাছে গেলাম এবং বসে থাকলাম। খুব উৎফুল্ল বোধ করছিলাম আমি।

কপাল ভালো যে আমাদের বাড়িতে কেউ ঢুকে পড়েনি। একই পথের চার-পাঁচটা বাড়ি লুট করে টেলিভিশন, সোনার গয়না নিয়ে গেছে। পাশের বাড়ির সাফিনার আম্মা নিরাপত্তার কথা ভেবে নিজের সোনার যতো গয়না গচ্ছিত রেখেছিলেন ব্যাংকের ভল্টে, ব্যাংকসুদ্ধ লুট হয়ে গেছে।

আব্বা তখনও উদ্বিগ্ন স্কুলের কথা ভেবে। আমিও রওনা হলাম তার সঙ্গে। মেয়েদের স্কুলের উল্টোপাশের ভবনে একটা মিসাইলের আক্রমণের চিহ্ন আছে, তবে স্কুলটা ঠিকই আছে। আব্বার চাবি কেন যেন কাজ করছিলো না। একটা ছেলেকে খুঁজে পাওয়া গেল, সে দেওয়াল বেয়ে উঠে ভেতরে থেকে দরজা খুলে দিল। বুকভর্তি আশঙ্কা নিয়ে আমরা সিড়িগুলো দৌড়ে উঠে গেলাম।

www.pathagar.com

'কেউ ছিলো এখানে', আঙিনার ভেতর পা রেখেই আমার আব্বা বললেন। সিগারেটের অবশিষ্টাংশ এবং খাবারের খালি মোড়ক ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। চেয়ারগুলো পড়ে আছে এলোমেলো এবং পুরোটা জায়গা প্রচন্ড নোংরা হয়ে আছে। আব্বা খুশল স্কুলের সাইনবোর্ডটা আঙিণায় ছুড়ে ফেললেন। সাইনবোর্ড দেয়ালে হেলিয়ে রাখা ছিলো এবং আমি এটাকে সোজা করেই ভীষণ ভয় পেলাম। সাইনবোর্ডের নিচে পড়ে ছিল ছাগলের মাথা। পচন ধরেছে ওগুলোতে। দেখে মনে হয় কারও রাতের খাবারের অবশিষ্ট অংশ যেন।

তারপর ক্লাসরুমগুলোতে গেলাম আমরা। দেয়াল জুড়ে তালেবান-বিরোধী শ্লোগান লিখে রাখা হয়েছে। একটা হোয়াইট বোর্ডে স্থায়ী কালি দিয়ে কেউ লিখেছে– সেনাবাহিনী জিন্দাবাদ। আমরা বুঝতে পারলাম এখানে কারা অবস্থান করছিলো। একজন সৈন্য তো আমার এক সহপাঠীর ডায়েরিতে আবেগে গদগদ প্রেমের কবিতাও লিখে রেখেছিলো। মেঝেতে ছড়ানো গুলির খোসা। সৈন্যরা দেওয়ালে একটি ফোকড় তৈরি করেছিলো, যেখান দিয়ে দেখা যায় নিচের শহর। হয়তো এই ফোকড় দিয়েও মানুষের দিকে গুলি ছুড়েছে তারা। আমাদের এতো চমৎকার স্কুল রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে দেখে আমি ভীষণ দুঃখ অনুভব করলাম।

আমরা যখন আশেপাশে দেখছিলাম তখন নিচের তলার কেউ দরোজায় দড়াম দড়াম করে আঘাত করছে শুনলাম। 'মালালা, খুলতে যেও না!' আব্বা নির্দেশ দিলেন আমাকে।

সেনাসদস্যদের রেখে যাওয়া একটা চিঠি পাওয়া গেল আব্বার অফিসে। চিঠিতে অভিযোগ করা হয়েছে আমাদের মতো নাগরিকরাই নাকি তালেবানদের সোয়াত নিয়ন্ত্রণের সুযোগ করে দিয়েছিল। 'আমরা আমাদের অনেক সৈন্যের মূল্যবান জীবন হারিয়েছি এবং তা আপনাদের অবহেলার কারণেই। পাকিস্তান সেনাবাহিনী দীর্ঘজীবি হোক', আব্বা চিঠি থেকে পড়লেন।

'এটা অদ্ভুত', আব্বা বললেন, 'আমরা সোয়াতের মানুষেরা প্রথমে তালেবানদের দ্বারা আক্রান্ত হলাম, তারপর এদের হাতে নিহত হলাম এবং এখন এদের জন্য অভিযুক্তও হচ্ছি। আক্রান্ত, নিহত এবং অভিযুক্ত।'

কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীকে আর জঙ্গিদের থেকে আলাদা মনে হয় না। আমাদের এক প্রতিবেশি জানালেন, তিনি দেখেছেন কিভাবে তালেবানদের মৃতদেহ রাস্তায় ফেলে গেছে সেনাসদস্যরা, যেন সবাই দেখতে পায়। এখন সেনাবাহিনীর জোড়া হেলিকপ্টার বিরাট পতঙ্গের মতো গুনগুন শব্দ তুলে চক্কর কাটছে মাথার ওপর, এবং আমরা বাড়ির ভেতরে হাঁটাচলার সময় দেওয়ালের আড়ালে থাকি যেন তারা আমাদের না দেখতে পায়।

শুনেছি গ্রেপ্তার করা হয়েছে হাজার হাজার মানুষকে, এমনকী আট বছর বয়সী সেই শিশুকেও, আত্মঘাতী বোমা হামলার ট্রেনিং নিতে মগজধোলাই করা হয়েছে

www.pathagar.com

যাদের। গ্রেপ্তারকৃতদের জিহাদি বিশ্বাস সংস্কারের জন্য স্থাপিত বিশেষ ক্যাম্পে পাঠিয়েছে সেনাবাহিনী। গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে ছিলেন আমাদের বয়স্ক উর্দু শিক্ষকও, যিনি মেয়েদের পড়াতে রাজি হননি। বরং ফজলুল্লাহর লোকদের সাহায্য করেছেন সিডি ও ডিভিডি সংগ্রহ ও ধ্বংসের কাজে।

ফজলুল্লাহর দাপট তবু কমেনি। ইমাম দেরিতে তার প্রধান দপ্তর ধ্বংস করে দিয়েছে সেনাবাহিনী এবং তারপর দাবি করা হয়েছিল পিচার পর্বতে তাকে ঘিরে ফেলা হয়েছে। পরে জানানো হয়, ফজলুল্লাহ মারাত্মকভাবে জখম হয়েছেন, কিন্তু তার মুখপাত্র মুসলিম খানকে হেফাজতে নেয়া হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে প্রেক্ষাপট বদলে গেল এবং সেনাবাহিনী জানাল, ফজলুল্লাহ আফগানিস্তানে পালিয়ে গেছে এবং দেশটির কুনার প্রদেশে অবস্থান করছে। কেউ কেউ বলেন, ফজলুল্লাহকে আটক করা হয়েছিলো সত্যি, কিন্তু তাকে আসলে কি করা হবে সে বিষয়ে একমত হতে পারেনি সেনাবাহিনী এবং আইএসআই। সেনাবাহিনী চেয়েছিলো তাকে বন্দি করে রাখতে। কিন্তু গোয়েন্দা সংস্থার মত ছিল অন্য, তারা ফজলুল্লাহকে নিয়ে যায় বাজুয়ারে যাতে সহজে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে আফগানিস্তানে পালাতে পারে সে।

তালেবানের শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃত্বের মধ্যে মুসলিম খান এবং মেহমুদ নামের এক কমান্ডারই কেবল হেফাজতে ছিল– বাকিরা সবাই এখনও মুক্ত। ফজলুল্লাহ যেহেতু আশেপাশেই আছে, আমি তাই আশঙ্কা করছিলাম যে ওরা হয়তো আবার পুনর্গঠিত হবে এবং ক্ষমতায় ফিরে আসবে। আমি রাতে দুঃস্বপ্নও দেখতাম, তবে ফজলুল্লাহর রেডিও সম্প্রচার অন্তত তখনও বন্ধ ছিলো।

আহমেদ শাহ নামে আব্বার এক বন্ধু বলতেন এসব 'নিয়ন্ত্রিত শান্তি, তবে টেকসই নয়'। কিন্তু তারপরও ধীরে ধীরে উপত্যকার বাসিন্দারা ফিরতে থাকলেন। কারণ সোয়াত অসম্ভব সুন্দর জায়গা, এখান থেকে দূরে খুব বেশিদিন থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

আবারও আমাদের স্কুলে ঘন্টা বেজে উঠল আগস্টের ১ তারিখে। ঘন্টা শুনে আবারও সেই আগের মতো সিঁড়ি টপকে দরোজার দিকে ছুটে যাওয়া– সে অসাধারণ অনুভূতি। পুরোনো সব বন্ধুদের ফিরে পেয়ে আমি তো আনন্দে আটখানা। উদ্বাস্তু সময়ের অনেক গল্প তখন আমাদের মনে জমা। আমাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলো বন্ধু বা পরিবারের সঙ্গে, তবে কারও দিন কেটেছে ক্যাম্প। আমরা জানতাম আমরা ভাগ্যবান। অনেক বাচ্চাদের ক্লাস নেওয়া হচ্ছিলো তাবুতে, কারণ তালেবানরা ওদের স্কুল ধ্বংস করে দিয়েছে। সুন্দুস নামে আমার এক বন্ধু ওর আব্বাকে হারিয়েছে। যিনি মারা গেছেন এক বিস্ফোরনে।

বিবিসিতে আমার লেখা রোজনামচার কথা যেন সকলেই জানে। কেউ কেউ অবশ্য সংশয় প্রকাশ করছিলো যে আমার হয়ে কাজটি নাকি আমার আব্বাই করে দিয়েছেন, কিন্তু আমাদের প্রিন্সিপাল ম্যাডাম মরিয়ম তাদের বললেন, 'না, মালালা শুধু ভালো বলতে নয়, ভালো লিখতেও পারে।'

www.pathagar.com

সেই গ্রীষ্মে ক্লাসে কথোপকথনের একটাই ছিলো বিষয়। আমাদের বন্ধু শিজা শহীদ ইসলামাবাদের বাসিন্দা, পড়াশোনা শেষ করেছেন স্ট্যানফোর্ড থেকে। তিনি খুশল স্কুলের ২৭ জন মেয়েকে আমন্ত্রণ জানালেন ইসলামাবাদে। উদ্দেশ্য রাজধানীর দর্শনীয় স্থান ভ্রমণ এবং কিছু কর্মশালায় অংশ নেওয়া, যা তালেবানদের অধীনে দুঃসহ দিনযাপনের মানসিক যন্ত্রণা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে আমাদের। আমিসহ আমার ক্লাসের মনিবা, মালকা-ই-নূর, রিদা, কারিশমা এবং সুন্দুসও ছিল। আমাদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে ছিলেন আমার আম্মা এবং ম্যাডাম মরিয়ম।

১৪ আগস্ট, স্বাধীনতা দিবসে আমরা রওনা হলাম রাজধানীর উদ্দেশ্যে। আমরা যাচ্ছিলাম বাসে করে, উত্তেজনা উদ্বেলিত হয়ে ছিলাম সবাই। মেয়েদের মধ্যে বেশির ভাগই এই উপত্যকার বাইরে পা রেখেছিলো কেবল উদ্বাস্তু হওয়ার পরই। তবে এবার ব্যাপারটা ভিন্ন, উপন্যাসে যেমন ছুটির দিনের কথা পড়েছি তেমন আমেজ পাচ্ছিলাম আমরা। আমাদের থাকার ব্যবস্থা হল একটা গেস্টহাউজে এবং আমরা অংশ নিলাম অনেকগুলো কর্মশালায়। যেখানে আমাদের শেখানো হলো কিভাবে নিজেদের গল্পগুলো বাইরের মানুষকে জানাতে হবে, যার মাধ্যমে সকলে জানবে উপত্যকার ভেতরের অবস্থা এবং এগিয়ে আসবে আমাদের সাহায্য করার জন্য। প্রথম অধিবেশন থেকেই আমরা সবাই এতোটা উদ্যমী এবং সোচ্চার ছিলাম যে শিজাও বোধহয় চমকে গিয়েছিল। 'অনেক মালালা-ভর্তি এই ঘর!' সে বলেছিল আমার আব্বাকে।

মজাও করেছি অনেক। বেড়াতে গিয়েছি পার্কে, শুনেছি গান। অনেকের কাছে এসব খুব সাধারণ বিষয় মনে হতে পারে, তবে সোয়াতে এসবও রাজনৈতিক প্রতিবাদের ব্যাপার। এবং আমরা দর্শনীয় স্থানগুলোতেও বেড়াতে গিয়েছি। মারগালা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত ফয়সাল মসজিদ দেখতে গিয়েছিলাম আমরা। লাখ লাখ টাকা খরচ করে এই মসজিদ নির্মাণ করেছে সৌদিরা। এটা বিরাট এবং সাদা। দেখে মনে হয় মিনারগুলোর মধ্যে যেন ঝকমকে একটা তাবু টাঙানো হয়েছে। জীবনে প্রথমবার আমরা থিয়েটারে গেলাম, 'টম, ডিক অ্যান্ড হ্যারি' নামের একটা ইংরেজি নাটক দেখতে এবং আর্ট ক্লাসেও অংশ নিলাম। রেস্টুরেন্টে খেয়েছি আমরা এবং জীবনে প্রথমবার ম্যাকডোনাল্ড'সে গিয়েছি। জীবনের এমন অনেক প্রথমের সঙ্গেই আমাদের দেখা হয়েছিল যদিও একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্টে ভোজনের সুযোগ আমার হাতছাড়া হয়ে গেল। কারণ আমি তখন 'ক্যাপিটাল টক' নামের একটা টেলিভিশন অনুষ্ঠানে অংশ নিতে গিয়েছিলাম। তাই হাঁসের প্যানকেক জাতীয় একটা খাবারের স্বাদ নেওয়া হয়নি আমার!

ইসলামাবাদ সোয়াতের চেয়ে একেবারে আলাদা। আমাদের চোখে এতোটাই আলাদা যে, ইসলামাবাদ যেন নিউইয়র্ক। শিজা আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন এমন নারীদের সঙ্গে, যারা কেউ আইনজীবি, কেউ চিকিৎসক, কেউ অ্যাক্টিভিস্টও। তাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমরা জানলাম নিজের সংস্কৃতি এবং

www.pathagar.com

ঐতিহ্য বজায় রেখেও নারীরা গুরত্বপূর্ণ কাজ করতে পারেন। আমরা পর্দাছাড়া নারীদের দেখলাম পথে, তাদের মাথা অনাবৃত। আমিও কিছু সভায় যোগ দিলাম আমার শাল না জড়িয়েই। ভাবছিলাম আমি যেন আধুনিক মেয়ে হয়ে গেছি। যদিও পরে বুঝতে পেরেছি কেবল মাথায় পর্দা না থাকলেই আধুনিক হওয়া যায় না।

আমরা এক সপ্তাহ ওখানে ছিলাম এবং সম্ভবত মনিবার সঙ্গে আমার ঝগড়াও হল। সে আমাকে একটা মেয়ের সঙ্গে কথা চালাচালি করতে দেখল এবং আমাকে বলল, 'এখন থেকে তুমি রেশমের সঙ্গে আর আমি রিদার সঙ্গে।'

শিজা চেয়েছে প্রভাবশালী লোকদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে। আমাদের দেশে প্রভাবশালী মানে তো সেনাবাহিনীর লোকেরাই। সেনাবাহিনীর প্রধান মুখপাত্র এবং জনসংযোগ বিভাগের প্রধান মেজর জেনারেল আতহার আবব্বাসের সঙ্গেও একটা বৈঠক ছিলো আমাদের। ইসলামাবাদের যমজ শহর রাওয়ালপিন্ডিতে তার অফিসে দেখা করতে গেলাম আমরা। সেনাবাহিনীর প্রধান দপ্তর দেখে তো চোখ ছানাবড়া আমাদের। শহরের তুলনায় অনেক বেশি পরিচ্ছন্ন চকচকে দপ্তর। সুন্দর সবুজ ঘাস বেছানো লন এবং ফুটে থাকা ফুল- বৃদ্ধি করেছে সৌন্দর্য্য। এমনকী গাছগুলো সব একই মাপের, গোড়ার দিকের অর্ধেক অংশ সাদারং করা- কেন তা আমরা জানি না। দপ্তরের ভেতরে টেলিভিশনভর্তি অফিসরুম দেখলাম আমরা, লোকজন প্রত্যেক চ্যানেল পর্যবেক্ষণ করছে, এবং একজন কর্মকর্তা আমার আব্বাকে একটা মোটা ফাইল দেখালেন, যার মধ্যে ছিলো সেদিনের সংবাদপত্রে প্রকাশিত সেনাবাহিনী সম্পর্কিত সকল প্রতিবেদনের কাটিং। আব্বা ভীষণ অবাক হয়েছিলেন। জনসংযোগের ব্যাপারে আমাদের রাজনীতিবিদদের চেয়ে সেনাবাহিনীকেই বেশি সক্রিয় মনে হল।

আমাদের নিয়ে যাওয়া হল একটা হলঘরে। সেখানে আমরা জেনারেলের জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম। হলঘরের দেয়ালে আমাদের সকল সেনাপ্রধানদের ছবি ঝোলানো। আমাদের দেশের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তিবর্গ, মুশাররফের মতো স্বৈরশাসক এবং ভয়ঙ্কর জিয়াসহ। সাদা হাতমোজা পরা একজন ভৃত্য আমাদের জন্য চা, বিস্কুট এবং মাংস দেওয়া ছোট ছোট সমুচা নিয়ে এলো। সমুচা মুখে দিতেই যেন গলে গলে যাচ্ছিলো। যখন জেনারেল আবব্বাস এলেন আমরা সবাই উঠে দাঁড়ালাম।

তিনি আমাদের সঙ্গে কথোপকথন শুরু করলেন সোয়াতে সামরিক অভিযানের প্রসঙ্গ দিয়ে, যে অভিযানকে তিনি একটি বিজয় হিসেবে উপস্থাপন করলেন। তিনি বললেন এই অভিযানে ১২৮ জন সেনা এবং ১,৬০০ সন্ত্রাসবাদী নিহত হয়েছে।

তার কথা শেষে প্রশ্ন করার সুযোগ ছিলো আমাদের। আগেই আমাদের বলে রাখা হয়েছিলো প্রশ্ন তৈরি রাখতে এবং আমি সাত-আটটা প্রশ্নের একটা তালিকা

www.pathagar.com

তৈরি করে ফেললাম। শিজা হেসে বলল, উনি এতো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন না। আমি সামনের সারিতে বসা ছিলাম এবং আমাকেই প্রথম প্রশ্ন করতে বলা হলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'দুই বা তিন মাস আগে আপনারা জানিয়েছিলেন ফজলুল্লাহ এবং তার সহযোগী গুলিবিদ্ধ হয়েছে, কিন্তু পরে জানানো হল ওরা সোয়াতে আছে এবং কখনও কখনও বলছেন ওরা আফগানিস্তান পালিয়ে গেছে। ওরা ওখানে গেল কিভাবে? যদি আপনাদের কাছে আসলেই যথেষ্ট তথ্য থেকে থাকে, তাহলে কেন আপনারা ওদের ধরতে পারছেন না?'

প্রায় দশ থেকে পনেরো মিনিট ধরে জেনারেল আবব্বাস আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন। যদিও এতোক্ষন ধরে তিনি যা বলেছেন তার মধ্যে প্রশ্নের উত্তর কোনটা তা আর আমি বুঝতে পারিনি। তারপর আমি পুনর্গঠনের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল্যাম। 'শুধু সামরিক অভিযানের দিকে নয়, আমাদের উপত্যকার ভবিষ্যতের জন্যও সেনাবাহিনীর কিছু করা উচিত', আমি বললাম।

মনিবাও প্রায় একই রকম প্রশ্ন করল, 'ক্ষতিগ্রস্ত ভবন এবং স্কুলগুলো পুনর্গঠন করবে কে?' সে জানতে চাইলো।

জেনারেল খুব সামরিক কায়দায় উত্তর দিলেন, 'অভিযানের পর, আমাদের প্রথমে পুনরুদ্ধার করতে হবে, তারপর স্থিতিশীলতা ফেরাতে হবে, তারপর পরিস্থিতি স্থিতিশীল রেখে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করতে হবে।

আমরা সব মেয়েরা পরিষ্কারভাবে বোঝাতে চেয়েছি যে তালেবানদের বিচারের কাঠগড়ায় দেখতে চাই আমরা, কিন্তু আদতে এমন কিছু ঘটবে বলে আশাবাদী হতে পারলাম না কেউ।

বৈঠক শেষে জেনারেল আবব্বাস আমাদের মধ্যে কয়েকজনকে তার ভিজিটিং কার্ড দিলেন এবং বললেন যে কোনও প্রয়োজনে তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে।

শেষ দিনে ইসলামাবাদ ক্লাবে তালেবান শাসিত উপত্যকায় দিনযাপন বিষয়ে একটি করে বক্তব্য দিতে হয়েছিলো আমাদের সবাইকে। মনিবা যখন বলছিলো, তখন সে নিজের কান্না আটকে রাখতে পারছিলো না। কিছুক্ষণের মধ্যে সবার চোখই ছলছলে হয়ে উঠলো। ইসলামাবাদের দিনগুলোর বৈচিত্র্যের স্বাদ আমরা উপভোগ করেছি। আমি বক্তব্যে শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বললাম, ইংরেজি নাটকটি দেখার আগ পর্যন্ত পাকিস্তানেও যে কতো প্রতিভাবান লোক আছেন সে সম্পর্কে আমার কোনও ধারণা ছিলো না। 'এখন আমি বুঝতে পারলাম, আমাদের আর ভারতীয় সিনেমা দেখার দরকার নেই', আমি ঠাট্টা করে বলেছিলাম। খুব সুন্দর সময় কেটেছে আমাদের। যখন সোয়াতে ফিরলাম আমরা, আমি ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব আশান্বিত হয়ে উঠেছিলাম। আমি বাগানে একটি আমের বীজ রোপন করলাম। রমযান মাসে রোজা ভাঙার পর খাওয়ার জন্য আম অন্যতম প্রিয় ফল।

কিন্তু আমার আব্বা একটা মুশকিলে পড়ে গেলেন। যে সময়টায় উদ্বাস্তু ছিলাম আমরা, তখন তো পুরোটা সময় ধরেই স্কুল ছিলো বন্ধ। কোনও ফিসও নেওয়া

হয়নি, কিন্তু শিক্ষকরা তো বেতন পাওয়ার আশা করছিলেন। সে জন্য প্রয়োজন দশ লাখেরও বেশি রুপি। সব প্রাইভেট স্কুলে একই অবস্থা। একটা মাত্র স্কুল তাদের শিক্ষকদের এক মাসের বেতন দিল, কিন্তু বাকিরা জানতো না কোথা থেকে বেতন দেওয়ার সামর্থ্য জোগাবে। খুশল স্কুলের শিক্ষকরাও কিছু দাবি করলেন। তাদের নিজস্ব ব্যয় আছে, এবং শিক্ষকদের মধ্যে একজন, মিস হিরার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। বিয়ের অনুষ্ঠানের খরচ মেলাতে বেতনের অপেক্ষাতেই বসে ছিলেন তিনি।

সব মিলিয়ে আব্বা যখন বিরাট ঝামেলায়। আমাদের তখন মনে পড়ল জেনারেল আবক্কাস এবং তার ভিজিটিং কার্ডের কথা। যে সামরিক অভিযানের চালানো হয়েছিল তালেবানদের নির্মূল করতে, সেই অভিযানের জন্যই তো আমাদের চলে যেতে হয়েছিলো এবং এর ফলশ্রুতিতেই তো আমরা এখন এই সঙ্কটে। তাই ম্যাডাম মরিয়ম এবং আমি জেনারেল আবক্কাসকে একটা ই-মেল পাঠালাম, বর্তমান পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে। তিনি খুব সৌজন্যতা দেখালেন এবং আমার আব্বা যেন সকলের তিন মাসের বকেয়াই শোধ করে দিতে পারেন সেজন্য ১১ লাখ রুপি পাঠালেন। শিক্ষকরা বেতন পেয়ে প্রচন্ড খুশি। তাদের মধ্যে অনেকেই এর আগে এতো টাকা হাতে পায়নি। মিস হিরা ভেজা গলায় আমার আব্বাকে কৃতজ্ঞতা জানালেন, নিজের বিয়েটা পরিকল্পনা মতো এগোতে পারবেন বলে।

তাই বলে আমরা সেনাবাহিনীর প্রতি আমরা সাবলীল হয়ে যাইনি। তালেবান নেতাদের ধরতে না পারার ব্যর্থতার জন্য সেনাবাহিনীর উপর খুব অসন্তুষ্ট ছিলাম আমরা। আব্বা আর আমি অনেক অনেক সাক্ষাৎতার দেওয়ার অব্যাহত রাখলাম। আমরা প্রায়ই যোগ দিতাম আব্বার বন্ধু জাহিদ খানের সঙ্গে। তিনি সোয়াত কওমি পরিষদের ফেলো সদস্য। তিনি অল সোয়াত হোটেলস অ্যাসোসিয়েশনেরও সভাপতি। তাই তিনিও খুব করে চাইছিলেন জীবন আবার স্বাভাবিক হয়ে আসুক যাতে পর্যটকেরা ফিরে আসে। আমার আব্বার মতো তিনিও ছিলেন স্পষ্টবাদী এবং হুমকিপ্রাপ্ত। ২০০৯ সালের নভেম্বরের এক রাতে অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছিলেন তিনি। সেই রাতে সার্কিট হাউসে সেনা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এক বৈঠক শেষে জাহিদ খান যখন বাড়ি ফিরছিলেন, অতর্কিতে তার ওপর ঝাপিয়ে পড়ে দুর্বৃত্তরা। ভাগিস্য, যেখানে তার ওপর হামলা হয়, সে অঞ্চলে জাহিদ খানের অনেক স্বজনের বসবাস। হামলাকারীদের সঙ্গে গুলি বিনিময়ের ঘটনাও ঘটে। এক সময় দুর্বৃত্তরা পালাতে বাধ্য হয়।

এরপর ২০০৯ সালেরই ১ ডিসেম্বর, আত্মঘাতী বোমা হামলার শিকার হলেন আওয়ামী ন্যাশনাল পার্টির বহুল পরিচিত স্থানীয় নেতা এবং পাখতুনখাওয়া পরিষদের সদস্য ডক্টর শমসের আলী খান। তিনি নিজ হুজরায় বন্ধু ও নেতা-কর্মীদের সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করছিলেন। ফজলুল্লাহর প্রধান দপ্তর ইমাম দেরি থেকে মাত্র মাইলখানেক দূরে ডক্টর শমসের হুজরা। তিনি ছিলেন তালেবানদের কঠোর সমালোচক। তিনি মারা যান ঘটনাস্থলেই, আহত হয়

www.pathagar.com

আরও নয়জন। লোকজন বলে, বোমা বহনকারী ছেলেটার বয়স আঠারোর মতো হবে। পুলিশ ছেলেটার পা আর শরীরের কিছু অংশ খুঁজে পেয়েছিলো।

এর কয়েক সপ্তাহ পরে আমাদের স্কুল সোয়াতের জেলা শিশু পরিষদে যোগদানের আমন্ত্রণ পেল। ইউনিসেফ চ্যারিটি এবং 'খপাল খর (আমার ঘর) ফাউন্ডেশন' নামে অনাথ শিশুদের জন্য সংস্থার উদ্যোগে এই পরিষদ আয়োজন করা হয়। সদস্য হিসেবে ষাটজন শিক্ষার্থীকে বাছাই করা হল সমগ্র সোয়াত থেকে। বাছাইকৃতদের বেশির ভাগই ছেলে, মেয়ে সদস্য হিসেবে ছিলাম আমাদের স্কুলের এগারোজন ছাত্রী। প্রথম অধিবেশন বসল বিরাট এক হলে, যেখানে যোগ দিলেন অনেক রাজনীতিবিদ এবং অ্যাক্টিভিস্টরাও। আমরা এটা করলাম স্পিকার বাছাইয়ের জন্য এবং আমি জয়ী হলাম! মঞ্চের উপর উঠে দাঁড়ানো ছিল অন্য রকম অভিজ্ঞতা, লোকে আমাকে ম্যাডাম স্পিকার সম্বোধন করছিলো, তবে আমার সবচেয়ে ভালো লাগছিলো যে আমার কথা সবখানে ছড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে বলে। এই পরিষদ এক বছরের জন্য নির্বাচিত হল এবং প্রায় প্রতি মাসেই আমরা অধিবেশনে মিলিত হতাম। আমরা প্রায় নয়টি প্রস্তাবনা পেশ করলাম। একটি শিশুশ্রম বন্ধ এবং বঞ্চিত ও পথশিশুদের স্কুলে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া সংক্রান্ত। এবং একটি অবশ্যই তালেবানদের হিংস্রতায় ক্ষতিগ্রস্ত স্কুল পুনর্নির্মাণের দাবিতে। একবার প্রস্তাবনা পাশ হয়ে গেলে, তা পাঠিয়ে দেওয়া হতো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হাতে এবং কিছু উদ্যোগও গৃহিত হয়েছিল।

ইনস্টিটিউট ফর ওয়ার অ্যান্ড পিস রিপোর্টিং নামের একটি ব্রিটিশ সংস্থায় সাংবাদিকতা বিষয়ে শিক্ষা নিচ্ছিলাম মনিবা, আয়েশা এবং আমি। এই সংস্থা 'মুক্ত চিন্তার পাকিস্তান' নামের প্রজেক্ট পরিচালনা করে। কিভাবে বিভিন্ন ইস্যুতে যুৎসই প্রতিবেদন তৈরি করতে হয় এসব শেখা খুব মজার অভিজ্ঞতা। আমার শব্দগুলো কিভাবে ভিন্নতা পেতে পারে তা দেখে আমি সাংবাদিকতা নিয়ে তুমুল আগ্রহী হয়ে উঠলাম। এবং ডিভিডিতে 'আগলি বেটি' নামের সিরিজে দেখা আমেরিকান ম্যাগাজিনের কর্মজীবনও এই আগ্রহে রসদ জুগিয়েছে কিছুটা। যদিও পোষাক বা চুলের স্টাইল গোছের ব্যাপারের চেয়ে আমাদের ঘটনাগুলো একেবারে আলাদা। তালেবানদের চরমপন্থা ধরনের বিষয় নিয়ে আমরা লিখতাম, যা ছিলো আমাদের হৃদয়ের নিকটবর্তী বিষয়।

তারপর দেখতে দেখতে আরও একটা পরীক্ষার বছর শুরুহয়ে গেল। আমি আবারও মালকা-ই-নূরকে টপকে প্রথম স্থান অধিকার করলাম, যদিও বরাবরের মতো ব্যবধান ছিল সামান্যই। আমাদের প্রধানশিক্ষিকা নূরকে বোঝালেন, ও স্কুলে সেরা বটে, কিন্তু তার এমন কিছু করা উচিত নয় যেন তার পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটে। 'তোমাকে আরও মালালার মতো হয়ে উঠতে হবে এবং অন্য কিছু করতে হবে', বললেন ম্যাডাম মরিয়ম। 'তোমার পড়াশোনা সবচেয়ে জরুরী। কাজকর্ম সবকিছু নয়।' কিন্তু আমি নূরকে দোষারোপ করি না। সে সত্যিই তার আব্বা-আম্মাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেছে, বিশেষ করে তার আম্মাকে।

এই সোয়াত আর আগের মতো ছিলো না– হয়তো তেমন আর হবেও না– কিন্তু সবকিছুতে এক ধরণের স্বাভাবিকতা ফিরে আসছিলো। এমনকী বানর বাজারের কিছু নাচিয়েও ফিরে এলো। যদিও সরাসরি পারফর্ম করার চেয়ে ওরা বেশিরভাগই বিক্রির জন্য ডিভিডি তৈরি করতে লাগলো। নাচেগানে আমরা উদযাপন করলাম শান্তি উৎসব, তালেবানদের অধীনে যা করা যায়নি। মর্গাবাজারে আমার আব্বাও একটা উৎসবের আয়োজন করলেন এবং নিম্নাঞ্চলে যারা আশ্রয় দিয়েছিলেন উদ্বাস্তু আমাদের তাদের নিমন্ত্রণ জানানো হল ধন্যবাদ দিতে। সারা রাত ধরে চলল গান বাজনা।

সবকিছু সবসময় আমার জন্মদিনের কাছাকাছি সময়েই ঘটে যায়। ২০১০ সালের জুলাইতে আমি যখন তের বছরে পা রাখলাম তখন বৃষ্টি নেমে এলো। সোয়াতে সাধারণ বর্ষার দেখা মেলেনা। এবার নিশ্চয়ই বৃষ্টির ছোঁয়া ভালো ফসল ফলাবে ভেবে আমরা আনন্দিত হয়েছিলাম শুরুতে। কিন্তু অবিরাম বৃষ্টি তো আর থামে না, বরং এতো ভারী বর্ষন শুরুহল যে সামনে দাঁড়ানো লোকটাকেও দেখা যায় না। পরিবেশবিদরা সর্তক করলেন তালেবান ও কাঠ চোরাকারবারীদের হাতে আমাদের পর্বতগুলো থেকে প্রচুর গাছ কাটা পড়েছে। অচিরেই প্রচন্ড কর্দমাক্ত স্রোতে প্লাবিত হল আমাদের উপত্যকা, চোখের সামনে ভেসে গেল সবকিছু।

যখন বন্যা শুরুহল আমরা তখন স্কুলে। আমাদের ছুটি দিয়ে বাড়ি পাঠানো হল। কিন্তু ফেরার পথে আমরা দেখলাম ব্রিজটা নোংরা ধারার নিচে ডুবে আছে। তাই বিকল্প পথ খুঁজতে হল আমার। পরের ব্রিজটাও ডুবে ছিলো, কিন্তু গভীরতা বেশি ছিলো না বলে আমরা কোনমতে পেরিয়ে গেলাম। কিন্তু বাড়ি পৌছতে পৌছতে আমরা সকলে ভিজে নোংরা হয়ে গেলাম।

পরের দিন শুনলাম স্কুলও নাকি ডুবে গেছে বন্যায়। পানি নামতে সময় লাগলো। ফিরে গিয়ে দেখলাম স্কুলের দেয়ালে বুক-সমান উচ্চতায় পানির ছাপ। আর সবখানে কাদামাটি, নোংরা। আমাদের ডেস্ক আর চেয়ারগুলোও কাদামাটিতে ভর্তি। ক্লাসরুমগুলো থেকে জঘন্য গন্ধ বের হচ্ছিলো। ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিলো প্রচুর। যা সংস্কারের জন্য আমার আব্বাকে ৯০ হাজার রুপি খরচ করতে হয়েছে– যা ৯০ জন ছাত্রের মাসিক ফিসের সমান।

পুরো পাকিস্তানে একই অবস্থা। খরস্রোতা ইন্দুস নদী নেমে এসেছে হিমালয় থেকে। খাইবার পাখতুনখাওয়া এবং পাঞ্জাব হয়ে এই নদী করাচি দিয়ে আরব সাগর পর্যন্ত বয়ে গেছে। আমার অহংকার এই নদী। এই নদীই অশান্ত উত্তাল হয়ে উঠল এবং দুই কূল প্লাবিত হল। রাস্তা, ফসল এবং পুরো গ্রাম ভেসে গেল। ডুবে গেল প্রায় হাজার দুয়েক মানুষ, আক্রান্ত হলেন আরও ১৪ মিলিয়ন। তাদের অধিকাংশজন বাড়িঘর হারালেন এবং ৭ হাজার স্কুল ধ্বংস হয়ে গেল। স্মরণকালের সবচেয়ে ভয়ংকর বন্যা ছিল এটা। জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি-মুন এই বন্যাকে 'ধীর-গতির সুনামি' হিসেবে অবিহিত করেছেন। আমরা পড়েছি এশিয়ান সুনামি, আমাদের ২০০৫ সালের ভূমিকম্প, হারিকেন ক্যাটরিনা এবং

www.pathagar.com

হাইতি ভূকম্পনের সম্মিলিত ক্ষতির পরিমাণকে ছাড়িয়ে যাবে এই বন্যা। এই দুর্যোগে আরও অনেক বেশি জীবন আক্রান্ত হয়েছে এবং আরও অনেক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোর মধ্যে একটি ছিল সোয়াত। ৪২টা ব্রিজের মধ্যে ৩৪টাই ভেসে গিয়েছে, উপত্যকার অনেকটা অংশ ভেঙে বিলীন হয়েছে। বৈদ্যুতিক থামগুলো টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে ছিল, কোনও বিদ্যুৎ সরবরাহ ছিল না আমাদের। আমাদের নিজেদের রাস্তা পাহাড়ের ওপর, তাই ফুঁসে ওঠা নদী থেকে খানিকটা নিরাপদেই ছিলাম আমরা। তবুও বারবার শিহরিত হচ্ছিলাম নদীর গর্জন শুনে, যেন কোনও ড্রাগনের ভারী নিঃশ্বাস, যে চলতি যা পাবে তাই ধ্বংস করে দেবে। নদীর পাড়ের হোটেল-রেস্টুরেন্টগুলো যেখানে বসে মিঠা পানির মাছ খেতে খেতে দৃশ্য উপভোগ করতেন পর্যটকেরা– সব ধ্বংস হয়ে গেছে। সোয়াতের পর্যটন এলাকাগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সবচেয়ে বেশি। পর্বত চূড়ায় অবস্থিত মালাম জাবব্বা, ময়দান এবং বাহরাইনের মতো রিসোর্টগুলো এখন সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, পড়ে আছে তাদের হোটেল এবং বাজারের ধ্বংসাবশেষটুকু।

আমাদের আত্মীয়দের কাছ থেকে দ্রুত জানতে পেলাম, সাংলা-তে যে অবিশ্বাস্য ক্ষয়ক্ষতি ঘটেছে। আমাদের গ্রাম থেকে সাংলা-র রাজধানী আলপুরিতে গেছে প্রধান সড়ক, সেটাও প্লাবিত হয়েছে। পুরো গ্রাম ডুবে আছে পানিতে। কারশাত, শাহপুর এবং বারকানার মতো পাহাড়ি চত্বরের অনেক বাড়ি পাহাড় ধ্বসে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আমার মাতুলালয়, যেখানে ফাইয়াজ মোহাম্মদ মামা বাস করেন, সেই বাড়িটা এখনও টিকে আছে। কিন্তু যে রাস্তার মাথায় বাড়িটা, সেই রাস্তা উধাও হয়ে গেছে।

সবাই ভীষণ চেষ্টা করেছে নিজের খুচরো সম্পদটুকুও রক্ষা করতে, পালিত প্রাণী সরিয়ে নিয়েছে উঁচু স্থানে। কিন্তু ক্ষেতে ক্ষেতে ছিলো যে ফসল, উজাড় হয়েছে সেসব। ধ্বংস হয়েছে ফলের বাগান। স্রোতে ভেসে গেল কতো কতো মেষ। গ্রামবাসী তখন চূড়ান্ত অসহায়। কোনও বিদ্যুৎ সরবরাহ নেই। অস্থায়ী জলবিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো স্রোতে চুরমার হয়ে গেছে। বর্জ্য আর ধ্বংসাবশেষ বাদামি করে তুলেছে পানির রং, নেই কোনও পরিষ্কার পানির বন্দোবস্ত। স্রোত এমনই শক্তিশালী যে কংক্রিটের ভবনকেও গুড়িয়ে দেয় অনায়াসে। স্কুল, হাসপাতাল এবং বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে শুরুকরে প্রধান সড়ক সব মাটিতে মিশে গেল।

কেমন করে এমন হল তা কারও বোধগম্য হয় না। এই সোয়াত নদীর তীরবর্তী জনপদ প্রায় ৩ হাজার বছর পুরোনো, এই নদী সবার কাছে জীবনের ধারা বলে বিবেচিত হয়েছে, কখনও হুমকি মনে করা হয়নি একে। এবং আমাদের এই উপত্যকা ছিল দুনিয়ার বাইরে, কোনও বেহেশত যেন। আর এখন তা পরিণত হয়েছে 'দুঃখের উপত্যকা'য়, আমার তুতোভাই সুলতান রোম বলল এমন কথা। প্রথমে ভূমিকম্প, তারপর তালেবান, তারপর সামরিক অভিযান এবং সবশেষে

www.pathagar.com

আমরা যখন সব কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা শুরু করেছি, তখন এই ভয়াবহ বন্যা। নতুন করেই যতদূর এগিয়েছিল, বন্যার স্রোতে তারচে বেশি পিছিয়ে গেলাম আবার। এমন বিশৃঙ্খলার সুযোগে যদি আবার চড়াও হয় তালেবানরা এবং ফিরে আসে এই উপত্যকায়, এমন দুশ্চিন্তায় লোকজনের মনে আরও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল।

বন্ধু এবং 'সোয়াত অ্যাসোসিয়েশন অব প্রাইভেট স্কুলস' থেকে অর্থ সাহায্য সংগ্রহ করলেন আমার আব্বা। সেই অর্থে কেনা খাবার ও সহায়তা পাঠালেন সাঙ্গলা-তে। আমাদের বন্ধু শিজা এবং ইসলামাবাদের পরিচয় হওয়া কয়েকজন অ্যাক্টিভিস্ট এলেন মিঙ্গোরায়, বিতরণ করলেন প্রচুর অর্থ। কিন্তু সেই ভূমিকম্পকালীন সময়ের মতোই, দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে প্রথম সহায়তা নিয়ে হাজির হল ইসলামিক গ্রুপগুলোর স্বেচ্ছাসেবকরা। অনেকে বললেন, সাম্প্রতিক উৎসবে আমরা নাচগান করেছি বলেই সৃষ্টিকর্তার অভিশাপ নেমে এসেছে আমাদের ওপর, এই বন্যার মধ্য দিয়ে। ভাগিস্য, এমন মতবাদ প্রচারের জন্য কোনও রেডিও তখন ছিল না!

যখন মারাত্মক দূরবস্থা সকলের, লোকে হারাচ্ছে আপনজন, নিজেদের বাড়িঘর-জীবিকা, আমাদের রাষ্ট্রপতি আসিফ আলি জারদারি তখন অবকাশ যাপন করছেন ফ্রান্সের এক প্রাসাদে। 'আমি বুঝতে পারি না আবক্ষা', আমি আমার আব্বাকে বললাম। 'কি জন্য আমাদের প্রত্যেক রাজনীতিক বিরত থাকেন ভালো কাজ করা থেকে? কেন তারা চায় না যে মানুষ নিরাপদ থাকুক, খাবার এবং বিদ্যুৎ পাক?'

ইসলামিক গ্রুপগুলোর পরে হলেও প্রধান সাহায্য এলো সেনাবাহিনীর কাছ থেকে। কেবল আমাদের সেনারাই নন, মার্কিন হেলিকপ্টারে করেও সহায়তা এলো। যাতে আবার কিছু লোক সন্দিহান হয়ে উঠলেন। একটি মতবাদ ছড়িয়ে পড়ল, এই দূর্যোগ নাকি মার্কিনীদের তৈরি! হারপ (হাই ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাক্টিভ অরোরাল রিসার্চ প্রোগ্রাম) নামক কোনও এক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নাকি সমুদ্রের তলদেশে তুমুল কম্পন তৈরি করা হয়েছে, আর সেই কারণেই প্লাবিত হয়েছে আমাদের ভূমি। এই পরিস্থিতিতে সহায়তা বিতরণের নাম করে বৈধ উপায়েই পাকিস্তানে প্রবেশ করেছে আমেরিকা এবং গোয়েন্দাগিরি করছে আমাদের সকল গোপনীয়তায়।

শেষ পর্যন্ত বৃষ্টি থামল, জীবনযাত্রা তবু স্বাভাবিক হওয়ার নাম নেই কোনও। তখনও পরিষ্কার পানি এবং বিদ্যুৎ নেই আমাদের। আগস্টে প্রথম কলেরা সংক্রমণের খবর পাওয়া গেল মিঙ্গোরায় এবং দ্রুতই হাসপাতালের বাইরে তাবুতে রোগীদের চিকিৎসা শুরুহল। সরবরাহ নেই তাই অল্প-সল্প যা খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায়, তার মূল্যও চড়া। তখন পীচ ও পেঁয়াজের মৌসুম। কৃষকরা মরিয়া হয়ে উঠলেন ফসল রক্ষার্থে। রাবারের টায়ার দিয়ে বানানো নৌকায় জীবনের

www.pathagar.com

ঝুঁকি নিয়ে ফুঁসতে থাকা উত্তাল নদী পেরিয়ে ফসল বাজারে সরবরাহ করলো তারা অনেকে। পীচ ফল বিক্রির উপযোগী হওয়ার পর আমরা ভীষণ আনন্দিত হলাম।

অন্যান্য দূর্যোগকালীন সময়ের চেয়ে এবার ভিনদেশি সহায়তার পরিমাণ ছিলো অনেক কম। কারণ পশ্চিমের ধর্নাঢ্য দেশগুলো নিজেরাই আছে অর্থনৈতিক সংকটে এবং এই দূর্যোগে আমাদের রাষ্ট্রপতি জারদারির ইউরোপে ঘুরে বেড়ানোর বিষয়টিও তাদের সহানুভূতি কমিয়ে দিয়েছে। আমাদের অধিকাংশ রাজনীতিক কর দেন না- এই বিষয়টি ভিনদেশি সরকারগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সেহেতু তারা কেন এমন দেশের সহায়তার জন্য নিজের দেশের কঠোর কর-দাতাদের আহ্বান জানাবে। ভিনদেশি সহায়তা সংস্থাগুলো কর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে ভীষন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল, যখন তালেবানদের একজন মুখপাত্র পাকিস্তান সরকারের প্রতি খ্রিস্টান এবং ইহুদিদের দেওয়া সহায়তা প্রত্যাখান করার দাবি জানালো। তালেবানরা যে এই বিষয়ে কঠোর অবস্থানেই ছিল তা নিয়ে কারও সংশয় ছিলো না। আগের অক্টোবরে, 'বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি'র ইসলামাবাদ অফিসে এক বোমা হামলায় পাঁচ সহায়তাকর্মী নিহত হয়।

তালেবানরা যে সোয়াত ছেড়ে আসলে যায়নি কখনও, তা ধীরে ধীরে বুঝতে পারলাম আমরা। আরও দুটি স্কুল উড়িয়ে দেওয়া হল বিস্ফোরণে এবং একটি খ্রিস্টান গ্রুপের তিনজন কর্মী কাজ শেষে মিঙ্গোরায় নিজেদের ঘাটিতে ফেরার পথে অপহৃত হলেন। পরবর্তীতে তাদের খুন করা হয়। আমরা আরও ধাক্কা খেলাম আমার আব্বার বন্ধু সোয়াত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ডক্টর মোহাম্মদ ফারুকের নিহত হওয়ার খবর শুনে। দুই বন্দুকধারীর অতর্কিত আক্রমণে নিজের অফিসেই নিহত হন তিনি। ডক্টর ফারুক একজন ইসলামি পন্ডিত এবং জামায়াত-ই-ইসলামি পার্টির সাবেক সদস্য, এবং তালেবানিকরণের বিরুদ্ধে একজন সোচ্চার কণ্ঠধারী। যিনি আত্মঘাতী হামলা প্রসঙ্গে একটি ফতোয়াও জারি করেছিলেন।

আমরা চিন্তিত এবং আতঙ্কিত হলাম আবারও। যখন আমরা বাড়িঘর ছেড়ে উদ্বাস্তু, তখন রাজনীতিক হওয়ার কথা ভেবেছিলাম আমি এবং এখন আমি জানলাম সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছি। আমাদের দেশে আছে বিবিধ সঙ্কট, কিন্তু সেসব সামাল দেওয়ার মতো প্রকৃত নেতা নেই কোনও।

www.pathagar.com

১৭

বেড়ে ওঠার প্রার্থনাতে

তের বছর বয়সে আমার শারীরিক বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে গেল। এমনিতে বয়সের তুলনায় বয়স্ক দেখায় আমাকে, কিন্তু বন্ধুরা হঠাৎ সবাই আমার চেয়েও লম্বা হয়ে গেল। ক্লাসের তিরিশ জন ছাত্রীর মধ্যে আমি ছিলাম সবচেয়ে বেটে তিনজনের একজন। বন্ধুদের সঙ্গে থাকতে খুব অস্বস্তি হতো আমার। রোজ রাতে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতাম আরেকটু লম্বা হওয়ার জন্য। শোবার ঘরের দেয়ালে পেন্সিলে দাগ কেটে রুলার দিয়ে প্রতিদিন নিজেকে মাপতাম। প্রতি সকালে দাগের পাশে দেখতাম একটু বেড়ে উঠেছি কিনা। কিন্তু ৫ ফুটেই স্থির থাকে পেন্সিলের দাগ। এমনকী আমি আল্লাহর কাছে মানত করলাম যদি আমি আরেকটু লম্বাও হতে পারি, তাহলে একশ রাকাত নফল নামায আদায় করবো।

আমি তখন অনেক অনেক ইভেন্টে বক্তব্য রেখে বেড়াচ্ছি, কিন্তু উচ্চতায় বেটে হওয়ার কারণে লোকের গুরুত্ব আকর্ষণ করাটা মোটেও সহজ ছিলো না। কোনও কোনও সময় তো মাইকের ওপাশের দর্শকদের দেখতেই কষ্ট হতো আমার। হাই হিল জুতো আমার পছন্দ না, তবু আমি তেমন জুতো পরা শুরু করলাম।

আমাদের ক্লাসের একটা মেয়ে ওই বছর থেকে আর স্কুলে এলো না। বয়ঃসন্ধিতে পা রাখতে না রাখতেই বিয়ে হয়ে গেল তার। দেখতে শুনতে বেশ পরিণত মনে হলেও, ওর বয়স কিন্তু তেরই ছিলো। কিছুকাল পরে খবর পেলাম, মেয়েটা নাকি দুই বাচ্চার আম্মা হয়ে গেছে। কেমিস্ট্রি ক্লাসে হাইড্রোকার্বন ফর্মূলা পড়তে গিয়ে আমিও কিছুটা সময় কাটিয়েছি অনেকটা সময় কেটে গেছে আমার স্কুল যাওয়া বাদ দিয়ে স্বামী দেখাশোনায় ব্যস্ত থাকার ব্যাপারটা কেমন হতে পারে ভেবে।

তালেবানদের ছাপিয়ে আমার চিন্তাভাবনার জগতে আরও অনেক প্রসঙ্গের প্রবেশ ঘটা শুরু হল, যদিও পেছনের কথা পুরোপুরি ভুলে যাওয়া খুব কঠিন। আমাদের সেনাবাহিনী আগে থেকেই কর্নফ্লেক্স এবং সার নির্মাণ কারখানাসহ বিচিত্র বিবিধ ব্যবসায় যুক্ত। এবার তারা একটা ধারাবাহিক নাটক প্রযোজনা করল। টেলিভিশনের প্রাইম টাইমে পাকিস্তানের মানুষের ওপর 'বিওন্ড দ্য কল অব ডিউটি' নামের যে সোপ অপেরাটি চাপিয়ে দেওয়া হল, তা আসলে সোয়াতে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সৈন্যদের জীবনের সত্য কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

www.pathagar.com

সামরিক অভিযানে প্রায় শ খানেক সেনাসদস্য নিহত হয়, আহত হয়েছিলো ৯০০ জনের মতো এবং তাদের চাওয়া ছিলো তাদের যেন নায়োকোচিতভাবে উপস্থাপন করা হয়। তাদের আত্মত্যাগ সরকারের নিয়ন্ত্রণ পুনস্থাপন করেছে সত্যি, কিন্তু আমরা এখনও আইনের শাসনের অপেক্ষাতেই আছি। অধিকাংশ দুপুরেই স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে কোনও না কোনও মহিলাকে দেখতাম, তাদের অশ্রুসজল চোখ। সামরিক অভিযানের সময় থেকে শতাধিক পুরুষ নিখোঁজ। কাউকে সেনাবাহিনী তো কাউকে তুলে নিয়ে গেছে আইএসআই, যদিও তারা কেউ এ বিষয়ে কিছু বলছে না। মহিলারা কোনও খবর জোগাড়া করতে পারছেন না, তারা জানে না তাদের স্বামী কিংবা সন্তানেরা জীবিত নাকি মৃত। কারও কারও এমন দুরাবস্থা যে নিজের পরিপোষনের সামর্থ্যটুকুও নেই। একজন নারী তখনই আবার বিয়ে করতে পারেন যখন নিশ্চিত হওয়া যাবে তার স্বামী মৃত, নিখোঁজ থাকলেও নতুন বিয়ের বিধান নেই।

আমার আম্মা আগত মহিলাদের চা-বিস্কুট খেতে দিতেন, কিন্তু ওরা কেউ এসবের জন্য আসে না। তারা চায় আমার আব্বার সাহায্য। সোয়াতের কওমি পরিষদের মুখপাত্র হওয়ার কারণে আমার আব্বা সেনাবাহিনী এবং জনগণের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের কাজটি করে থাকেন।

'আমি শুধু জানতে চাই আমার স্বামী মারা গেছে কিনা', একজন মহিলা, যার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল তিনি আকুতি জানিয়েছিলেন এভাবে। 'যদিও ওরা তাকে মেরে ফেলে তাহলে আমার সন্তানদের কোনও এতিমখানায় রেখে আসতে পারি। কিন্তু এখন তো আমি কারও স্ত্রী কিংবা বিধবা কোনওটাই নই। আরেকজন মহিলা আমাকে জানালেন তার ছেলে নিখোঁজ। মহিলা আরও জানালেন, নিখোঁজ ছেলেটি তালেবানদের সহযোগিতা করতে যায়নি, বরং তাদের নির্দেশে হয়তো এক গ্লাস পানি বা কিছু রুটি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই নির্দোষ মানুষটিকেও আটক করা হলো, অথচ তালেবান নেতারা ঠিকই মুক্ত ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আমাদের বাড়ি থেকে মাত্র দশ মিনিট হাঁটা দূরত্বে বাস করতেন আমাদের স্কুলের একজন শিক্ষক। তার ভাইকে সেনাবাহিনী তুলে নিয়ে যায়, পায়ে লোহার বেড়ি পড়িয়ে নির্যাতন করে এবং মৃত্যু হওয়ার আগ পর্যন্ত তাকে ঢুকিয়ে রাখা হয় একটা রেফ্রিজারেটরে। তালেবানদের সঙ্গে তার কোনও লেনদেনই ছিল না। সে ছিল একজন মামুলি দোকানদার। পরবর্তীতে এই ঘটনার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছে সেনাবাহিনী। তাদের বক্তব্য, নাম বিভ্রাটে তারা ভুল লোকটিকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলো।

কেবল দরিদ্র মহিলারাই আমাদের বাড়িতে আসতেন তা নয়। একদিন উপসাগরীয় মুসকাত থেকে এক ধর্ণাঢ্য ব্যবসায়ী এলেন। আব্বাকে তিনি জানালেন, তার ভাই এবং পাঁচ ভাইপোকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাদের গ্রেপ্তার করে রাখা হয়েছে নাকি হত্যা করা হয়েছে তিনি তা জানতে চান, হত্যা

www.pathagar.com

করা হলে এদের স্ত্রীদের জন্য নতুন পাত্র খুঁজবেন তিনি। নিখোঁজদের মধ্যে একজন ছিলেন মাওলানা এবং আমার আব্বা তাকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এই ধরণের ঘটনা কেবল সোয়াতেই ঘটেনি। শুনেছি, পুরো পাকিস্তানে এমন প্রায় হাজারখানেক মানুষ লাপাত্তা। অনেক মানুষ বিচারালয়ের বাইরে এই ঘটনায় প্রতিবাদ দেখালেন কিংবা কেউ পোস্টার সাটলেন সেই নিখোঁজের, কিন্তু কোথাও খোঁজ নেই যার।

এই সময়ে আমাদের আদালত অবশ্য ব্যস্ত অন্য বিষয় নিয়ে। পাকিস্তানে 'ব্লাসফেমি আইন' নামক কিছু একটা আছে, যা পবিত্র কোরআনকে অপবিত্রতা থেকে রক্ষা করার জন্য। জেনারেল জিয়ার ইসলামিকরণ অভিযানের অংশ হিসেবে এই আইন এতোটাই কঠোর রূপ ধারণ করে, যে এর ভিত্তিতে 'মহানবীর পবিত্র নাম'কে কলুষিত করার চেষ্টাকারীকে মৃত্যু কিংবা যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা যেতে পারে।

২০১০ সালের নভেম্বর মাসের কোনও এক দিনে আসিয়া বিবি নামের এক খ্রিস্টান নারীকে নিয়ে একটি প্রতিবেদন করা হল। তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়েছে। পাঞ্জাবের এক গ্রামে বসবাসকারী এই নারী পাঁচ সন্তানের মা। ফলকুড়ানির কাজ করেন জীবিকা নির্বাহের জন্য। একদিন তিনি তার সহকর্মীদের পানি এনে দিলেন, কিন্তু কেউ কেউ সেই পান করতে অপারগতা প্রকাশ করল। বলল, নারীটি খ্রিস্টান তাই তার হাতের পানি 'নাপাক'। তারা বিশ্বাস করতো মুসলিম হিসেবে এই বিধর্মী নারীর হাতে পানি পান করলে তারা দূষিত হয়ে যাবে। এমন বিশ্বাসীদের মধ্যে একজন ছিলেন আসিয়া বিবির প্রতিবেশি, আসিয়ার ছাগল যার পানি ময়লা করেছে। তারা একটা বিবাদে জড়িয়ে পড়ল। এবং যথারীতি আমাদের স্কুলের ঝগড়াগুলোর মত একই ঘটনার একেক রকম বিবরণ পাওয়া গেল একেক জনের কাছে। তার একটি বিবরণে জানা যায়, আসিয়া বিবিকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য চাপ প্রয়োগ করা হয়। তখন আসিয়া প্রশ্ন তোলেন, খ্রিস্টানের পাপমোচনের জন্য ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মরেছেন যীশু, মুসলমানদের জন্য নবী মোহাম্মদ কি করেছেন। ফলকুড়ানিদের মধ্যে একজন স্থানীয় ইমামকে এই প্রশ্নের ভিত্তিতে অভিযোগ জানাল, ইমাম জানালেন পুলিশকে। মামলা আদালতে ওঠার আগেই আসিয়া বিবি একদিন কারাগারে কাটালেন এবং তারপর মৃতুদণ্ড পেলেন।

মুশাররফ স্যাটেলাইট টেলিভিশনের অনুমোদন দেওয়ার পর থেকে, এখন অনেকগুলো চ্যানেল আমাদের। কিন্তু এই ধরনের বিষয় মাঝেসাঝেই টেলিভিশনে দেখতে পাই আমরা। বর্হিবিশ্বে যখন এসব নিয়ে তোলপাড়, কিন্তু সব টক শোগুলোতে এই ব্যাপারটি আড়াল করে রাখা হল। আসিয়া বিবি প্রসঙ্গে পাকিস্তানের যে দুয়েকজন কথা বলেছেন, তাদের মধ্যে একজন পাঞ্জাবের গভর্নর সালমান তাসির। বেনজিরের ঘণিষ্ঠ হওয়ায় রাজনৈতিক বন্দিত্ব বরণ করতে

হয়েছে তাকে। পরবর্তীতে তিনি ধনবান মিডিয়া মোঘলে পরিণত হন। তিনি কারাগারে গেলেন আসিয়া বিবির সঙ্গে দেখা করতে এবং বললেন প্রেসিডেন্ট জারদারির উচিত আসিয়াকে ক্ষমা করা। তিনি ব্লাসফেমি আইনকে 'কালো আইন' হিসেবে অভিহিত করেন। তার এই বক্তব্য আরও অতিরঞ্জিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে টেলিভিশনের উপস্থাপকের কৃতিত্বে। রাওয়ালপিন্ডির সবচেয়ে বড় মসজিদে শুক্রবারের জামাতে কয়েকজন ইমাম গভর্নরের তুমুল নিন্দা করলেন।

এর কিছু দিন পর, ২০১১ সালের ৪ জানুয়ারি, সালমান তাসির নিহত হলেন। ইসলামাবাদের সবেচেয়ে ফ্যাশনেবল কফি বার অঞ্চলে নিজের এক দেহরক্ষীর গুলিতে। খুনি ছাবিক্ষশটি গুলি করেছিল তাকে। পরবর্তীতে খুনি জানায়, রাওয়ালপিন্ডিতে শুক্রবারের নামাযে গিয়ে বক্তব্য শোনার পর সৃষ্টিকর্তার জন্যই সে এই খুন করেছে। আমরা বিস্মিত হয়ে দেখলাম, কতো লোকে খুনির প্রশংসা করল। যখন আদালতে নিয়ে যাওয়া হল আইনজীবি পর্যন্ত খুনির শরীরে গোলাপের পাপড়ি ছিটিয়ে দিচ্ছিলেন। ওদিকে গভর্নরের মসজিদের ইমাম পর্যন্ত জানাযা পড়াতে রাজি হননি এবং প্রেসিডেন্ট জারদারিও গভর্নরের শেষকৃত্যে যোগ দেননি।

আমাদের দেশ রীতিমতো ক্ষেপাটে হয়ে উঠল। খুনির গলায় ফুলের মালা তুলে দেওয়া হচ্ছে, এটা কিভাবে সম্ভব হয়?

কয়েকদিন পরেই আমার আব্বা আরও একটি জীবন নাশের হুমকি পেলেন। হাজি আব্বা হাই স্কুলে বোমা হামলার তৃতীয় বর্ষ স্মরণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রেখেছিলেন আব্বা। আবেগাপ্লুত হয় তিনি বলেছিলেন, 'ফজলুল্লাহ শয়তানদের নেতা!' তিনি চিৎকার করে বলেছিলেন। 'কেন তাকে ধরা হচ্ছে না?' বক্তব্য শেষে লোকজন আব্বাকে সাবধানে থাকার পরামর্শ দিলেন। তারপর আব্বার জন্য বেনামি চিঠি এলো বাড়িতে। চিঠির শুরুতে লেখা 'আসসালামু আলাইকুম'– অর্থ্যাৎ আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক– কিন্তু চিঠির পর সমাচারে কোনও শান্তির বার্তা আদৌ ছিলো না। বরং চিঠিতে বলা হল, 'তুমি একজন ধার্মিক আলেমের সন্তান কিন্তু নিজে একজন ভালো মুসলিম নও। তুমি যেখানেই যাও মুজাহিদরা তোমাকে খুঁজে বের করবে।' চিঠি পাওয়ার পর সপ্তাহ দুশ্চিন্তায় ছিলেন আব্বা, কিন্তু নিজের কর্মকাণ্ড বন্ধ রাখতে রাজি হলেন না, বরং দ্রুতই তিনি আরও নানান কর্মকাণ্ডে যুক্ত হলেন।

*

এইসব দিনে সবাই আমেরিকাকে নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত। যদিও একদা সবকিছুর জন্য আমাদের পুরোনো শত্রু ভারতকেই দায়ী করা হতো, এখন সবার মুখে মুখে যুক্তরাষ্ট্রের সমালোচনা ড্রোন হামলার জন্য, ফাতায় যা প্রতি সপ্তাহে ঘটছিলো। শুনেছি তাতে প্রচুর বেসামরিক মানুষ নিহত হয়েছে। তারপর লাহোরে সিআইএ এজেন্ট রেমন্ড ডেভিস গুলিবিদ্ধ হলেন এবং দুজনকে গুলি

www.pathagar.com

করে হত্যা করলেন, যারা একটি মোটরসাইকেল নিয়ে তার গাড়িতে আক্রমণ করেছিলো। তিনি বলেছিলেন, নিহতরা তাকে লুট করার চেষ্টা করেছিলো। মার্কিনীরা দাবি করল, ডেভিস সিআইএ এজেন্ট নন, একজন সাধারণ কূটনীতিক। এমন দাবি সবাইকে বিস্মিত করলো। কারণ আমাদের মতো স্কুলশিক্ষার্থীরাও জানতো যে সাধারণ কূটনীতিকরা অচিহ্নিত গাড়িতে 'জিলক' পিস্তল নিয়ে ঘুড়ে বেড়ায় না।

আমাদের মিডিয়া দাবি করলো ডেভিস মূলত একটি প্রকান্ড গোপন সেনাবাহিনীর অংশ, যাকে সিআইএ পাকিস্তানে পাঠিয়েছে। কারণ তারা আমাদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে বিশ্বাস করে না। ডেভিসকে পাঠানো হয়েছে লস্কর-ই-তৈয়বা নামের একটি জঙ্গিগোষ্ঠীর ওপর গোয়েন্দাগিরি করতে, যে জঙ্গিগোষ্ঠী ভূমিকম্প এবং বন্যার সময় বহু মানুষকে সাহায্য করেছে। ২০০৮ সালে মুম্বাইতে নির্মম হামলার পেছনে তাদের হাত আছে বলে ধারণা করা হয়। যদিও তাদের মূল লড়াই কাশ্মীরের মুসলিমদের ভারতের শাসন থেকে মুক্ত করার, কিন্তু সাম্প্রতিককালে আফগানিস্তানেও তাদের তৎপরতা বেড়েছে। অন্য অনেকের দাবি, ডেভিস নাকি আমাদের পরমাণু অস্ত্র নিয়ে গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছে।

অল্প সময়েই পাকিস্তানে সবচেয়ে খ্যাতিমান মার্কিনী হয়ে উঠল রেমন্ড ডেভিস। সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড়। লোকজন ধারণা করতে লাগলো, আমাদের বাজারগুলো রেমন্ড ডেভিসে ভর্তি হয়ে গেছে, গোয়েন্দাদের একত্রিত করা হচ্ছে দেশে ফেরত পাঠাতে। এমন সময়ে ন্যায় বিচার পাওয়া যাবে না বলে হতাশায় ইদুঁর মারার বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করলেন একজন বিধবা, যার স্বামী ডেভিসের হাতে নিহতদের একজন।

মামলা চূড়ান্ত নিস্পত্তির আগে প্রায় সপ্তাহখানেক খুব টানা-হেচড়া চলল ওয়াশিংটন এবং ইসলামাবাদ কিংবা রাওয়ালপিন্ডির সেনাবাহিনীর প্রধান দপ্তরের মধ্যে। সেই ঐতিহ্যগতভাবেই আমেরিকা ২.৩ মিলিয়ন 'রক্তাত্ব অর্থ' দিয়ে খালাস এবং ডেভিস সদর্পে আদালত থেকে মুক্ত হয়ে চলে গেল এই দেশ ছেড়ে। পরবর্তীতে পাকিস্তান দাবি করল সিআইএ তার চুক্তিকারীদের বেশির ভাগকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে এবং ভিসা অনুমোদন স্থগিত করেছে। পুরো বিষয়টা খুব অপ্রীতিকর হয়ে উঠলো, বিশেষ করে মার্চের ১৭ তারিখে, ডেভিস মুক্তি পাওয়ার একদিন পরে। দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের উপজাতি কাউন্সিলে একটি ড্রোন হামলা চালানো হয়, তাতে মারা যায় প্রায় ৪০ জন। এই হামলার মধ্য দিয়ে যেন সিআইএ বার্তা পাঠালো, আমাদের দেশে যা খুশি তাই করতে পারে তারা।

এক সোমবারে দেয়ালের সামনে নিজেকে মাপতে ব্যস্ত আমি, যদি কোনও আশ্চর্য্য উপায়ে রাতে একটু লম্বা হয়েছি হয়তো, এমন আশায়! পাশের দরোজায় তখন উচ্চকণ্ঠ শোনা গেল। আমার আব্বার বন্ধুরা যে খবর নিয়ে এসেছেন, তা অবিশ্বাস্য। রাতে নেভি সিলস নামে আমেরিকার একটি বিশেষ বাহিনী

www.pathagar.com

অ্যাবাটাবাদে অভিযান চালিয়েছে, উদ্বাস্তু হওয়ার পর যে শহরে আমরাও অবস্থান করেছি। সেখানে ওসামা বিন লাদেনকে খুঁজে পাওয়া গেছে এবং হত্যা করা হয়েছে। সেনা একাডেমির এক মাইল এলাকার মধ্যেই উঁচু প্রাচীর ঘেরা একটি বাড়িতে বাস করছিলেন বিন লাদেন। বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিলো, নাকের ডগায় বসে থাকা লাদেনের সন্ধান পায়নি আমাদের সেনাবাহিনী। পত্রপত্রিকায় খবরে বলা হলো, ক্যাডেটরা নাকি এই বাড়ির পাশের মাঠে অনুশীলনও করেছে। বাড়িটি বারো ফুট উঁচু প্রাচীরে ঘেরা, প্রাচীরের ওপর কাটাতার বাধা। ওপরের তলায় লাদেনের সঙ্গে থাকতেন তার কণিষ্ঠা স্ত্রী, আমল নামের এক ইয়েমেনি নারী। বাকি দুই স্ত্রী এবং এগারো সন্তানের বসবাস ছিলো নিচের তলাতে। একজন মার্কিন সিনেটর বলেছিলেন, লাদেনের গোপন আশ্রয়ে ছিল নাকি ছিল না কেবল একটা নিওন সাইন।

এটা সত্য, পাশতুন অঞ্চলের অনেক মানুষ পর্দা ও গোপনীয়তা রক্ষার্থে প্রাচীর ঘেরা বাড়িতে বসবাস করেন, সেহেতু বাড়িটা অস্বাভাবিক ছিলো না। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার বাড়ির বাসিন্দারা কেউ বাইরে বের হতো না কখনও এবং তাদের কোনও টেলিফোন বা ইন্টারনেট সংযোগ ছিলো না। খাবার দাবার সংগ্রহের কাজ করতো দুই সহোদর, স্ত্রীসহ ওই বাড়িতেই যাদের বাস। ওরা কর্মরত ছিলো বিন লাদেনের দূত হিসেবে। এদের একজনের স্ত্রী সোয়াতের মেয়ে।

সিল সদস্যদের গুলি বিদ্ধ হয়েছে লাদেনের মাথায় এবং মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয়েছে হেলিকপ্টারে করে। সেখানে যুদ্ধংদেহী কোনও পরিস্থিতির আঁচ মেলেনি। তবে দূত ভাতৃদ্বয় এবং লাদেনের তরুণ এক সন্তানও নিহত হয়েছে, কিন্তু বিন লাদেনের স্ত্রী এবং বাকি সন্তানদের বেঁধে ঘটনাস্থলেই রেখে যাওয়া হয় এবং পরবর্তীতে তাদের পাকিস্তানে হেফাজতে নেওয়া হয়। লাদেনের মৃতদেহ সাগরে ভাসিয়ে দেয় মার্কিনীরা। প্রেসিডেন্ট ওবামা এতে ভীষণ আপ্লুত হন এবং হোয়াইট হাউস প্রাঙ্গণে বিরাট উল্লাস অনুষ্ঠানের আয়োজন দেখি আমরা টিভিতে।

মনে তো করেছিলাম, এই মার্কিন অভিযান সম্পর্কে অবগত এবং তাতে সম্পৃক্ত ছিলো আমাদের সরকার। কিন্তু অচিরেই জানা গেল, মার্কিনীরা এই অভিযান সম্পন্ন করেছে নিজেরাই। ব্যাপারটা সহজে গ্রহণ করতে পারেনি আমাদের লোকজন। কারণ আমাদের মিত্র বলেই গণ্য করা হয়েছে এবং তাদের এই সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে তাদের চেয়েও বেশি সৈন্য নিহত হয়েছে আমাদের। মার্কিনীরা রাতের আঁধারে এই দেশে প্রবেশ করল, বিশেষ হেলিকপ্টারে করে খুব নিচু দিয়ে উড়ে এসে এবং বৈদ্যুতিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের রাডার বধ্য করে রেখে। নিজেদের অভিযান সম্পর্কে তারা কেবল আমাদের সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ জেনারেল আশফাক কায়ানি এবং প্রেসিডেন্ট জারদারিকে অবহিত করল, তবে সেটা অভিযান সম্পন্ন হওয়ার পর। আর শীর্ষ সেনা কর্মকর্তাদের অধিকাংশজনই এই খবর জানলেন টিভি থেকে।

www.pathagar.com

মার্কিনীরা বলল, এভাবে ছাড়া কোনও বিকল্প ছিলো না তাদের। আইএসআইয়ের কোন অংশটি সক্রিয় দায়িত্বে তা জানা ছিলো না এবং কোনওভাবে সিল সদস্যরা পৌঁছনোর আগে লাদেনের কাছে তথ্য ফাঁস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিলো। সিআইয়ের প্রধান বলেছেন পাকিস্তান 'হয়তো জড়িত কিংবা অক্ষম। নয়তো দুটোর মধ্যে কোনওটাই নয়।'

আমার আব্বা বলেন এটা একটা লজ্জাজনক দিন। 'কিভাবে সবার অজান্তে এমন একটা কুখ্যাত সন্ত্রাসী পাকিস্তানে লুকিয়ে থাকতে পারে?' তিনি প্রশ্ন তোলেন। এই প্রশ্নটা অন্যদেরও।

আপনি বুঝতে পারবেন লোকে কেন ভাবে আমাদের গোয়েন্দা সংস্থা লাদেনের অবস্থান সম্পর্কে অবগত ছিলো। আইএসআই একটি বিরাট সংস্থা, সর্বত্র ছড়িয়ে আছে এজেন্টরা। লাদেন কিভাবে রাজধানীর এতো কাছাকাছি, মাত্র ষাট মাইল দূরে, বসবাস করতে পারে? এবং এতো লম্বা সময় ধরে? হয়তো সবচেয়ে খোলামেলা জায়গাটাই লুকোনোর জন্য উৎকৃষ্ট, কিন্তু সে এই বাড়িতে ২০০5 সালের ভূমিকম্পের পর থেকেই অবস্থান করছে। অ্যাবাটাবাদ হাসপাতালে তার দুটি সন্তানেরও জন্ম হয়েছে। এবং সে পাকিস্তানে নয় বছর ধরে থাকছে। অ্যাবাটাবাদের আগে সে হরিপুরে থাকতো এবং তারও আগে সে আমাদের এই সোয়াতের উপত্যকাতেই আত্মগোপনে ছিল। এখানেই তার সঙ্গে পরিচয় খালিদ শেখ মোহাম্মদের, ৯/১১-এর হামলার পরিকল্পনা যার মস্তিষ্কপ্রসূত।

আমার ভাই খুশল যেসব গোয়েন্দা সিনেমা দেখতে ভালোবাসে, লাদেনকে খুঁজে বের করার প্রক্রিয়াটা অনেকটা ওসব সিনেমার কাহিনীর মতোই। গোয়েন্দা জাল এড়াতে ফোন বা ইমেইলের পথ মাড়াতেন না, মানব-দূত ব্যবহার করতেন। মার্কিনীরা সেই দূতদেরই একজনকে নিশানা করে ফেলল, গাড়ির নম্বর নিয়ে ফেলল এবং গাড়ি অনুসরণ করেই পেশোয়ার থেকে হাজির হল অ্যাবাটাবাদে। তারপর তারা ওই বাড়িটাকে বিশাল আকৃতির ড্রোন দিয়ে এক্স-রে করা হয়, যা থেকে কম্পাউন্ডের ভেতরে শ্মশ্রুধারী এক খুব লম্বা মানুষের গতিবিধি সম্পর্কে জানা যায়। এই মানুষটির নাম দেওয়া হয় পেসার।

এই গুপ্ত অভিযান সম্পর্কে প্রতিদিনই নিত্যনতুন তথ্য জানছে মানুষ এবং মানুষ ফুঁসছে আমেরিকান আক্রমণের বিরুদ্ধে যতোটা, তারচেয়ে বেশি ক্ষোভের কারণ দুনিয়ার সবচেয়ে বড়ো সন্ত্রাসবাদী আমাদের মাটিতে লুকিয়ে থাকতে পেরেছে, তাই। কিছু পত্রিকা খবর দিল, আমেরিকানরা আসলে বিন লাদেনকে অনেক বছর আগেই হত্যা করে রেফ্রিজারেটরে রেখে দিয়েছিলো। তারপর তারা লাশটা অ্যাবাটাবাদে নিয়ে এসে মিথ্যা গল্প ফাঁদে। এবং ভুয়া অভিযানের খবর বানায় পাকিস্তানকে বিব্রত করতে।

সেনাবাহিনীর প্রতি সমর্থন জানিয়ে রাস্তায় র‍্যালি করার বার্তা পেতে থাকি আমরা। 'আমরা আপনাদের জন্য ছিলাম ১৯৪৮, ১৯৬৫ এবং ১৯৭১ সালে', একটি বার্তায় বলা হয়, ভারতের বিপক্ষে তিনটি যুদ্ধের উল্লেখসহ। 'এখন যখন

www.pathagar.com

আমাদের পিঠে ছোরা বসানো হচ্ছে তখন আমাদের পাশে থাকুন।' আবার সেনাবাহিনীর প্রতি বিদ্রুপ করেও বার্তা এসেছিলো। অনেকে প্রশ্ন তুলছিলো এমন একটা সেনাবাহিনীর পেছনে আমরা কেন প্রতি বছর ৬ বিলিয়ন করে গুণবো (শিক্ষা খাতে বরাদ্দের চেয়ে সাত গুণ বেশি), যে বাহিনীর রাডারকে ভেলকি দিয়ে অনায়াসে চারটা আমেরিকান হেলিকপ্টার আমাদের দেশে ঢুকে পড়তে পারেই যদি। এবং তারা যদি করতে পারে, তাহলে বাড়ির পাশের ভারতকেই বা ঠেকানোর উপায় কি? 'দয়া করে কড়া নাড়বেন না, সেনাবাহিনী ঘুমোচ্ছে,' একটা বার্তায় লেখা, এবং 'সেকেন্ড হ্যান্ড পাকিস্তানি রাডার বিক্রি হবে... মার্কিন হেলিকপ্টার ধরা না পড়লেও টিভি চ্যানেল চমৎকার ধরা যায় এতে,' আরেক বার্তায় লেখা।

জেনারেল কায়ানি এবং আইএসআইয়ের প্রধান জেনারেল আহমাদ সুজাকে স্বাক্ষ্য দেওয়ার জন্য সংসদে ডাকা হয়েছিল, কিন্তু ডাকে সাড়া দেননি তারা। আমাদের দেশের অবমাননা হল তাতে এবং আমরা জানতে চাই কেন।

জানা গেছে, মার্কিনী রাজনীতিকরাও এতে ভীষণ ক্ষুব্ধ যে তারা ভেবেছিলো লাদেন কোনও গুহায় লুকিয়ে আছে, অথচ সে আমাদের নাকের ডগায় দিব্যি অবস্থান করছিলো। সহযোগিতার জন্য আট বছরে বিভিন্ন ধাপে মার্কিনীরা ২০ মিলিয়ন ডলার দিয়েছে আমাদের, স্বাভাবিকভাবেই তাই অভিযোগ করছে তারা এবং প্রশ্ন তোলাই যায় আমরা আসলে কোন দলে ছিলাম? মাঝেমাঝে মনে হয় পুরোটাই আসলে টাকার খেলা। যার বেশির ভাগ গেছে সেনাবাহিনীর পকেটে, আর সাধারণ মানুষ পায়নি কিছুই।

*

বেশ কিছুদিন পর, ২০১১ সালের অক্টোবরে আমার আব্বা আমাকে জানালেন তিনি একটা ইমেইল পেয়েছেন অ্যামস্টারডম ভিত্তিক শিশু-অধিকার বিষয়ক গ্রুপ 'কিডসরাইটস' থেকে। তাদের আন্তর্জাতিক শান্তি পুরস্কারের জন্য পাঁচজন মনোনীত হয়েছেন, আমি তাদের একজন। আমার নাম প্রস্তাব করেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার আর্চবিশপ ডেসমন্ড টুটু। বৈষ্যমের বিরুদ্ধে এই মহান যোদ্ধা আমার আব্বার আদর্শ পুরুষ। কিন্তু আমি পুরস্কার পাইনি,আব্বা খুব হতাশ হলেন। তাকে বোঝালাম, আমি শুধু বক্তব্য দিয়েছি, সাংগঠনিকভাবে প্রকৃত কিছু তো আমি করিনি, জয়ীরা যে কাজটি করেছেন।

অল্প কিছুদিন পরেই পাঞ্জাবের মুখ্য মন্ত্রী শাহবাজ শরিফের পক্ষ থেকে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হল লাহোরে, একটি শিক্ষা উৎসবে। মুখ্য মন্ত্রী দানিশ স্কুল নামের নতুন একটি স্কুলে নেটওয়ার্ক তৈরি করছেন এবং শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে ল্যাপটপও দেওয়া হচ্ছে। যা চালু করলে স্ক্রিনে মুখ্য মন্ত্রীর ছবিও দেখা যাবে। শিক্ষার্থীদের মনোনিবেশ বাড়াতে তিনি সব প্রদেশে পরীক্ষার ভালো নম্বর পাওয়া

www.pathagar.com

ছাত্রদের নগদ অর্থ পুরস্কার দিচ্ছেন। মেয়ে অধিকার বিষয়ক ক্যাম্পেইনটির জন্য আমাকেও পাঁচ লাখ রুপির একটি চেক দেওয়া হল, যা প্রায় সাড়ে ৪ হাজার ডলারের কাছাকাছি।

আমি সেই উৎসবে প্রথম গোলাপী পোষাক পরলাম এবং প্রথমবার প্রকাশ্যে বললাম, কিভাবে তালেবান নিষেধাজ্ঞা ডিঙিয়ে গোপনে স্কুলে যেতাম আমরা। 'আমি জানি পড়াশোনার গূরত্ব, কারণ আমার কলম এবং বই জোর করে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে', আমি বললাম।'কিন্তু সোয়াতের মেয়েরা কাউকে ভয় করে না। আমরা পড়াশোনা অব্যাহত রেখেছি।'

তারপর একদিন আমি ক্লাসে বসে ছিলাম, আমার এক সহপাঠী এসে আমাকে বলল, 'তুমি একটা বিরাট পুরস্কার জিতেছো এবং পাঁচ লাখ রুপি!' আব্বা বললেন, সরকার আমাকে প্রথমবারের মতো পাকিস্তানের শান্তি পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। স্কুলে অনেক সাংবাদিকের ভীড় জমলো এবং স্কুল সেদিন নিউজ স্টুডিওতে রুপান্তরিত হল।

২০১১ সালের ২০ ডিসেম্বর ছিলো পুরস্কার প্রদানের দিন। প্রধানমন্ত্রীর দাপ্তরিক বাসভবনে, কনস্টিটিউশন অ্যাভিনিউয়ের শেষে পাহাড় চূড়ায় এই বিরাট অট্টালিকা আমি ইসলামাবাদ যাওয়ার সময় দেখেছি। ওই অনুষ্ঠানের পর থেকেই রাজনীতিকদের সঙ্গে আমার আলাপ নিয়মিত হয়। আমি মোটেও ভীত ছিলাম না, আব্বা আমাকে ভড়কে দেওয়ার চেষ্টা করলেন, বললেন প্রধান মন্ত্রী গিলানি সাধু পরিবার থেকে আসা লোক। প্রধানমন্ত্রী আমাকে অ্যাওয়ার্ড আর চেক দেওয়ার পর, আমি তাকে দাবিদাওয়ার একটা লম্বা তালিকা উপহার দিলাম। আমি তাকে জানালাম, আমরা চাই আমাদের স্কুলটি সংস্কার করা হোক এবং সোয়াতে একটি নারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হোক। আমি জানতাম তিনি আমার দাবিগুলো খুব গুরত্ব সহকারে নেবেন না, তাই আমিও খুব জোরাজুরি করিনি। ভেবেছি, একদিন আমিও রাজনীতিক হবো, এবং এই দাবি নিজেই পূরণ করবো।

ঠিক হলো প্রতি বছর আঠারো বছরের নিচের শিশুদের প্রতিবছর এই পুরস্কার দেওয়া হবে এবং আমার সম্মানে এই পুরস্কারের নামকরণ করা হয় মালালা পুরস্কার। আমি খেয়াল করলাম, আমার আব্বা এতে খুব একটা খুশি হচ্ছেন না। অধিকাংশ পশতুনের মতো তিনিও কিছু সংস্কার মানেন। পাকিস্তানে আসলে জীবিত মানুষকে সম্মান দেখানোর কোনও নজির নেই, মৃত্যুর পরই মানুষের সম্মান বাড়ে আমাদের কাছে, আব্বা তাই পুরস্কারের নামকরণ করাকে বাজে কিছুর পূর্বাভাস ভেবে নিলেন।

আমি জানি আম্মা এসব পুরস্কার দেখে মোটেও খুশি হবেন না। কারণ তিনি ভাবেন, আমি বেশি পরিচিতি পেলে হয়তো জঙ্গিদের নিশানা হতে পারি। তিনি নিজে কখনও প্রকাশ্যে আসতেন না। তিনি ছবি তুলতেও নারাজ। তিনি খুব

www.pathagar.com

পরহেজগার একজন নারী এবং এটাই আমাদের শত বছর পুরোনো ঐতিহ্য। একমাত্র একেবারে নিজস্ব পারিবারিক পরিমন্ডলেই তিনি এই ঐতিহ্য ভঙ্গ করতেন, যেখানে নারী-পুরুষ তার সঙ্গে কথা বলতে পারতো। কখনও তিনি বলেননি আব্বা এবং আমার কোনও উদ্যোগে তিনি দুঃখ পেয়েছেন। কিন্তু আমি পুরষ্কার পাওয়ার পর তিনি বললেন, 'আমি কোনও পুরষ্কার চাই না। আমি আমার মেয়েকে চাই। আমি এই পুরো দুনিয়ার বদলেও আমার মেয়ের একটা ভ্রু পর্যন্ত বিনিময় করবো না।'

আব্বা বোঝানোর চেষ্টা করতেন, তিনি সারাজীবন স্বপ্ন দেখেছেন এমন একটা স্কুল তৈরির, যেখানে বাচ্চারা পড়বে। এজন্য রাজনীতিতে জড়ানো এবং শিক্ষা বিষয়ক ক্যাম্পেইনে নামা ছাড়া তার কোনও উপায় নেই। 'আমার একমাত্র লক্ষ্য', তিনি বলেন, 'আমার বাচ্চাদের, আমার জাতিকে ততটুকু শিক্ষিত করে তোলা যতোটুকু করার সামর্থ্য আমার আছে। কিন্তু তোমাদের অর্ধেক নেতা যখন মিথ্যা বকছেন আর বাকি অর্ধেক তালেবানদের সঙ্গে ঘোট পাকাচ্ছেন, কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। তখন কাউকে না কাউকে তো বলতে হবে।'

আমি যখন বাড়ি ফিরলাম তখন জানতে পারলাম একদল সাংবাদিক এসেছেন যারা, স্কুলে বসে আমার একটা সাক্ষাৎকার নিতে চান। তাই আমার একটু সাজুগুজু করে নেওয়া উচিত। প্রথমে ভাবলাম আমি খুব সুন্দর একটা জামা পড়বো। কিন্তু পরে মনে হল সাক্ষাৎকারের জন্য আমাকে এমন কিছু পড়তে হবে যা আরও অনেক বিনয়ী, কারণ আমি চাই মানুষ আমার পোষাকে নয়, কথাতে মন দিক। স্কুলে পৌঁছে দেখি আমার সব বন্ধুরা খুব সেজেগুজে হাজির। আমি ভেতরে পা রাখতেই ওরা 'সারপ্রাইজ!' বলে হৈ হৈ করে উঠল। তারা নিজেদের মধ্যে চাদা তুলে একটা পার্টির আয়োজন করেছে। এককটা বিরাট সাদা কেক আনা হয়েছে, চকলেট দিয়ে যার উপরে লেখা 'সাফল্য চিরদিনের'। এটা খুবই আনন্দদায়ক যে আমার বন্ধুরা আমার সাফল্য ভাগাভাগি করে নিতে চাইছে। আমি জানি, আমার যা অর্জন, তা আমার ক্লাসের যে কোনও মেয়ে পেতে পারে যদি তারা তাদের অভিভাবকের সমর্থন পায়।

'এখন তোমরা ক্লাসে ফিরতে পারো,' বললেন ম্যাডাম মরিয়ম যখন আমরা কেক খেয়ে সাবাড় করেছি। 'মার্চে কিন্তু পরীক্ষা!'

কিন্তু বছরটা শেষ হল খুব দুঃখের একটা খবর দিয়ে। পুরষ্কার পাওয়ার পাঁচ দিন পর আমার বড় খালা, আমার মায়ের বড়ো বোন হুট করে মারা গেলেন। অথচ পঞ্চাশও হয়নি তার বয়স। ডায়বেটিকে আক্রান্ত ছিলেন তিনি এবং টিভিতে বিজ্ঞাপন দেখে খালুকে রাজি করিয়ে লাহোরের কোনও এক চিকিৎসকের কাছে গেলেন জাদুকরি চিকিৎসা নিতে। তিনি জানতেন না সেই চিকিৎসক তার গায়ে কি ইনজেক্ট করল, কিন্তু তিনি পক্ষাঘাতের শিকার হলেন এবং মারা গেলেন। আব্বা বললেন এই চিকিৎসক ছিলো একটা হাঁতুড়ে এবং এই কারণেই আমাদের অশিক্ষা-অজ্ঞতার বিরুদ্ধে লড়াই করে যেতে হবে।

www.pathagar.com

অবাক হয়ে আবিষ্কার করলাম বছর শেষে আমার হাতে অনেকগুলো টাকা জমেছে। প্রধানমন্ত্রী, পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও আমাদের রাজ্য খায়বার পাখতুনখাওয়ার মুখ্যমন্ত্রী, সিন্ধ সরকার, স্থানীয় সেনাবাহিনীর কমান্ডার মেজর জেনারেল গুলাম কমর– প্রত্যেকে আমাকে পাঁচ লাখ রুপি করে দিয়েছিলেন। গুলাম কমর আমাদের স্কুলে একটা বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার ও একটা পাঠাগার নির্মাণের জন্যও এক লাখ রুপি দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার লড়াই তখনও শেষ হয়নি। ইতিহাস বইতে পড়া সেই অধ্যায়গুলোর কথা মনে পড়ে, যা থেকে জেনেছি একজন সৈনিক অর্জন কিংবা উদারতা তখন উপভোগ করে যখন সে যুদ্ধ জয় করে। আমি এই পুরস্কার এবং স্বীকৃতিগুলোকে সেভাবে বিবেচনা করলাম। এসব কেবল ঠুনকো রত্ন, বিশাল কোনও অর্থবহ কিছু না। আমাকে মনোনিবেশ করতে হবে এই লড়াই জেতার লক্ষ্যে।

অর্জিত অর্থের কিছুটা খরচ করে আব্বা আমাকে নতুন বিছানা এবং কেবিনেট কিনে দিলেন। আমার মায়ের দাঁত ইমপ্লান্ট বাবদ খরচ হলো কিছু এবং সাংলায় এক খন্ড জমি কেনা হলো। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম অবশিস্ট টাকা আমরা খরচ করবো তাদের জন্য, যাদের সাহায্য প্রয়োজন। আমি একটা শিক্ষা কার্যক্রম চালু করার সিদ্ধান্ত নিলাম। যা ভাবছিলাম আর্বজনার স্তুপে শিশুদের কাজ করতে দেখার পর থেকেই। আমি এখনও মনে করতে পারি সেখানে দেখা কালো ইঁদুরের ছবিটা এবং জট পাকানো চুলের সেই মেয়েটা যে আবর্জনা বাছাই করছিলো। আমরা ২১ জন মেয়েকে নিয়ে একটা সভার আয়োজন করলাম, সোয়াতের সকল মেয়েকে শিক্ষা দানে ব্যবস্থা সম্পর্কে গূরত্ব দেওয়া হলো, বিশেষ করে পথশিশু এবং শিশুশ্রমিকদের শিক্ষার ব্যাপারে।

মালাকান্দ পাস পাড়ি দেওয়ার সময় আমি দেখলাম একজন তরুণী কমলা বিক্রি করছে। সে পড়াশোনা জানে না, তাই কমলা বিক্রির হিসেব রাখতে এক টুকরো কাগজে একটা পেন্সিল দিয়ে আঁকিবুঁকি চালাচ্ছিলো। আমি তার ছবিটা মনে গেঁথে নিলাম এবং শপথ করলাম, এই মেয়েদের শিক্ষিত করার জন্য নিজের সামর্থ্যের পুরোটুকু দিয়ে চেষ্টা করবো আমি। এটাই সেই লড়াই যা আমি লড়তে যাচ্ছি।

www.pathagar.com

১৮

নারী এবং সমুদ্র

নাজমা খালার চোখ ভেজা। এর আগে সমুদ্র দেখেননি উনি। আমরা পুরো পরিবার বসে ছিলাম পাথর খন্ডের ওপর, একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলাম পানির দিকে, শ্বাস নিচ্ছিলাম আরব সাগরের নোনতা বাতাসে। বিস্তীর্ণ এই জলধারার শেষ কোথায়, নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারবে না। সে মুহূর্তে আমি খুব আনন্দিত বোধ করছিলাম। 'একদিন আমি এই সমুদ্র পাড়ি দেবো', বললাম আমি।

'বলে কি মেয়ে?' নাজমা খালা এমনভাবে বললেন যেন অসম্ভব কিছু বললাম আমি। তখনও অবশ্য তার ব্যাপারটাই ঘুরছে আমার মগজে। তিনি করাচিতে সমুদ্র তীরবর্তী একটা এলাকায় থাকেন প্রায় তিরিশ বছর ধরে, অথচ আজকের আগে তার সমুদ্র দর্শন হয়নি। তার স্বামী তাকে সৈকতে নিয়ে আসেন না এবং কখনও তিনি বাড়ি থেকে বের হতে পারলেও, পথনির্দেশিকা দেখে তিনি সমুদ্রের পাড়ে পৌঁছতে পারেননি, কারণ তিনি পড়াশোনা জানেন না।

আমি পাথরের ওপর বসে ছিলাম এবং ভাবছিলাম সমুদ্রের ওপাশে নিশ্চয় কোনও জায়গা আছে যেখানে নারীরা মুক্ত। পাকিস্তানে একদা একজন নারী প্রধানমন্ত্রীও ছিলেন এবং ইসলামাবাদে সেই মহিয়সী পরিশ্রমী নারীর সঙ্গে আমার দেখাও হয়েছে, কিন্তু তবু এখনও আমাদের দেশে অধিকাংশ নারীই পুরোপুরি পুরুষনির্ভর। আমার প্রধান শিক্ষিকা ম্যাডাম মরিয়ম বেশ বলবান, শিক্ষিত নারী কিন্তু তাকে আমাদের সমাজ একা থাকার বা কাজ করার অনুমতি দেয় না। তাকে বাস করতে হবে স্বামী, ভাই কিংবা অভিভাবকের সঙ্গে।

পাকিস্তানে যখন নারীরা স্বাধীনতা চায়, তখন লোকে ভ্রু কুঁচকে ভাবে এর মানে বুঝি আব্বা, ভাই কিংবা স্বামীকে আর মান্য না করার মতো বিষয়। কিন্তু আসলেতো তা না। এর মানে আমরা নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরা নিতে চাইছি। আমরা নির্বিঘ্নে স্কুলে কিংবা কাজে যেতে চাইছি। কোরআনের কোথাও লেখা নেই নারীদের কেবল পুরুষের ওপর নির্ভরশীল হয়েই বাঁচতে হবে। এমন কোনও নির্দেশ বেহেশত থেকে নাযিল হয়নি যে প্রত্যেক নারী পুরুষের কথা মানতে বাধ্য।

www.pathagar.com

'তুমি এখনও লাখো মাইল দূরে আছো, জানি', আমার ভাবনায় বাগড়া দিলেন আব্বা। 'কি স্বপ্ন দেখছো তুমি?'

'কেবল এই সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার কথা ভাবছি, আবা', আমি জবাব দিলাম।

'ভুলে যাও এসব!' আমার ভাই অতল চিৎকার করে উঠলো। 'আমরা এখন সৈকতে আছি এবং আমি এখন উটের পিঠে চড়তে চাই।'

সিন্ধু সরকার মিশন রোডে মেয়েদের একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নাম আমার নামে করার ঘোষণা দেওয়ার পর ২০১২ সালের জানুয়ারি আমরা করাচিতে গেলাম জিও টিভিতে অতিথি হিসেবে। আমার ভাই খুশল অ্যাবাটাবাদের স্কুলে, তাই আমার সঙ্গে গেলেন আব্বা-আম্মা আর অটল। আমরা উড়ে গেলাম করাচিতে, এবং এটা আমাদের বিমানভ্রমনের প্রথম অভিজ্ঞতা। এই ভ্রমণ মাত্র দুই ঘন্টার, আমি বিস্মিত হলাম। কারণ বাসে এই রাস্তা পাড়ি দিতে অন্তত দুই দিন লাগার কথা। বিমানে আমরা দেখলাম, অনেকে তাদের সিট খুঁজে পাচ্ছে না। কারণ তারা অক্ষর জানে না, সংখ্যা চেনে না। আমি জানালার পাশের একটা সিটে বসেছিলাম এবং নিচে আমাদের ভূখন্ডের মরুভূমি আর পর্বত দেখতে পাচ্ছিলাম। যতো উত্তরে এগোচ্ছিলাম, জমিন ততোই শুষ্ক হয়ে উঠছিলো। ইতিমধ্যেই আমার মনে পড়ল উপত্যকার অনাবীল সবুজের কথা। আমি দেখতে পেলাম, আমাদের লোকজন করাচিতে কাজ করতে গেলেও, নিজের কবর কেন উপত্যকার শীতল ছায়াতেই দেখতে চায়।

বিমানবন্দর থেকে হোস্টেলে যাওয়ার পথে মানুষ, বাড়ি এবং গাড়ির সংখ্যা চমক ধরিয়ে দিলো। করাচি সারা দুনিয়ার অন্যতম বৃহৎ শহর। আশ্চর্য্য ব্যাপার পাকিস্তান যখন তৈরি হল তখন এই বন্দরটিতে মাত্র ৩ লাখ লোকের ছিল বসবাস। জিন্নাহ এখানে বাস করতেন এবং এখানে আমাদের প্রথম রাজধানী স্থাপন করেন, এবং অচিরেই এখানে ভারত থেকে আসা লাখো মুসলিম শরনার্থীর ঢল নামে, যারা মোহাজির মানে প্রবাসী নামে পরিচিত। এরা কথা বলে উর্দু ভাষায়। এখন বাসিন্দা প্রায় বিশ মিলিয়ন। এটা আসলে বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো পশতুন শহর। কেবল আমাদের দেশের নয়, এই শহর প্রায় পাঁচ থেকে সাত মিলিয়ন পশতুনের কর্মস্থল।

দূর্ভাগ্যজনকভাবে করাচি প্রচণ্ড হিংস্র শহরে পরিণত হয়েছে এবং মোহাজির আর পশতুনদের মধ্যে সারাখন বিবাদ চলছেই। আমরা দেখলাম মোহাজির অঞ্চলগুলো খুবই ছিমছাম এবং পরিচ্ছন্ন। কিন্তু পশতুনদের এলাকা নোংরা-বিশৃঙ্খল। মোহাজিররা প্রায় সকলেই 'মুত্তাহিদা কওমি মুভমেন্ট' (এমকিউএম) নামে একটি রাজনৈতিক দলের অনুসারি। তাদের নেতা আলতাফ হুসাইন লন্ডনে নির্বাসিত এবং স্কাইপের মাধ্যমে নেতা-কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। এমকিউএম খুবই গোছানো একটা মুভমেন্ট এবং মোহাজিররা একজোট হয়ে থাকে। বিপরীতে আমরা পশতুনরা ভীষন বিভক্ত, কেউ ইমরান খানকে অনুসরণ করছে কারণ সে পশতুন, খান একজন বিরাট ক্রিকেটার, কেউ মওলানা ফজলুর

www.pathagar.com

রেহমানের পিছু কারণ তার 'জামায়াতে উলামা-ই-ইসলাম' একটি ইসলামপন্থী দল। কেউ ধর্মনিরপেক্ষ 'আওয়ামী ন্যাশনাল পার্টি'র পক্ষে কারণ এটি একটি পশতুন জাতীয়তাবাদী দল। কেউ আছে বেনজির ভুট্টোর 'পাকিস্তান পিপলস পার্টি' কিংবা নওয়াজ শরিফের 'পাকিস্তান মুসলীম লীগ'এ।

আমরা সিন্দের বিধানসভায় গেলাম। প্রত্যেক সদস্য আমাকে প্রশংসা করলেন। তারপর আমরা স্কুলগুলোতে গেলাম, আমার নামে নামকরণ করা স্কুলেও। আমি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বক্তব্য দিলাম এবং বেনজির ভুট্টোকে নিয়ে কথা বললাম, এটা তার শহর। 'আমাদের সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে মেয়েদের অধিকার আদায়ের জন্য', আমি বলেছিলাম। বাচ্চারা আমার জন্য গান করল এবং আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে আছি এমন একটা পেইন্টিং উপহার পেলাম। মালাই অব মাইওয়ান্ডের সঙ্গে নিজের নামের মিল যেন উদ্ভট আর আনন্দময় লাগে নিজের নামে স্কুল দেখে তেমনই লাগল, তারপর তো আফগানিস্তানে অনেক স্কুলেরই নামকরণ হল। আগামী স্কুল ছুটির দিনে দূরবর্তী পাহাড়ী অঞ্চলে অভিভাবকদের কাছে বাচ্চাদের পড়াশোনার প্রয়োজনীয়তা প্রচার করতে যাওয়ার পরিকল্পনা করলাম আব্বা আর আমি। 'আমরা শিক্ষা প্রচারক হবো', আমি বললাম।

সেদিনের পর আমরা আমাদের এক চাচা-চাচীর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তারা ভীষণ ছোট একটা বাড়িতে বাস করে, যে কারণে আব্বা বুঝতে পারলেন কেন ছাত্র বয়সে বন্ধুটি তাকে বাড়িতে আনতে চায়নি। পথে আমরা আশেকান-ই-রসূল চত্ত্বর পেরিয়ে আসার সময় ভীষণ ধাক্কা খেলাম, গভর্নর সালমান তাসিরের হত্যাকারীর একটি ছবিতে মালা এবং গোলাপের পাপড়ি দিয়ে রাখা হয়েছে যেন সে কোনও সন্ত। আব্বা ক্ষেপে উঠলেন। 'এই বিশ মিলিয়ন মানুষের শহরে একটাও লোক নেই যে সে ছবিটা নামিয়ে ফেলতে পারে?'

করাচি ভ্রমণে একটা বিশেষ ব্যাপার তো উল্লেখ করতেই হবে সমুদ্র কিংবা বিরাট বাজারে ঘুরতে গিয়ে, আমার আম্মা প্রচুর পোষাক কিনেছেন। প্রয়োজন ছিলো আমাদের প্রতিষ্ঠাতা এবং মহান নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সমাধিতে যাওয়ার। সাদা মার্বেল পাথরে তৈরি ভবনটা খুব শান্তিদায়ক, শহরের হুল্লোড় থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আমরা এক ধরণের পবিত্রতা অনুভব করছিলাম। বেনজির পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তনের পর এখানেই তার প্রথম বক্তব্য রাখার জন্য রওনা হয়েছিলেন, যখন পথে তার বাস বিস্ফোরিত হয়।

নিরাপত্তা কর্মী আমাদের বুঝিয়ে দিলেন চায়না থেকে আনা বিরাট ঝাড়বাতির নিচে যে সমাধি তাতে জিন্নাহর দেহ নেই। তার মৃতদেহ নিচের তলার একটি সমাধিতে রাখা, যেখানে তার পাশে আছে তার বোন ফাতিমার সমাধি, যিনি অনেক পরে মারা যান। এর পরের সমাধিটি আমাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের, তাকে হত্যা করা হয়েছিলো।

এরপরে আমরা পেছনের ছোট মিউজিয়ামে গেলাম। যেখানে ডিসপ্লেতে আছে প্যারিস থেকে আনা জিন্নাহর বো-টাই, লন্ডন থেকে বানিয়ে আনা তার থ্রি-পিস

www.pathagar.com

স্যুট, গল ক্লাব এবং একটা বিশেষ ভ্রমণকালীণ বাক্স, যাবে বারো রকমের জুতো রাখার ড্রয়ার আছে, জিন্নার পছন্দের দো রং ব্রোগা জোড়াসহ। দেয়াল ছেয়ে রাখা আলোকচিত্রে। পাকিস্তানের শুরুর দিনগুলোর একটা ছবিতে সহজেই আপনার চোখে পড়বে মলিন চেহারার জিন্নাহ্ কিভাবে মারা যাচ্ছেন। সে সময় এই তথ্য গোপন রাখা হয়েছিলো। জিন্নাহ্ দিনে প্রায় গোটা পঞ্চাশেক সিগারেট টানতেন। যক্ষ্মায় তার শরীর ঝরঝরে হয়ে পড়েছিল এবং ফুসফুসে কর্কট রোগ বাসা গেড়েছিল। যখন ভারতে শেষ রাজ প্রতিনিধি লর্ড মাউন্টব্যাটন রাজি হলেন ভারতকে খন্ডিত করে স্বাধীনতা দিতে। পরবর্তীতে তিনি বলেছিলেন, জিন্নাহ মারা যাচ্ছে এই খবর জানলে ভাগাভাগি বন্ধ হয়ে থাকতো এবং হয়তো পাকিস্ত ান নামে কোনও রাষ্ট্রেরও জন্ম হতো না। একদম তাই, জিন্নাহ্ মারা গেলেন ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বরে, পাকিস্তানের জন্মের ঠিক এক বছর পরেই। তারপর তিন বছরের চেয়ে কিছুকাল পরেই খুন হলেন আমাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী, একদম শুরু থেকেই খুব দূর্ভাগা জাতি আমরা।

জিন্নার কিছু বিখ্যাত ভাষণ প্রদর্শন করা হয়েছে। সেখানকার একটি ভাষণে তিনি বলেছেন, সকল ধর্মের মানুষ এই নতুন পাকিস্তানে নিজের ধর্ম পালনের সুযোগ পাবে। এবং আরেকটি ভাষণে তিনি বলেছেন নারীর গূরত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে। তার জীবনে নারীদের ছবি দেখতে আগ্রহ হল আমার। কিন্তু তার স্ত্রী খুব কম বয়েসে মারা গেছেন, তিনি ছিলেন একজন পার্সি। এবং তাদের একমাত্র মেয়ে দিনা একজন পার্সিকে বিয়ে করে ভারতেরই থেকে গিয়েছিলেন। নতুন মাতৃভূমিতে পার্সিদের অবস্থা খুব ভালো ছিলো না, এখন উনি নিউইয়র্কে থাকেন। তাই ছবি যা পাওয়া গেল অধিকাংশই তার বোন ফাতিমার।

এই পাকিস্তান দেখলে জিন্নাহ কতোটা নিরাশ হবেন ভাবতে গেলেও সমাধি ভ্রমণ কিংবা প্রদর্শিত ভাষণ পড়া কঠিন। জিন্নাহ হয়তো বলবেন, এই রাষ্ট্র হয়তো সেই রাষ্ট্র না, যা তিনি চেয়েছিলেন। তিনি স্বাধীনতা চেয়েছিলেন, সহনশীলতা চেয়েছিলেন, পরস্পরের প্রতি মায়া-সংহতি দেখতে চেয়েছিলেন। চাওয়া ছিলো স্বাধীনভাবে সকলে নিজের বিশ্বাসের অনুসারী হতে পারবে।

'স্বাধীন না হয়ে আমরা ভারতের অংশ থেকে গেলেই কি ভালো হতো?' আমি আব্বাকে জিজ্ঞেস করলাম। আমার মনে হলো, পাকিস্তানের জন্মের আগে হিন্দু আর মুসলমানদের মধ্যে অবিরাম লড়াই চলতে থাকতো। এখন নিজেদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র পাওয়ার পরও আমরা লড়াই করেই চলেছি। কিন্তু এবারের লড়াই মোহাজির আর পশতুনের মধ্যে এবং শিয়া ও সুন্নিদের মধ্যে। একে অন্যকে টেক্কা দিতে তৎপর, এবং আমাদের চারটি প্রদেশ স্বতন্ত্র হয়ে উঠতে সংগ্রাম করছে। সিন্ধিরা বরাবরই আলাদা হয়ে যাওয়ার কথা বলে, বেলুচিস্তানে চলমান যুদ্ধ সম্পর্কে কেউ জানে না এই অঞ্চল দুর্গম হওয়ার কারণে। এইসব মারামারির অর্থ কি আমরা আবার আমাদের দেশকে খন্ডিত করতে চাই?

www.pathagar.com

আমরা মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে দেখলাম কয়েকজন তরুণ পতাকা হাতে বিক্ষোভ করছে। জানলাম, তারা পাঞ্জাবের উত্তরাঞ্চল থেকে আসা শিরাইকি ভাষাভাষী, তারাও নিজেদের স্বতন্ত্র প্রদেশ চায়।

যারা লড়াই করছে তাদের কিছু বিষয় ভাবা উচিত। যদি খ্রিস্টান, হিন্দু কিংবা ইহুদিরা সত্যিই আমাদের শত্রু হয়, যেমনটা অনেকে বলেন, তাহলে আমরা নিজেদের মধ্যে কেন মারামারি করছি? আমাদের জনগণ পথভ্রষ্ট হচ্ছে। তারা মনে করছে ইসলাম রক্ষা করা তাদের মহান দায়িত্ব এবং তারা পরিচালিত ও বিভ্রান্ত হচ্ছে তালেবানদের মতো মতবাদীদের মাধ্যমে, যারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোরআনের ভুল ব্যাখ্যা করে। আমাদের মনোনিবেশ করতে হবে প্রকৃত বিষয়ের ওপর। আমাদের দেশের অজস্র নিরক্ষর মানুষ আছে এখনও। অধিকাংশ মেয়েদের শিক্ষার কোনও উপায় নেই। যেখানে বিস্ফোরণে স্কুল উড়িয়ে দেওয়া হয়। একটা স্থায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ নেই আমাদের। এমন একটা দিন কাটে না যেদিন অন্তত একজন পাকিস্তানী হত্যা হচ্ছে না।

একদিন শেহলা আনজুম নামের এক মহিলা এলেন আমাদের হোস্টেলে। তিনি আলাস্কাতে বসবাসকারী একজন পাকিস্তানি সাংবাদিক এবং নিউ ইয়র্ক টাইমসের ওয়েবসাইটে আমাদের নিয়ে বিশেষ তথ্যচিত্র দেখার পর আমার সঙ্গে দেখা করতে আগ্রহী হয়েছেন। কিছুক্ষন তিনি আমার সঙ্গে কথা বললেন তারপর আব্বার সঙ্গে কথা শুরু করলেন। আমি তার চোখে অশ্রু দেখলাম। তারপর সে আমার আব্বাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি জানেন, জিয়াউদ্দিন নামে তালেবান এই নিষ্পাপ মেয়েটাকে খুন করার হুমকি দিয়েছে?' আমরা বুঝতে পারছিলাম না শেহলা কি বলতে চাইছেন। তিনি তখন ইন্টারনেটে ঢুকলেন এবং আমাদের দেখালেন তালেবানরা সেদিন দুজন নারীকে হত্যার হুমকি পাঠিয়েছে– একজন দির-এর অ্যাক্টিভিস্ট শাদ বেগম এবং অন্যজন মালালা, আমি। 'এরা দুজন নাস্তিকতার বিস্তার ঘটাচ্ছে এবং এদের হত্যা করা হবে', হুমকিতে বলা হয়েছে। কিন্তু এটাকে খুব বেশি গুরত্ব সহকারে নিতে পারলাম না, ইন্টারনেটে তো কত কিছুই থাকে। জরুরী কিছু হলে নিশ্চয় অন্য কোনও জায়গা থেকেও খবর পাওয়া যেতো।

সেই সন্ধ্যায় আব্বার কাছে ফোন করল, আঠারো মাস ধরে আমাদের বাড়িতে আমার সঙ্গে ভাগাভাগি করে থাকছে যে পরিবারটি তাদের কেউ। তাদের বাড়ির ছাদ ছিল ভঙ্গুর এবং বৃষ্টির পানি চালের ফুটো দিয়ে ঢুকে পড়তো। আমাদের দুটো অতিরিক্ত ঘর ছিলো। তারা আমাদের সঙ্গে নামমাত্র ভাড়ায় থেকে গেছেন। তাদের তিন সন্তান, বিনাবেতনে পড়াশোনা করে আমাদের স্কুলে। ওরা আমাদের সঙ্গে থাকায় আমরা খুব আনন্দিত। কখনও কখনও আমরা ছাদে দিয়ে চোর পুলিশ খেলি একসঙ্গে। ফোনে জানা গেল, আমাদের বাড়িতে পুলিশ এসেছে জানতে আমরা হুমকি পেয়েছি কিনা। আব্বা ফোনে কথা বললেন পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্টেনডেন্টের সঙ্গে, পুলিশ কর্তাও জানতে চাইলেন এবং

www.pathagar.com

কথা, কোনও হুমকি পেয়েছেন? আব্বা জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন? আপনাদের কাছে কোনও তথ্য আছে? পুলিশ কর্তা সোয়াতে ফেরার পর আব্বাকে দেখা করতে বললেন।

এরপরে আব্বা কি আর করাচি উপভোগ করতে পারেন? তিনি চিন্তিত হয়ে উঠলেন। আব্বা-আম্মা দুজনই খুব ভড়কে গেছেন দেখলাম। জানতাম, আম্মা খালার শোকে কাতর এবং আমার বেশি বেশি পুরস্কার পাওয়া নিয়ে চিন্তিত, তারচেয়ে বড় কোনও চিন্তায় তারা আটকে আছেন তা সহজেই বোঝা যেত। 'তোমরা এমন হয়ে আছো কেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। 'তোমরা কিছু নিয়ে ভাবছো কিন্তু আমাদের তা জানাচ্ছো না।'

তারপর তারা আমাকে বাড়ি থেকে ফোন এবং হুমকির বিষয়টি জানালেন। তারা হুমকির ঘটনাটিকে খুব গুরুতরভাবে নিচ্ছেন। কেন জানি না, আমি লক্ষ্যবস্তু এখন জানার পরও খুব বেশি চিন্তা হয়নি। আমার মনে হল, একদিন তো সকলকেই মরতে হবে। মৃত্যুকে কেউ থামাতে পারে না। মৃত্যু মানে মৃত্যু, সেটা তালেবান মারফত এলো নাকি ক্যান্সার, তাতে কি যায় আসে। আমার যা করার আমি তা করে যাবো।

'আমাদের ক্যাম্পেইন বোধহয় বন্ধ করে দেওয়া উচিত। জানি, কিছু সময়ের জন্য আড়ালে থাকাই ভালো হবে', আব্বা বললেন।

'আমরা কিভাবে তা করতে পারি?' আমি প্রশ্ন তুলি। 'তুমিও তাদের একজন বলেছিলে জীবনের চেয়েও বৃহৎ কিছুতে বিশ্বাস করলে, আমাদের কণ্ঠ স্বর কিছুতেই রুদ্ধ হতে পারে না। এমনকী আমাদের মৃত্যু হলেও। আমরা আমাদের ক্যাম্পেইনকে অপমান কতে পারি না।'

লোকজন আমাকে ডাকছে বিভিন্ন আয়োজনে কথা বলতে। আমি তাদের কি কারণে না করে দেবো, নিরাপত্তাজনিত সমস্যার কথা বলে? আমরা তা করতে পারি না, গর্বিত পশতুন হিসেবে তো আরও পারি না। আমার আব্বা সবসময় বলেন বীরত্ব পশতুনদের মজ্জাগত।

তারপর চিন্তা মনে আমরা সোয়াতে ফিরলাম। আব্বা যখন পুলিশের কাছে গেলেন, তারা আমার সম্পর্কিত একটি নথি প্রদর্শন করলেন। যাতে দেখা যাচ্ছে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে আমার যে প্রোফাইল, আমি যে মনোযোগ আকর্ষণ করেছি এবং তালেবানীদের হত্যার হুমকিপ্রাপ্ত হওয়ায় আমার নিরাপত্তা প্রয়োজন। পুলিশ নিরাপত্তা রক্ষী দিতে চাইলেও আব্বা রাজি হলেন না। কারণ সোয়াতে বহু বিদগ্ধজন রক্ষীদের সামনেই নিহত হয়েছেন, আর পাঞ্জাবের গভর্নর তো নিজ দেহরক্ষীর হাতেই খুন হয়েছেন। আব্বা ভাবলেন, এতে স্কুলের জন্য শিক্ষার্থীদের অভিভাবকেরা চিন্তিত হবেন। তিনি কাউকে ঝুঁকির মুখে ফেলতে চান না। যখন আব্বা জীবন নাশের হুমকি পেয়েছেন তখনও বলেছেন, 'আমাকে খুন করতে দাও কিন্তু আমি একা মরবো।'

www.pathagar.com

আব্বা পরামর্শ করলেন খুশলের মতো আমাকেও অ্যাবাটাবাদের আবাসিক স্কুলে ভর্তি করার, কিন্তু আমি রাজি হইনি। তিনি দেখা করলেন স্থানীয় সেনাবাহিনীর কর্ণেলের সঙ্গে। তিনি জানালেন, অ্যাবাটাবাদে যাওয়া খুব নিরাপদ কোনও সিদ্ধান্ত হবে না তারচেয়ে বরং একটু সামলে থাকলে সোয়াতেই আমি নিরাপদ থাকবো। যখন খায়বার পাখতুনখাওয়ার সরকার আমাকে শান্তি দূত নিয়োগ করতে চাইলো, আব্বা মনে করলেন প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়াই ভালো হবে।

প্রতি রাতে বাড়ির গেটে খিল দেওয়া শুরু করলাম আমি। 'ও বিপদের গন্ধ পাচ্ছে', আম্মা বলতেন আব্বাকে। তিনি খুব অখুশি ছিলেন। রাতে আমার ঘরের পর্দা টেনে রাখতে বলতেন তিনি, আমি রাখতাম না।

'আব্বা, এটা তো খুব অদ্ভুত', আমি বললাম আব্বাকে। 'যখন তালেবানরা ছিলো তখন আমরা নিরাপদ ছিলাম, এখন তালেবানরা নেই তবু আমরা অনিরাপদ।'

'হ্যা মালালা', তিনি উত্তর দিলেন। 'এখন তলেবানি হুমকি শুধু আমাদের জন্য। তোমার আমার মতো যারা কথা বলা অব্যাহত রেখেছে তাদের জন্য। বাকি সোয়াত ঠিক আছে। রিকশাচালক, দোকানি সবাই নিরাপদ। এই তালেবানি দৌরাত্ম্য নির্দিষ্ট মানুষদের জন্য, আমরা তারা।'

এতো এতো পুরস্কার পাওয়ার আরেকটা বাজে বিষয় ঘটল– স্কুলে নিয়মিত অনুপস্থিতি ঘটলো। মার্চের পরীক্ষা শেষে আমার নতুন কেবিনেটে যে কাপটি জায়গা পেল, সেটি দ্বিতীয় স্থান অধিকারীর।

www.pathagar.com

১৯

ব্যক্তিগত ভালেবানিকরণ

'মনে করো এটা একটা টোয়াইলাইট সিনেমা এবং আমরা এই জঙ্গলে ভ্যাম্পায়ার', মনিবাকে বললাম আমি। আমরা স্কুল থেকে মর্গাবাজার ভ্রমণে এসেছি। একটা সুন্দর সবুজ উপত্যকা, যেখানে বাতাস হিম। আমরা যেখানে পিকনিকের পরিকল্পনা করছি সেখানে অনেক উচু পর্বত এবং একটি স্বচ্ছ পানির নদী। কাছেই হোয়াইট প্যালেস হোটেল, যা ব্যবহৃত হতো ওয়ালির গ্রীষ্মকালীন বাসভবন হিসেবে।

২০১২ সালের এপ্রিল মাস, আগের মাসেই পরীক্ষা শেষ হল। এখন সবার অবকাশ। প্রায় সত্তর জন মেয়ের দল আমাদের। সঙ্গে আছেন শিক্ষক এবং অভিভাকরাও। আব্বা তিনটি ফ্লাইং কোচ ভাড়া করলেন, কিন্তু তাতে স্থান সংকুলান হয় না। আমি মনিবা এবং আরও তিনজন মেয়ে 'ডায়না' নামের আমাদের স্কুল ভ্যানে চড়ে রওনা হলাম। বাহনটি মোটেও আরামদায়ক নয়, তার ওপর পিকনিকের পোলাও-মুরগীর অতিকায় পাত্রগুলোও গাড়ির মেঝেতে। তবে মাত্র আধ ঘন্টার পথ। আমরা গান গেয়ে আনন্দ করতে করতেই পৌছে গেলাম। মনিবাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিলো, তার ত্বক স্বচ্ছ আর ধবধবে হয়ে ছিলো। 'কি ক্রিম ব্যবহার করেছো তুমি?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'তুমি যেটা করেছো সেটাই', উত্তর দিলো সে।

আমি জানি কথাটা সত্য নয়। 'না। আমার ত্বক কেমন অন্ধকার হয়ে আছে আর তোমারটা দেখো!'

আমরা হোয়াইট প্যালেস ঘুরলাম এবং রানী কোথায় শুয়ে আছেন দেখলাম। সুন্দর ফুলসমৃদ্ধ বাগানও দেখেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ওয়ালির ঘরটা দেখা গেল না, কারণ সেটা বন্যায় ধ্বসে গেছে।

সবুজ বনে আমরা কিছুক্ষন ছুটে বেড়ালাম, কিছু ছবি তোলা হলো। তারপর নদীতেই হুল্লোড় করে পানি ছিটিয়ে দেওয়ার দুষ্টুমি। রোদ লেগে পানি ফোটা চকচক করছিলো। খাড়ি বেয়ে নেমে আসা একটা ঝর্ণার শব্দ শুনলাম পাথরে বসে খানিক। তারপর আবার মনিবা পানি ছেটানো শুরুকরল।

www.pathagar.com

'পানি দিও না আর। আমি আমার জামাকাপড় ভেজাতে চাই না।' আমি অনুরোধ করলাম। তারপর অন্য দুই মেয়ের সঙ্গে সরে পড়লাম, যাদের মনিবা পছন্দ করে না। তাই ঘটনা 'পরিস্থিতিতে মশলা ছিটিয়ে দেওয়া'র মতো ঝাঝালো হয়ে উঠলো, যা পরবর্তীতে মনিবা ও আমার মধ্যে আরও তর্কের রসদ জোগাবে। এতে আমার একটু মন খারাপ হল, তবে খাড়ির ওপরে উঠে অবশ্য সব ভুলে গেলাম। দুপুরে খাওয়ার প্রস্তুতি শুরুহল। ড্রাইভার উসমান ভাইজান যথারীতি আমাদের খুব হাসালেন। ম্যাডাম মরিয়ম তার পিচ্চি বাচ্চাটার সঙ্গে দুই বছরের ছেলে হান্নাহকেও নিয়ে এসেছেন। এই ছেলেটা দেখতে ছোট্ট পুতুলের মতো, কিন্তু ভয়ানক দুষ্টু।

খাবার নিয়ে রীতিমতো কেলেঙ্কারি ঘটে গেল। খাবার গরম করতে গিয়ে স্কুল সহকারীদের মনে হলো খাবারে টান পড়বে, তখন মেয়েরা গিয়ে ঝরণার পানি এনে ঢেলে দিলো তরকারিতে। 'সবচেয়ে জঘন্য দুপুরের খাবার' বলে আখ্যায়িত হল এই খাওয়া। এতোই পানসে হয়েছিল অবস্থা যে মেয়েরা বলল, 'তরকারির ঝোলে নাকি আকাশ দেখা যাচ্ছিলো।'

প্রত্যেক ভ্রমণের মতো এবারও ফিরে আসার আগ মুহূর্তে পাথরের উপরে দাঁড়িয়ে সবাইকে সারাদিনের অভিজ্ঞতা জানাতে দাঁড় করিয়ে দিলেন আব্বা। এই দফা সবাই খাবার কতোটা বাজে ছিলো তাই নিয়ে বলতে থাকলো। আমার আব্বা অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন এবং একবার কথা সংক্ষিপ্তও করা হলো।

পর দিনের স্কুলের এক কর্মচারী আমাদের নাস্তার জন্য দুধ, রুটি আর ডিম দিয়ে গেল বাড়িতে। নারীদের অন্দরে থাকার নিয়ম, তাই আব্বাকেই দরজা খুলতে যেতে হয়। কর্মীটি জানাল দোকানি তাকে একটি ফটোকপি করা চিঠি দিয়েছে।

চিঠি পড়ে আব্বার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠল। 'হে খোদা, এ যে আমাদের স্কুলের বিরুদ্ধে ভয়ানক অপপ্রচার!' আম্মাকে বললেন আব্বা। তারপর চিঠি পাঠ করলেন।

প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা

খুশল নামের স্কুলটি, যা পরিচালিত হয় একটি এনজিওর মাধ্যমে [ধর্মভীরুমানুষের কাছে এনজিও অত্যন্ত গর্হিত প্রতিষ্ঠান, উস্কানির জন্য এই কথাটি বলা হয়েছে] এবং এই স্কুল অভদ্রতা এবং অশ্লীলতার ঘাটি। মহানবীর হাদিসে বলা হয়েছে, তুমি মন্দ এবং শয়তানকে দেখেও যদি চুপ থাকো, তাহলে তা তোমার ওপরেও ভর করবে। যদি তুমি কিছু করতে অক্ষম হয়ে থাকো, তাহলে অন্যকে জানাও এই সম্পর্কে। যদি তাও না পারো তাহলে ভাবো তোমার মন কতোটা কলুষিত। আমার কোনও ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নেই, আমি শুধু বলছি ইসলাম কি বলে। এই স্কুল অভদ্রতা আর অশ্লীলতার ঘাটি এবং এরা মেয়েদের বিভিন্ন রিসোর্টে পিকনিকে নিয়ে যায়। আপনারা যদি এসব বন্ধ না করেন,

www.pathagar.com

তাহলে রোজ হাশরে আপনাকেও জবাবদিহি করতে হবে। হোয়াইট প্যালেসের হোটেলের ম্যানেজারের কাছে খোঁজ নিন, তিনিই জানাবেন মেয়েরা কি করেছে...

তিনি কাগজের টুকরোটা রাখলেন, 'এখানে কোনও নাম নেই। অজ্ঞাত।'

আমরা স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

'ওরা জানে কেউ ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করতে যাবে না', আব্বা বললেন। 'মানুষ কেবল ধারণা করবে ভয়ানক কিছু ঘটেছে।'

'আমরা জানি কি হয়েছে। মেয়েরা মন্দ কিছুই করেনি', আম্মা আরও জোর দিয়ে বললেন।

আব্বা আমার তুতোভাই খানজিকে পাঠালেন এই চিঠি কতোদূর ছড়িয়েছে তার খোঁজ নিতে। সে খুব খারাপ খবর নিয়ে ফিরল– চিঠি সবখানে ছড়িয়ে গেছে, অধিকাংশ দোকানী এই চিঠি অবেহলা করে ফেলে দেওয়ার পরও। মসজিদের পার্শ্ববর্তী রাস্তায় একই দোষারপ করে পোস্টারিংও করা হয়েছে।

স্কুলে আমার সহপাঠীরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠল। 'স্যার ওরা খুব বাজে কথা বলছে আমাদের স্কুল নিয়ে', ওরা বলল আমার আব্বাকে। 'এখন আমাদের অভিভাবকরা কি বলবেন?'

আব্বা স্কুলের সব মেয়েদের আঙিণায় জড়ো করলেন। 'তোমরা কেন আতঙ্কিত?' তিনি প্রশ্ন করলেন। 'তোমরা ইসলামবিরোধী কাজ করেছো? কোনও পাপ করেছো? না, তোমরা কেবল পানি ছিটিয়েছো আর ছবি তুলেছো। সেহেতু ভয়ের কিছু নেই। এসব মোল্লা ফজলুল্লাহর লোকদের অপপ্রচার। তুচ্ছ করো এদের। ছেলেদের মতো তোমাদেরও অধিকার এই সবুজ, ঝর্ণা এবং নিস্বর্গ উপভোগের।'

আব্বা রীতিমতো সিংহের মতো কথা বলছিলেন। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছিলাম, মনে মনে তিনিও চিন্তিত এবং আতঙ্কিত। মাত্র একজন লোকই তার বোনকে স্কুল থেকে প্রত্যাহার করে নিয়ে গেলেন, কিন্তু আমরা জানতাম এখানেই শেষ নয়। কিছুদিন পর ডেরা ইসমাইল খান থেকে শুরু হওয়া শান্তির পক্ষের মিছিলে অংশ নেওয়া একজনের আসার কথা মিঙ্গোলায় এবং আমরা তাকে স্বাগত জানাতে চাইছিলাম। আমি আমার আব্বা-আম্মার সঙ্গে যখন রওনা হলাম সেই লোকটির উদ্দেশ্যে, পথে আমাদের দেখা হল একজন বেঁটে লোকের সঙ্গে, যিনি চূড়ান্ত তুমুল ক্ষিপ্রতায় একই সময়ে দুটি ফোনে কথা বলছিলেন। তিনি আমাদের পথরোধ করলেন, বললেন, 'এই পথে যাবেন না। 'সামনে একজন আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী আছে!' কিন্তু আমরা সেই লোকটির সঙ্গে দেখা করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম। তাই অন্য পথে আমরা গেলাম, লোকটার গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে দ্রুত সেখান থেকে বাড়ি ফিরে এলাম।

www.pathagar.com

গোটা বসন্ত ও গ্রীষ্মকাল জুড়ে বিভিন্ন বিচিত্র ঘটনা ঘটতেই থাকলো। অচেনা লোকজন প্রায়ই হানা দিতো আমাদের বাড়িতে, জেরা করতো আমার পরিবার সম্পর্কে। আব্বা বললেন, এরা গোয়েন্দা সংস্থার লোক। মিঙ্গোরার মানুষের জন্য নেওয়া সেনা পরিকল্পনা প্রতিরোধ এবং রাত্রিকালীন পাহারার জন্য আমাদের সম্প্রদায়ের লোকদের নিয়ে একটি কমিটি গঠনের উদ্যোগে সোয়াত কওমি পরিষদ এবং আমার আব্বার উদ্যোগে একটি বৈঠকের আয়োজন করা হয় আমাদের স্কুলে, তারপর থেকে গোয়েন্দাদের আনাগোনা বেড়ে গেল। 'সেনাবাহিনীর দাবি এখন শান্তি বিরাজ করছে', আব্বা বললেন। 'সেহেতু পতাকা মিছিল কিংবা রাত্রিকালীন পাহারার কি দরকার আমাদের?'

মিঙ্গোরার শিশুদের জন্য আমাদের স্কুলে একটা ছবি আঁকার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হল। প্রতিযোগিতা স্পন্সর আমার আব্বার একজন বন্ধু, যিনি নারী অধিকার বিষয়ক একটি এনজিও পরিচালনা করেন। প্রতিযোগিতার ছবিগুলোতে লিঙ্গ সমতা কিংবা নারীদের প্রতি বৈষম্যের বিষয়গুলোতে আলোকপাত করা হয়েছিল। সেই সকালে গোয়েন্দা সংস্থার দুজন লোক এলেন আমার আব্বার সঙ্গে দেখা করতে। 'কি চলছে আপনার স্কুলে?' তারা জানতে চাইলো।

'এটা একটা স্কুল', আব্বা জবাব দিলেন। 'এখানে বিতর্ক প্রতিযোগিতা, রান্না কিংবা রচনা প্রতিযোগিতার মতোই একটি ছবি আঁকা প্রতিযোগিতা চলছে।' লোকগুলো আব্বার ওপর ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল এবং আমার আব্বাও রেগে গেলেন। 'সবাই চেনে আমাকে এবং জানে আমি কি করি!' তিনি বললেন। 'আপনারা নিজেদের আসল কাজটি কেন করছেন না? ফজলুল্লাহ এবং অন্য যাদের হাত এই সোয়াতের রক্তে রাঙা তাদের কেন খুঁজে বের করছেন না?'

সে বছর রমযানে করাচি থেকে ওয়াকিল খান নামে আব্বার এক বন্ধু দরিদ্রদের জন্য পোষাক পাঠালেন, তার চাওয়া এগুলো যেন আমরা বিতরণ করি। আমরা একটা বিরাট হল রুমে এই পোষাক বিতরণের আয়োজন করলাম। কিন্তু অনুষ্ঠান শুরুর আগেই গোয়েন্দা কর্মকর্তারা হাজির হলেন এবং জানতে চাইলেন, 'কি করছেন আপনারা? এই পোষাক কোথা কে পাঠিয়েছে?'

জুলাইয়ের ১২ তারিখে চোদ্দ বছরে পা রাখলাম আমি, ইসলাম ধর্ম-মতে এই বয়সে একজন মানুষ প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠে। আমার জন্মদিন হাজির হলো সোয়াতের কন্টিনেন্টাল হোটেলের মালিকের মৃত্যুর সংবাদে। যিনি একটি শান্তি কমিটিরও সদস্য ছিলেন। বাড়ি থেকে মিঙ্গোরা বাজারে নিজের হোটেলে যাওয়ার পথে তালেবানরা অতর্কিতে হামলা চালিয়ে হত্যা করে তাকে।

তারপর আবারও লোকের মনে ভয় জাগে, তালেবানরা ধীরে ধীরে ফিরে আসছে নাকি! ২০০৮-৯ সালের সব ধরণের মানুষই হুমকি-ধামকির শিকার হয়েছেন, কিন্তু এই বার কেবল সে সকল মানুষকে হুমকি দেওয়া হলো যারা কথা বলেছেন জঙ্গিদের বিরুদ্ধে কিংবা সেনাবাহিনীর নাক-উঁচু মানসিকতা নিয়ে।

www.pathagar.com

'তালেবানরা আসলে তেমন কোনও সুসংগঠিত দল নয়, আমরা যা ভেবেছিলাম', আমার আব্বার বন্ধু হেদায়তুল্লাহ এসব প্রসঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে বললেন। 'এটা মূলত এক ধরণের মানসিকতা, যা পুরো পাকিস্তানে বিদ্যমান। কেউ আমেরিকার বিপক্ষে, কেউ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধী, ইংরেজ শাসন বিরোধী কেউই, তালেবানরা এমন মানুষদের বিভ্রান্ত করেছে।'

জিও টিভির একজন প্রতিনিধি মেহবুবের কাছ থেকে একটি উদ্বেগজনক ফোন পেলেন আমার আব্বা, ৩ আগস্ট সন্ধ্যারও কিছু পরে। মেহবুব আব্বার বন্ধু জাহিদ খানের ভাইপো, জাহিদ খান সেই হোটেল মালিক ২০০৯ সালে যার ওপর হামলা চালানো হয়। লোকে বলতো, জাহিদ খান এবং আমার আব্বা নাকি তালেবানদের চক্ষুশূলে পরিণত হয়েছেন এবং তাদের হত্যা করা হতে পারে, কেবল একটি বিষয়ে কেউ নিশ্চিত ছিলো না, কাকে আগে খুন করা হবে। মেহবুব জানালেন, দিন শেষে এশার নামায পড়তে বাড়ির কাছের মসজিদে যাওয়ার সময় গুলি করা হয়েছে তার চাচাকে, মুখের ওপর।

এই খবর শোনার পর নাকি আব্বার পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে গিয়েছিল। 'এটা আমাকে গুলি করার মতোই ব্যাপার', তিনি বললেন। 'আমি নিশ্চিত এর পরে আমার পালা।'

আমরা ভীষণ অনুরোধ করলাম আব্বাকে এই রাতে জাহিদ খানকে দেখতে হাসপাতালে না যাওয়ার জন্য, হয়তো জাহিদ খানের ওপর হামলাকারীরা আব্বার অপেক্ষাতেই আছে। কিন্তু আব্বা বললেন, তিনি কাপুরুষের মতো কাজ করতে পারবেন না। কয়েকজন রাজনৈতিক সহকর্মী তার সঙ্গে যাওয়ার কথা বললেন কিন্তু তাদের তৈরি হওয়ার অপেক্ষাতে আরও দেরি হয়ে যেতে পারে। তাই আব্বা আমার তুতোভাইকে ডেকে পাঠালেন, তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আম্মা বসলেন প্রার্থনায়।

যখন তিনি হাসপাতালে পৌঁছলেন, তখন পরিষদের একজন মাত্র সদস্য উপস্থিত ছিলেন হাসপাতালে। জাহিদ খানের প্রচুর রক্তপাত ঘটছিলো, এমনকী তার সাদা দাড়ি পর্যন্ত লাল হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু তিনি ভাগ্যবান। খুব কাছে থেকে একজন আততায়ী পরপর তিনবার গুলি করে তাকে, কিন্তু শুরুতেই আততায়ীর হাত চেপে ধরেন জাহিদ খান, যে কারণে একটি মাত্র গুলিই বিদ্ধ হয়। আশ্চর্য্যজনকভাবে গুলিটা গলায় লেগে নাক দিয়ে বেরিয়ে আসে। পরে তিনি বলেছেন, একজন বেটেখাটো দাড়িমোছ কামানো হাসিমুখের লোকের কথা মনে করতে পারেন, যার মুখে কোনও মুখোশও ছিলো না। তারপর চারিদিক থেকে অন্ধকার গ্রাস করল তাকে। তিনি কোনও কালো গহ্বরে পতিত হলেন। মজার ব্যাপার, সম্প্রতি আবারও হেঁটে মসজিদে যাওয়া শুরু করেছেন জাহিদ খান কারণ তিনি মনে করেন এখন কোনও বিপদের সম্ভাবনা নেই

বন্ধুর জন্য প্রার্থনা করে, আমার আব্বা কথা বললেন মিডিয়ার সঙ্গে। 'আমরা বুঝতে পারছি না কেন তার ওপর আক্রমণ হলো যখন সেনাবাহিনীর দাবি শান্তি

বিরাজ করছে', তিনি বললেন। 'এটা সেনাবাহিনী এবং প্রশাসনের জন্য বিরাট প্রশ্ন।'

লোকজন আমাকে আব্বাকে হাসপাতাল থেকে সরে পড়তে সতর্ক করলেন। 'জিয়াউদ্দিন, এখন মধ্যরাত এবং তুমি এখানে। বোকামি কোরো না!' তারা বলল, 'তুমিও জাহিদের মতোই লক্ষ্যবস্তু। নতুন করে ঝুঁকি নিতে যেও না!'

অস্ত্রোপচারের জন্য শেষ পর্যন্ত পেশোয়ারে পাঠানো হল জাহিদ খানকে এবং আব্বা বাড়ি ফিরলেন। আমি চিন্তায় ঘুমাতে পারিনি। তারপর থেকে প্রতিরাতে আমি একাধিকবার তালাগুলো পরখ করে দেখতাম।

আমাদের বাড়ির ফোনের রিং যেন আর থামছিলো না, আমার আব্বা যেহেতু পরবর্তী লক্ষ্যবস্তু হতে পারেন, তাই সকলে তাকে সতর্ক করছিলো। হেদায়েতুল্লাহ ছিলেন প্রথম সতর্ককারী। 'আল্লাহর দোহাই সাবধানে থেকো', তিনি সাবধান করেছিলেন। 'এরপর হয়তো তুমি। ওরা পরিষদের সদস্যদের একে একে গুলি করছে। তুমি মুখপাত্র– তারা কি তোমাকে বেঁচে থাকতে দেবে?'

আব্বা শেষ পর্যন্ত মেনে নিলেন তালেবানরা তাকে খুঁজে বের করবে এবং খুন করবে। তবু তিনি পুলিশের নিরাপত্তা নিতে রাজি হলেন না। 'যদি তুমি অনেক নিরাপত্তা বেস্টিত হয়ে কোথাও যাও, তালেবানরা তাহলে কালাসনিকোভস রাইফেল বা আত্মঘাতী বোমা হামলা চালাবে, তাতে আরও বেশি প্রাণহানি ঘটতে পারে', আব্বা বলেছিলেন। 'অন্তত আমি খুন হতে চাই।' তিনি সোয়াত ছেড়ে যেতেও রাজি হলেন না। 'আমি কোথায় যাবো?' আব্বা জিজ্ঞেস করলেন আম্মাকে। 'আমি এই এলাকার বাইরে বাঁচতে পারবো না। আমি আন্তর্জাতিক শান্তি পরিষদের সভাপতি, গুরুজন পরিষদের মুখপাত্র, আমি সোয়াত অ্যাসোসিয়েশন অব প্রাইভেট স্কুলসের সভাপতি, আমার স্কুলে পরিচালক এবং আমার পরিবারের মাথা।'

তিনি একমাত্র যে সতর্কতা অবলম্বন করলেন, তা হল নিজের দৈনন্দিন রুটিন পাল্টে ফেললেন। কোনও দিন তিনি প্রথমে প্রাথমিক স্কুলে যেতেন, আরেক দিন হয়তো প্রথমেই মেয়েদের স্কুলে, তারপরের দিনে ছেলেদের স্কুল থেকেই হয়তো তার কাজকর্ম শুরু হতো। আমি তাকে বললাম, যেখানেই যাও রাস্তার ওপর নিচে চার-পাঁচবার দেখে নিতে।

এতো সব ঝুঁকির পরও, আব্বা এবং তার বন্ধুরা তাদের কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখলেন, প্রতিবাদ ও সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করতে থাকলেন। 'যদি শান্তি ই থাকে তাহলে জাহিদ খান এতো আক্রান্ত হলেন? কে তাকে আক্রমণ করেছে?' তারা প্রশ্ন তুললেন। 'উদ্বাস্তু অবস্থা কাটিয়ে ফিরে আসার পর এখন পর্যন্ত সেনাবাহিনী বা পুলিশের ওপর তো কোনও হামলা দেখিনি আমরা। এখন হামলার একমাত্র লক্ষ্য শান্তিকামী এবং বেসামরিক লোকেরা।'

www.pathagar.com

স্থানীয় সেনাবাহিনী কমান্ডার মোটেও সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। 'আমি আপনাদের বলেছি মিঙ্গোরায় কোনও সন্ত্রাসবাদী নেই,' তিনি জোর দিয়ে বললেন। 'আমাদের প্রতিবেদন তাই বলছে।' তিনি দাবি করেন, সম্পত্তি নিয়ে বিরোধের জের ধরেই নাকি জাহিদ খানকে গুলি করা হয়েছে।

বারো দিন হাসপাতালে কাটিয়ে বাড়ি ফিরে আরও মাসখানেক অপেক্ষা করতে হয়েছে তাকে সুস্থ হওয়ার জন্য। নাক ঠিক করতে নিতে হয়েছে প্লাস্টিক সার্জারির সাহায্য। তারপরও তিনি চুপ হয়ে থাকলেন না। কিছু ঘটলেই আরও বেশি চাঁছাছোলা মন্তব্য করতে লাগলেন, বিশেষ করে গোয়েন্দা সংস্থার বিরুদ্ধে, তিনি উপলব্ধি করলেন এরাই আসলে তালেবানদের মদদ দিয়ে থাকে। তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় মন্তব্য লিখলেন। তিনি দাবি করেন, সোয়াতের সংঘর্ষ ছিলো লোকদেখানো, বানোয়াট। 'আমি জানি কে আমাকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছিল। কিন্তু এই জঙ্গিদের লেলিয়ে দিয়েছে আমাদের পেছনে, কে সেটা আমাদের জানতে হবে', তিনি লিখেছিলেন। তিনি প্রধান বিচারকের প্রতি আহ্বান জানালেন কারা তালেবানদের এনেছিলো আমাদের উপত্যকায় তা আবিষ্কারের জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্তের বন্দোবস্ত করতে।

আমরা সেই আততায়ীর একটি ছবি আঁকলাম এবং বললাম আরও কেউ আক্রান্ত হওয়ার আগেই একে থামাতে হবে। কিন্তু পুলিশ এই আততায়ীকে খোঁজার কোনও উদ্যোগই নেয়নি।

হুমকি আসার পর আম্মা চাইতে না আমি পথেঘাটে একা চলাফেরা করি। রিকশা করে স্কুলে যাওয়া এবং বাসে করে বাড়ি ফেরা শুরু করলাম আমি, যদিও মাত্র পাঁচ মিনিট হাঁটা পথের দূরত্ব। বাস আমাকে নামিয়ে দিতো সেই পথের মাথায়, যে পথ গেছে আমাদের বাড়ি অভিমুখে। পাশের এলাকার কিছু ছেলে সেখানে নিয়মিত আড্ডা দিতো। কখনও সেই দলে থাকতো হারুন নামের একটা ছেলে। সে আমার চেয়ে এক বছরের বড়ো এবং আমাদের এলাকাতেই বাস করতো। ছোটবেলা আমরা একসঙ্গে খেলাধুলাও করেছি এবং হারুন বলেছিলো সে আমাকে ভালোবাসে। কিন্তু আমাদের প্রতিবেশি সাফিনার বাড়িতে যখন ওর এক সুন্দরী তুতোবোন বেড়াতে এলো, হারুন তার প্রেমে পড়ে গেল। যখন সেই তুতোবোন জানালো সে হারুনকে পছন্দ করে না, হারুন বেচারা আবার আমার পিছু নিল। তারপর এক সময় ওরা বাড়ি বদল করে চলে গেল অন্য এলাকায় এবং আমরা ওদের বাড়িতে উঠলাম। হারুন সেনাবাহিনীর ক্যাডেট কলেজে ভর্তি হয়ে চলে গেল।

কিন্তু ছুটির দিনগুলোতে ফিরে আসতো সে। একদিন আমি যখন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছি সে তখন রাস্তায় আড্ডা দিচ্ছিলো। আমাকে দেখে সে পিছু নিল। বাড়ি পর্যন্ত এসে আমাদের গেটের ভেতরে এমন জায়গায় একটা চিরকূট ফেলে

www.pathagar.com

গেল সে, যেন নজরে পড়ে আমার। আমি একটা ছোট্ট মেয়েকে বললাম সেটা কুড়িয়ে আনতে। হারুন তাতে লিখেছে, 'এখন তুমি অনেক বিখ্যাত, তবুও আমি তোমাকে ভালোবাসি এবং জানি তুমিও আমাকে ভালোবাসো। এটা আমার নম্বর, ফোন কোরো।'

আমি এই চিরকূট পৌঁছে দিলাম আমার আব্বার হাতে এবং তিনি প্রচন্ড রেগে গেলেন। তিনি হারুনকে ডেকে আনলেন এবং বললেন এই বিষয়টি তিনি ওর আব্বাকে জানিয়ে দেবেন। সেই শেষবার আমি হারুনকে দেখেছি। তারপর আমাদের এলাকায় ছেলেদের আনাগোনা বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু অটলের খেলার সঙ্গী একটা পুচকে ছেলে, আমাকে দেখলেই ইঙ্গিতপূর্ণভাবে বলে উঠতো, 'হারুন কেমন আছে?' আমি একদিন প্রচণ্ড বিরক্ত হয়ে উঠলাম এবং অটলকে বললাম ছেলেটাকে টেনে ভেতরে নিয়ে আসার জন্য। আমি এতোই রাগান্বিত হয়ে ধমকালাম ছেলেটাকে, পরে সে এই কাজ করেনি আর।

আমি মনিবাকে জানালাম এইসব ঘটনা, আবার আমাদের বন্ধুত্ব জমে উঠেছিলো। মনিবা ছেলেদের সঙ্গে কথা বলার বিষয়েও খুব সতর্ক থাকে, কারণ তার ভাই তাকে নজরে রাখে সবসময়। 'কখনও কখনও মনে হয় সোয়াতের মেয়ে হওয়ার চেয়ে টোয়াইলাইটের ভ্যাম্পায়ার হওয়া অনেক ভালো', আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। কিন্তু সত্যি কোনও ছেলের সঙ্গে বিবাদে জড়ানো মানে নিজের বিরাট সমস্যা।

www.pathagar.com

২০

মালালা কে?

গ্রীষ্মের শেষ দিকের এক সকালে আব্বা স্কুলে যাবার জন্য প্রস্তুত হবার সময় আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা পেইন্টিংটা যেখানে ছিল সেখানে না থাকায় সেদিকে আব্বার নজর পড়লো। করাচির স্কুল থেকে ওটা আমাদের দেওয়া হয়েছিল। ওটা যেখানে ঝুলানো ছিল সেখান থেকে রাতে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। তিনি ওই পেইন্টিংটা পছন্দ করতেন তাই ওটা তাঁর বিছানার উপরে টানানো ছিল। ওটা বাঁকানো অবস্থায় থাকায় তিনি বিরক্ত হন। পেইন্টিংটা ওই অবস্থায় থাকায় তিনি আমার আম্মাকে অস্বাভাবিক কড়া সুরে বলেছিলেন, 'দয়া করে এটা সোজা করে রেখ।'

ওই সপ্তাহে আমাদের অঙ্কের শিক্ষিকা মিস শাজিয়া আমাদের বাড়িতে মূর্চ্ছারোগগ্রস্ত অবস্থায় এলেন। তিনি আমার বাবাকে বললেন যে, তিনি রাতে দুঃস্বপ্ন দেখেছেন যে আমি মারাত্মকভাবে পোড়া পা নিয়ে বাড়ি এসেছি। তিনি আমাকে রক্ষা করার চেষ্টা করছেন। দুস্থলোকদের ভাত খেতে দেবার জন্য তিনি আমার আব্বার কাছে মিনতি জানালেন। আমাদের বিশ্বাস ছিল যে দুটো ভাত মেঝেতে পড়লে তা যদি পিঁপড়া ও পাখিতেও খায় তবে তারা আমাদের জন্য দোয়া করে। ভাতের পরিবর্তে টাকা দিতে চাইলে আমাদের অঙ্কের শিক্ষকা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে বললেন ভাত খেতে দেওয়া আর টাকা দেওয়া এক নয়।

আমরা মিস শাজিয়ার পূর্বাভাসকে হেসে উড়িয়ে দিলাম। কিন্তু আমিও রাতে খারাপ স্বপ্ন দেখলাম। আমি আমার খারাপ স্বপ্ন সম্বন্ধে কাউকে কিছু না বললেও কিন্তু আমি যখন বাইরে বের হলাম তখন আমি ভয় পেলাম এ ভেবে যে তালেবান আমাকে গুলি করতে কিংবা আমার মুখে এসিড ছুড়তে পারে। কারণ তারা আফগানিস্তানের মহিলাদের ওপর এমনটা করে থাকে। আমি আমাদের রাস্তায় বের হতে ভয় পেলাম। মাঝে মধ্যে আমার মনে হতো আমি যেন আমার পেছনে কারো পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। কাল্পনিক একটা আকৃতি যেন ছায়ায় মিলিয়ে গেল।

আমার আব্বার মত আমিও সাবধানতা অবলম্বন করলাম। রাতে আমি সবাই ঘুমিয়ে পড়া পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকতাম-আমার বাবা, মা, ভাই, আমাদের বাড়ির অন্যান্যরা এমনকি গ্রাম থেকে আসা অতিথিরা- তারপর আমি সব কয়টা জানালা

www.pathagar.com

দরজা বন্ধ করা হয়েছে কিনা ভালোভাবে পরীক্ষানিরীক্ষা করতাম। আমি বাইরে গিয়ে বাড়ির প্রধান ফটকে তালাচাবি দেওয়া হয়েছে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হতাম। তারপর এক এক করে রুমগুলো চেক করতাম। আমার রুমটির সামনের দিকের রুমে অনেকগুলো জানালা। আমি পর্দা খুলে রাখতাম যাতে আমি বাইরের সব কিছু দেখতে পারি। আমার আব্বা এসব করতে নিষেধ করতেন। আমি আব্বা কে বলতাম,'তারা যদি আমাকে মেরে ফেলতে চাইতো তবে ২০০৯ সালেই তা করতো। আমার কিন্তু ভয় ছিল কেউ আমাদের ঘরের সাথে মই লাগিয়ে দেওয়ালে ওপর উঠে জানালা ভেঙে ফেলতে পারে।

তারপর আমি নামাজ পড়তাম। রাতে আমি অনেকবার নামাজ পড়তাম। তালেবান মনে করতো আমরা মুসলমান না, আমরা কিন্তু খাঁটি মুসলমান। তাদের চেয়েও আমরা আল্লাহকে বেশি বিশ্বাস করতাম। আমাদের বিশ্বাস ছিল যে তিনি আমাদের রক্ষা করবেন। আমি কোরআনের দ্বিতীয় সূরার অংশ *আয়াতুল-কুরসি* পড়তাম। এটি বিশেষ আয়াত যাকে আমরা বিশ্বাস করতাম। যদি আপনার বাড়িতে রাতে তিনবার এ আয়াত তেলাওয়াত করা হয় তবে আপনার বাড়ি শয়তানের হাত থেকে নিরাপদ থাকবে। যদি আপনি পাঁচবার এ আয়াত তেলাওয়াত করেন তবে আপনার রাস্তা নিরাপদ থাকবে, সাতবার তেলাওয়াত করলে আপনার পুরো এলাকা সুরক্ষিত থাকবে। তাই আমি সাত বার অথবা তারো অধিকবার এ আয়াত তেলাওয়াত করতাম। তারপর আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করতাম,' 'আমাদের উপর তুমি দোয়া বর্ষণ করো। প্রথমে আমাদের আব্বা এবং পরিবারের, তারপর আমাদের রাস্তা তারপর আমাদের পুরো মহল্লার, তারপর সোয়াতের সব এলাকার লোকজনের ওপর তুমি রহম করো।"

তারপর আমি দোয়া করতাম, 'শুধুই মুসলিমদের জন্য নয়, সমস্ত মানবজাতির জন্য।'

পরীক্ষার সময় আমি বেশি বেশি নামাজ পড়ি। আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজই পড়তাম। আমার মা আমাকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার জন্য সব সময়ই বলতেন। পরীক্ষার সময় ভালো নম্বর পাবার জন্য বেশি বেশি আল্লাহর ইবাদত করতাম। যদিও আমাদের শিক্ষকরা বলতেন,'আল্লাহ তোমাকে নম্বর দিবেন না যদি তুমি বেশি বেশি পড়াশোনা না করো। তুমি কঠিন পরিশ্রম করলে আল্লাহ তোমার উপর অবশ্যই দোয়া বর্ষণ করবেন।'

তাই আমি কঠিন পরিশ্রম করে পড়াশোনা করতাম। সচরাচর আমি পরীক্ষার ভালো ফলাফল করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিতে চাইতাম। ২০১২ সালের অক্টোবর মাসে আমি চাপের মুখে ছিলাম। মার্চের মত আমি মালকা-নূরের চেয়ে কম নম্বর পেয়ে দ্বিতীয় হতে চেয়েছিলাম না। সে আমাকে দু'এক নম্বরে পিছনে ফেলে রাখে নি। আমাদের নম্বরের পার্থক্য ছিল পাঁচ নম্বরের। আমি

www.pathagar.com

বয়েজ' স্কুলের আমজাদ স্যারের কাছে প্রাইভেট পড়তাম। সেবারের পরীক্ষা শুরুর আগের রাতে আমি তিনটা পর্যন্ত পড়লাম। সকালে পুরো টেক্সটবুক পুনরায় পড়লাম।

৮ অক্টোবরের সোমবারে ফিজিক্সের প্রথম পত্র পরীক্ষা ছিল। ফিজিক্স আমার ভালো লাগতো। এ বিষয়টি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সূত্র ও মূলনীতির দ্বারা এ বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত- বিশেষ করে আমাদের দেশের রাজনীতির মত কদর্য ছিল না। পরীক্ষা শুরুর আগে আমি মনে মনে কোরআনের আয়াত আবৃত্তি করলাম। আমি লেখা শেষ করলাম। কিন্তু আমি পরে জানতে পারলাম শূন্যস্থান পূরণ করতে একটা ভুল করেছি। এতে আমি প্রায় কেঁদেই ফেললাম। মাত্র একটা নম্বর, আমার মনে হলো একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে গেছে।

আমি বাড়ি যাবার পর বিকেলের দিকে আমার চোখে ঘুম ঘুম ভাব দেখা দিল। পরদিন পাকিস্তান স্টাডিজ পরীক্ষা। আমার কাছে এটা একটা কঠিন সাবজেক্ট। আমার চোখ থেকে ঘুম তাড়ানোর জন্য কফি পান করলাম।

পরদিন সকালে আমার আম্মা-আব্বা আমার রুমে এসে আমাকে জাগিয়ে তুললেন। আমার স্কুলের দিনগুলোতে এমন একটা দিনের কথাও মনে পড়ে না এভাবে তারা আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলেছেন। আমার আম্মা আমাদের জন্য সকালের নাস্তায় সচরাচর চা, চাপাতি ও ডিম ভাজার ব্যবস্থা করতেন। আম্মা, আব্বা, খুশাল ও আতাল মিলে আমরা সবাই এক সঙ্গে সকালের নাস্তা খেতাম। আমার আম্মা আমার কিন্ডারগার্টেনের পুরনো শিক্ষিকা মিস উলফাতের কাছে বিকালে লেখা পড়া শুরু করেন।

আমার আব্বা আট বছরের অটলকে ঠাট্টা করে বলতেন, 'দেখ অটল, মালালা প্রধানমন্ত্রী হলে তুমি তার সেক্রেটারি হবে।'

'না, না না!' আব্বার কথা শুনে অটল বলতো, 'আমি মালালার চেয়ে কম কিসে। আমিই প্রধানমন্ত্রী হবো, আর সে আমার সেক্রেটারি হবে।'

যেমনটা ভেবেছিলাম তার চেয়ে পাকিস্তান স্টাডিসের পরীক্ষায় আমি ভালো করলাম। প্রশ্নগুলো ছিল এমন- কেমন করে জিন্নাহ্ প্রথম মুসলিমদের স্বদেশভূমি হিসাবে আমাদের দেশ সৃষ্টি করেন আর কেমন করে জাতীয় বিপর্যয় হিসাবে বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এটা ভাবলেও অবাক হতে হয় এক সময় হাজার মাইল দূরের বাংলাদেশ পাকিস্তানের অংশ ছিল। আমি সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ভাবলাম আমি এ বিষয়ে ভালো করেছি। পরীক্ষার পর আমি আমার বান্ধবীদের সাথে খোশগল্প করছিলাম। বাস এসে পৌঁছিলে স্কুলের সহকারী মোহাম্মদ বাবা আমাদের বাসে উঠবার জন্য ডাকবেন, তাই তার জন্য আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম।

বাস প্রতিদিন দু'বার দুটো ট্রিপ দেয়। এটা ছিল বাসের দ্বিতীয় ট্রিপ। আমরা স্কুলে অপেক্ষা করতে পছন্দ করলাম। মনিবা বললো,'পরীক্ষার পর ক্লান্ত হয়ে

www.pathagar.com

পড়েছি বাড়ি যাবার আগে এসো আমরা এখানে বসে গল্প করি।' পাকিস্তান স্টাডিস পরীক্ষা ভালো হওয়ায় আমি তার কথায় রাজি হলাম। ওই দিন আমার আর কোনো ভয়ভীতি ছিল না। আমার খিদে পেল। আমার বয়স পনেরো তাই বাইরে গিয়ে খাবার কিনে আনার উপায় নেই। আমি কয়েকটা ছোট্ট মেয়েকে বাইরে খাবার কিনতে পাঠালাম। খাবার এনে দিলে আমি তা থেকে একটু খেয়ে তা অন্যদেরকে দিলাম।

বারটার দিকে মোহাম্মদ বাবা লাউডস্পিকারে আমাদের ডাকলেন। আমরা সবাই দৌড়ে বাসে উঠলাম। মেয়েরা দরজার ওখান থেকেই মুখ ঢেকে বাসের পিছনের সিটে গিয়ে বসে পড়লো।

দু'জন শিক্ষকের আসার অপেক্ষায় থাকাকালে আমি ওসমান ভাইকে হাসি কৌতুকের গল্প বলতে বললাম। তিনি মজার মজার গল্প জানতেন। সেদিন তিনি গল্প না বলে একটা নুড়ি পাথর অদৃশ্য হবার ম্যাজিক দেখালো। তার ম্যাজিক দেখে আমরা সবাই অবাক হলাম। "আপনি এটা কেমন ভাবে করলেন, তা আমাদের শিখিয়ে দিন।' আমরা সবাই মিলে তাকে বললাম। কিন্তু তিনি তা আমাদের শিখাতে রাজি হলেন না।

যখন সবাই তার কাছ থেকে ম্যাজিক কৌশল জানতে চাচ্ছিল তখন তিনি মিস্ রুবি এবং দুটো ছেলে মেয়েকে বাড়ির সামনে থেকে উঠিয়ে সামনের সিটে বসলেন। আর একটা ছোট মেয়ে চিৎকার করে বলে উঠল আমিও ওখানে বসব। ওসমান অইজান বললেন সামনে জায়গা নেই। ছোট মেয়েটি আমাদের সাথে পিছনে বসে থাকল। তার জন্য আমার মায়া হলো।

অটল আমার সাথে বাসে চড়তে চেয়েছিল। সে হেঁটে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায়। আমি আমার বুদ্ধিমতি ও সুন্দরী বান্ধবী মনিবার সাথে কথা বলছিলাম, আর আমি আঙ্গুল দিয়ে বাসের সিটে তাল ঠুকছিলাম। মনিবা এবং আমি পিছনের সিটে বসতে পছন্দ করতাম যাতে বাইরের সবকিছু দেখা যায়। একসময় হাজী বাবা রোডে রিকশা, পায়ে হাঁটা লোকজন এবং স্কুটার চড়া লোকে ভরা থাকত। একজন আইসক্রিম বিক্রেতা ছেলে একটা লাল রংয়ের ট্রাইসাইকেলে আমাদের পেছন পেছন আসছিল। একটা লোক মুরগির মাথা কেটে ফেলায় রাস্তার উপরে ফোটা ফোটা রক্ত পড়ছিল। আমি আমার আঙ্গুলগুলো দিয়ে তাল ঠুকছিলাম। চপ, চপ, চপ। ড্রিপ, ড্রিপ। মজার ব্যাপার আমরা ছিলাম সোয়াতি। তাই আমরা শান্তি প্রিয়। একটা মুরগি জবাই করা দেখেও আমাদের কষ্ট লাগে।

ডিজেল পাউরুটি ও কাবাবের গন্ধ একাকার হয়ে বাতাসে ভাসছে। শীতকাল আসছে, বরফ পড়া শুরু হলে রাস্তায় আবর্জনাগুলো বরফে ঢেকে যাবে। বাস ডানদিকে মোড় নিয়ে একটা আর্মি চেক পয়েন্টের দিকে পৌছাল। ওপরের দিকে

www.pathagar.com

একটা পোষ্টার দেখা যাচ্ছিল। পোষ্টারে মুখে দাড়ি, মাথায় পাগড়ি বাধা একটা রাগী চোখওয়ালা লোক। বড় বড় অক্ষরে লেখা সন্ত্রাসী পাকড়াও করতে চাই। এ ছবির উপরের দিকের কালো পাগড়ি ও দাড়িওয়ালা লোকটাই ছিল ফজলুল্লাহ। সোয়াত থেকে তালেবান তাড়ানোর জন্য মিলিটারি অপারেশন চলেছিল তিন বছরের বেশি সময় ধরে। আমরা আর্মিদের প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমরা বুঝতে পারিনা কেন এখনও সর্বত্র মেশিনগান নিয়ে চেক পয়েন্টের ছাদে মিলিটারিরা অবস্থান নিয়ে থাকে। এমনকি আমাদের উপত্যকায় কোনো লোককে ঢুকতে হলে সরকারি অনুমোদন লাগে। ছোট পাহাড়টা পর্যন্ত রাস্তা সবসময় ব্যস্ত থাকে। এটা সর্টকাট পথ। কিন্তু অবাক কান্ড আজ অদ্ভুত ভাবে জায়গাটা শান্ত। মনিবা জিজ্ঞেস করল এখানকার লোকজন কোথায় গেছে?' বাসের সব মেয়েরাই গান গাইছিল আর একে অপরের সাথে গল্প করছিল। আমাদের কতাবার্তা বাসের ভিতর থেকে বাইরে ছড়িয়ে পড়ছিল।

এক সময় আমার আম্মা সম্ভবত আমাদের স্কুলের দুয়ারে পা দিয়েছিলেন। তিনি ছয় বছর বয়সে স্কুল ছাড়েন।

দু'জন তরুণ বয়সের লোক রাস্তা ধরে হেঁটে এসে এর মধ্যে বাস থামিয়েছে তা আমি লক্ষ্য করি নি। বাস থামা মাত্র তারা বাসে উঠে জিজ্ঞেস করল 'মালালা কে?' আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে পারতাম কেন তারা আমাদের মত মেয়েদেরকে এবং তাদের বোন ও কন্যাদের স্কুলে পাঠানো উচিত নয় ভাবছে।

শেষ জিনিসটা আমার মনে আছে যে, পরের দিনের পরীক্ষার বিষয়টা রিভিশন দেবার কথা আমি সে সময় ভাবছিলাম। আমার মাথায় তিনটি বুলেট ক্র্যাক ক্র্যাক ক্র্যাক শব্দ না করে যেন লোকটার মুরগির মাথা কাটার শব্দ এবং ফোটা ফোটা রক্ত অপরিচ্ছন্ন রাস্তায় পড়ার কথা মনে পড়ে চপ, চপ, চপ ড্রিপ, ড্রিপ ড্রিপ শব্দই কানে আসছে।

www.pathagar.com

অধ্যায় চার

জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে

ښېرې به ولې درته نه کړم   توره ټوپکه وران دې کړې ودان کورونه

খাইরে বা ওয়ালি দারতা না ক্রাম
তুরা তোপাকা ওরানাওয়ে ওয়াদান কোরোনা।

তমস আঁধারে বন্দুক ! কেন আমি তোমাকে অভিশাপ দেব না।
তুমি ভালোবাসায় অভিসিক্ত আবাসকে আবর্জনার স্তূপে পরিণত করেছো।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

২১

'আল্লাহ, আমি ওকে তোমার হাতে সঁপে দিলাম'

কি ঘটেছে বুঝতে পেরে ওসমান ভাইজান তাৎক্ষণিকভাবে ডান দিকে মোড় নিয়ে দ্রুতবেগে গাড়ি চালিয়ে সোয়াত সেন্ট্রাল হসপিটালে গিয়ে পৌছলো।

অন্যান্য মেয়েরা চিৎকার করে কান্নাকাটি করছিল। আমি মনিবার কোলে শুয়ে পড়লাম। আমার মাথা ও বা'কান দিয়ে রক্ত ঝরছিল। আমাদের গাড়ি সামান্য একটু পথ গেলে একজন পুলিশ গাড়ি থামিয়ে জিজ্ঞাসা করে মূল্যবান সময় নষ্ট করলো। একটা মেয়ে আমার পাল্‌স পরীক্ষা করে বললো,"বেঁচে আছে!' সে চিৎকার করে বললো, 'আমরা ওকে নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছাতে পারবো। আমাদের সাথে নেমে আয়, যে গুলি করেছে তাকে পাকড়াও করি!'

আমাদের কাছে মিঙ্গোরা একটা বড় শহর বলে মনে হলেও আসলে এটা একটা ছোট জায়গা। মুহূর্তের মধ্যে এ খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। আমার আব্বা সোয়াত প্রেস ক্লাবে প্রাইভেট স্কুলের অ্যাসোশিয়েশনের মিটিংয়ে ছিলেন। তিনি স্টেজে উঠে সবেমাত্র তার ভাষণ শুরু করেছেন এমন সময় তার মোবাইল ফোন বেজে উঠলো। তিনি খুশাল স্কুলের ফোনের নম্বর চিনতেন। জবাব দেবার জন্য তিনি নিজের ফোনটা তার বন্ধু আহমাদ শাহ এর কাছে এগিয়ে দিলেন। 'তোমাদের স্কুল বাসে গুলি করেছে', সে ফিসফিস করে আমার আব্বাকে বললেন।

কথাটা শুনে আমার আব্বার মুখটা শুকিয়ে গেল। তিনি তাৎক্ষণিক ভাবে ভাবলেন, *ওই বাসে তো মালালা থাকতে পারে!*

তারপর তিনি নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করে ভাবলেন একজন ঈর্ষান্বিত প্রেমিক লাজলজ্জার মাথা খেয়ে তার ভালোবাসা জানানোর জন্য তার পিস্তল থেকে গুলি ছুড়তে পারে। এটা কোনো ছেলেছোকড়ার কাজ হতে পারে। সারা সোয়াত থেকে আসা ৪০০ জন প্রিন্সিপালের সমাবেশে আমার আব্বা উপস্থিত হয়ে সরকারের সেন্ট্রাল রেগুলেটরি অথরিটি কর্তৃক বলবত করতে যাওয়া পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাদের অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট হিসাবে আব্বা তাঁর বক্তৃতা শেষ না করে এতগুলো লোককে রেখে চলে যেতে পারেন না।

www.pathagar.com

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বক্তৃতা শেষ করে আমার আব্বা আহমাদ শাহকে সাথে নিয়ে তার আর এক বন্ধু রিয়াজের গাড়ীতে উঠে বসেন। হাসপাতাল মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ। তারা সেখানে পৌঁছে দেখলেন হাসপাতালের বাইরে বিপুল সংখ্যক লোকের জমায়েত। তাদের মধ্যে ফটোগ্রাফার ও টিভি ক্যামেরাম্যানও রয়েছে। তিনি নিশ্চিতভাবে জানতে পারলেন যে, আমি সেখানে আছি। তিনি লোকজনদের ভীর ঠেলে ক্যামেরার ফ্লাশের মাঝ দিয়ে হাসপাতালের ভিতরে ঢুকলেন। ভিতরে আমি একটা ট্রলিতে শুয়েছিলাম। আমার মাথায় একটা ব্যান্ডেজ বাঁধা। আমার চোখ বোজা, চুলগুলো এলোমেলো।

'মাই ডটার, মাই ব্রেভ ডটার, মাই বিউটিফুল ডটার।' তিনি বারবার এ কথা বলে আমার কপাল, চিবুক ও নাকে চুমু দিতে থাকলেন। তিনি জানতেন না কেন তিনি তার কথাগুলো ইংরেজিতে বলছিলেন। তখনও আমার চোখ দুটো বন্ধ । আমার আব্বা আমাকে পরে বলেছিলেন,'আমি সে সময়কার কথা বর্ণনা করতে পারবো না। আমি অনুভব করলাম সে আমার জবাব দেবে।' কে যেন বললো আমি হাসছিলাম। কিন্তু আমার আব্বার মুখে হাসি ছিল না। পরে আমি জানতে পারলাম তিনি ভেবেছিলেন যে আমাকে চিরতরে হারাবেন না। এভাবে আমাকে দেখে ভাবলেন একটা খারাপ কিছু তার জন্য অপেক্ষা করছে। সব ছেলেমেয়েই তাদের পিতামাতার কাছে আদরণীয়। কিন্তু আমার আব্বার কাছে আমি ছিলাম তার জগত সমগ্র। আমি ছিলাম তার সাথী, প্রথমে একান্ত গুল মাকাই, আর প্রকাশ্যভাবে মালালা। তিনি সব সময়ই বিশ্বাস করতেন যে, তালেবান যদি কখনো আসে তবে তার খোঁজেই আসবে, আমার জন্য নয়। আব্বা বলতেন তিনি অনুভব করেন তিনি যেন বজ্রের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। 'তারা একটা ঢিলে দু'পাখি হত্যা করতে চেয়েছিল। মালালাকে হত্যা করে আমাকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে চায়।'

আব্বা খুবই ভীত হলেও তিনি কিন্তু কাঁদছিলেন না। হাসপাতালের সব জায়গা লোকে লোকারণ্য। মিটিং এ উপস্থিত প্রিন্সিপালরা আমাকে দেখতে হাসপাতালে এলেন। আব্বা তাদের কাছে বললেন 'আপনারা মালালার জন্য দোয়া করেন।' ডাক্তাররা তাকে পুনরায় আশ্বাস দিয়ে বললেন যে, তারা সিটি স্ক্যান করেছেন তাতে দেখা গেছে বুলেট আমার ব্রেনের কাছাকাছি যায় নি। তারা ক্ষত পরিষ্কার করে ব্যান্ডেজ করেছেন।

'ও জিয়াউদ্দিন! তারা কী করেছেন?' ম্যাডাম মরিয়ম দরজা দিয়ে হঠাৎ করে ঢুকে আব্বাকে বললেন। তিনি ওইদিন স্কুলে ছিলেন না। তিনি বাড়িতে তার শিশু সন্তানের নার্সিং করছিলেন। তিনি তার দেবরের কাছ থেকে ফোনে জেনেছেন মালালা শংকামুক্ত। টিভি খুলে হেড লাইনে দেখলেন যে, খুশাল স্কুল বাসে গুলি করা হয়েছে। খবর জানার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার স্বামীকে বলে তার মোটরবাইকে চড়ে স্বামীর সাথে হাসপাতালে এসেছেন। তার মতো সম্মানীয়া পাশতুন মহিলা কালেভদ্রে দেখা যায় না। 'মালালা, মালালা। তুমি কি আমার কথা শুনতে পারছো?' তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন।

www.pathagar.com

আমি গো গো শব্দ করলাম।

মরিয়ম জানার চেষ্টা করলেন আমার অবস্থা কেমন। একজন ডাক্তার বললেন তার কপালের ভিতর দিয়ে বুলেট চলে গেছে। ব্রেনে আঘাত করে নি। এখন নিরাপদেই আছে। তিনিও খুশালের আরো দু'জন বালিকাকে গুলিবিদ্ধ হবার খবর জানেন। শাজিয়াকে দু'বার বা'দিকের কলারবোন এবং হাতের তালুতে আঘাত লাগে। আমিই তাকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছিলাম। কিয়ানাত বুঝতে পেরেছিল না তার আঘাত লেগেছে, বাড়িতে এসে সে তাকিয়ে দেখে তার ডান বাহুতে বুলেটের আঘাত লেগেছে । তার পরিবার তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

আমার আব্বা হাসপাতালের বিছানার পাশে বসেছিলেন। তিনি আমাকে ছেড়ে যেতে চাইলেন না। তার ফোন বেজে চললো। কেপিকে এর চিফ মিনিস্টার প্রথম ব্যক্তি ফোনে বললেন,'দু:চিন্তা করবেন না। আমরা সব কিছু দেখবো।' তিনি বললেন 'আমরা তাকে পেশওয়ারের লেডি রিডিং হসপিটালে নিয়ে যাবার কথা ভাবছি।' আমার বিষয়ে আর্মি দায়িত্ব গ্রহণ করলো। তিনটার দিকে আর্মি লোকাল কমান্ডার হাসপাতালে এসে ঘোষণা করলেন তারা একটা আর্মি হেলিকপ্টারে করে আমাকে এবং আমার আব্বাকে পেশওয়ার নিয়ে যাচ্ছে। আমার আম্মাকে নিয়ে আসার সময় ছিল না। মরিয়ম জেদ ধরলেন তিনি আমার সঙ্গে যাবেন, কারণ আমাকে সেবাযত্ন করার জন্য একজন মহিলার সাহায্য প্রয়োজন। মরিয়মের পরিবার এতে খুশি ছিল না। কারণ ছোট একটা অপারেশনের পর তিনি তার শিশুসন্তানকে নার্সি করছিলেন। মরিয়ম আমার দ্বিতীয় মায়ের মতো।

আমাকে অ্যাম্বুলেন্সে উঠানোর পর আমার আব্বার ভয় হলো যে তালেবান আবার আক্রমণ না করে। এক মাইল দূরে হেলিপ্যাড। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমরা হেলিপ্যাডে পৌঁছালাম। আব্বা সারা রাস্তাই ভয়ের মধ্যে ছিলেন। আমরা সেখানে পৌঁছানের পরেও হেলিকপ্টার এসে পৌঁছে নি। আমরা হেলিকপ্টারের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। অবশেষে আমি এ্যাম্বুলেন্স থেকে নামলাম। আমার আব্বা, আমার কাজিন খানজি, আহমাদ শাহ ও মরিয়ম আমার সাথে থাকলেন। তাদের কেউই হেলিকপ্টারে চড়েন নি। আমাদের হেলিকপ্টার হেলিপ্যাড থেকে উড়ে যাবার সময় আর্মির স্পোর্ট উপলক্ষ্যে লাউডস্পিকারে দেশপ্রেমমূলক গান বাজছিল। তাদের গানে দেশের প্রতি ভালোবাসার অভিব্যক্তি প্রকাশ পেলেও আমার আব্বা স্বস্তিবোধ করছিলেন না। তিনি সাধারণ অবস্থায় গান ভালোবাসেন। কিন্তু তার পনেরো বছরের বালিকা বয়সী মেয়েকে গুলি করা হয়েছে যে মারা যেতে বসেছে এ অবস্থায় আব্বার পক্ষে গান ভালো লাগার কথা নয়।

আমার আম্মা আমাদের বাড়ির ছাদ থেকে হেলিকপ্টার উড়ে যাওয়া দেখছিলেন। তিনি যখন মিস উলফাতের কাছে ইংরেজি শব্দ শিখছিলেন তখন জানতে পারেন যে আমি আঘাত পেয়েছি। এ খবরে তিনি বিচলিত হয়ে পরেন। তিনি প্রথম

www.pathagar.com

দিকে মনে করেছিলেন যে এ্যক্সিডেন্টে আমার পায়ের ক্ষতি হয়েছে। তিনি সেখান থেকে বাড়িতে ছুটে এসে আমার দাদীকে সব কথা বলেন। তিনি আমার দাদীকে আল্লাহর দরবারে আমার জন্য দোয়া কামনা করতে বললেন। আম্মা ব্রেকফাস্টে আমার খাওয়া ডিমের অর্ধেকটা টেবিলে দেখতে পেলেন। বাড়ির সর্বত্র আমার পাওয়া পুরস্কার গ্রহণের ছবি সে সময় তার চোখে পড়লো। তিনি হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তিনি ওইগুলো দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। চার দিকেই মালালা, মালালা। এ খবর শুনে প্রতিবেশী মহিলারা আমাদের বাড়িতে ছুটে এলেন। আমার আম্মা সব লোকজনদের দেখে অবাক হয়ে যান। তিনি জায়নামাজ বিছিয়ে কোরআন তেলওয়াত করতে শুরু করেন। তিনি সেখানে উপস্থিত মহিলাদের বললেন, “আপনারা কান্নাকাটি না করে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানান।' তারপর আমার ভাইয়েরা রুমে ছুটে আসে। আতাল তার স্কুল থেকে পায়ে হেঁটে বাড়ি পৌঁছে টেলিভিশন খুলে আমাকে গুলি করার খবর জানতে পায়। তারা সবাই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। লোকজন আমার আম্মাকে আশ্বস্ত করেন এ বলে যে, আমার কপাল ঘেষে বুলেট বিদ্ধ হয়েছে, ব্রেনে আঘাত লাগে নি। বিভিন্ন কথা শুনে আমার মা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েন। তিনি প্রথমে শুনেছিলেন পায়ে আঘাত লেগেছে, তারপর শুনছেন আমার মাথায় লেগেছে। আমার আব্বার এক বন্ধু আম্মাকে ফোন করে জানান যে আমাকে হেলিকপ্টারে করে পেশোয়ার নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমাদের বাড়ি থেকে হেলিপ্যাডের দূরত্ব মাত্র এক মাইল। আমাদের বাড়িতে জমায়েত লোকেরা হেলিকপ্টারের শব্দ শুনে দৌড়ে ছাদে গেলে। তারা বললো, 'ওটাতেই মালালা যাচ্ছে! তারা হেলিকপ্টার করে তাদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে যেতে দেখলেন। আম্মা তার মাথায় স্কার্ফ দিয়ে দু'হাত একত্রিত করে আল্লাহর উদ্দেশে ফরিয়াদ জানালেন, 'আল্লাহ, আমি তাকে তোমার হাতে সঁপে দিলাম। আমাদের নিরাপত্তা রক্ষীর প্রয়োজন নেই- তুমি আমাদের রক্ষাকর্তা। তার রক্ষাকর্তা তুমি। তুমি তার জীবন ফিরিয়ে দাও।'

হেলিকপ্টারের মধ্যে আমি রক্ত বমি করতে লাগলাম। আমার আম্মা আতঙ্কিত হয়ে ভাবলেন এর অর্থ আমার ইন্টারনাল ব্লিডিং হচ্ছে। তিনি আমার বাঁচার আশা ছেড়ে দিলেন। মরিয়ম আমাকে লক্ষ্য করে তার স্কার্ফ দিয়ে আমার মুখ মুছিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন।'দেখুন, ও সাড়া দিচ্ছে!' তিনি বললেন। 'এটা একটা ভালো লক্ষণ।'

আমরা পেশোয়ার বিমান বন্দরে নামার পর তারা অনুমান করলেন যে আমাকে লেডি রিডিং হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে ডা.মুমতাজ নামে একজন বিখ্যাত নিউরোসার্জন আছেন। তারা কিন্তু আমাকে কম্বাইন্ড মিলিটারী হসপিটাল সিএমএইচএ নিয়ে যাবার কথা জানালেন। ৬০০ শয্যা বিশিষ্ট সিএমএইচ ব্রিটিশ আমলে প্রতিষ্ঠিত। এ হাসপাতালে আহত সৈনিক এবং সুইসাইড বোম এর শিকার আহত রোগীতে ভরা হাসপাতালের বেডগুলো। সুইসাইড বোম্বারের হাত থেকে সুরক্ষা দেবার জন্য এখানে কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

আমাকে তাৎক্ষণিকভাবে আলাদা ভবনের ইনসেন্টিভ কেয়ার ইউনিটে নিয়ে যাওয়া হলো। তখন বিকাল ৫টা বাজে। কাঁচ ঘেরা হুইলড বেডে করে আমাকে নির্জন কক্ষে ঢোকানো হলো। একজন নার্স আমার সাথে আছে। পাশের রুমে আইইডি আক্রমণে মারাত্মকভাবে দগ্ধ একজন সৈনিক ছিল। তার পা বোমার আঘাতে উড়ে গেছে। একজন তরুণ ভিতরে এসে নিউরোসার্জন কর্ণেল জুনাইদ বলে নিজের পরিচয় দিলেন। আমার আব্বা হতাশাগ্রস্ত হলেন। এখানে এমন একজন ডাক্তারকে তিনি দেখতে পাবেন বলে ভাবতে পারেন নি। কর্ণেল আমার আব্বাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মেয়েটি আপনার মেয়ে।' মরিয়ম নিজেকে আমার আম্মা হিসাবে পরিচয় দিলেন, যাতে তিনি ভিতরে ঢুকতে পারেন।

কর্ণেল জুনাইদ আমাকে পরীক্ষা করলেন। জ্ঞান থাকলেও আমি অস্থিরতা অনুভব করছিলাম। আমি কথা বলতে না পারলেও সব বুঝতে পারছিলাম। আমার চোখের পাতা লাফাচ্ছিল। আমার বা'দিকের ভ্রু'র উপরের ক্ষত সেলাই করলেন। ওখান দিয়েই বুলেট ঢুকেছিল। স্ক্যান করার পর ভিতরে কোনো বুলেট নেই দেখে ডাক্তার অবাক হলেন। 'একটা কিছু ঢুকলে তা যদি ভিতরে না থাকে তবে তা বের হয়ে যাবারও তো একটা ক্ষত থাকবে' তিনি বললেন, তিনি আমার মেরুদন্ড পরীক্ষা করে দেখলেন আমার বা'কাঁধের পাশে বুলেটটি রয়েছে। 'সে অবশ্যই তার গলা নিচু করেছিল যখন তাকে গুলি করা হয়।' তিনি বললেন।

তারা আমার আর একটা সিটি স্ক্যান করলেন। তারপর কর্ণেল আমার আব্বাকে তার অফিসে ডেকে নিয়ে গেলেন। ডাক্তার স্ক্রিনে স্ক্যানগুলো দেখছিলেন। তিনি আব্বাকে বললেন যে, সোয়াতে একটা অ্যাঙ্গেল থেকে সিটি স্ক্যান করা হয়েছে। কিন্তু এখন স্ক্যান করে দেখা যাচ্ছে ক্ষত মারাত্মক। 'দেখুন জিয়াউদ্দিন, সিটি স্ক্যান থেকে দেখা যাচ্ছে বুলেট ব্রেনের অতি নিকট দিয়ে চলে গেছে।' হাড়ের টুকরো অংশ মেমব্রেনের ক্ষতি করেছে। তিনি বললেন, 'আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া চাইতে পারি। আমাদের অপেক্ষায় থাকতে হবে কী হয় তা দেখার জন্য। এ অবস্থায় আমরা অপারেশন করতে যাচ্ছি না।

আমার আব্বা আরো হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। সোয়াতের ডাক্তাররা তাকে বলেছিলেন যে, এটা সাধারণ বিষয়, আর এখন বলছে এটা মারাত্মক বলে মনে হচ্ছে। যদি মারাত্মক না হবে তবে কেন তারা অপারেশন করছে না? আব্বা মিলিটারী হসপিটালে অস্বস্তিবোধ করছিলেন। আমাদের দেশে আর্মি বহুবার শাসন ক্ষমতা দখল করেছে। আব্বার এক বন্ধু তাকে বললেন, 'তাকে এ হাসপাতাল থেকে স্থানান্তর করেন। আমরা চাই না যে সে লিয়াকত খানের মত একজন শহীদ মিল্লাত হোক।' আমার আব্বা কী করবেন বুঝতে পারছিলেন না।

'আমি বিভ্রান্তির মধ্যে আছি,' তিনি কর্ণেল জুনাইদকে বললেন। 'আমরা কেন এখানে আছি? আমি ভাবছি আমাদের সিভিল হাসপাতালে যাওয়া উচিত। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'দয়া করে কি তাকে ডাক্তার মুমতাজের কাছে নিয়ে যাবেন?'

www.pathagar.com

'এটা কেমন করে ভাবতে পারলেন?' কর্নেল জুনাইদ জবাবে বললেন। তিনি আব্বার কথায় অবাক ও রাগান্বিত হলেন।

পরে আমরা জানতে পারি তরুণ বয়সী চেহারা সত্ত্বেও নিউরোসার্জন হিসাবে তার তের বছরের অভিজ্ঞতা। তিনি পাকিস্তান আর্মির একজন অভিজ্ঞ নিউরোসার্জন। তিনি পাকিস্তানী আর্মিতে একজন ডাক্তার হিসাবে যোগদান করেন। তার চাচাও পাকিস্তানী আর্মির একজন নিউরোসার্জন ছিলেন, তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিউরোসার্জারীতে বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় রাখেন। পেশওয়ার সিএমএইচ তালেবানদের লড়াইয়ের ফ্রন্টলাইনে অবস্থিত। জুনাইদ প্রতিদিনই বন্দুকের গুলিবিদ্ধ আহত এবং বোমা বিস্ফরণে আহতদের ভালো করার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। 'আমি হাজার হাজার মালালাকে চিকিৎসা করেছি।' পরে তিনি বলেন।

আমার আব্বা কিন্তু সে সময় এ সব কথা জানতেন না। তাই তিনি আমাকে নিয়ে আরো হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। 'আপনি যাই ভাবেন না কেন, আপনি একজন ডাক্তার।' আব্বা বললেন।

পরবর্তী কয়েক ঘন্টায় কী হয় তা দেখার জন্য কেটে গেল। নার্সরা আমার হার্টবিট ও ভাইটাল সাইন পরীক্ষা করলেন। মাঝে মাঝে আমি হাই তুলছিলাম এবং হাত নাড়াচ্ছিলাম আর চোখের পাতা খুলছিলাম আর বন্ধ করছিলাম।তারপর মরিয়ম বললেন, 'মালালা, মালালা।' এক সময় আমি আমার চোখদুটো পুরোপুরি খুলতে পারলাম।'আমি কখনোই লক্ষ্য করি নি মালালা'র চোখ দুটো এত সুন্দর,' মরিয়ম বললেন। অস্থির হয়ে আমি আমার হাতের আঙুলগুলো নাড়াতে লাগলাম।'ওটা করো না।' মরিয়ম বললেন।

'মিস, আমাকে এটা করতে নিষেধ করবেন না।' আমি স্কুলেই আছি এমন ভাবে ফিসফিস করে বললাম। ম্যাডাম মরিয়ম ছিলেন একজন নিয়মকানুন মেনে চলা হেডমিস্ট্রেস।

সন্ধ্যার একটু পরে আমার আম্মা অটলকে সাথে নিয়ে হাসপাতালে এলেন। আব্বার বন্ধু মোহাম্মদ ফারুকের গাড়িতে তার বাই রোডে এখানে আসতে চার ঘন্টা সময় লেগেছে। আম্মা আমার এখানে আসার আগে মরিয়ম তাকে সাবধান করে দেন তিনি যেন আমার সামনে এসে কান্নাকাটি ও চিৎকার না করে। আম্মা এলেন, তার চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছিল। 'এই যে আতাল আসছে।' আম্মা আমাকে বললেন। আতাল এসে কান্নাকাটি করতে লাগলো। সে আম্মাকে বললো, 'মালালার এমন মারাত্মক অবস্থা হয়েছে।'

আম্মা এতই শোকাচ্ছন্ন ছিলেন যে, তিনি বুঝতে পারছেন না কেন এখানকার ডাক্তাররা তাকে অপারেশন করছে না।

'আমার সাহসী মেয়ে, আমার সুন্দরী মেয়ে,' তিনি চিৎকার করে কেঁদে উঠে বললেন। অটল এতই কান্নাকাটি আর চিৎকার করছিল যাতে একজন আর্দালী তাকে ওখান থেকে মিলিটারী হোস্টেলে দিয়ে যায়।

www.pathagar.com

হাসপাতালের বাইরে আব্বাকে ঘিরে ছিল একটা জমায়েত- তাদের মধ্যে ছিল রাজনীতিবিদ, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা, প্রাদেশিক গভর্নররা- তারা সহানুভূতি প্রকাশ করতে এসেছেন। এমন কি সেখানে গভর্নরও উপস্থিত হন। তিনি আমার চিকিৎসার জন্য আমার আব্বাকে ১০,০০০ রুপি দেন। আমাদের সমাজের কেউ যদি মারা যান তবে এ ধরনের পদমর্যাদা সম্পন্ন লোক উপস্থিত হলে গৃহকর্তা নিজেকে সম্মনিত লোক বলে ভাবতে পারেন।

পরে যখন তারা খাওয়াদাওয়া করছিলেন তখন অটল টিভির সুইস অন করলে আব্বা তাৎক্ষণিকভাবে তা বন্ধ করে রাখেন। ওই মুহূর্তে আব্বা আমাকে গুলি করার দৃশ্য বার বার দেখাতে চাচ্ছিলেন না। আব্বা রুম থেকে বাইরে গেলে মরিয়ম আবার টিভি অন করলেন। প্রত্যেকটি চ্যানেলেই আমার ফুটেজ দেখাচ্ছিল। আর সাথে ছিল দোয়া দরুদ, আমি যেন মারা গেছি। 'আমার মালালা, আমার মালালা,' আমার আম্মা মরিয়মকে জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি করতে লাগলেন।

মাঝরাতের দিকে কর্ণেল জুনাইদ আমার আব্বাকে আইসিউ এর বাইরে সাক্ষাৎ করে বললেন, 'জিয়াউদ্দিন, মালালার ব্রেন স্ফিত হয়ে উঠেছে।' আব্বা বুঝতে পারলেন না এ কথার অর্থ কী। ডাক্তার তাকে বললেন, আমি বুঝতে পেরেছি তার ব্রেন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে; আমার চেতনাও আস্তে আস্তে নিস্প্রভ হয়ে যাচ্ছে। আমি আবার রক্ত বমি করতে লাগলাম। কর্ণেল জুনাইদ তৃতীয়বার সিটি স্ক্যান করার আদেশ দিলেন। এ থেকে দেখা গেল আমার ব্রেনের ক্ষতস্থান মারাত্মক ভাবে স্ফিত হয়ে উঠছে।

'আমি কিন্তু ভেবেছিলাম বুলেট তার ব্রেনে ঢুকে নি।' আব্বা বললেন।

কর্ণেল জুনাইদ ব্যাখ্যা করে বললেন যে, একটা হাড় ফেটে গিয়ে তার টুকরো ব্রেনের ভিতরে ঢুকে গিয়েছে, তার ফলেই ব্রেনে আঘাত লেগেছে এবং এতেই তা এতটা স্ফিত হয়ে উঠছে। ব্রেনের জায়গা বাড়ানোর জন্য তিনি আমার মাথার খুলির কিছুটা অংশ বাদ দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করছেন। অন্যথায় অসহ্য রকমের চাপ সৃষ্টি হবে। 'এখনই অপারেশন করার প্রয়োজন।' তিনি বললেন। 'যদি আমরা এ মুহূর্তে অপারেশন না করি তবে সে মারা যেতে পারে। আমি চাই আপনি অপারেশনে বাধা সৃষ্টি করবেন না।'

আমার মাথার খুলি কিছুটা কাটার কথা শুনে আব্বা বললেন, 'সে কি বেঁচে থাকবে?' সে হতাশাগ্রস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি তাদের কাছ থেকে কোনো প্রকার আশ্বাস পেলেন না।

এটা ছিল কর্ণেল জুনাইদ এর সাহসী সিদ্ধান্ত। তিনি তার সুপিরিয়রদেরকে রাজি করাতে পারছিলেন না। অন্যান্য লোকেরা বললেন যে, আমাকে বিদেশে পাঠিয়ে

www.pathagar.com

দেওয়া উচিত। এ সিদ্ধান্ত নিলে আমার জীবন রক্ষা পেতে পারে। আমার আব্বা তাকে সামনে এগিয়ে যেতে বললেন। কর্ণেল জুনাইদ বললেন, তিনি ডা. মুমতাজের সাহায্য নিতে চান। সম্মতিসূচক পত্রে সহি করতে আব্বার হাত যেন কেঁপে উঠলো। কাগজে-কলমে সম্মতি দেওয়া হলো যে রোগী মারা যেতে পারে।'

তারা রাত ১.৩০ টার দিকে অপারেশন শুরু করলেন। আব্বা ও আম্মা অপারেশন থিযেটারের বাইরে বসে রইলেন। আব্বা আল্লাহর কাছে দোয়া চাইতে লাগলেন। 'ও আল্লাহ, দয়া করে মালালাকে ভালো করে দাও।' 'আল্লাহ আমি যদি সাহারা মরুভূমিতেও থাকি আমি চাই মালালা যেন চোখ খোলে। তাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারবো না। আল্লাহ, মালালার জন্যই আমি বাকী জীবনটা বেঁচে থাকতে চাই। সে আহত হয়ে বেঁচে থাকলেও যেন বেঁচে থাকে।

অপর দিকে আম্মা আব্বার সাথে সাথে আল্লাহের বন্দেগী করতে থাকলেন, 'আল্লাহর কৃপা অসীম। হে আল্লাহ, আমার মেয়েকে আমার কাছে ফিরিয়ে দাও সে যে অবস্থায় ছিল সে অবস্থায়।' দেওয়ালের দিকে মুখ করে তিনি তার হাতের কোরআন তেলাওয়াত করতে থাকলেন কয়েক ঘন্টা ধরে।

'আমি কাউকে এমনভাবে ইবাদত বন্দেগী করতে দেখিনি।' ম্যাডাম মরিয়ম বললেন, 'আমি নিশ্চিত যে আল্লাহ তার ইবাদতের জবাব দিবেন।'

অপারেশন থিয়েটারের ভিতরে আমার মাথার খুলির উপরের বা'দিকের অংশের আট থেকে দশ বর্গ সেন্টিমিটার কর্ণেল জুনাইদ করাত দিয়ে কেটে বাদ দিলেন যাতে আমার ব্রেনের ক্ষিতি না ঘটে। তারপর তিনি আমার পাকস্থলীর বা'দিক থেকে চামড়ার নিচের টিস্যু কাটলেন এবং সেটার সুরক্ষার জন্য একটুকরো হারের ভিতরে তা প্রতিস্থাপন করলেন । তারপর ব্রেনের ক্ষিতির ফলে আমার বায়ু চলাচলের পথ ব্লক না হবার জন্য তিনি পথ করে দিলেন । তিনি আমার ব্রেন থেকে হাড়ের টুকরোগুলো বের করে ফেললেন এবং আমার সোল্ডার ব্লেড থেকে বুলেট অপসারণ করলেন। পুরো অপারেশন চলাকালে আমাকে ভেন্টিলেটর পরানো ছিল। প্রায় পাঁচ ঘন্টা ধরে অপারেশন চলেছিল।

আম্মার ইবাদত বন্দেগী সত্ত্বেও আমার আব্বা ভাবলেন, বাইরের নব্বই পার্সেন্ট লোকই মনে করে অপেক্ষায় ছিল যে আমার মৃত্যু সংবাদ আসবে। তাদের মাঝে আব্বার বন্ধু এবং সহানুভূতিশীল মানুষেরা মনের দিক থেকে ভেঙ্গে পড়ছিলেন। বাকীরা আমাকে সরকারীভাবে উচ্চমানের চিকিৎসা সেবাদানের জন্য আমাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিলেন।

আমার আব্বা অপারেশন থিয়েটারের বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন এমন সময় একজন নার্স বাইরে এসে আব্বার দিকে এগিয়ে এসে বললেন, 'আপনি কি মালালার

www.pathagar.com

বাবা? আর একবার আমার আব্বার হার্টবিট বেড়ে গেল। নার্স তাঁকে রুমের ভিতরে নিয়ে গেলেন।

আব্বা ভাবলেন, নার্সটি বলতে চাচ্ছে, 'আমরা দু:খিত, আমরা তাকে হারিয়েছি।' আগে আর একবার তাকে ভিতরে যেতে হয়েছিল। সে সময় তাকে তারা বলেছিলেন, 'ব্লাড ব্যাংক থেকে রক্ত আনার জন্য একটা লোকের দরকার।' তিনি স্বস্তিবোধ করলেও হতবুদ্ধিকর অবস্থায় পড়লেন। *আমি একমাত্র ব্যক্তি, কে এখন ব্লাড ব্যাংক থেকে রক্ত আনতে যাবে।* তার পরিবর্তে তার এক বন্ধু রক্ত আনতে গেলেন।

ভোর ৫.৩০ এ সার্জনরা অপারেশন থিয়েটার থেকে বের হয়ে এলেন। অন্যান্য কথার মাঝে তারা আব্বাকে বললেন যে, তারা মাথার খুলির এক টুকরো অপসারণ করে তা আমার অ্যাবডোমেনে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। ডাক্তাররা রোগী কিংবা তার আত্মীয়ের কাছে এ সব ব্যাখ্যা করেন না। তবুও আমার আব্বা বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন,'যদি কিছু মনে না করেন তবে আমি বোকার মত একটা প্রশ্ন করতে চাই। সে কি বেঁচে উঠবে- আপনারা কি মনে করেন?"

'চিকিৎসা শাস্ত্রে দুই যোগ দুই এ সব সময় চার হয় না।' কর্ণেল জবাবে বললেন, 'আমরা আমাদের কাজ করেছি- আমরা খুলির টুকরো অপসারণ করেছি- এখন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

'আমি বোকার মত আর একটা প্রশ্ন জানতে চাচ্ছি,' আব্বা জিজ্ঞাসা করলেন। 'সেই হাড়টার কি হলো? ওটার কি করবেন?' ডা. মুমতাজ জবাবে বললেন, 'তিন মাস পরে আমরা ওটা প্রতিস্থাপন করবো। 'এটা একটা সাধারণ ব্যাপার। তিনি হাতে তালি দিয়ে বললেন।

পরদিন সকালে খবরটা ছিল ভালো। আমি হাত নাড়াতে পারছিলাম না। তারপর প্রভিন্স থেকে তিন জন সার্জন আমাকে পরীক্ষা করতে এলেন। তারা বললেন, কর্ণেল জুনাইদ ও ডা. মুমতাজ সুন্দর কাজ করেছেন। অপারেশন খুব ভালো হয়েছে। কিন্তু এখন আমার উচিত কোমার মধ্যে রাখা, কারণ আমি যদি চেতন অবস্থায় থাকি তবে আমার ব্রেনে প্রেসার পড়বে।

যখন আমি জীবন মৃত্যুর মাঝে ছিলাম তখন তালেবানরা একটা স্টেটমেন্ট ইস্যু করে আমাকে গুলি করার দায়দায়িত্ব স্বীকার করলো। তবে শিক্ষার জন্য ক্যাম্পেনের কারণে এটা করা হয় নি। 'আমরা এ আক্রমণ চালিয়েছি, আমাদের বিরুদ্ধে যারা বলবে তাদেরকে আক্রমণ করা হবে একই ভাবে।' টিটিপি এর একজন মুখপাত্র এহসানুল্লাহ এহসান বললেন, 'মালালা আমাদের লক্ষ্যবস্তু ছিল কারণ সে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রচার করছিল---- সে তরুণী হয়েও পাকতুস্তান

www.pathagar.com

এলাকাতে পশ্চিমা কালচার প্রচার করছিল। সে ছিল প্রো-ওয়েস্ট; সে তালেবানদের বিরুদ্ধে বক্তব্য দিচ্ছিল; তাকে অভিহিত করা হয় প্রেসিডেন্ট ওবামার পুতুল হিসাবে।'

আমার আব্বা জানতেন সে এ সব কথার দ্বারা কী বলতে চেয়েছিলেন। এক বছর আগে আমি ন্যাশনাল পিস প্রাইজ লাভ করার পর আমি অনেক টিভি সাক্ষাৎকার দিয়েছিলাম। তাদের একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমার প্রিয় রাজনীতিবিদ কে? আমার প্রিয় রাজনীতিবিদ ছিলেন খান আব্দুল গফ্ফার খান, বেনজির ভুট্টো এবং প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। আমি ওবামা সম্বন্ধে পড়েছিলাম। কারণ একটা সংগ্রামী পরিবার থেকে একজন তরুণ বয়সী কালো মানুষ তার স্বপ্ন ও আকাঙ্খাকে বাস্তবায়িত করতে পারায় আমি তাকে প্রশংসা করতাম। পাকিস্তানে আমেরিকার ভাবমূর্তি খারাপ হয় ড্রোন বিমান হামলা, আমাদের ভূখন্ডে গোপন হামলা ও রেমন্ড ডেভিস সংক্রান্ত বিষয়ের কারণে।

একজন তালেবান মুখপাত্র বলেন যে, ফজলুল্লাহ একটা সভায় দু'মাস আগে আমাকে আক্রমণ করার আদেশ দিয়েছিলেন।' যে কেউ সরকারের পক্ষে থেকে আমাদের বিরুদ্ধে কাজ করবে তারা আমাদের হাতে মারা পড়বে।' তিনি বললেন, 'আপনারা দেখবেন অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ লোকেরাও শীঘ্রই আমাদের শিকারে পরিণত হবে।' তিনি আরো বলেছিলেন, আমার এবং আমার স্কুলে যাবার পথ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে তারা স্থানীয় দু'জন সোয়াতী ব্যবহার করেছেন। তিনি আমাকে একটা আর্মি চেক পোস্টের কাছে আক্রমণ চালানোর নির্দেশ দেন। এটা দেখানোর জন্য যে তারা যেকোনো স্থানে আক্রমণ চালাতে পারে।

আমার অপারেশনের কয়েক ঘন্টা পর ওই দিন সকালে হঠাৎ করে একটা ঘটনা ঘটলো। লোকজন তাদের পোশাকআশাক পরে পরিপাটি হচ্ছিল। হঠাৎ সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল কায়ানির আগমন ঘটলো। তিনি আমার আব্বাকে বললেন, 'জাতি আপনার এবং আপনার মেয়ের জন্য দোয়া দরুদ পড়ছে।' ২০০৯ সালের শেষ দিকে তালেবানদের বিরুদ্ধে ক্যাম্পেন করে তিনি সোয়াতে বড় একটা জনসভায় ভাষণ দেন। সে সময় আমি জেনারেল কায়ানির সাথে সাক্ষাৎ করি। 'আপনারা সুন্দর কাজ করছেন এ জন্য আমি খুশি।' আমি একটা সভায় বললাম। 'এখন ফজলুল্লাহকে পাকড়াও করা আপনাদের একান্ত প্রয়োজন' সভাস্থলের হল ঘরটা হাততালিতে মুখরিত হয়ে উঠলো। জেনারেল কায়ানি আমার কাছে এসে আমার মাথায় তার হাত রাখলেন পিতার মত।

কর্ণেল জুনাইদ সার্জারী এবং প্রস্তাবিত চিকিৎসার পরিকল্পনা সম্পর্কে জেনারেলকে ব্রিফিং করলেন। জেনারেল কায়ানি তাকে বললেন যে, অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী সিটি স্ক্যান করার উদ্দেশে তিনি আমাকে বিদেশে

www.pathagar.com

পাঠাবেন। তার সফরের শেষে ইনফেকশনের ভয়ে কাউকেই আমার পাশে যাবার অনুমতি দেওয়া হলো না। অনেকেই এলেন। ক্রিকেটার থেকে রাজনীতিবিদ হওয়া ক্রিকেটার ইমরান খান, প্রাদেশিক তথ্যমন্ত্রী মিঁয়া ইফখার হুসাইন। তিনি ছিলেন তালেবানদের কট্টর সমালোচক। তার ছেলে তালেবানের গুলিতে নিহত হয়। আমাদের প্রদেশের চিফ মিনিস্টার হায়দার হোতিও এলেন।

'আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে মালালা ইন্তেকাল করবে না।' হোতি লোকজনদের কাছে বললেন। তাকে এখনো অনেক কাজ করতে হবে।

তারপর বিকাল ৩টা দিকে দু'জন ব্রিটিশ ডাক্তার রাওয়ালপিন্ডি থেকে হেলিকপ্টার যোগে এলেন। বার্মিংহাম এর হাসপাতাল থেকে ডা. জাভেদ কায়ানি ও ডা. ফিওনা রেনোল্ডস এসে পাকিস্তানে দেশের প্রথম লিভার প্রতিস্থাপন প্রোগ্রাম চালু করেন। আমাদের দেশের শিক্ষা ও চিকিৎসা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান হতাশাব্যাঞ্জক। শিক্ষার যথাযথ ব্যবস্থা নেই। পাকিস্তানের সাতজন শিশুর একজন হেপাটাইটিসে আক্রান্ত। বহু শিশু লিভারের রোগে মারা যায়। জেনারেল কায়ানি এ সব সমস্যা দূর করার জন্য বদ্ধপরিকর। সিভিলিয়ানরা ব্যর্থ হলে আর্মি আবার ক্ষমতায় আসতে পারে। বিমানে দেশে ফিরে যাবার আগে কায়ানি ব্রিফ করার জন্য ডাক্তারদেরকে বললেন।

আর্মি চিফ ও ডাক্তাররা পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত না হওয়া সত্ত্বেও জেনারেল কায়ানি তাদেরকে ভালোভাবেই চিনতেন। ডা. জাভেদ কুইন এলিজাবেথ হসপিটালের একজন এমার্জেন্সী বিভাগের কনসালট্যান্ট। ডা. জাভেদ তার কথায় রাজি হয়ে ব্রিফ করলেন। ডা. ফিওনা বার্মিংহাম চিল্ড্রেন'স হসপিটালের একজন মহিলা শিশু বিশেষজ্ঞ। কর্ণেল জুনাইদ তাদের দেখে খুশি ছিলেন না। অন্যদিকে যা করা হয়েছে তাতে ব্রিটিশ ডাক্তাররাও খুশি ছিলেন না। তারা আমাকে পরীক্ষা করলেন। তারা আমার রক্তচাপ সার্বক্ষণিকভাবে পরীক্ষা করতে বললেন। ডা. ফিওনা অভিযোগ করলেন যে, আমার কার্বন ডাইঅক্সাইড লেভেল খুবই লো।

ডা. ফিওনা যা যা ডা. জাভেদকে বললেন তা আমার আব্বার না শোনাই ভালো ছিল। ডা. ফিওনা আরো বললেন তার সঠিক সাজরী হয়েছে। নিউরোসার্জারীর পর এখন তাকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। তারপর তারা রাত নামার আগেই হেলিকপ্টারে ওখান থেকে চলে গেলেন এটা ভেবে যে, রাতের আঁধারে পেশওয়ার বিপদজনক হয়ে উঠতে পারে।

ভিজিটরদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রী রেহমান মালিক আসলেন। কিন্তু তাকেও আমার রুমে আসার অনুমতি দেওয়া হলো না। তিনি সাথে করে আমার পাসপোর্ট নিয়ে এসেছিলেন। আব্বা ভেঙ্গে পড়লেও মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানালেন। তিনি আর্মি হোস্টেলে চলে যাবার আগে তার পকেট থেকে আমার পাসপোর্ট

www.pathagar.com

বের করে আমার আম্মার হাতে দিয়ে বললেন 'এটা মালালার, কিন্তু তাকে বিদেশে না বেহেশতে যেতে হবে আমি জানি না।' তারা উভয়েই কেঁদে ফেললেন। তারা জানতেন আমার গল্প সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। বিদেশের অনেকেই আমাকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর জন্য আহ্বান জানায়।

আমার অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপের দিকে যেতে থাকে। আমার আব্বা এটা উপলব্ধি করতে পারছিলেন। যারা আমাকে বিদেশে পাঠানোর জন্য আহ্বান করছিলেন তাদের মধ্যে আরফা করিমের আব্বা ছিলেন অন্যতম। আরফা করিম ছিল পাঞ্জাবের শিশু কম্পিউটার জিনিয়াস। বিভিন্ন ফোরামে আমি তার সাথে আলাপ করেছিলাম। সে বিশ্বের মাত্র নয় বছর বয়সের সর্বকনিষ্ঠ 'মাইক্রোসফট-সার্টিফাইড প্রফেশনাল। তার নয় বছর বয়সের সময় তার মাইক্রোসফটে দক্ষতার স্বীকৃতি স্বরূপ বিল গেটস সিলিকন ভ্যালিতে তার সাথে দেখা করার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু দু:খের বিষয় ওই জানুয়ারিতেই সে হার্ট অ্যাটাকে মারা যায়। সে ছিল আমার চেয়ে এক বছরের বড়। তার আব্বার সাথে মিলিত হবার পর আমার আব্বা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বলেছিলেন,'আমাকে বলেন কন্যাদেরকে ছেড়ে বেঁচে থাকা যায়।,' তিনিও আব্বার কথা শুনে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলেন।

www.pathagar.com

২২

অজানার উদ্দেশে যাত্রা

মঙ্গলবার লাঞ্চ টাইমের সময় আমাকে গুলি করা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার আমার আব্বা উপলব্ধি করলেন যে, আমি মারা যাব। তিনি আমার চাচা ফয়েজ মোহাম্মাদকে বললেন যে, গ্রামে আমার দাফনের ব্যবস্থা করতে। আমি অচেতন অবস্থায় ছিলাম। আমার জীবনী শক্তি নিভে যাবার মত অবস্থায় পৌঁছাচ্ছিল। আমার কিডনি ও লাংস অকার্যকর অবস্থায় চলে যাচ্ছিল। আব্বা আমাকে পরে আমার সে সময়ের শোচনীয় অবস্থার কথা বলেছিলেন। যতদূর তিনি বুঝতে পারছিলেন তাতে তিনি মনে করছিলেন যে আমার ক্লিনিক্যাল ডেথ ঘটেছে। তিনি ভেবেছিলেন তার বয়স মাত্র ১৫ বছর। তার জীবন কি এতই স্বল্প সময়ের?'

আমার আম্মা তখনো ইবাদত বন্দেগীতে রত ছিলেন- তার চোখে ঘুম ছিল না। ফয়েজ মোহাম্মাদ তাকে কোরআনের সূরা হজ্ব তেলাওয়াত করতে বলেন। আম্মা বার বার ওই সূরার বারটি আয়াত (৫৮- ৭০) তেলাওয়াত করছিলেন।

কর্ণেল জুনাইদ আমাকে আবার পরীক্ষা করতে এলে আমার আব্বা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন," সে কি বাঁচবে?'

'আপনি আল্লাহকে বিশ্বাস করেন।' তিনি আব্বাকে প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ,' আব্বা জবাব দিয়েছিলেন। কর্ণেল জুনাইদের মধ্যে বড় ধরনের আধ্যাত্মিক গভীরতা বিদ্যমান ছিল। তিনি আব্বাকে আল্লাহকে ডাকার উপদেশ দিলেন ।

বুধবার রাতের শেষ দিকে ইসলামাবাদ থেকে বাই রোডে ইনসেন্টিভ কেয়ার বিষয়ে বিশেষজ্ঞ দু'জন মিলিটারী ডাক্তার এসে পৌঁছালেন। ব্রিটিশ ডাক্তাররা ফিরে গিয়ে জেনারেল কায়ানিকে রিপোর্ট করলে তিনি তাদেরকে পাঠিয়েছিলেন। পরদিন বৃহস্পতিবার ইসলামাবাদ থেকে আসা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ব্রিগেডিয়ার আসলাম ডা. ফিওনা এর সাথে ফোনে যোগাযোগ করে বললেন,'মালালা এখন খুবই অসুস্থ।' সে সময় আমার ব্লাড পেসার খুবই লো ছিল। আমার ব্লাডে এসিডের মাত্র বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আমার প্রশ্রাব হচ্ছিল না। কিডনি কাজ করছিল না। ডা. ফিওনা আমার খারাপ অবস্থার কথা শুনলেন, তখন তিনি বার্মিহামে

www.pathagar.com

ফিরে যাবার জন্য বিমান বন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা হবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তার ব্যাগপত্র বিমান বন্দরে ইতিমধ্যেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তার সাথে বার্মিহামের দু'জন নার্সও ছিলেন।

ডা. ফিওনা বৃহস্পতিবার লাঞ্চ টাইমে পেশওয়ারে ফিরে এসে আমার আব্বাকে বললেন যে, আমি তাকে বিমানে রাওয়ালপিন্ডির আর্মি হসপিটালে নিয়ে যেতে চাই। ওখানকার ইনসেন্টিভ কেয়ার খুবই উন্নত। আব্বা ভেবেই পেলেন না মারাত্মক ভাবে অসুস্থ একটা বাচ্চা মেয়েকে কিভাবে বিমানে করে ওখানে নিয়ে যাওয়া হবে। ডা. ফিওনা আব্বাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন যে, তিনি এমনটা প্রায়ই করে আসছেন। তাই দু:চিন্তার কোনো কারণ নেই।

ওই দিনই পরে একজন নার্স এসে আমার চোখে ড্রপস দিলেন। আমার আম্মা বললেন, 'ডা. ফিওনা ভালো ব্যবস্থা করেছেন কারণ নার্স মালালার চোখে আই ড্রপ দিয়েছেন। তিনি এ ব্যবস্থা না করলে এখানকার ওরা মালালার চোখে আই ড্রপ দেবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না।' শাজিয়া নামে আর একটা মেয়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছিল, তাকে ওই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ডা. ফিওনা তাকে চিকিৎসা করেন। তিনি আব্বাকে বললেন যে, শাজিয়া বর্তমানে ভালো আছে। সে আমার কাছে আকুতি জানিয়েছে এ বলে, "মালালার যত্ন নেবেন!'

মোটর সাইকেল পরিবেষ্ঠিত করে ব্লু ফ্লাশ লাইট জ্বালিয়ে কঠোর নিরাপত্তার মাঝ দিয়ে এ্যাম্বুলেন্সে করে আমাকে হ্যালি প্যাডে নিয়ে যাওয়া হলো। হেলিকপ্টারে ওখানে পৌঁছাতে এক ঘন্টা পনেরো মিনিট লাগলো। ডা. ফিওনা হেলিকপ্টারের মাঝে খুবই ব্যস্ত ছিলেন। তিনি সারাটা পথ নানা ধরনের যন্ত্রপাতি দিয়ে আমার পরীক্ষা করছিলেন। তিনি যা করছিলেন তা তিনি বছরের পর বছর করে আসছেন। তিনি ইউকে তে সংকটজনকভাবে অসুস্থ শিশুদের চিকিৎসা করে ভালো করে তুলেছেন। তার কাজের অর্ধেকটা ছিল ইনসেন্টিভ কেয়ারে চিকিৎসায় রত থাকা। যদিও তিনি এর আগে এ ধরনের অবস্থাকে কখনোই মোকাবিলা করেন নি। পেশওয়ার পশ্চিমাদের জন্যই বিপদজ্জনক হবে না, আমাকে নিয়েও কথা চালাচালি হবে। এটা একটা সাধারণ কেস নয়। তিনি এক পর্যায়ে বললেন, 'যদি সে মারা যায় আমি পাকিস্তানের মাদার তেরেসাকে হত্যা করেছি বলে গণ্য হবে।'

রাওয়ালপিন্ডিতে হেলিকপ্টার অবতরণ করা মাত্রই আমাদের একটা মিলিটারীদল স্কর্ট করে এ্যাম্বুলেন্সে আর্ম ফোর্সেস ইনস্টিটিউট অব কার্ডিওলোজি নামের হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হলো। আমার আব্বা সতর্ক হলেন- তারা কেমন করে মাথার ক্ষতের চিকিৎসা করবেন? ডা. ফিওনা কিন্তু আব্বাকে নিশ্চয়তা দিলেন এ বলে যে, এটাই হচ্ছে পাকিস্তানের সবচেয়ে উত্তম ইনসেন্টিভ কেয়ার। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জামাদিতে এখানকার ইনসেন্টিভ কেয়ার সুসজ্জিত। এখানে ব্রিটিশ- ট্রেনড ডাক্তাররা আছেন। বার্মিহাম থেকে আসা তার নিজস্ব নার্সরাও এখানে অপেক্ষা করছেন। তিনি আমার আব্বাকে ব্যাখ্যা করে বললেন

www.pathagar.com

যে, হেড ইনজুরির জন্য সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে চলা কার্ডিওলজি নার্সরাও এখানে আছে। তারা আমার সাথে পরবর্তী তিন ঘন্টা থেকে এন্টিবাওটিক প্রয়োগ এবং সঠিক ভাবে আমার শরীরে রক্ত প্রবাহের ব্যবস্থা করলেন। আমার মনে হলো রক্ত চলাচলে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে। পরিশেষে তারা বললেন যে আমার অবস্থা স্থিতিশীল।

হাসপাতালটি পুরোপুরি তালাবন্ধ। সেখানে একটা পুরো ব্যাটালিয়ন সৈন্য প্রহরায় ছিল। এমনকি হাসপাতালের ছাদের শীর্ষদেশেও সৈন্যরা প্রহরায় ছিল। কাউকেই হাসপাতালে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছিল না। ডাক্তাররা ইউনিফরম পরা অবস্থায় ছিলেন। শুধুমাত্র রোগীদের ঘনিষ্ট আত্নীয়স্বজনদের কঠোর সিকিউরিটি চেকের মাধ্যমে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছিল। আমার আব্বা আম্মাকে সুরক্ষা দেবার জন্য একজন আর্মি মেজরকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। তিনি সবত্রই তাদেরকে অনুসরণ করছিলেন।

আমার আব্বা ভীত ছিলেন । আমার চাচা বললেন,'খুব সতর্ক থাকবেন- এ সব লোকগুলো সিক্রেট এজেন্ট হতে পারে।' আমার পরিবারবর্গের জন্য অফিসার হোস্টেলে তিনটা রুম দেওয়া হয়। প্রত্যেকের মোবাইল ফোন নিরাপত্তার কারণে বন্ধ রাখা হয়েছিল। আব্বাকে একটি ওয়াকি-টকি দেওয়া হয়, তাতে তিনি কমপক্ষে আধা ঘন্টা কথা বলতে পারতেন। তারা হোস্টেলের লন থেকে ডাইনিং হলে যাবার সময়ও পাহরায় থাকেন। কোনো ভিজিটরের ভিতরে প্রবেশের অধিকার ছিল না। এমনকি প্রধানমন্ত্রী আমার সাথে দেখা করতে এলেন তখনো তাকে ভিতরে আসার অনুমতি দেওয়া হলো না। অবাক করা নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু গত তিন বছরে তালেবানরা উচ্চ প্রহরাধীন মিলিটারী স্থাপনা মেহরান নেভাল বেসে, কামরা এয়ার ফোর্স বেসে এবং রাস্তার পাশের আর্মি হেড কোয়ার্টারেও আক্রমণ চালায়।

আমরা তালেবান আক্রমণের ঝুঁকির মধ্যে ছিলাম। আমার আব্বাকে বলা হলো যে আমার ভাইয়েরাও ভীতির আওতার বাইরে নয়। তিনি এ ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিলেন। কারণ ওই সময়ও খুশাল মিঙ্গোরাতে ছিল। পরে যদিও তাকে রাওয়ালপিন্ডিতে তাদের কাছে নিয়ে আসা হয়। হোস্টেলে কোনো কম্পিউটার কিংবা ইন্টারনেট ছিল না। কিন্তু সেখানে বন্ধুভাবাপন্ন কুক ইয়াসীম মামা ছিলেন । তিনি আমার পরিবারের জন্য খবরের কাগজ ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এনে দিতেন। ইয়াসীম তাদেরকে বলেন যে, তাদের পরিবারের জন্য খাবার তৈরি করার জন্য তিনি গর্বিত। তারা দয়ালুতায় এতই মুগ্ধ ছিলেন যে, তারা আমাদের গল্প তাকে বলতে দ্বিধা করতো না। তিনি তাদের খাবারদাবার যুগিয়ে ভোগান্তির হাত থেকে রেহাই দেবার জন্য চেষ্টা করতেন। তাদের ক্ষুধা ছিল না তাই তিনি তাদের জন্য সুস্বাদু খাবারদাবার ও মিষ্টান্ন তৈরি করতেন। একদিন খাবার সময় খুশাল বললো যে তার কাছে তাদের ডাইনিং টেবিল শূন্য মনে হচ্ছে কারণ তাদের মাঝে চার জন আছে, একজন নেই। তারা আমাকে ডাইনিং টেবিলে না পেয়ে শূন্যতা অনুভব করলো।

www.pathagar.com

ইয়াসীমের আনা একটা খবরের কাগজে আব্বা প্রথম পড়লেন আমাকে গুলি করায় আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় প্রতিক্রিয়া হয়েছে। মনে হলো সারাবিশ্ব এতে ক্ষুব্ধ হয়েছে। ইউ এন সেক্রেটারী জেনারেল বান কি-মুন একে 'গর্হিত ও কাপুরুষচিত কাজ বলেছেন। প্রেসিডেন্ট ওবামা আমাকে গুলি করাকে বর্ণনা করলেন 'নিন্দনীয় ও বিরক্তিকর ও মর্মান্তিক' বলে। পাকিস্তানে কিন্তু অনেকেই তেমনটা ইতিবাচক ভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলো না। কয়েকটি খবরের কাগজে আমাকে একজন 'পিস আইকন ' হিসাবে বর্ণনা করলো। অন্যেরা একে যড়যন্ত্রের থিয়োরী হিসাবে দেখলো। এমনকি কয়েকজন ব্লগার প্রশ্ন তুললো সত্যি কি আমি গুলিবিদ্ধ হয়েছি। সব ধরনের গল্পই তৈরি করা হলো। বিশেষ করে উর্দু সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে একটা দাবী করলোা যে, আমি দাড়ি রাখা সম্বন্ধে সমালোচনা করেছি। ধর্মীয় জামায়াতে ইসলামী পার্টির এমপি ডা. রাহেলা কাজী আমার বিরুদ্ধে সবচেয়ে সোচ্চার ছিলেন। তিনি আমাকে আমেরিকার একজন প্রতিনিধি হিসাবে বর্ণনা করে সাক্ষ্য হিসাবে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত রিচার্ড হলব্রুক পাশে বসা আমার ছবি প্রদর্শন করে বলেন 'ইউএস মিলিটারী অথরিটির সাথে আমি আড্ডা দেই।'

ডা. ফিওনা আমাদের সাথে স্বস্তিতেই ছিলেন। আমার মা শুধুমাত্র পশতু ভাষায় কথা বলতে পারতেন, তাই ডা. ফিওনা যা বলতেন তা তিনি বুঝতে পারতেন না। ডা. ফিওনা ইশারার সাহায্যে আম্মাকে তার কথা বুঝাতেন। তিনি আমার রুম থেকে ফিরে এসে থাম্বস আপ দেখিয়ে বলতেন, 'ভালো।' তিনি আমার আব্বা-আম্মার কাছে শুধুমাত্র ডাক্তারই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন দূতও। তিনি তাদের পাশে বসে আমার আব্বাকে সব কথা বিস্তারিত ভাবে বুঝিয়ে বলে বলতেন, আম্মাকে তার কথাগুলো বুঝিয়ে বলেন। আমার আব্বা এ মহিলা ডাক্তারের ব্যবহারে মুগ্ধ হলেন। এটা ভেবে অবাক হলেন যে, আমাদের দেশের ডাক্তাররা কখনোই একজন অশিক্ষিতা মহিলার কাছে কোনো বিষয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে বিরক্ত হন। তারা জানতে পারলেন আমেরিকার বিখ্যাত জনস হপকিনস হাসপাতাল সহ বিদেশী হাসপাতাল থেকে বিনা ব্যয়ে আমার চিকিৎসার জন্য অফার আসছে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে পাকিস্তানে বহুবার সফরকারী ধনবান সিনেটর জন কেরী, আরিজোনা একটা সপিং মলে গুলিবিদ্ধ কংগ্রেস উওম্যান গ্যাবিয়েল গিফোর্ডস আমার চিকিৎসার দায়দায়িত্ব নেবার কথা জানান। জার্মানী, সিঙ্গাপুর, ইউএই এবং ব্রিটেন থেকেও অফার আসে।

কেউই আমার আব্বা ও আম্মার সাথে পরামর্শ করতে আসেন তার চিকিৎসার বিষয়ে। আর্মি সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। জেনারেল কায়ানি ডা. জাভেদকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমাকে বিদেশে নিয়ে যাওয়া হবে কিনা। আর্মি চিফ তার সময়ের অবাক হবার মত অর্থ আমার চিকিৎসা বাবদ খরচ করেন। ডা. জাভেদ বলেন, তারা আমার বিষয়ে ছয় ঘন্টা আলোচনা করেন। সম্ভবত জেনারেল কায়ানি বুঝেছিলেন তিনি পদক্ষেপ না নিলে কোন রাজনীতিবিদ আমাকে নিয়ে রাজনৈতিক ফয়দা আদায় করতে পারে। তিনি তালেবানদের সমস্ত আক্রমণের

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সচেতনা গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। জেনারেল কায়ানি ডা, জাভেদকে বলেছিলেন যে, তিনি একজন সহানুভূতিশীল মানুষ। তার নিজের আব্বা একজন সাধারণ সৈনিক ছিলেন। তাকে আট বছর বয়সী রেখে তিনি যুবা বয়সে মারা যান। তার বড় ছেলে হিসাবে তাকেই তাদের পুরা পরিবারের দায়িত্ব নিতে হয়। জেনারেল কায়ানি আর্মি চিফ হয়ে অফিসারদের চেয়েও সাধারণ সৈনিকদের আবাসন, খাবারের রেশনের উত্তম ব্যবস্থা করেন।

ডা. ফিওনা জেনারেল কায়ানিকে বলেন যে, আমার ডান হাত এবং ডান পা দুর্বল। সুতরাং আমাকে সুস্থ করে তোলার জন্য বাইরে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। পাকিস্তানে সব সুবিধা পাওয়া যাবে না। আপনি যদি ভালো ফলাফল আশা করেন, তবে তাকে বিদেশে পাঠাতে হবে।,' তিনি উপদেশ দিলেন।

জেনারেল কায়ানি আমেরিকা সম্বন্ধে একগুঁয়ে থাকায় এর মাঝে আমেরিকাকে জড়াতে চাচ্ছিলেন না কারণ দু'দেশের সম্পর্কের অবনতি ঘটে রেমন্ড ডেভিস এর ঘটনা, বিন লাদেন রেইড এবং সীমান্ত এলাকায় একটা ইউএস হেলিকপ্টারের দ্বারা কয়েকজন পাকিস্তানী সেনাকে হত্যা। ডা. জাভেদ পরামর্শ দিলেন লন্ডনের গ্রেট ওর্মোন্ড রোডের নতুবা এডিনবার্গের বা গ্লাসগো স্পেসালিস্ট হসপিটালে নিয়ে যাবার জন্য। 'আপনপর হাসপাতালে নয় কেন?' জেনারেল কায়ানি প্রশ্ন করলেন।

ডা. জাভেদ জানতেন, এ কথা তিনি বলবেন। আফগানিস্তান ও ইরাকে আহত ব্রিটিশ সেনাদের চিকিৎসার জন্য বর্মিহামের কুইন এলিজাবেথ হসপিটাল বিশেষ ভাবে খ্যাত। নগরীর কেন্দ্রস্থলের বাইরে অবস্থিত হলেও এ হাসপাতালের প্রাইভেসি আছে। তিনি হাসপাতালের চিফ অপারেটিং অফিসার তার বস কেলভিন বোলগারকে ফোন করলেন। তিনি তাৎক্ষণিক ভাবে রাজি হলেন, কিন্তু পরে তিনি বললেন, 'আমাদের কেউই কল্পনা করতে পারছি না কেমন করে এ দায়িত্ব নেওয়া যায়।' আমাকে নিয়ে এত ভাবনা চিন্তা- একজন বিদেশী অপ্রাপ্ত বয়স্কা- কুইন হসপিটালে কাছে সহজ ব্যাপার ছিল না। বোলগার নিজেকে ব্রিটিশ ও পাকিস্তানী আমলাতন্ত্রের জালে জড়িয়ে পড়লেন। ইত্যবসরে সময় গড়িয়ে যাচ্ছিল। আমার অবস্থা স্থিতিশীল থাকলেও আমাকে আটচল্লিশ কিংবা বেশির পক্ষে বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে বিদেশে নিয়ে যাবার প্রয়োজন দেখা দিল।

•

পরিশেষে সামনে এগিয়ে যাবার সময় উপস্থিত হলো। ডাক্তাররা সমস্যায় পড়লেন কিভাবে আমাকে নিয়ে যাওয়া হবে। কে আমার ব্যয়ভার বহন করবে। ডা. জাভেদ পরামর্শ দিলেন রয়্যাল এয়ার ফোর্স থেকে একটা অফার গ্রহণ করতে। তারা আফগানিস্তান থেকে আহত সৈনিকদেরকে পরিবহন করে থাকে। জেনারেল কায়ানি কিন্তু এ পরামর্শ প্রত্যাখান করলেন। তিনি ডা. জাভেদকে তার বাড়িতে শেষ রাতের দিকে তার সাথে মিলিত হবার জন্য আহ্বান করলেন- জেনারেল শেষ রাতের দিকে-ডা. জাভেদকে বললেন তিনি ফরেন মিলিটারীদের সম্পৃক্ততা পছন্দ করেন না। ইতিমধ্যেই আমাকে নিয়ে অনেক রকমের

www.pathagar.com

ষড়যন্ত্রের গন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। লোকজন বলাবলি করছিল আমি সিআইয়ের এজেন্ট ইত্যাদি ইত্যাদি। আর্মি চিফ পুনরায় এ আগুনে আর ঘি ঢালতে চাইলেন না। ডা. জাভেদ বড় রকমের অসুবিধায় পড়লেন। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট সাহায্যের জন্য অফার দিলেও তারা পাকিস্তানের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক অনুরোধ পেতে চাইলেন। কিন্তু আমাদের সরকার আনুষ্ঠানিক অফার দিতে ভয় পাচ্ছিল। সৌভাগ্যক্রমে ইউনাইটেড আরব আমিরাতের শাসক পরিবার এ বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হলেন। তারা তাদের প্রাইভেট জেট প্রদান করার অফার দিলেন। ১৫ অক্টোবর সোমবার সকালের দিকে আমার পাকিস্তান থেকে বিমানে বিদেশে রওনা হবার কথা, বিমানে চড়ে কোথায়ও যাওয়া এটা আমার জীবনের প্রথম।

আমার আব্বা- আম্মা কেউই আমাকে বিদেশে নিয়ে যাবার কথা জানতেন না। তবে তারা জানতেন এ বিষয়ে আলোচনা চলছে। স্বাভাবিকভাবে তারা ধারণা করেছিলেন যে আমাকে দেশের বাইরে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হবে, আর তারা তার সাথে যাবে। আমার আম্মা আর ভাইদের পাসপোর্ট ছিল না। কর্ণেল রবিবার বিকালে আমার আব্বাকে জানালেন যে পরদিন সকালে আমি ইউকে এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করছি। আমার সাথে শুধুমাত্র আব্বাই যাবেন। আমার আম্মা ও ভাইয়েরা যেতে পরবে না। তাদের পাসপোর্ট সম্বন্ধে সমস্যার উদ্ভব দেখা দিয়েছে। নিরাপত্তার কারণে তাকে জানানো হয় নি আমার পরিবারের বাকীরা আমার সাথে যাচ্ছে না।

আমার আব্বা সব কিছুই আমার আম্মার কাছে বলতেন এবং তারা পরস্পর আলোচনা করতেন। আম্মা আমার চাচা ফয়েজ মোহাম্মাদের কাছে বসেছিলেন। তিনি তার নিজের এবং আমার ভাইদের নিরাপত্তার বিষয়ে উদ্বিগ্ন হলেন। তিনি আব্বাকে বললেন,'যদি তিনি দুটো বালককে নিয়ে মিঙ্গোরাতে থেকে যান তবে তাদের উপর যে কোনো ঘটনা ঘটতে পারে!

আব্বা কর্ণেলকে ফোন করে জানালেন,'আমি পরিবারকে জানিয়েছি, তারা কিন্তু খুবই অখুশি। আমি তাদেরকে ফেলে রেখে যেতে পারবো না।' এ ব্যাপারে আবার সমস্যার উদ্ভব দেখা দিল, কারণ আমি অপ্রাপ্ত বয়সী, তাই আমাকে একা পাঠানো যায় না। কর্ণেল জুনাইদ, ডা. জাভেদ এবং ডা. ফিওনাসহ অনেকেই আমার সাথে আমার আব্বাকে যাবার জন্য রাজি করাতে চেষ্টা করলেন। আমার আব্বা কিন্তু তাদের অনুরোধে ইতিবাচক সাড়া দিলেন না। তিনি চরম সংকটের মধ্যে থাকলেও আমার আম্মা ও ছোট দু'ভাইকে দেশে রেখে আমার সাথে যেতে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হলেন। তিনি ডা. জাভেদকে বুঝিয়ে বললেন,'আমার কন্যা এখন নিরাপদ মানুষের হাতে আছে। নিরাপদ দেশে যাচ্ছে। আমি আমার স্ত্রী ও ছেলেদের একাকী রেখে যেতে পারি না। তারা ঝুঁকির মধ্যে আছে। আমার কন্যার যা ঘটে গেছে, এখন তাকে আল্লাহের হাতে সঁপে দিয়েছি। আমি একজন পিতা-আমার পুত্রেরাও আমার কন্যার মতই প্রিয়।

www.pathagar.com

ডা. জাভেদ আমার আব্বাকে তার সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করতে বললেন। 'আপনি নিশ্চিত এটাই কি আপনার না যাবার একমাত্র কারণ?' তিনি জানতে চাইলেন কেউ কি তাকে চাপ দিয়েছে।

'আমার স্ত্রী আমাকে বললেন, "আপনি আমাদেরকে ছেড়ে যাবেন না।" 'আমার আব্বা বললেন। ডাক্তার তার কাঁধে হাত রেখে আমার আব্বাকে নিশ্চয়তা দিলেন যে আমার যত্ন নেওয়া হবে। তিনি তাকে বিশ্বাস করতে পারেন। 'এটা কি আপনার কাছে একটা অলৌকিক ব্যাপার বলে মনে হয় না, মালালা গুলিবিদ্ধ হবার পর থেকে এখানে যা যা ঘটেছে তাতে? আমার আব্বা জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমার বিশ্বাস আল্লাহ প্রথমে সমাধানের ব্যবস্থা করে পরে সমস্যা সৃষ্টি করেন।' ডা. জাভেদ জবাবে বললেন।

ইউকে যাত্রায় ডা. ফিওনাকে আমার অভিভাবক নিযুক্ত করে আব্বা 'ইন লোকো প্যারেন্টিস' ডকুমেন্টে স্বাক্ষর করলেন। আমার আব্বা চোখের পানি ফেলতে ফেলতে আমার পাসপোর্ট ডা. ফিওনার হাতে দিলেন।

'ফিওনা, আমি আপনাকে বিশ্বাস করি। দয়া করে আমার মেয়েকে যত্ন নিবেন।'

তারপর আমার আব্বা ও আম্মা আমার পাশে এসে বিদায় জানালেন। বেলা ১১ টায় তাদের সাথে আমার শেষ দেখা হলো। আমি কথা বলতে পারছিলাম না। আমার চোখদুটো বন্ধ হয়ে এলো। শুধুমাত্র আমার শ্বাসপ্রশ্বাস চলতে থাকায় তারা নিশ্চিত হলো যে আমি বেঁচে আছি। আমার আম্মা কেঁদে ফেললেন। আমার আব্বা কিন্তু তার কান্না থামানোর চেষ্টা করলেন, কারণ তিনি জানতেন আমি বিপদমুক্ত। ডাক্তাররা ডেডলাইনস বেঁধে দিয়েছিলেন- তারা বলেছিলেন পরের চব্বিশ ঘন্টা ছিল মারাত্মক, আটচল্লিশ ঘন্টা ছিল সংকটজনক, আর বাহাত্তর ঘন্টা ছিল মারাত্মক সংকটপূর্ণ- সময়গুলো কোনো ঘটনা ছাড়াই কেটে গেছে। স্ফিতি কমে গিয়েছিল, আর আমার রক্তের লেভেলের উন্নতি ঘটেছিল। আমার পরিবার আস্থা রাখলেন যে, ডা. ফিওনা ও ডা. জাভেদ আমাকে সর্বোত্তম যত্ন নিতে পারবেন।

আমার পরিবার রুমে ফিরে গেল। আব্বার ঘুম আসছিল না। মাঝরাতের পরে কে যেন তাদের দরজায় নক্ করলো। আব্বা দরজা খুলে দেখলেন সেই কর্ণেল যিনি আম্মাকে বাড়িতে রেখে আব্বাকে ইউকে যাবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। তিনি সে সময় বলেছিলেন আব্বা আমার সাথে না গেলে আমাকে ইউকে তে নিয়ে যাওয়া হবে না।

'আমি আগের রাতেই এ সমস্যার সমাধান করে এসেছি।' আব্বা জবাবে বললেন। 'কেন আপনি আমাকে এত রাতে জাগিয়ে তুললেন। আমি আমার পরিবার ফেলে রেখে যাচ্ছি না।'

আর একবার আর একজন অফিসার তার সাথে কথা বললেন। 'আপনাকে

অবশ্যই যেতে হবে। আপনি তার পিতা। যদি আপনি তার সাথে না জান তবে ইউকে এর হাসপাতালে তাকে ভর্তি করা যাবে না।' তিনি বললেন।

আব্বা জেদ করে বললেন, 'আমি আমার কথা বলে এসেছি। আমি আমার কথার পরিবর্তন করতে পারবো না। পাসপোর্ট পেলেই আমরা কয়েকদিনের মধ্যে ইউকে তে যাব।'

কর্ণেল তারপর বললেন, 'আমাদের সাথে হাসপাতালে আসেন ওখানে আর একটা ডকুমেন্টে সই করতে হবে।'

আমার আব্বার মনে সন্দেহ দেখা দিল। মাঝরাতের পর তাকে যেতে হবে ভয়েরই কথা তিনি ভাবলেন। তিনি অফিসারদের সাথে একা যেতে চাইলেন না। আব্বার সাথে আম্মাও গেলেন। আব্বা খুবই ভয়ের মধ্যে থাকায় তিনি সারাক্ষণই বারবার কোরআনের সূরা ইউনূস পড়ছিলেন।

তারা হাসপাতালে পৌঁছিলে কর্ণেল আব্বাকে বললেন যে, যদি আমাকে ইউকে তে যাবার অনুমতি দেন তবে তাকে আরো ডকুমেন্টে সই করতে হবে। এটা ছিল সাধারণ ব্যাপার। এটাই ছিল আমলাতন্ত্রের একটা পুরো এপিসোড।

আমার আব্বা - আম্মা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে হোস্টেলে ফিরে গেলেন। আমার আব্বা চেয়েছিলেন না তার পরিবার ছাড়া নতুন দেশে একা আমার সাথে যেতে।

১৫ অক্টোবর সোমবার ভোর ৫টায় সেনা পরিবেষ্টিত হয়ে আমি বিমান বন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। বিমান বন্দরের পথগুলো বন্ধ ছিল। ইউএই প্লেন বিমান বন্দরে অপেক্ষা করছিল। আমাকে বলা হয়েছিল ষোলটি প্রথম শ্রেণির আসনের পুস ডবল বিছানায় সজ্জিত বিলাসবহুল এ বিমানটিতে ইউরোপীয়ান নার্স ও জার্মান ডাক্তারদের সমন্বয়ে এ বিমানটিতে একটা মিনি হসপিটাল রয়েছে। দু:খের বিষয় আমার চেতনা না থাকায় আমি এ সব সুবিধা উপভোগ করতে পারলাম না। বিমানটি উড়ে গিয়ে আবুধাবীতে অবতরণের পর পুনরায় জ্বালানী নিয়ে বার্মিংহামের উদ্দেশ্যে উড়াল দিল।

হোস্টেলে আমার পিতামাতা অপেক্ষা করছিলেন। তারা ধারণা করেছিল তাদের পাসপোর্ট এবং ভিসা প্রস্তুতের প্রক্রিয়াধীন ছিল। তারা কয়েকদিন পরে তার সাথে মিলিত হবেন। কিন্তু তারা কিছুই শুনতে পেলেন না। তারা কোন ফোন পেলেন না। তাদের সীমাহীন অপেক্ষায় থাকতে হলো।

www.pathagar.com

অধ্যায় পাঁচ

দ্বিতীয় জীবন

وطن زما زه د وطن يم ـ كه د وطن د پاره مرم خوشحاله يمه

ওয়াতান জামা জা দা ওয়াতান ইয়াম
কা দা ওয়াতান দা পারা ম্রাম খুশালা ইয়ামা।

আমি একজন দেশপ্রেমিক, আমি আমার দেশকে ভালোবাসি
আর এ জন্যই আমি আনন্দের সাথে সব কিছু উৎসর্গ করছি।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

২৩

'বালিকাটির মাথায় গুলিবিদ্ধ, বার্মিংহাম'

গুলিবিদ্ধ হবার এক সপ্তাহ পরে ১৬ অক্টোবর আমি জেগে উঠলাম। আমি বাড়ি থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থান করছিলাম। আমার গলায় একটা টিউব লাগানো, যা আমার শ্বাসপ্রশ্বাসে সাহায্যে করছে। আমি কথা বলতে পারছিলাম না। আমার আর একটা সিটি স্ক্যান করা হলো। আমি স্বাভাবিক ভাবে জেগে উঠবার আগে চেতনা ও ঘুমের মাঝামাঝি স্তরে ছিলাম।

আমি আরোগ্য লাভ করলে প্রথমেই ভাবলাম, *আমি মারা যাই নি,আল্লাহকে ধন্যবাদ*। আমার কোনো ধারণা ছিল না আমি কোথায় আছি। আমি জানতে পারলাম যে আমি স্বদেশে নেই। নার্স ও ডাক্তাররা ইংরেজিতে কথাবার্তা বলছিলেন। মনে হচ্ছিল তারা বিভিন্ন দেশের লোক। আমি তাদের সাথে কথা বললাম, কিন্তু কেউই আমার কথা শুনলেন না। কারণ আমার গলায় টিউব লাগানো। আমার ব্রেন কাজ করছিল। আমার মনে প্রশ্ন জাগলো : *আমি কোথায় আছি? কে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন? আমার আব্বা- আম্মা কোথায়? আমার আব্বা কি বেঁচে আছেন? আমি আতঙ্কের মধ্যে আছি।*

ডা. ডেভিড আমার সাথে ছিলেন যখন আমাকে হাঁটাহাঁটি করানোর জন্য নিয়ে আসা হলো। তিনি বললেন, আমার ভয়ার্ত চাহনীর কথা তিনি কখনোই ভুলবেন না। তিনি আমার সাথে উর্দুতে কথা বলছিলেন। আমি জানতাম আমার নতুন জীবন আল্লাহর দান। মাথায় স্কার্ফ জড়ানো একজন ভদ্র মহিলা আমাকে বললেন, '*আস্‌সালামু আলাইকুম,*' এটা হচ্ছে আমাদের ঐতিহ্যবাহী মুসলিম অভিনন্দন রীতি। তারপর তিনি কোরআন তেলওয়াত করলেন। তিনি বললেন যে তার নাম রেহানা। তিনি একজন মুসলিম ধর্মযাজক। তার গলার স্বর সুমিষ্ট এবং তার মুখের কথাগুলো সুন্দর। আমি আবার ঘুমিয়ে পড়লাম।

আমি স্বপ্ন দেখলাম আমি আসলে হাসপাতালে নেই

পরদিন আবার জেগে উঠে লক্ষ্য করলাম আমি একটা সুন্দর সবুজ রুমের মধ্যে শুয়ে আছি। রুমটাতে কোনো জানালা নেই। ভিতরে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। এটাই হলো এলিজাবেথ হসপিটালের ইনটেনসিভ কেয়ার কিউবিসিল। সব কিছুই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও চকচকে। মিনগেরা হসপিটালের মত নয়।

www.pathagar.com

একজন নার্স আমাকে একটা পেন্সিল ও একটা প্যাড দিয়ে গেল। আমি সঠিক ভাবে লিখতে পারলাম না। শব্দগুলো লিখতে গিয়ে ভুল করলাম। আমি আব্বার ফোন নম্বর লিখতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু সংখ্যাগুলো পর পর লিখতে পারলাম না। অক্ষরগুলোও স্পেস দিয়ে লিখতে পারছিলাম না। ডা. জাভিদ একটা অ্যাল্‌ফাবেট বোর্ড এনে দিলেন যাতে আমি অক্ষরগুলো চিনতে পারি। আমি প্রথম 'ফাদার' ও কান্ট্রি বানান করতে পারলাম। নার্স আমাকে বললেন, আমি বার্মিংহামে আছি। তা কোথায় অবস্থিত সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিল না। মেয়েটি আমাকে একটা মানচিত্র এনে দিল। আমি মানচিত্র থেকে দেখলাম যে বার্মিংহাম ইংল্যান্ডে অবস্থিত। আমি জানতাম না কী ঘটেছিল। নার্সরা আমাকে কোনো কিছুই বললেন না। এমনকি আমার নাম পর্যন্ত না। আমি তখনো মালালা ছিলাম?

আমার মাথায় খুবই ব্যথা করছিল। আমাকে ইনজেকশন দেওয়া সত্ত্বেও আমার ব্যথা কমলো না। আমার কান দিয়ে রক্ত পড়তে লাগলো। বা'হাতটা ভাল ভাবে নাড়াতে পারছিলাম না। নার্স ও ডাক্তাররা আমার রুমে আশা যাওয়া করছিলেন। নার্সরা আমাকে নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন। প্রশ্নগুলোর জবাব ছিল ইতিবাচক। কেউই আমাকে জানালো না কী হয়েছে কিংবা কে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। আমি ভাবলাম তারা নিজেরা নিজেদেরই চেনে না। আমি অনুভব করলাম যে আমার মুখের বা'দিক সঠিকভাবে কাজ করছে না। আমি দূরের নার্স ও ডাক্তারদের দিকে তাকালাম, আমার বা'চোখ পানিতে ভরে গেল। আমি বা'কান দিয়ে শুনতে পারছিলাম। চোয়ালও ভালোভাবে নাড়াতে পারছিলাম না।

তারপর একজন দয়ালু ভদ্রমহিলা ডা. ফিওনা এসে আমাকে একটা সাদা টেড্ডি বিয়ার দিয়ে বললেন, আমরা একে জুনাইদ নামে ডাকবো। পরে তিনি বললেন, আমি জানি না জুনাইদ কে, তাই আমি তার নাম দিলাম লিলি। তিনি লেখার জন্য আমাকে গোলাপী রঙের একখানা এক্সারসাইজ বুক দিলেন। আমার কলম প্রথমে দুটো প্রশ্ন তাতে লিখলো,'কেন আমার আব্বা এখানে নেই? আমার আব্বার অর্থকড়ি নেই। কে এখানকার খরচ জোগাবে?'

'তোমার আব্বা নিরাপদেই আছেন,' তিনি জবাবে বললেন। 'তিনি পাকিস্তানে আছেন। অর্থকড়ি সম্বন্ধে তুমি দু:চিন্তা করো না।'

ভিতরে কেউ এলে আমি তাকেই বার বার একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছিলাম। তারা সবাই একই জবাব দিল। কিন্তু আমি তাদের কথায় মেনে নিলাম না। আমি কারো কথাই বিশ্বাস করতে পারছিলাম। যদি আমার আব্বা ভালো থাকেন তবে তিনি কেন এখানে নেই? আমি ভাবলাম আমার আব্বা- আম্মা জানেন না আমি কোথায় আছি। তারা মিদোরাগোরা বাজারের চকে আমাকে খুঁজছেন। আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না যে আমাদের পরিবার ভালো আছে। প্রথম দিকের সে সব দিনগুলোতে আমি একটা স্বপ্নের জগতে বাস করতাম। আমার মন পিছনে ফেলে আসা দিনগুলোর দিকে ফিরে গেল। আমি বিছানায় শুয়ে আছি। আমাকে

www.pathagar.com

ঘিরে অনেক লোক। এত লোক যে তাদের গুণে শেষ করা যায় না। 'আমার আব্বা কোথায়?' আমি ভাবলাম আমি গুলিবিদ্ধ হয়েছিলাম, কিন্তু তা নিশ্চিত নয় - আমি স্বপন দেখছি নাকি আমার স্মৃতি থেকে এ সব কথা ভাবছি।

এখানে অনেক খরচ লাগছে। পুরস্কারের অর্থের সিংহভাগ স্কুলের কাজে আমাদের গ্রাম শাংলায় একখন্ড জমি ক্রয়ের জন্য খরচ হয়েছিল। ডাক্তারদেরকে প্রায়ই একে অপরের সাথে শলাপরামর্শ করতে দেখলাম। আমি ভাবলাম তারা হয়তো বলাবলি করছেন, 'মালালার অথর্কড়ি নেই, তার চিকিৎসার খরচের অর্থ কে বহন করবে।' ডাক্তারদের মধ্যে একজন ছিলেন পোলিশ। তাকে সব সময়ই বিষণ্ন লাগতো। আমার মনে হলো তিনিই হয়তো এ হাসপাতালের মালিক। তিনি সব সময়ই মন মরা অবস্থায় থাকেন, আমি তাকে পেমেন্ট করিনি তাই হয়তো এমনটা থাকেন। আমি একজন নার্সকে কলম ও কাগজ আনার জন্য ইশারা করলাম। আমি লিখলাম, 'আপনার মন কেন দু:খ ভারাক্রান্ত? তিনি জবাবে বললেন, 'না আমি দু:খ ভারাক্রান্ত নই।' 'কে আপনাদেরকে পেমেন্ট দেবে?' আমি লিখলাম। 'আমাদের কোনো অর্থকড়ির দরকার নেই।' 'দু:চিন্তা করো না। তোমাদের সরকার আমাদেরকে পেমেন্ট দেবে।' তারপর থেকে তিনি আমাকে দেখলেই হাসতেন।

আমি সব সময়ই সব রকমের সমস্যার সমাধানের কথা ভাবতাম। আমি ভাবলাম ফোনে আমার আব্বা- আম্মার সাথে কথা বলতে হলে আমাকে হাসপাতালের রিসিপশনে যেতে হবে। কিন্তু আমার ব্রেন আমাকে জানান দিল, *তোমার কাছে ফোন করার মতো অর্থ নেই, তাছাড়া আমি কান্ট্রি কোডও জানি না।* তারপর আমি ভাবলাম, *তাহলে আমাকে বাইরে গিয়ে কাজ করে অর্থ আয় করতে হবে। তাহলেই আমি আমার আব্বার কাছে ফোন করতে পারবো।*

সবকিছুই আমার মনে তালগোল পাকিয়ে তুললো। আমি ভাবলাম ডা. ফিওনা আমাকে টেডি বিয়ারটা দিয়েছিলেন তার রঙ ছিল সবুজ। এখন তার সাদা হয়ে গেছে। 'সবুজ টেডিটা কোথায়?' আমি বার বার বলতে থাকলাম সবুজ বেয়ারটা কোথায়।

আমি ভুলে যাওয়া ইংরেজি শব্দগুলো মনে করার চেষ্টা করলাম। আমি নার্সদের উদ্দেশে লিখলাম। 'আমার দাঁত পরিষ্কার করার জন্য একটা তার দরকার।' তারা বুঝলেন আমি একটা খোসা জাতীয় কিছু চাচ্ছি। আমার দাঁতগুলো সুন্দর থাকলেও আমার জিব্বটা অসার লাগছিল। রেহানা এলে আমি স্বস্তিবোধ করতাম। তিনি আল্লাহর উদ্দেশে দোয়া দরুদ পড়তে থাকলে আমি তার সাথে সাথে আমার ঠোঁট মেলাতাম। তিনি দোয়া দরুদের শেষে 'আমিন' বলতেন (আমরা বলতাম 'আমেন')। টেলিভিশন বন্ধ করে রাখা ছিল। শুধুমাত্র মাস্টারচেফ অনুষ্ঠানটা দেখানো হতো। আমি মিনগোরা থাকাকালে এটা দেখতে

www.pathagar.com

পছন্দ করতাম। আমাকে খবরের কাগজ দেওয়া হতো না। পরে জেনে ছিলাম আমি আমাদের ওখানকার খবর পড়ে বিচলিত হয়ে পড়তে পারি ভেবে ডাক্তাররা আমাকে খবরের কাগজ পড়তে দিতেন না।

আমার আব্বা মারা যেতে পারেন এটা ভেবে আমি আতঙ্কিত ছিলাম। তারপরে ডা. ফিওনা এক সপ্তাহ আগের খবরের কাগজে প্রকাশিত আমার আব্বার ফটো আমাকে দেখালেন। আমার আব্বা জেনারেল কায়ানীর সাথে কথা বলছেন। আব্বার পাশে আমার ভাই বসে আছে। আমি শুধুমাত্র একজনের পা দু'খানা দেখতে পেলাম। 'আমার মায়ের পা হয়তো!' আমি লিখলাম।

তার একদিন পরে ডা. জাভিদ তার মোবাইল ফোন নিয়ে আমার কাছে এসে বললেন,'এখন আমরা তোমার আব্বা- আম্মার সাথে কথা বলবো।' আমার চোখদুটো চঞ্চল হয়ে উঠলো। ডা. আমাকে আদেশের সুরে বললেন, 'তুমি চিৎকার করে এমনকি ফুঁপিয়েও কান্নাকাটি করবে না।' তিনি আদেশের সুরে কথা বললেও তার কথার মধ্যে একধরনের মিষ্টতা ছিল। তিনি এমনভাবে কথা বললেন যেন আমি তার চিরচেনা। 'আর একটু সবল ও সুস্থ হলেই আমি তোমাকে মোবাইল ফোন দেব। ' আমি আমার মাথা নেড়ে তার কথায় সম্মতি দিলাম। তিনি ডায়াল করে ফোনটা আমার হাতে দিলেন।

আমি আমার আব্বার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। কিন্তু আমি তার সাথে কথা বলতে পারলাম না কারণ আমার গলায় তখনো টিউব লাগানো ছিল। আমি আব্বার গলার স্বর শুনতে পেয়ে খুশি হলাম। আমার ভেতরে যেন আনন্দের বান ডেকে গেল। 'আমি তাড়াতাড়িই আসছি।' আব্বা প্রতিজ্ঞা করলেন। 'ধৈর্য ধর, আমরা দু'দিনের মধ্যে তোমার সাথে মিলিত হবো।' তিনি আমাকে পরে বলেছিলেন যে, ডা. জাভিদ আব্বাকে আদেশ করেছিলেন তিনি যেন আমার সাথে কথা বলার সময় কান্নাকাটি না করেন। ডাক্তার চেয়েছিলেন আমরা উভয়েই যেন মনের দিক থেকে শক্ত থাকি। আমি ক্লান্ত না হয়ে পড়ি সে জন্য ফোনে আব্বা বেশিক্ষণ আমার সাথে কথা বললেন না। তখনো আমার মনে হচ্ছিল আব্বা আমার চিকিৎসার খরচপাতি যোগাতে না পারায় গ্রামের জমি এবং আমাদের স্কুল বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনি পাকিস্তানেই থেকে গেছেন। কিন্তু আমাদের জমির পরিমাণ তো সামান্য আর আমাদের স্কুল বিল্ডিং ও আমাদের বাড়ি তো ভাড়া করা। তাই তিনি কি বা বিক্রি করবেন? হয়তো তিনি ধনী লোকদের কাছ থেকে ঋণ করতে চাচ্ছেন।

*

আমাকে ফোন করার পরও আমার আব্বা ও আম্মা পুরোপুরি আমার সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে তারা আমার কণ্ঠস্বর শুনতে পেরেছিলেন না। তারা তখনো পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলোর থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। যারা তাদের

www.pathagar.com

সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করছিলেন তারা আব্বাকে বিভ্রান্তিকর খবর দিচ্ছিলেন। তাদের সাথে দেখা করতে আসা অন্যতম একজন ছিলেন সোয়াতের মিলিটারী অপারেশনের প্রধান মেজর জেনারেল গুলাম কুয়ামার।'ইউকে থেকে ভালো খবর এসেছে।' তিনি আব্বাকে বলেন। 'আমাদের কন্যা বেঁচে থাকায় আমরা খুবই খুশি।' তিনি বলেন 'আমাদের' কারণ আমি এখন জাতির কন্যা হিসাবে বিবেচিত।

জেনারেল আব্বাকে বলেন যে, তারা সারা সোয়াতের দরজায় দরজায় ওদেরকে তন্ন তন্ন করে খুঁজছেন। সীমান্তে বিশেষ নজরদারী জোরদার করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন যে তারা জানতে পেরেছে যারা আমাকে লক্ষ্যবস্তু করে তারা ছিল বাইশজনের একটা তালেবান দল। এ দলটি দু'মাস আগে আমার আব্বার বন্ধু জাহিদ খানকে গুলি করে হত্যা করে।

আব্বা কোনো কথা না বললেও মনে মনে তিনি তিক্তবিরক্ত ছিলেন। আর্মি যুগ যুগ ধরে বলে আসছে মিনগোরাতে কোনো তালেবান নেই। তারা সবাইকে বিতারিত করেছে। এখন জেনারেল তাকে বলছেন বাইশজন তালেবান তাদের শহরে দু'মাস ধরে ছিল। আর্মি জাহিদ খানের হত্যাকান্ডের পর বলেছিল তালেবানদের দ্বারা নয়, পারিবারিক কলহের কারণে তিনি নিহত হয়েছেন। এখন তিনি বলছেন তার মতই আমাকেও তালেবানরা লক্ষ্যবস্তু করে। আমার আব্বা বলতে চাইলেন 'আপনি জানতেন দু'মাস ধরে এ উপত্যকায় তালেবানরা অবস্থান করছিল। আপনি জানতেন তারা আমার কন্যাকে হত্যা করতে চেয়েছিল। তবে কেন আপনারা তা থামালেন না ?' আব্বা বুঝতে পারলেন এ সময় তাকে এ কথা বলা ঠিক হবে না।

জেনারেল তার কথা শেষ না করে বলে চলেন। তিনি আব্বাকে বলেন যদিও ভালো খবর আসায় আমার মধ্যে সচেতনা বৃদ্ধি পেয়েছে, তবুও আমার দৃষ্টিতে সমস্যা আছে। তার কথা শুনে আব্বা বিভ্রান্ত হলেন। কেমন ভাবে অফিসার এ সব তথ্য পেয়েছেন? আমি অন্ধ হয়ে যেতে পারি তার মুখ থেকে শুনে আমার আব্বা দু:চিন্তাগ্রস্ত হলেন। আব্বা আল্লাহের নামে শপথ করে বললেন, আমার মেয়ের চোখ নষ্ট হয়ে গেলে আমি আমার চোখ তাকে দেব। পরদিন আব্বা তাদের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা মেজরকে বললেন, 'আমি শুনেছি মালালা চোখে দেখতে পারছে না। আপনি কর্ণেল জুনাইদের সাথে কথা বলার জন্য আপনার ফোনটা আমাকে ধার দেন।'

ফোনে ডা. জুনাইদ এর সাথে যোগাযোগ করে মালালা অন্ধ হয়ে গেছে কিনা জানতে চাইলে তিনি জবাবে বললেন, 'ওটা একটা বোকার মত কথা,' 'যদি সে লিখতে ও পড়তে পারে তবে সে কিভাবে অন্ধ হবে? ডা. ফিওনা আমাকে মালালার সর্বশেষ অবস্থা জানিয়েছেন। মালালার লেখা প্রথম নোটে সে আপনার সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিল।'

www.pathagar.com

বার্মিংহাম অনেক দূরে, আমি একটা আয়না চাইলাম। 'আয়না', আমি গোলাপী ডাইরীতে লিখলাম- আমি আমার মুখ ও চুল দেখতে ইচ্ছে করলাম। নার্সরা আমাকে একটা ছোট সাদা আয়না এনে দিলেন, সেটা এখনো আমার কাছেই আছে। আয়নায় আমি নিজেকে দেখতে পেয়ে বড়ই দু:খ পেলাম। আমার লম্বা চুলগুলো কেতাদূরস্ত ছিল। এখন আর আমার মাথায় তা নেই। 'এখন আমার মাথায় ছোট ছোট চুল।' আমি বইয়ে লিখলাম। আমি ভাবলাম তালেবানরা আমার মাথার চুল কেটে ফেলেছিল। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানী ডাক্তাররা দয়ামায়া হীনভাবে আমার মাথা কামিয়ে দিয়েছিল। আমার মুখমন্ডল বিকৃত। কেউ যেন মুখটাকে একপাশে টেনে নামিয়ে দিয়েছে। আমার বা'চোখের দিকে একটা কাটা দাগ।

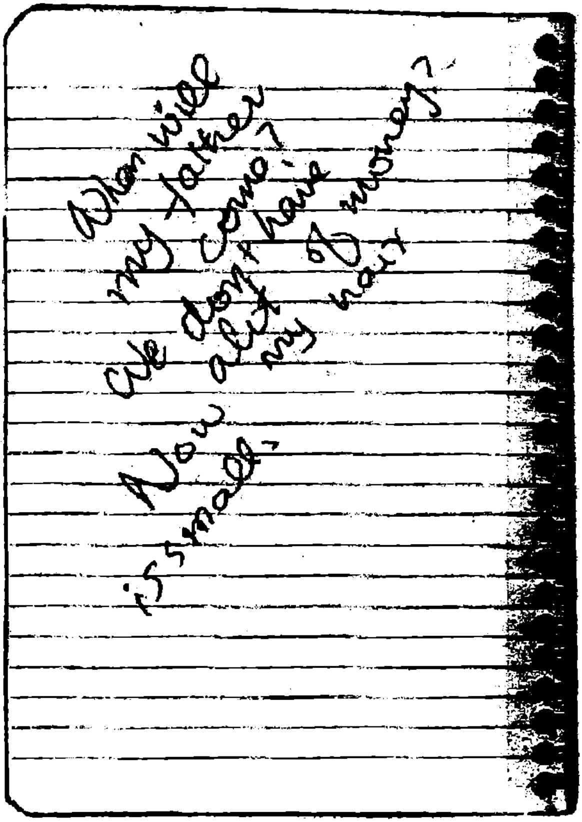

(ডাইরীর পাতা)

আমি লিখলাম। তখনো আমার লেখা অক্ষরগুলো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। 'আমার কী ঘটেছিল?'

www.pathagar.com

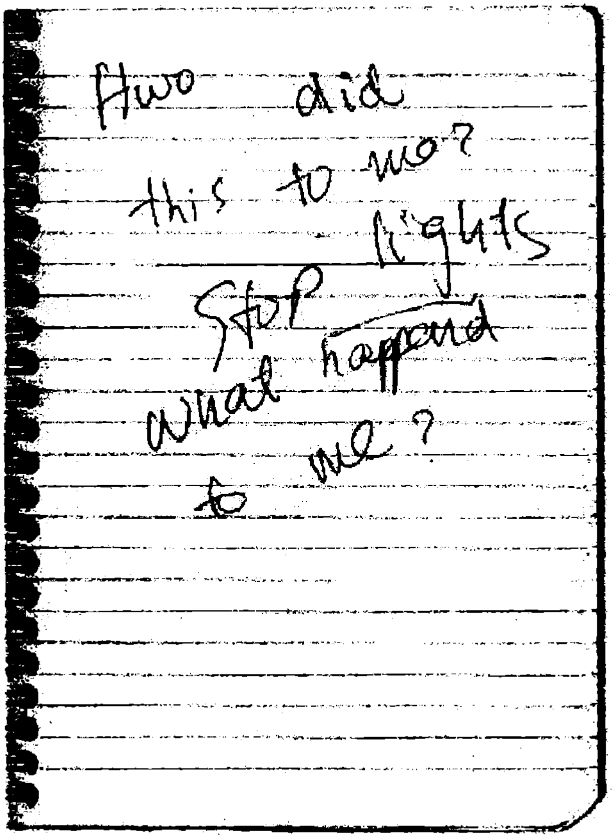

(ডাইরীর পাতা)

আমি আরো লিখলাম 'আলো নিভান। কড়া আলোতে আমার মাথা ব্যথা করছে।'

'তোমার খারাপ কিছু ঘটেছে।' ডা. ফিওনা বললেন।

'আমাকে কি গুলি করা হয়েছিল?' আমার আব্বাকেও কি গুলি করা হয়েছিল?' আমি লিখলাম।

ডা, ফিওনা আমাকে বললেন যে স্কুলবাসে আমাকে গুলি করা হয়েছিল। তিনি আরো বললেন, যে, বাসের বান্ধবীদের মধ্যে দু'জনকেও গুলি করা হয়। তিনি বিস্তারিতভাবে বললেন যে আমার চোখের বা'পাশ দিয়ে বুলেট প্রবেশ করে, সে জন্যই ওখানে কাটা দাগ। আমার বা'কাঁধের আঠারো ইঞ্চি নিচে দিয়ে বুলেট ঢুকে ভিতরেই তা থেকে যায়। এটা আমার চোখের ভিতর দিয়ে আমার ব্রেনে ঢুকতে পারতো। আমি বেঁচে আছি এটাই অলৌকিক ব্যাপার।

www.pathagar.com

আমি কোনো কিছুই মনে করতে পারছিলাম না। তবে আমার সবচেয়ে দু:খ ছিল যে তারা আমাকে গুলি করার আগে তাদের সাথে আমি কথা বলতে পারলাম না বলে। আমি তাদেরকে কী বলতে চেয়েছিলাম তারা তা জানতে পারলো না। যে লোকটি আমাকে গুলি করেছিল তার প্রতি আমার বিন্দুমাত্র খারাপ চিন্তা ছিল না- প্রতিশোধ নেবার মত আমার কোনো চিন্তা ভাবনাও আমার মনে ছিল না- আমি সোয়াতে ফিরে যেতে চাই। আমি বাড়ি যেতে চাই।

আমার মাথার মধ্যে ওই ছবিটা ভেসে ভেসে উঠতে শুরু করলো। কিন্তু আমি নিশ্চিত ছিলাম না কোনটা স্বপ্ন আর কোনটা বাস্তব। আমাকে গুলি করার যে গল্প আমি স্বপ্নে দেখছিলাম তার সঙ্গে বাস্তব ঘটনার মধ্যে পার্থক্য ছিল।

আমি আলাদা একটা বাসে আব্বা ও গুল নামে আমার এক বান্ধবীর সাথে বাড়ি ফিরছিলাম। বাড়ি যাবার পথে কালো পোশাক পরা দু'জন তালেবান আমাদের সামনে হাজির হয়। তাদের একজন আমার মাথায় বন্দুক রেখে গুলি করলে একটা ছোট্ট বুলেট আমার শরীরের মধ্যে ঢুকে যায়। এ স্বপ্নে আমি দেখতে পাই সে আমার আব্বাকেও গুলি করে মেরে ফেলা হয়। তারপর সবকিছু অন্ধকার হয়ে যায়। আমি একটা স্টেচারে শুয়ে আছি। আমার চারপাশ লোকে লোকারণ্য। প্রচুর লোক চার দিকে। আমার চোখ দুটো আমার আব্বাকে খুঁজতে থাকে। পরিশেষে আমি তাকে দেখতে পেয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করি। কিন্তু আমার মুখ দিয়ে কথা বের হয় না। আর একবার আমি স্বপ্নে অনেক জায়গার ছবি দেখি, ইসলামাবাদের জিন্নাহ মার্কেট, চীনা বাজার এবং আমাকে গুলি করার জায়গা। এমনকি আমি স্বপ্নে দেখলাম ডাক্তাররাও তালেবান।

আমি আরো সচেতন হবার পর আরো বিস্তারিতভাবে সব কিছু জানতে চাইলাম। আমার সাথে দেখা করতে আসা লোকজনদেরকে মোবাইল ফোন আনার অনুমতি ছিল না। ডা. ফিওনা এমার্জেন্সি বিভাগের চিকিৎসক হওয়ায় তার সাথে সব সময়ই আইফোন থাকতো। তিনি তার আইফোন আমার কাছে রাখলে গুগলে আমার নাম সার্চ করার চেষ্টা করলাম। আমি ভুল অক্ষরে টাইপিং করছিলাম। আমি আমার ইমেইল চেক করতে চাইছিলাম। কিন্তু আমার পাসওয়ার্ড মনে পড়লো না।

পাঁচ দিনের দিন আমি কথা বলতে পারলাম। কিন্তু গলা থেকে স্পষ্ট শব্দ বের হলো না। রেহানা আসলে আমাকে গুলি করা সম্বন্ধে তার সাথে আলোচনা করলাম। 'তারা আমাকে গুলি করে?' আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। 'হ্যাঁ,' তিনি জবাবে বললেন। 'মুসলিম বিশ্বের অনেক লোকই বিশ্বাস করে না একজন মুসলিম এ ধরনের কাজ করতে পারে।' তিনি বললেন। 'উদাহরণ হিসাবে আমার আম্মার কথা বলা যায়। তিনি বলেছেন যে, তারা মুসলিম নয়। কয়েকজন বলে তারা মুসলিম কিন্তু তাদের কাজ ইসলামিক নয়।' আমরা আলোচনা করলাম কোন কোন ঘটনার কারণে আমার প্রতি এ আচরণ করা হতে

www.pathagar.com

পারে। শুধু পুরুষদের নয় মেয়েদেরও শিক্ষার অধিকার ইসলামিক বিধানে স্বীকৃত। মেয়েদের স্কুলে যাবার কথা একজন মুসলিম মহিলার অধিকারের ভিত্তিতেই আমি বলেছিলাম।

*

এক সময় আমি কথা বলার শক্তি ফিরে পেলাম। ডা. জাভেদের ফোনে আমি আব্বা -আম্মার সাথে কথা বললাম। আমি আমার গলার স্বর সম্বন্ধে দু:চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম। 'আমার গলার শব্দ কি অন্য ধরনের লাগছে?' আব্বাকে জিজ্ঞাসা করলাম।

'না', তিনি জবাবে বললেন। 'তোমার গলার স্বর একই রকম আছে। তোমার গলার স্বর আরো ভালো হবে। তুমি ভালো আছো তো ?' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

'হ্যাঁ,' আমি জবাবে বললাম। তবে আমার মাথায় মারাত্মক ব্যথা হচ্ছে। আমি ব্যথা সহ্য করতে পারছি না। '

আমার আব্বা প্রকৃতপক্ষেই দু:চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। আমি অনুভব করলাম আমার চেয়েও তার মাথাব্যথা বেশি। আমাদের ফোনালাপের শেষের দিকে সব সময়ই তিনি জিজ্ঞাসা করতেন,'তোমার মাথা বেড়েছে না কমেছে?'

আমাদের আলোচনার শেষে বলতাম 'আমি ভালো আছি।' সুস্থ না থাকলেও তা তাকে বলে উদ্ভ্রান্ত করতে চাই নি। 'আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি আপনারা কবে আসছেন?'

তারপর এক সপ্তাহ বার্মিংহামের সাথে তাদের কোনো যোগাযোগ থাকে না। আমার আম্মা চরমভাবে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তিনি আব্বাকে বলেন, 'আগামীকালের মধ্যে মেয়ের কোনো খবর না পেলে আমি অনশন ধর্মঘট করবো।' আব্বা তাদের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত মেজরের সাথে দেখা করে তাকে সব কথা বলেন। মেজর এ বিষয়ে সচেতন হন। মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে আব্বাকে তারা তাদের সিদ্ধান্ত জানালো। পরদিন তাদের ইসলামাবাদে পৌঁছাতে বলা হলো। তাদের বার্মিংহামে যাবার ব্যাপারে সেখান থেকেই সব ব্যবস্থা করা হবে।

আব্বা বাড়ি ফিরে মাকে বললেন, 'তুমি একজন মহিয়সী মহিলা। এতদিন ভেবে এসেছি মালালা ও আমিই ক্যাম্পেনার। এখন দেখছি তুমিও ভালোভাবেই প্রতিবাদ করতে জান!'

তারা ইসলামাবাদের কাশ্মীর হাউসে এসে উঠলেন। এটা পার্লামেন্ট সদস্যদের একটা হোস্টেল। এখানেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুদৃঢ়। তারা সেখান থেকে আমার সাথে সহজেই ফোনে যোগাযোগ করতে পারলেন। আব্বা আমার সাথে কথা

www.pathagar.com

বললেন। আমাকে আম্মার এগারো ডিজিটের ফোন নম্বর টিপতে দেখে ডা. জাভেদ অবাক হলেন। তিনি এ থেকে উপলব্ধি করলেন যে আমার স্মৃতিশক্তি ভালই আছে। তখনো আমার এখানে পাঠানোর ব্যাপারে আমার আব্বা- আম্মা অন্ধকারেই ছিলেন। ডা. জাভিদও এ বিষয়ে বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েন। তিনি ফোন করে জানলেন সমস্যা আর্মি কর্তৃপক্ষের সাথে নয়, সমস্যা সিভিলিয়ান সরকার নিয়ে।

পরে তারা জানতে পারলেন আব্বা- আম্মাকে বার্মিংহামে তাদের অসুস্থ মেয়ের সাথে মিলিত হবার জন্য যে বিমানে যাবেন সে বিমানে আভ্যন্তরীণ মন্ত্রী রেহমান মালিকও যাবেন। তারা হাসপাতালে একটা প্রেস কনফারেন্স আয়োজন করবেন। এ সব ব্যবস্থা করার জন্যই সময় লেগেছিল। মন্ত্রী আরো নিশ্চিত হতে চাইছিলেন আমার আব্বা-আম্মা ব্রিটেনে রাজনৈতিক আশ্রয় চাইবেন কিনা। এটা চাইলে তার সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট হবে। তিনি স্পষ্ট করেই আমার আব্বা- আম্মার কাছে এ বিষয়টা জানতে চাইলেন যে তাদের এ ধরনের কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা। মজার ব্যাপার আমার আম্মার এ বিষয়ে কোনো ধারণাই ছিল না। অন্যদিকে আব্বা এধরনের কথা কখনোই ভাবেন নি।।

আব্বা- আম্মা কাশ্মীর হাউসে পৌঁছে শাজিয়ার আম্মা সোনিয়া শাহিদের সাথে দেখা করতে গেলেন। শাজিয়া আমাদের বান্ধবী, সে খুশাল স্কুলের মেয়েদের একজন। তিনি একবার আমাদের সবাইকে ইসলামাবাদ সফরের আয়োজন করেছিলেন। শাজিয়ার আম্মা ভেবেছিলেন তারা আমার সাথে ইউকে তে গেছেন। এখন তিনি দেখলেন তারা পাকিস্তানেই আছেন। তিনিও আতঙ্কিত ছিলেন। তারা তাকে বললেন যে, তাদের জন্য বার্মিংহামে বিমানের টিকেট নেই। সোনিয়া তাদের পোশাকপরিচ্ছদ এনে দিলেন। তারা তাদের কাপড়চোপড় সোয়াতে ফেলে রেখে এসেছেন। তিনি আব্বাকে প্রেসিডেন্ট জারদারির অফিসের নম্বর দিলেন। আব্বা শাজিয়ার দেওয়া ফোন নম্বরে কল করলেন এবং একটা মেসেজও পাঠালেন। সে রাতেই প্রেসিডেন্ট আব্বার সাথে কথা বললেন এবং ওয়াদা করলেন সব ব্যবস্থা তিনি করবেন। 'আমি জানি সন্তানদের থেকে আলাদা করে রাখার জ্বালা' তিনি বললেন। তাকে বছরের পর বছর জেলে আটকে রাখার কথাও উল্লেখ করলেন।

দু'দিনের মধ্যে তারা বার্মিংহামে আসছেন জানতে পেরে আমি আব্বাকে অনুরোধ করে বললাম,'আমার স্কুল ব্যাগটা দিয়ে আসবেন।' আমি তাকে আরো বললাম,'আপনি যদি সোয়াত যেতে না পারেন তবে ওটা আনার দরকার নেই- আমার জন্য নতুন বই কিনে আনবেন, কারণ মার্চ মাসে আমার বোর্ড পরীক্ষা।' অবশ্যই আমি ক্লাসে ফার্স্ট হতে চেয়েছিলাম।

আমি ভাবলাম আমি নভেম্বরের মধ্যে বাড়িতে ফিরে যেতে পারবো।

আব্বা-আম্মা আসার আগে আমার দশটা দিন শেষ হলো। ওই দশটা দিন তাদের ছাড়াই আমি হাসপাতালে কাটিয়েছি। কিন্তু আমার মনে হলো, আমি যেন

www.pathagar.com

তাদের ছাড়া একশ'দিন কাটিয়েছি। হাসপাতালের দিনগুলো ছিল বিরক্তিকর। আমি ওই দিনগুলোতে ভালোভাবে ঘুমাতে পারি নি। আমি আমার রুমের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে থাকতাম। খুব সকাল সকাল আমার ঘুম ভেঙ্গে যেত। আমি নার্সদের আসার অপেক্ষায় সকাল ৭ টা কখন বাজবে সে আশায় ঘড়ির কাটার দিকে চেয়ে থাকতাম। ডা. ফিওনা ও নার্সরা আমার সাথে গেমস খেলতেন। কিউইএইচ (কুইন এলিজাবিথ হসপিটাল) শিশুদের হাসপাতাল নয়। তাই আমার সাথে গেমস খেলার এ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমার প্রিয় গেমস ছিল কানেক্ট ৪। আমি প্রায়ই ডা. ফিওনাকে হারাতে পারতাম না। তাছাড়া সবাই আমার কাছে হেরে যেত। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূর দেশের এ হাসপাতালে থাকায় নার্স ও হসপিটাল স্টাফ দু:খ বোধ করতেন। তারা আমার প্রতি খুবই দয়ালু ছিলেন। বিশেষ করে অপারেশন ডিরেক্টর ইমা চৌধুরী এবং নার্সদের প্রধান জুলি ট্রাসি। তারা আমার পাশে বসে প্রায়ই আমার হাত ধরতেন।

আমার সাথে শুধুমাত্র পাকিস্তান থেকে আনা একটা শাল ছিল। কর্ণেল জুনাইদ শালটা আমাকে দেবার জন্য ডা. ফিওনার কাছে দিয়েছিলেন। আমার জন্য কিছু কাপড় কিনতে তারা কাপড়ের দোকানে গিয়েছিলেন। পোশাকেআশাকে আমি কতটা রক্ষণশীল কিংবা সোয়াত উপত্যকার একজন টিনএজার গার্ল কি ধরনের পোশাক পরে সে সম্বন্ধে তাদের কোনো ধারণা ছিল না। তারা পাশের ব্রিটিশ হোম স্টোরসে গিয়ে ব্যাগে করে টি-শার্ট, পাজামা, মোজা এবং এমনকি ব্রা পর্যন্ত নিয়ে এলেন। ইমা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমি শালওয়ার কামিজ পছন্দ করি কিনা। আমি মাথা নেড়ে সম্মতি দিলে তিনি আবার জানতে চাইলেন 'তোমার প্রিয় রঙ কী?' আমি জবাবে বললাম, 'অবশ্যই গোলাপী।'

আমি খাওয়া দাওয়া করছিলাম না বলে তারা চিন্তিত ছিলেন। আমি হাসপাতালের খাবার পছন্দ করতাম না। হালাল খাবার কিনা সে সম্বন্ধে আমি দু:চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম। আমি শুধুমাত্র দুধের তৈরি পুষ্টিকর খাবারই খাচ্ছিলাম। নার্স জুলি বুঝতে পারলেন যে, আমি কী খাবার খেতে পছন্দ করি। তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন,'আমি কী খাবার পছন্দ করি? 'আমি জবাবে বললাম, 'ফ্রাইড চিকেন' ইমা ছোট্ট একটা দোকানে হালাল ফ্রাইড চিকেনের বিক্রি হবার কথা জানতে পেরে তিনি প্রতিদিন বিকালে আমার জন্য সেখান থেকে চিকেন ও চিপ কিনে আনতেন। একদিন তিনি আমার জন্য একটা কারিও রান্না করলেন।

আমার মন ভালো করার উদ্দেশ্যে তারা আমার জন্য একটা ডিভিডি প্লেয়ার এনে দিলেন। প্রথম মুভিগুলোর মধ্যে একটা ছিল *বেন্ড ইট লাইক বেকহাম*, তার কৃষ্টি ও আদর্শের বিরুদ্ধে এক শিখ বালিকা'র চ্যালেঞ্জিং এর গল্প ও ফুটবল খেলা যা দেখে আমি বিচলিত হলাম। বালিকারা তাদের গায়ের জামা খুলে স্পোর্টস ব্রা পরে ফুটবল অনুশীলন করার দৃশ্য দেখে আমি বড়ই মর্মাহত হলাম। আমি নার্সদের দিয়ে ডিভিডি প্লেয়ারের সুইজ অফ করালাম। তারপর তারা কার্টুনস ও ডিজনি মুভিস নিয়ে এলো। আমি শ্রেক মুভিসএর তিনটা এ শার্ক'স টেল নামের

www.pathagar.com

ছবি দেখলাম। এক নাগাড়ে ছবি দেখায় আমার বা'চোখের দৃষ্টি অস্পষ্ট লাগছে বলে অনুভব করলাম। কটন- উল বল দিয়ে কান পরিষ্কার করায় আমার বা'কান দিয়ে রক্ত বের হতে লাগলো। একদিন আমি একজন নার্সকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ পিন্ডটা কী?' আমার পাকস্থলী ছিল বড় ও শক্ত আমি জানতাম না কেন এমনটা হয়েছিল।

'এটা তোমার মাথার খুলির উপরের অংশ।' সে জবাবে বললো। আমি তার কথা শুনে বিচলিত হলাম।

আমি কথা বলতে পারার পর থেকে আমি হাঁটতেও শুরু করলাম। পা ও হাতে কোনো সমস্যা অনুভব করলাম না। কারণ আমার বা'কাঁধের পাশ দিয়ে বুলেট ঢুকেছিল। তাই আমি বুঝতে পারি নি কেন আমি ভালোভাবে হাঁটতে পারবো না। কয়েক পা হাঁটতে আমার কষ্ট হলো, আমার মনে হলো আমি যেন এর মধ্যে এক শ' মাইল হেঁটেছি। ডাক্তার আমাকে বললেন, আমি ভালই হাঁটতে পেরেছি; আমার ম্যাসলগুলো যাতে আগের মতো কাজ করতে পারে তার জন্য আমাকে প্রচুর ফিজিওথেরাপি নিতে হবে।

একদিন আর এক ফিওনা এলেন। ভদ্রমহিলা হলেন হাসপাতালের প্রেস অফিসের ইনচার্জ ফিওনা আলেক্সজান্ডার। আমি ভাবলাম, এটা একটা মজার ব্যাপার। সোয়াত সেন্ট্রাল হসপিটালে একটা প্রেস অফিস থাকতে পারে তা আমি কল্পনা করতে পারলাম না। তার সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণা ছিল না। আমি যখন পাকিস্তান থেকে বিমানে ইউকে এর উদ্দেশ্যে রওনা হই তখন সম্ভবত পাকিস্তানে খবরের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি ছিল। কিন্তু পাকিস্তান ছেড়ে চলে আমি ইউকে তে চলে আসার সময়ের ফটোগ্রাফ লিক আউট হয়ে দেশের বাইরে চলে আসে। মিডিয়া প্রচার করেছিল আমার গন্তব্য বার্মিংহাম। একটা স্কাই নিউজ হেলিকপ্টার মাথার উপরে বৃত্তাকারে উড়ছিল। ২৫০ জনের মত সাংবাদিক হাসপাতালে এসেছিলেন। তাদের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া এবং জাপানের সংবাদিকও ছিলেন। ফিওনা আলেক্সজান্ডার বিশ বছর যাবত সাংবাদিকতা পেশার সাথে সম্পৃক্ত আছেন। তিনি বার্মিংহাম পোস্ট এর সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। হাসপাতাল আমার প্রতিদিনের অবস্থা সম্পর্কে তাকে ব্রিফ করতো।

লোকজন আমাকে দেখার জন্য অপেক্ষায় ছিলেন- সরকারের মন্ত্রী, ডিপ্লোম্যাট, রাজনীতিবিদ এমন কি ক্যানটাবারির আর্চবিশপও একটা প্রতিনিধি দল নিয়ে আসলেন। অধিকাংশই সুন্দর সুন্দর ফুলের তোড়া উপহার দিলেন। একদিন ফিওনা আলেক্সজান্ডার এক ব্যাগ কার্ড, খেলনা এবং ছবি নিয়ে আসলেন। সে দিন ছিল ঈদ-উল- আজহা,'আমাদের বড় ধর্মীয় উৎসব। সুতরাং আমি ভাবলাম এগুলো হয়তো মুসলিমরা আমাকে পাঠিয়েছেন। তারপর আমি পোস্ট করার তারিখ দেখলাম ১০ অক্টোবর, ১১ অক্টোবর ও তার আগে। এ থেকে আমি বুঝলাম এগুলো ঈদের উপহার নয়। আমার দ্রুত আরোগ্য কামনা করে সারা পৃথিবী থেকে শুভেচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ এগুলো পাঠানো হয়েছে। প্রেরকদের

www.pathagar.com

মধ্যে স্কুল ছাত্রছাত্রী ছিল। আমি এগুলো দেখে অবাক হলাম। অন্য দিকে ফিওনা হেসে বললেন, 'তুমি তো কোনো কিছুই এখনো দেখোই নি।' বস্তা বস্তার চেয়েও বেশি, ৮০০০ কার্ড। অনেকেই শুধু সম্বোধন করেছিলেন, 'মালালা, বার্মিংহাম হসপিটাল'। একজন সম্বোধন করেছিলেন,'মাথায় গুলিবিদ্ধ বালিকা, বার্মিংহাম'।

রেহানা আমাকে বললেন যে, সারাবিশ্বে হাজার হাজার এবং লক্ষ লক্ষ লোক ও শিশু আমাকে সমর্থন করে আমার জন্য প্রার্থনা জানিয়েছে। তারপর আমি উপলব্ধি করলাম যে, লোকজন আমার জীবন রক্ষা করতে চায়। লোকজন অন্যান্য উপহারও পাঠিয়েছিল। সে সব উপহার সামগ্রীর মধ্যে ছিল বাক্স বাক্স চকলেট ও বিভিন্ন আকার আকৃতির টেডি বেয়ার। সম্ভবত বেনজির ভুট্টোর ছেলে বিলওয়া ও বখতাওয়ারের কাছ থেকে সবচেয়ে মূল্যবান পার্সেল এসেছিল। পার্সেলের ভিতরে ছিল দুটো শাল যার মালিক ছিলেন তাদের মা। আমি শাল দুটোতে আমার নাক লাগিয়ে তার সুগন্ধ নেবার চেষ্টা করছিলাম। পরে আমি পার্সেলের মধ্যে একটা কাল লম্বা চুল দেখতে পেয়েছিলাম। সেটা ছিল আমাকে পাঠানো বিশেষ উপহার।

আমি উপলব্ধি করলাম তালেবান আমাকে বিশ্বাঙ্গনে বিশেষ ভাবে পরিচিত করে তুলেছে। আমি বিছানায় শুয়ে নতুন বিশ্বে আমার প্রথম পদক্ষেপ রাখার অপেক্ষায় ছিলাম। গর্ডন ব্রাউন, ইউএন স্পেশিয়াল এনভয় ফর এডুকেশন এবং ব্রিটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী একটা আবেদন রেখেছিলেন এ স্লোগানকে সামনে রেখে 'আই অ্যাম মালালা' যে ২০১৫ সালের মধ্যে কোন শিশু স্কুলে যাওয়া থেকে বিরত থাকবে না এ দাবী তুলে। রাষ্ট্র প্রধান, মন্ত্রী এবং মুভি স্টাররা এবং আমাদের দেশের শেষ ব্রিটিশ গভর্নর স্যার ওস্ক ক্যারো এর প্রপুত্রী মেসেজ পাঠিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন তিনি এ ব্যাপারে লজ্জিত, তিনি পশতু ভাষায় লিখতে ও পড়তে পারতেন না পারলেও তার পিতামহ অনর্গল ওই ভাষা বলতে পারতেন। বেয়োন্স আমাকে একটা কার্ড পাঠিয়েছিলেন এবং ফেসবুকে একটা ফটো পোস্ট করেছিলেন। সেলেনা গোমেজ আমাকে নিয়ে গান লিখেছিলেন আর ম্যাডোনার একটা গান আমার নামে উৎসর্গ করেছিলেন। এমন কি আমার প্রিয় অভিনেত্রী ও সমাজকর্মী অ্যাঞ্জেলা জোলি আমাকে একটা মেসেজ পাঠিয়েছিলেন-মবিনাকে এ সব কথা বলার জন্য আপেক্ষা করতে পারলাম না।

আমি তখন বুঝতে পারিনি যে, আমি বাড়ি ফিরে যেতে পারবো না।

www.pathagar.com

২৪

'তারা তার হাসি ছিনিয়ে নিয়েছিল'

আমার আব্বা-আম্মা বার্মিংহামের উদ্দেশ্যে যে দিনটিতে বিমানে আসছিলেন সেদিনটিতে আমি ইনসেন্টিভ কেয়ার থেকে বের হয়ে ৫১৯নং ওয়ার্ডের৪নং রুমে এলাম। রুমটির জালানাগুলো দিয়ে আমি প্রথম ইংল্যান্ডকে দেখতে পেলাম।'কোথায় পর্বতমালা আছে?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম। এটা ছিল কুয়াচ্ছন্ন এবং বৃষ্টিস্নাত এমনটাই আমি ভেবেছিলাম। আমি তখন জানতাম না এটা ছিল অল্পস্বল্প সূর্যের একটা দেশ। আমি বাড়িঘর ও রাস্তাঘাট দেখতে পেলাম। বাড়িগুলো লাল ইটের তৈরি আর সবগুলোই দেখতে একই রকমের। সব কিছুই খুবই শান্ত ও ছিমছাম। লোকজন এমনভাবে চলাচল করছে যেন কোথাও কিছুই হয় নি।

ডা. জাভেদ আমাকে বললেন, আমার আব্বা- আম্মা আসছেন তাই আমার বিছানা গোছগাছ করা হয়েছিল যাতে আমি বিছানায় বসে আমার আব্বা-আম্মা এসে পৌঁছালে তাদের অভ্যর্থনা জানাতে পারি। আমি খুবই উৎফুল্ল ছিলাম। ষোলদিন আগে সকালে মিঙ্গোরা আমাদের বাড়ি থেকে তাদেরকে চিৎকার করে গুডবাই বলে বের হয়েছিলাম। আমাকে চারটা হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে হয়েছিল এবং আমাকে হাজার হাজার মাইল পড়ি দিয়ে এ হাসপাতালে াবস্থান করতে হচ্ছিল। আমার কাছে মনে হলো এ সময় যেন ষোলটা বছর। তারপর দরজা খুলে গেলে আমার পরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে এলো 'জানি' এবং 'পিশো', তারা আমার হাত দুটোতে চুমু দিল। তারা আমাকে স্পর্শ করতে ভয় পাচ্ছিলেন।

আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছিলাম না। আমি যতটা পারলাম শব্দ করে কেঁদে ফেললাম। সব সময়ই আমি একা ছিলাম। কিন্তু এমন করে কখনো কেঁদে উঠিনি। তা আমাকে ইনজেকশন দেওয়া কিংবা আমার মাথার খুলি কেটে ফেলার সময়ও এমন করে কেঁদে উঠিনি। কিন্তু এখন আর আমি কান্না থামিয়ে রাখতে পারলাম না। আমার আব্বা-আম্মা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন। আমার মন থেকে যেন সব বোঝা সরে গেছে। আমার মনে হলো সব কিছু এখন সুন্দর হয়ে উঠবে। এমন কি আমি আমার ভাই খুশালকে দেখেও খুশি হলাম। বাড়িতে থাকাকালে আমরা পরস্পর খুনসুটি করতাম। 'আমরা তোমাকে হারিয়ে ছিলাম মালালা,' আমার ভাইয়েরা বললো। এখন

www.pathagar.com

তারা আমার সব রকমের উপহার সামগ্রীর চাইতে প্রিয়। খুশাল ও আমি আবার মারামারি করবো যখন ও আমার ল্যাপটপ নিয়ে গেম খেলতে শুরু করবে। আমি আব্বা ও আম্মার চেহারা দেখে মর্মাহত হলাম। তারা পাকিস্তান থেকে বিমানের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আসায় ক্লান্ত হওয়া স্বাভাবিক হলেও তাদেরকে যেন অনেকটা বুড়ো দেখাচ্ছে। তাদের উভয়েরই চুল ধুসর বর্ণ ধারণ করেছে। তারা নিজেদের আসল চেহারা লুকানোর চেষ্টা করছেন। ডা. জাভেদ তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, 'আপনারা দেখতে পাবেন মেয়েটি দশ পার্সেন্ট আরোগ্য লাভ করেছে। এখনো নব্বই পার্সেন্ট ভালো হতে বাকী আছে।' কিন্তু তাদের কোন ধারণা নেই যে আমার মুখের অর্ধেকটা কাজ করছে না। এখনো আমি হাসতে পারি না। আমি আমার বা'চোখ দিয়ে স্পষ্ট দেখতে পারি না। আমার মাথার অর্ধেকটাতে চুল নেই। আমার মুখ একদিকে বেঁকে আছে। আমি এক কান দিয়ে কিছু শুনতে পারি না। আমি শিশুদের ভাষার মত শব্দে কথা বলি। যেন আমি একটা শিশু।

আমার আব্বা-আম্মাকে একটা ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তাদের হোস্টেলে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। হাসপাতালের দায়িত্বে থাকা লোকজন ভাবলেন তাদেরকে হাসপাতালে রাখায় অসুবিধা হচ্ছে। কারণ তাদেরকে সাংবাদিকদের মুখে পড়তে হবে। আমার আরোগ্য লাভের সংকটপূর্ণ মুহূর্তে তারা আমাদের সুরক্ষা দিতে চাইলেন।

আমার আব্বা-আম্মা যা পরিধান করে এসেছিলেন তার বাইরে যৎসামান্য পোশাক পরিচ্ছদ তারা নিয়ে এসেছিলেন। শাজিয়ার আম্মা সোনিয়া তাদের যে কাপড়চোপড় দিয়েছিলেন সেগুলোই তাদের সম্বল ছিল। ৯ অক্টোবর বাড়ি থেকে আসার সময় তারা বাবতে পারছিলেন না যে, তারা আবার বাড়ি ফিরে যেতে পারবেন না। তারা হোস্টেল রুমে ফিরে গিয়ে শিশুদের মত কান্নাকাটি করেন। আমি সব সময়ই একজন সুখী সন্তান ছিলাম। আমার আব্বা ~~'আমার স্বর্গীয়~~ হাসি ও স্বর্গীয় হাস্যজ্জ্বল' মুখশ্রীর জন্য লোকজনের কাছে প্রশংসিত ছিলেন। 'সেই সুন্দর মুখশ্রী, সেই উজ্জ্বল মুখমন্ডল এখন আর তার নেই। সে তার হাসি আর হাস্যোজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলেছে। তালেবানরা বড়ই নিষ্ঠুর- তারা তার হাসি ছিনিয়ে নিয়েছে। 'আব্বা বললেন। 'আপনি কাউকে চোখদুটো আর লাংস দিতে পারেন কিন্তু আপনি তার মুখের হাসি পুনোরুদ্ধার করতে পারবেন না।'

একটা ফ্যাসিয়াল নার্ভের সমস্যা ছিল। ডাক্তাররা এ বিয়য়ে নিশ্চিত ছিলেন না এটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিনা আর এটা আপনাআপনিই ঠিক হয়ে যাবে কিনা। কিংবা এটা কেটে ফেলতে হবে কিনা।

আমি আম্মাকে পুনরায় নিশ্চয়তা দিলাম যে, এটা আমার জন্য কোনো একটা বিষয় না যদি আমার মুখমন্ডল আগের মত নাও হয়। কে আমার চেহারার কথা ভেবে রেখেছে, আমার চুল দেখতে কেমন ছিল! যদি আপনি আমাকে মৃত দেখতেন তবে সবইতো

www.pathagar.com

শেষ হয়ে যেত।'এটা কোনো বিষয় নয় যদি আমি ভালোভাবে হাসতেও না পারি।' আমি তাকে বললাম। 'আমি এখনো মালালাই আছি। এটাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আল্লাহ আমার জীবন রক্ষা করেছেন।' তবুও তারা সব সময়ই হাসপাতালে আসছিলেন। আর আমি হাসলাম কিংবা হাসার চেষ্টা করলাম। আমার আম্মার মুখমন্ডল কালো হয়ে গেল যেন তার মুখে একটা কালো ছায়া পড়লো। এটা যেন একটা আয়না- কখনো আমার মুখে হাসি না থাকলে আমার আম্মার মুখের হাসি মিলিয়ে দু:খের ছায়া পড়বে।

আব্বা আমার আম্মার মুখের দিকে তাকালেন। তিনি দেখতে পেলেন আম্মার চোখে একটাই প্রশ্ন; *কেন মালালা এমন হয়ে গেছে?'* মেয়েটি পৃথিবীতে ভূমিষ্ট 'হবার পর থেকে পনেরো বছর পর্যন্ত তার মুখে হাসি লেগে ছিল। একদিন আব্বা আম্মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, *'পেকাই,* সত্যি করে বলতো, তুমি কী ভাব- এটা কি আমার দোষ?'

'না, *খাইস্তা,'* আম্মা জবাবে বলেছিলেন। "তুমি মালালাকে বাইরে চুরিচামারি, খুনখারাবি কিংবা অপরাধ করার জন্য পাঠিয়েছিলে না।'

এমন কি আমার আব্বা এ ভেবে ভীত ছিলেন যে, ভবিষ্যতে সব সময় তার হাসির কারণে গুলিবিদ্ধ হবার মত ব্যাপার হতে পারে। ওইটা একমাত্র কারণ ছিল না। তারা আমার মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলেন। সোয়াতে আমি খুবই দুর্বল ও স্পর্শকাতর শিশু ছিলাম যার মন সামান্যের জন্যও কেঁদে উঠতো। কিন্তু বার্মিংহামের হাসপাতালে যখন আমার ভয়ঙ্কর ব্যথায় কুঁকড়ে যাচ্চিলাম তখনো আমি সে ব্যথার কথা কাউকে জানাই নি।

অনেক অনুনয় বিণয় করা সত্ত্বেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ভিজিটরদেরকে আমাকে দেখার অনুমতি দেয় নি, কারণ তারা চেয়েছিলেন আমি যাতে একান্তে থেকে সুস্থ হয়ে উঠতে পারি। আব্বা-আম্মা আসার চারদিন পরে তিনটি দেশ থেকে একদল রাজনীতিবিদ এসেছিলেন আমাকে সাহায্য করার উদ্দেশে- তাদের মধ্যে ছিলেন পাকিস্তানের অভ্যন্ত রীণ বিষয়ক মন্ত্রী রেহমান মালিক, ব্রিটিশ পররাষ্টমন্ত্রী উইলিযাম হগ, ইউএই এর পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ আব্দুল্লাহ বিন জায়েদ। তাদেরকে আমার সাথে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। তবে ডাক্তাররা আমার অবস্থা সম্বন্ধে তাদেরকে ব্রিফ করেছিলেন। আব্বা তাদের সাথে মিলিত হয়েছিলেন। মিনিস্টারদের ভিজিটের ফলে আব্বার মধ্যে হতাশা দানা বেঁধে উঠেছিল। কারণ রেহমান মালিক আব্বাকে বলেছিলেন, 'মালালাকে বলুন সে যেন জাতির প্রতি নজর দিয়ে তার একটা হাসি হাসা উচিত।' রেহমান মালিক কিন্তু জানতেন না যে, ওই একটি জিনিসই আমি করতে পারিছিলাম না।

রেহমান মালিক ব্যক্ত করলেন যে, আতাউল্লাহ খান নামে একজন তালেবান আমার আক্রমণকারী। তিনি বলেন ২০০৯ সালে সোয়াতে মিলিটারী অপারেশনের সময় তাকে

www.pathagar.com

গ্রেফতার করা হয়েছিল। কিন্তু গ্রেফতার হবার তিন মাস পরেই সে মুক্তি পায়। মিডিয়ার প্রতিবেদনে জানা যায় যে, সে জেহানজেব কলেজ থেকে ফিজিক্সে ডিগ্রি নেয়। মালিক দাবী করেন তাদের পরিকল্পনা ছিল আমাকে গুলি করার মাঝ দিয়ে আফগানিস্তানে অভিসন্ধি হাসিল করা। তিনি বলেন, আতাউল্লাহ খানের মাথার দাম ১ মিলিয়ন ডলার ঘোষণা করা হয়েছে। তারা শপথ নিয়েছে যে কোনো মূল্যে তারা তাকে পাকড়াও করবে। আমরা সন্দেহ করলাম যে, কেউই ধরা পরবে না- এখনো বেনজির ভূট্টোর খুনি ধরা পড়ে নি। জেনারেল জিয়ার বিমান ক্রাসে নিহত হবার পিছনে কে কারা জড়িত ছিল তার সন্ধান আজও খুঁজে পাওয়া যায় নি। আমাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের খুনের পিছনে ককে বা কারা ছিল তার হদিস পাওয়া যায় নি।

আমাকে গুলি করার পর মাত্র দু'জন লোককে গ্রেফতার করা হয়েছিল- আমাদের প্রিয় বেচারা ড্রাইভার ওসমান ভাই জান এবং স্কুলের একাউন্ট্যান্টকে। এবং স্কুলের একাউন্ট্যান্ট কয়েকদিন পরেই মুক্তি পান। কিন্তু বেচারা ড্রাইভার ওসমান ভাই জান এখনো আর্মি কাসস্টোডিতে আছেন। তারা বলছে আক্রমণকারীদের সনাক্ত করার জন্য তার প্রয়োজন। আমরা তাকে আটকে রাখার জন্য হতাশ। তারা আতাউল্লাহকে আটকিয়ে না রেখে ওসমান ভাই জানকে কেন আটকিয়ে রাখলো?

আমাকে গুলিবিদ্ধ করার এক মাস এক দিন পর ১০ নভেম্বর কে ইউনাইটেড স্টেটস মালালা দিবস হিসাবে ঘোষণা করলো। আমি সে বিষয়ে মনোযোগ দিলাম না কারণ একদিন পরে আমার ফ্যাসিয়াল নার্ভের বড় ধরনের অপারেশন। ডাক্তাররা বলেছেন, এ অপারেশনটা না করালে আমার মুখটা প্যারালাইসড হয়ে যেতে পারে। হাসপাতাল প্রতিদিন আমার অবস্থা সম্বন্ধে সাংবাদিকদেরকে প্রতিবেদন জানাতে লাগলো। আমার অপারেশন সম্বন্ধে তারা তাদেরকে কিছু জানালো না।

রিচার্ড আরভিং নামের একজন সার্জনের দ্বারা অপারেশন করানোর জন্য ১১ নভেম্বর আমাকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হলো । তিনি আমাকে ব্যাখ্যা করে বললেন এ নার্ভটা আমাদের মুখের পাশকে নিয়ন্ত্রণ করে। এটা আরো কাজের মধ্যে বা'চোখের পাতা খোলা ও বন্ধ করা, নাককে নাড়ানো, আমার ভ্রু উপরের দিকে তোলা এবং আমাকে হাসতে সাহায্য করা। নার্ভটাকে অপারেশন করে স্বাভাবিক অবস্থায় আনা খুবই জটিল কাজ। এটা করতে সাড়ে আট ঘন্টা লাগবে। সার্জন প্রথমে আমার কানের নালীর কাটা টিস্যু ও বোনগুলো পরিষ্কার করলেন। তারপর তিনি আবিষ্কার করলেন আমার বা'দিকের এয়ার ড্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারপর তিনি আমার ফ্যাসিয়াল নার্ভ পরীক্ষা করলেন। সেখানে মাথার খুলি থেকে টুকরো হাড় ঢুকে আছে। তিনি সেখান থেকে অনেকগুলো হাড়ের টুকরো অপসারণ করলেন। এগুলো ওখানে থাকায় আমার চোয়ালের মুভমেন্ট বাধাগ্রস্ত হচ্ছিল। তিনি দেখতে পেলেন দু'সেন্টিমিটার নার্ভ পুরোপুরি ভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। যার ফলে আমার কানের সাথে একটা গ্যাপের সৃষ্টি হয়েছে। তিনি ওই গ্যাপটাকে মেরামত করলেন।

www.pathagar.com

অপারেশন ভালোভাবেই সম্পন্ন হলো। যদিও আমার মুখ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে তিন মাস সময় লাগবে। মুখের স্বাভাবিক অবস্থা দিনে দিনে ফিরে আসবে। আমার ছোট্ট আয়নাটির সামনে আমাকে প্রতিদিন ফ্যাসিয়াল এক্সারসাইজ করতে লাগলাম। মি. আরভিং আমাকে বললেন যে, ছয় মাস পরে আমার এ নার্ভটা সঠিক ভাবে কাজ করতে পারবে। তার আগে এ নার্ভটি পুরোপুরি সঠিক ভাবে কাজ করতে পারবে না। আমি দিনের আলোতে হাসতে ও চোখ মিটমিট করতে পারলাম। আমার আব্বা- আম্মা সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে দেখতে পেলেন আমার মুখের নড়াচড়া স্বাভাবিক হয়ে আসছে। এটা লক্ষ্য করে তাদের মনে আমার সুস্থ হয়ে উঠা সম্বন্ধে আশা জাগলো। আরভিং বললেন, আমি বিশ বছর ধরে ফ্যাসিয়াল নার্ভের সাজারী করে আসছি। আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি নার্ভে ৮৬ পার্সেন্ট রিকভারি সম্ভব।

আর একটা ভালো লক্ষণ দেখা গেল, আমার মাথা ব্যথা সেরে যাওয়ায় আমি আবার পড়তে শুরু করলাম। গর্ডন ব্রাউন এক গাদা বই আমাকে পাঠিয়েছিলেন। তার ভিতর থেকে আমি 'দ্য ওয়ান্ডারফুল উইজার্ড অব ওজ' বইখানা পড়তে লাগলাম। আমি ডরোথি সম্বন্ধে পড়তে ভালোবাসতাম। সে কেমন করে বাড়ি ফিরে এসে কাপুরুষের সিংহ ও মরচে ধরা মানুষের সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়ে দেন। সে অনেক অনেক বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করে সফলতার মুখ দেখে। আমি ভাবলাম যদি তুমি লক্ষে পৌঁছাতে চাও তবে তোমাকে কঠিন দৌড় লাগাতে হবে আর অবশ্যই তা হবে বিরতিহীন। আমি এক নাগাড়ে একের পর এক বই পড়ে যাবার কথা আমি আবার আব্বাকে বললাম। তিনি আমার কথা শুনে খুশি হলেন। কারণ তিনি ভেবেছিলেন যদি আমি মনে রেখে তা বর্ণনা করতে না পারি তবে আমার মেমোরি নষ্ট হয়ে গেছে বলে ধরা হবে। আমার কথা শুনে আব্বা বুঝলেন আমার মেমোরি ভালোই আছে।

আমি জানতাম আমার আব্বা এ ভয়ে ভীত ছিলেন। আমি আব্বা- আম্মাকে বলেছিলাম গুলিবিদ্ধ হবার পর থেকে আমি আমার ফ্রেন্ডদের নাম ভুলে গেছি। একদিন আমার আব্বা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন,'মালালা, তুমি আমাদেরকে *'পাশতো তাপেই' গেয়ে শোনাতে পারবে?* আমাদের পছন্দের একটা গান আমি গাইলাম। 'যখন তুমি তোমার যাত্রা শুরু সাপের লেজের শেষ প্রান্ত থেকে তোমাকে শেয়ার করতে হবে এক সাগর বিষে ভরা মাথায় গিয়ে।' আমাদের কাছে ওটা বোঝানো হয়েছে পাকিস্তানী অথরিটি প্রথম দিকে জঙ্গীদেরকে কাজে লাগায় তারই ফলে এখন তারা নিজেরাই ভোগান্তির শিকার হচ্ছে।

আব্বা বললেন, *তাপেই* হচ্ছে শতাব্দীর পর শতাব্দী আমাদের সমাজের পুরনো জ্ঞানভান্ডার। তুমি সেগুলোকে পরিবর্তন করতে পার না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন 'কোনটি তাপেই তে মেয়েদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে?'

www.pathagar.com

'এটাকে,' আমি বললাম।

که د زلمو نه پوره نه شوه
کرانه وطنه جینکی به دي ګټي نه

যদি পুরুষেরা যুদ্ধে জয়লাভ না করে তবে,ও আমার দেশ তারপর মেয়েরা এগিয়ে আসবে এবং তোমরা সম্মানের সাথে জয়লাভ করবে।

আমি এটা পরিবর্তন করে এভাবে বলতে চাই:

که د زلمو نه شوه که نه شوه
وطنه جینکی به دي ګټي کرانه
نه

যদি পুরুষেরা জয়লাভ কিংবা পরাজিত হয় তাদের যুদ্ধে,

মেয়েরা আসছে আর মেয়েরাই জয়লাভ করে তোমাদের জন্য সম্মান এনে দেবে।

আব্বা হেসে উঠলেন। আমি ফিজিওথেরাপিস্ট এর সাথে কঠিন ভাবে ব্যায়াম করছিলাম যাতে আমার বাহু ও পা দুটো সঠিক ভাবে কাজ করে। আমি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পর ৬ ডিসেম্বর আমার প্রথম পুরস্কার পেলাম। আমি ইমাকে বললাম যে, আমি প্রকৃতিকে ভালোবাসি তাই হাসপাতাল থেকে অল্প একটু দূরের বার্মিংহামের বোটানিক্যাল গার্ডেন আমাকে দেখাতে নিয়ে গেলেন হাসপাতালের দু'জন স্টাফ. আম্মাও সাথে থাকলেন। মিডিয়ার লোকেরা তাকে চেনেন বলে আব্বা আমাদের সাথে গেলেন না। এটাই বার্মিংহাম হাসপাতালের বাইরে ইংল্যান্ডের বার্মিংহাম দেখা। আমি খুব খুশি হলাম প্রথম হাসপাতালের বাইরে এসে। তারা আমাকে কারের পিছনে সাবার মাঝখানে বসতে বললেন। আমি ভাবলাম জানালার পাশে কেন নয়! তারা আমাকে সুরক্ষা দিতে চাইলো। আমি বোটানিক্যাল গার্ডেনের মনোরম দৃশ্য অবলোকন করে মুগ্ধ হলাম।

www.pathagar.com

বোটনিক্যাল গার্ডেন দেখার দু'দিন পর আমি প্রথম আমাদের পরিবারের বাইরে সাক্ষাৎ হলো-পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসিফ জারদারীর সাথে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাকে হাসপাতালে আসার ব্যবস্থা করে দিতে চাচ্ছিল না। কারণ তিনি হাসপাতালে এলে সাংবাদিকেরা এসে হাজির হবেন। আমার আব্বা কিন্তু আমাদের প্রেসিডিন্ট মি. জারদারী হাসপাতালে আসার বিপক্ষে যেতে পারলন না। আমাদের প্রেসিডিন্ট মি. জারদারী আমাকে দেখতে হাসপাতালেই এলেন। মি. জারদারী বললেন যে, সরকার আমার চিকিৎসার বিল পরিশোধ করবে। বিলের পরিমাণ ২০০,০০০ পাউন্ডের মতো হবে। আব্বা সহ আমাদের পরিবারের জন্য বার্মিহামের কেন্দ্রস্থলে একটা ভাড়া বাড়ি দেওয়া হবে। ফলে তাদেরকে হোস্টেলে থাকতে হবে না। ৮ ডিসেম্বর আমরা মি. জারদারীর সাথে মিলিত হয়েছিলাম। সব কিছুই যেনছিল জেমস বন্ড মুভি'র মত। আগে ভাগেই সাংবাদিকরা এসে জড়ো হলেন। জারদারী এবং তার দলবল দুটো কারে করে এলেন। তার সাথে তার চিফ অব দি স্টাফ, তার মিলিটারী সেক্রেটারী লন্ডনের পাকিস্তানী হাই কমিশনার সহ দশ জন ছিলেন। আমার আব্বা-আম্মা উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও আমার অফিসিয়াল অভিভাবক ডা. ফিওনা সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

আমার মুখের অবস্থার কথা উল্লেখ না করে ডাক্তাররা প্রেসিডেন্টকে প্রথমে ব্রিফ করলেন। তারপর তিনি আমাকে দেখতে এলেন। তার সাথে তার ছোট মেয়ে আসিফাও ছিল। সে আমার কয়েক বছরের বড় হবে। তারা আমাকে এক তোড়া ফুল উপহার দিলেন। তিনি আমার মাথা স্পর্শ করলেন। আমার মাথাটায় একটা স্কার্ফ ছিল। তারপর প্রেসিডেন্ট আমার আব্বার পাশে বসলেন। তিনি আব্বাকে এটা আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা তাকে ইউকেতে আনতে পেরেছিলাম। 'সে অবশ্যই পাকিস্তানে টিকে থাকবে। সে আবার হেসে উঠবে।'

মি. জারদারী লন্ডনস্থ পাকিস্তানী হাই কমিশনারকে বললেন আমার আব্বাকে লন্ডন হাই কমিশনে এডুকেশন অ্যাটাচে হিসাবে নিযোগ দিতে যাতে তিনি বেতন পেয়ে জীবন যাত্রা নির্বাহ করতে পারবেন, আর সাথে সাথে একটা ডিপ্লোম্যাটিক পাশপোর্টও পাবেন। আর এর ফলে তাকে রাজনৈতিক আশ্রয় নেবার প্রয়োজন পড়বে না। আমার আব্বা এ অফার দেওয়ায় যারপর নাই অবাক এবং ইউকে অবস্থানের ব্যবস্থা হওয়ায় স্বস্তিও পেলেন। মি. জারদারী মিডিয়ার কাছে আমাকে 'একজন স্মরণীয় বালিকা এবং পাকিস্তানের একটা ক্রেডিট' বলে অভিহিত করলেন।

২০১৩ সালের নতুন বছর আমার জন্য সুখকর ছিল। আমাকেজানুয়ারি মাসে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হলো। আমি আমার পরিবারের সাথে বসবাসের সুযোগ পেলাম। পাকিস্তান হাই কমিশন আমাদের পরিবারের জন্য বার্মিংহামের কেন্দ্রস্থলে একটা দশতলা বিল্ডিং এ একটা সুন্দর বাসা ভাড়া করে দিল।

www.pathagar.com

আমরা সবাই আবার একত্রিত ভাবে পারিবারিক অনুষঙ্গে বসবাস করে খুবই খুশি হলাম। আমি আমার চিকিৎসার কথা সবাইকে খুলে বললাম। সময়টা ছিল বরফ পড়ার মৌসুম। ঠান্ডা শীতকাল। কাঁচের বড় জানালা দিয়ে আমি বরফ পড়া দেখতাম। আমার ভাই খুশাল সব সময়ই বিরক্ত করছিল। অন্যদিকে আতাল নতুন জায়গায় এসে আনন্দের মাঝেই ছিল।

আমাদের বাসার পাশেই একটা স্কয়ার ছিল। সেখানে একটা ঝর্ণা আর একটা কোস্টা কফি বারও ছিল। আমরা দেখতে পেতাম সেখানে নারী পুরুষরা মিলিত হয়ে গল্পগুজব করছে। এ দৃশ্য সোয়াতে কল্পনা করা অকল্পনীয়। আমাদের বাসাটা ছিল বোর্ড স্ট্রীটের পাশে। দোকানপাট, নাইট ক্লাব ও স্ট্রিপবার ইত্যাদিতে ভরা রাস্তাটা। আমরা দোকানে গেলাম। যদিও আমি শপিং পছন্দ করতাম না। শীতের দিনেও ওখানকার মহিলাদের পোশাকআশাক আমাদের দেশের মত নয়। তাদের পরনে ছোট সর্টস আর পায়ে হাই হিলওয়ালা জুতো। আমার আম্মা ওদের সাজসজ্জা দেখে অবাক হলেন। আমাদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল আমরা যেন উইকএন্ড এর রাতে বোর্ড স্ট্রটে যেন না যাই। ওই সময় জায়গাটা বিপদজনক।

সপ্তাহের একটা দিনে আমি স্কাইপ এ মিনগোরার বান্ধবীদের সাথে মিলিত হতাম। তারা আমাকে বললো যে, তারা আমার জন্য ক্লাসে একটা সিট রেখে দিয়েছে। আমি তাদের থেকে দূরে থাকায় দু:খের মাঝেই ছিলাম। আমি দিনে দিনে শক্তি অর্জন করতে থাকলাম। আমার শ্রবণ শক্তি সম্বন্ধে ডাক্তাররা উদ্বিগ্ন ছিলেন। আমি তখনো ভালো করে শুনতে পারছিলাম না। আমাকে আবার কিউইএইচ এ যেতে হলো। আর একটা অপারেশন করানোর জন্য। ২ ফেব্রুয়ারি শনিবার আমি কিউইএইচ ফিরে গেলাম। এবার একজন মহিলা আমার অপারেশন করলেন। তার নাম অ্যানওয়েন হোয়াইট। আমার ব্রেনকে সুরক্ষা দেবার জন্য তিনি আমার মাথার খুলিতে অপারেশন করলেন।

এবার আমি অপারেশন থিয়েটারে পাঁচ ঘন্টা ছিলাম। তিনটা অপারেশন করা হলো। তবে আমি এবার আগের অপারেশনের মতো অনুভব করলাম না। অপারেশনের পর আমি বাসায় ফিরে এলাম। কয়েক সপ্তাহ পরে আমি ভালোভাবে শুনতে পেলাম। আল্লাহর অশেষ ধন্যবাদ জানাই। ডাক্তাররা আমার আরোগ্য লাভের জন্য যা যা করেছেন তা বলে শেষ করা যায় না। তারা আমাকে অবধারিত ভাবে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে এনে স্বাভাবিক জীবন দান করেছেন। আমি একজন ভালো মেয়ে । আমি দুস্থদের সাহায্য করতে চাই। আমি সব সময় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি,'আমি যেন মানুষের সাহায্য করতে পারি। দয়া করে তুমি আমাকে সে মুক্তি দিও।'

www.pathagar.com

একজন তালিব আমাদের তিনজন বালিকার উপর গুলি চালিয়েছিল। আমরা তিন জনই বেঁচে আছি। তারা আমাদের হত্যা করতে পারে নি। আমি অলৌকিকভাবে আরোগ্যলাভ করেছি। আমার বান্ধবী শাজিয়াকে দু'বার আঘাত করা হড়েছে। তাকে ওয়েলস এর আটলান্টি কলেজে একটা স্কলারসীপ দেওয়া হয়েছে। সে ইউকেতে আসবে। আমি আশা করি কাইনাতও এমন কিছু সুযোগ পেয়ে যাবে। আমি জানি আল্লাহ আমাকে কবরে পাঠান নি। আমার দ্বিতীয় জীবন শুরু হলো। মানুষেরা আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া দরুদ পড়েছেন। লোকজন বলাবলি করে আমাকে গুলি করা হয়েছিল আর যা ঘটেছিল সেগুলো ছিল মালালার গল্প, 'একজন বালিকা তালেবানের দ্বারা গুলিবিদ্ধ হয়েছিল; আমি অনুভব করি, এটা আমাকে নিয়ে মোটেই একটা গল্প নয়।

অন্তিমকথন

একটি শিশু, একজন শিক্ষক, একটি বই, একটি কলম...

বার্মিংহাম, আগস্ট ২০১৩

মার্চ মাসে অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে আমরা তৃণ-পল্লবশোভিত একটি সড়কের কাছে বাসা ভাড়া নিলাম। মনে হলো যেন আমরা কোনো ক্যাম্পিংয়ে এসেছি। আমাদের সংসারের যা কিছু আসবাবপত্র সব এখনও সোয়াতে রয়ে গেছে। এই বাসার সবখানেই কার্ডবোর্ডের বাক্স। বহু মানুষ আমাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে যেসব চিঠি লিখেছে এবং কার্ড পাঠিয়েছে সেগুলো এই বাক্সগুলোতে ভর্তি রয়েছে। একটা রুমে বড় একটা পিয়ানো রয়েছে, যদিও আমাদের বাসার কেউ পিয়ানো বাজাতে পারে না। ঘরের দেওয়ালে গ্রীক দেবতাদের ম্যুরাল এবং মাথার ওপর সিলিংয়ে দেবশিশুর খোদাই করা মূর্তির ব্যাপারে আম্মার আপত্তি আছে।

ভাড়া করা এই বাড়িটা আমাদের কাছে বিশাল মনে হয়। বিরাট একটা ইলেকট্রিক আয়রন গেটের ভেতরে বাড়িটাকে আমার মাঝে মাঝে পাকিস্তানে আমরা যাকে সাব-জেল বলি সেই রকম বিলাসবহুল কারাগার মনে হয়। বাড়িটার পেছনে নানা ধরণের গাছগাছালি ভরা একটা বাগান আছে। আর আছে সবুজ একটা লন। এখানে আমি আমার ভাইদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলি। কিন্তু এখানে খেলা করার মতো ছাদ নেই; এখানে রাস্তায় দাড়িয়ে ছেলেরা ঘুড়ি কাটাকাটি খেলে না; কোনো প্রতিবেশি আমাদের কাছে এক প্লেট চাল কিংবা দুই তিনটে টমেটো ধার চাইতে আসে না। আমাদের ও প্রতিবেশিদের বাড়ির মাঝখানে একটা দেওয়াল। কিন্তু তাতেই মনে হয় আমরা পরস্পর থেকে বহু মাইল দূরে আছি।

ঘর থেকে বাইরে তাকিয়ে দেখি আম্মা বাগানে একা একা পায়চারি করছেন। তাঁর মাথায় শাল জড়ানো। তিনি হয়তো পাখিদের খাওয়াচ্ছেন। দূর থেকে তাঁকে দেখে মনে হল তিনি যেন পাখিদের খাওয়াচ্ছেন আর গুনগুন করে তাঁর সেই প্রিয় ট্যাপাটি গাইছেন: 'বাগানের পাখিদের মেরো না, একটাকে মারলে বাকিরা আর আসে না।' গত রাতে যেসব খাবার বেঁচে গিয়েছিল আম্মা সেগুলোই পাখিদের খেতে দিচ্ছেন। তাঁর চোখে পানি দেখলাম।

দেশে থাকতে যেভাবে খেতাম এখানেও একই খাবার খাচ্ছি। আমরা দুপুরে আর রাতে সাধারণত ভাত এবং মাংস খাই। সকালের নাশতা সারি চাপাতি, ডিম ভাজি দিয়ে। কখনো কখনো সঙ্গে মধুও থাকে। সকালের নাশতায় মধু

www.pathagar.com

খাওয়ার অভ্যাসটা চালু করেছিল অটল। তার মধু খেতে ভালো লাগত বলে আমরা প্রায়ই সকালে নাশতায় মধু রাখতাম। তবে বার্মিংহামে এসে সে নতুন একটা প্রিয় খাবার আবিষ্কার করেছে। সেটা হল নাটেলা স্যান্ডউইচ। তবে সব সময়ই খাবার উচ্ছিষ্ট থেকে যায়। আম্মা খাবার অপচয় হলে খুবই মন খারাপ করেন। আমি জানি তাঁর সেই ছেলেমেয়েগুলোর কথা মনে পড়ে যায়, যাঁদের তিনি প্রায়ই আদর করে খাওয়াতেন, যারা খাবারের অভাবের কারণে স্কুলে যেতে পারে না। তাঁরা এখন কীভাবে আছে তা হয়তো তিনি ভাবতে থাকেন।

মিঙ্গোরায় থাকতে আমি স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে কোনোদিন বাড়িতে বাইরের লোক নেই এমনটা দেখিনি। এখন আমি যেন বিশ্বাসই করতে পারি না, আমি এক সময় অন্তত একটা দিন শান্তিতে থাকার জন্য, স্কুলের বাড়ির কাজ করার জন্য একটু নিভৃতি চেয়ে চেয়ে হাঁপিয়ে উঠতাম। এখানে পাখির কিচিরমিচির এবং খুশালের এক্সবক্সের শব্দ ছাড়া আর কোনোকিছুরই শব্দ পাই না। এখন আমি শুধু আমার রুমে বসে জিগস' পাজল নিয়ে একা একা খেলি আর কখন কোনো মেহমান আসে কিনা সেইজন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করি।

আমাদের তেমন কোনো অর্থকড়ি ছিল না। আমার আব্বা-আম্মা ভালো করেই জানতেন ক্ষুধার কষ্ট কত ভয়ানক। বাড়িতে কেউ কখনো এলে কাউকে খালিমুখে বা খালি হাতে যেতে দিতেন না। একদিন এক বৃদ্ধা প্রচন্ড গরমের মধ্যে ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়ে আমাদের দরজায় আসলেন। আম্মা তাঁকে ভেতরে নিয়ে আদর করে খেতে দিলেন। মহিলা খুব খুশি হলেন এবং বললেন, 'আমি এই মহল্লার প্রত্যেকটি দরজায় কড়া নেড়েছি। শুধুমাত্র তুমিই খুলে দিলে।' তিনি আম্মাকে বললেন, 'তুমি যেখানেই যাও সবখানেই যেন তোমার জন্য আল্লাহ দরজা খুলে দেন।'

আমি জানি আম্মা এখানে খুব নিঃসঙ্গ। তিনি খুব মিশুক এবং সামাজিকতাসম্পন্ন মহিলা। দেশের বাড়িতে থাকতে বিকেল হলেই আশপাশের বাড়ি থেকে মহিলারা আমাদের বাড়িতে চলে আসতেন। তাঁদের সঙ্গে বসে সুখঃদুখের গল্প করতেন। এমনকি প্রতিবেশিদের বাড়িতে যে মহিলারা কাজ করতেন তাঁরাও আমাদেও বাড়িতে এসে একটু জিরিয়ে নিতেন। এখন তিনি সব সময়ই দেশের বাড়ির আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে ফোনে কথা বলতে থাকেন। যেহেতু তিনি এক বর্ণ ইংরেজিও বলতে পারেন না, সেজন্য তাঁর এখানে থাকাটা অনেক বেশি কষ্টকর। আমাদের এই বাসাটায় নাগরিক সব সুযোগ সুবিধাই আছে। কিন্তু প্রথম তিনি যখন এখানে আসেন তখন ঘরের ব্যবহার্য জিনিসপত্রের বেশিরভাগই তাঁর কাছে ছিল খুব রহস্যজনক। কিভাবে চুলা জ্বালাতে হবে, ওয়াশিং মেশিন কিভাবে চালাতে হবে কিংবা টেলিভিশন কিভাবে চালাতে হবে–এইসব প্রথমদিকে কেউ না কেউ আমাদের শিখিয়ে দিত।

বরাবরের মতো আব্বা রান্নাঘরে কোনো সাহায্য করেন না। আমি আব্বাকে খেপানোর জন্য বলতাম, 'আব্বা, তুমি নারী অধিকারের পক্ষে কত বক্তব্য দাও,

www.pathagar.com

অথচ সংসারের সবকিছু আম্মাকেই সামাল দিতে হয়। সামান্য চায়ের কাপ ধোয়ার মতো কাজও তুমি কর না।'

এখানে বাস ট্রেন সবই আছে; কিন্তু এগুলো আমাদের কতটুকু কাজে আসবে সে বিষয়ে আমরা নিজেরাও নিশ্চিত হয়ে উঠতে পারিনি। মিঙ্গোরার চীনা বাজারে যাওয়াটা আম্মা খুব মিস করছেন। আমার চাচাতো ভাই শাহ এখানে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আসার পর থেকে আম্মা কিছুটা ভালো আছেন। শাহের একটা গাড়ি আছে। তিনি আম্মাকে মাঝে মাঝে শপিংয়ে নিয়ে যান। তবে আম্মা মিঙ্গোরাতে কেনাকাটা করে যে আনন্দ পেতেন এখানে তা পান না; কারণ সেখানকার মতো এখানে কেনাকাটা করার পর বাড়ি ফিরে জিনিসগুলো তিনি কোনো প্রতিবেশিকে দেখাতে এবং তা নিয়ে অনেক্ষণ ধরে গল্প করতে পারছেন না।

দরজায় কখনও দড়াম কওে শব্দ হলেই আম্মা লাফ দিয়ে ওঠেন। ইদানিং সামান্য শব্দ হলেও তিনি ধড়ফড় করে ওঠেন। তিনি প্রায়ই কান্নাকাটি করেন আর আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলেন, 'আমার মালালা এখনও বেঁচে আছে।' এখন তিনি আমাকে তাঁর সবচেয়ে বড় সন্তান না ভেবে মনে হচ্ছে সবচেয়ে ছোট সন্তান ভাবছেন।

আমি জানি, আব্বাও আমার জন্য কান্নাকাটি করেন। আমি যখন কানের পাশের চুল সরাই এবং তিনি গুলির ক্ষত দেখে ফেলেন তখন কেঁদে ফেলেন। বাচ্চাদের কলকাকলিতে তাঁর দুপুর বেলার ভাতঘুম ভেঙে যাওয়ার পর তিনি যখন টের পান ওই কিচিরমিচিরের মধ্যে আমার কণ্ঠও আছে তখন তিনি আনন্দে কেঁদে ফেলেন। তিনি জানেন আমার গুলি খাওয়ার জন্য লোকজন তাঁকে দোষারোপ করছে। তাঁরা বলাবলি করছে মেয়েকে বিজয়ীর আসনে বসানোর লোভে তাকে তিনি মৃত্যুর ঝুঁকি আছে জেনেও তালেবানের বিরুদ্ধে বক্তব্য দেওয়াতেন, যেন এ ব্যপারে আমার নিজের কোনো মতামতই ছিল না। এই ভাবনাটা তাঁর জন্য অবশ্যই কষ্টদায়ক। গত ২০ বছর ধরে তিনি পরিশ্রম করে যা কিছু অর্জন করেছেন তার সব কিছুই তাঁকে দেশে ফেলে রেখে আসতে হয়েছে। কপর্দকশূণ্য অবস্থায় তিনি যে স্কুল চালু করেছিলেন সেই স্কুলের এখন তিন তিনটে ভবন, ১১০০ ছাত্র-ছাত্রী এবং ৭০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা। আমি জানি কালো পাহাড় ও সাদা পাহাড়ের মাঝখানের সংকীর্ণ ও দারিদ্যক্লিষ্ট এলাকা থেকে উঠে আসা দীনহীন ছেলে হয়ে তিনি যা করতে পেরেছেন তার জন্য তিনি নিজেও গর্ববোধ করেন। আব্বা বলেন, 'তুমি যে গাছটাকে লাগিয়ে তাঁকে যত্ন করে বড় করেছ তার ছায়ায় বসে শরীরের ক্লান্তি দূর করার অধিকার তোমারই আছে।'

আব্বার স্বপ্ন ছিল সোয়াতে বিশাল একটা স্কুল থাকবে যেখানে সত্যিকারের মানসম্পন্ন শিক্ষা দেওয়া হবে, লোকজন শান্তিতে বাস করতে পারবে এবং আমাদের দেশে প্রকৃত অর্থে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। সোয়াতে নিজের সমাজসেবামূলক কাজ এবং অপরকে সাহায্য সহযোগিতা করার মাধ্যমে

www.pathagar.com

সেখানকার লোকজনের ভালোবাসা ও সম্মান তিনি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আব্বা কখনোই বিদেশ বিভুঁইয়ে বাস করতে চাননি। লোকজন যখন বলে আমরা যুক্তরাজ্যে বাস করতেই চেয়েছিলাম তখন তিনি খুব কষ্ট পান। আব্বা মাঝে মাঝে বলেন, আমরা আইডিপিএস থেকে এখন ইডিপিএস হয়েছি–এক্সটারনাল ডিসপ্লেসড্ পারসনস্। এই প্রসঙ্গে কথা উঠলে তিনি বলেন, 'যে লোকটার ১৮ বছরের শিক্ষকতার জীবন ছিল, একটা সুন্দর জীবন ছিল, একটা পরিবার ছিল, শুধুমাত্র মেয়েদের পড়াশুনার অধিকারের পক্ষে কথা বলার জন্য তাকে এমনভাবে আপনারা ছুড়ে ফেলে দিলেন যেভাবে পানি থেকে কেউ মাছকে বাইরে ছুড়ে ফেলে দেয়।' ভাত খাওয়ার সময় প্রায়ই আমরা আমাদের দেশের বাড়ির কথা বলি এবং পেছনের কথা মনে করার চেষ্টা করি। আমরা সেখানকার সবছিুর শূন্যতা অনুভব করি, এমনকি দুর্গন্ধযুক্ত পানির সেই খালটাকেও ভীষণ মিস করি। আব্বা বলেন, 'যদি আগেভাগে জানতে পারতাম কী ঘটতে যাচ্ছে, তাহলে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার সময় নবীজী (সা.) যেভাবে জন্মভূমিকে বার বার পেছনের দিকে ফিরে ফিরে দেখে নিয়েছিলেন সেইভাবে নিজের মাতৃভূমিকে দেখে নিতাম।' ইতিমধ্যেই সোয়াতের কিছু কিছু জিনিসকে দূর থেকে শোনা গল্পের মতো মনে হতে শুরু করেছে, বহু দূর থেকে কোনোকিছু সম্পর্কে পড়ে আমরা যে রকম কল্পনা করি সেই রকমের একটা ভাবনা সোয়াত সম্পর্কে আমার মনের মধ্যে আসতে শুরু করেছে।

শিক্ষার ওপর আয়োজিত সম্মেলনে বক্তব্য দিতে দিতে আব্বার বেশিরভাগ সময় কাটে। আমি জানি আমার কারণে মানুষ এখন তাঁর কথা শুনতে চায়–এ বিষয়টি তাঁর জন্য বিব্রতকর হয়ে দাঁড়ায়। আমি যেখানে তাঁর মেয়ে হিসেবে পরিচিত হতে চাই; সেখানে উল্টো তাঁকে আমার আব্বা হিসেবে লোকজনের কাছে পরিচিত হতে হচ্ছে। ফ্রান্সে আমাকে দেওয়া একটা সম্মাননা আনতে গিয়ে তিনি উপস্থিত দর্শকদের বলেছিলেন, 'পৃথিবী নামক এই গ্রহের যে অংশে আমার বাস সেখানে বেশিরভাগ লোকই তাদের পুত্রসন্তানের গৌরবজনক কাজের মধ্য দিয়ে পরিচিতি পায়। আমি সেই সৌভাগ্যবানদের একজন যে তার কন্যার পরিচয়ে পরিচিত হতে পারছে।'

এখন আমার শোবার ঘরের দরজায় রয়েল ব্লু রংয়ের ইউনিফর্মের বদলে একটা চমৎকার বটল গ্রিন রংয়ের ইউনিফর্ম ঝোলানো থাকে। আমি এখন এমন একটা স্কুলে পড়ি যেখানে কেউ স্কুলে যাওয়ার সময় হামলা হতে পারে বা স্কুল উড়িয়ে দেওয়া হতে পারে-এমন চিন্তায় আতঙ্কিত থাকে না। এপ্রিল মাসে বার্মিংহামে আমি স্কুলে যেতে শুরু করি। মিঙ্গোরাতে স্কুলে যাওয়ার সময় মনে হতো তালেবান আমাকে লক্ষ্য করছে, যে কোনো সময় তারা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে– কিন্তু এখানে স্কুলে যাওয়ার সময় সেরকম কোনো ভীতি কাজ করে না। ক্লাসে যাওয়ার সময় খুব ভালো লাগে।

এটা খুবই সুন্দর একটা স্কুল। আমাদের মিঙ্গোরার অনেক পাঠ্য বিষয় এবং এখানকার পাঠ্য বিষয় এক। তবে সেখানে বল্ল্যাকবোর্ডে শিক্ষকেরা চক দিয়ে

www.pathagar.com

লেখেন আর এখানে শিক্ষকদের হাতে থাকে পাওয়ারপয়েন্ট কম্পিউটার। এখানে সঙ্গীত, কলা, কম্পিউটার শিক্ষা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়গুলো ভিন্নভাবে পড়ানো হয়। এখানে রান্না শেখানো থেকে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক শিক্ষা এমনভাবে দেওয়া হয় যা পাকিস্তানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে খুব কমই চোখে পড়ে। পদার্থবিদ্যা বিষয়ে সম্প্রতি এক পরীক্ষায় মাত্র চল্লিশ শতাংশ মার্ক পেয়েছি। তারপরও এই সাবজেক্ট আমার খুব প্রিয়। নিউটনকে জানা এবং মহাবিশ্ব যে নীতিগুলো অনুরণ করে চলে বলে তিনি জানিয়ে গেছেন সেগুলোকে জানা আমার প্রিয় অধীত বিষয়গুলোর একটি।

কিন্তু আম্মার মতো আমিও খুব নিঃসঙ্গ। দেশে আমার যেমন ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ছিল সে রকম কারুর সঙ্গে বন্ধুত্ব হতে সময় লাগবে। এখানে সবাই আমাকে এখনও আলাদা চোখে দেখে। লোকজন বলে, 'ওহ! এতো দেখি মালালা!' তারা আমাকে 'নারী অধিকারকর্মী মালালা' হিসেবে চেনে। দেশে খুশাল স্কুলে আমি ছিলাম শুধুই মালালা যে ক্লাসে ঠাট্টা রসিকতা করতে ভালোবাসতো, ছবি এঁকে বন্ধুদের নানা বিষয় বুঝিয়ে দিতো; সারাক্ষণ যে তার ভাই এবং প্রিয় বান্ধবীদের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করত। আমি মনে করি, পৃথিবীর সব ক্লাসেই অন্তত একজন করে ভালো আচার ব্যবহারওয়ালা মেয়ে, ভালো বুদ্ধিদীপ্ত মেয়ে, তুমুল জনপ্রিয় মেয়ে, খুব সুন্দর চেহারার মেয়ে, খুব লজ্জাবতী মেয়ে, খুব কুটনা মেয়ে–এই রকম গুণ এবং দোষযুক্ত মেয়ে পাওয়া যাবে। তবে এখানে আমার ক্লাসের কে কোন প্রকৃতির মেয়ে তা এখনও ঠিক করে উঠতে পারিনি।

এখানে এখনও কারও সঙ্গে এমন বন্ধুত্ব হয়নি যে তাকে কৌতুক বা চুটকি শোনাবো। এ কারণে সেগুলো মনের মধ্যে সঞ্চয় করে রাখছি এবং স্কাইপে যখন মনিবার সঙ্গে কথা হয় তখন তাকে সেগুলো বলছি। মনিবার সঙ্গে কথা বলার সময় আমি প্রথমেই যে প্রশ্নটা তাকে করি সেটা হল, 'আমাদের স্কুলের সর্বশেষ খবর কি?' কার সঙ্গে কার ঝগড়া হয়েছে বা কোন শিক্ষক কাকে ক্লাস থেকে বের করে দিয়ে তা শুনতেই আমার যেন বেশি আগ্রহ। মনিবা এখন প্রায় সব পরীরক্ষাতেই প্রথম হচ্ছে। আমার বন্ধুরা আমার জন্য ক্লাসে একটা চেয়ার ফাঁকা রেখে সেখানে আমার নাম লিখে রেখেছে। বয়েজ স্কুলের আমজাদ স্যার স্কুলে ঢোকার মুখে দেওয়ালে আমার একটা বড় ছবিওয়ালা পোস্টার সেঁটে দিয়েছেন। অফিসে ঢোকার সময় প্রতিদিন তিনি ছবির মাধ্যমে আমার সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন।

ইংল্যান্ডের জীবন কেমন কাটছে মনিবাকে তা বলেছি। তাঁকে বলেছি, আমাদের ওখানে যেমন যে যেভাবে খুশি বাড়ি বানিয়েছে, বাড়ির সামনে হয়তো নোংরা ময়লার পাহাড় বানিয়ে রেখেছে, এখানে তেমনটা নয়। খুব পরিকল্পিতভাবে সুবিন্যাস্তভাবে বাড়িগুলো বানানো। বাড়িগুলো বন্যা এবং ভূমিকম্প সহনীয়। কিন্তু খেলাধুলা করা যায় এমন ছাদ এখানে নেই। আমি তাঁকে বলেছি, ইংল্যান্ড আমার খুব ভালো লেগেছে, কারণ এখানে মানুষ আইন কানুন মেনে চলে, পুলিশকে লোকজন শ্রদ্ধা করে এবং নির্ধারিত সময়ে সবকিছু হয়। সরকারই

www.pathagar.com

এখানে কর্তৃপক্ষ। এখানে কে সেনাপ্রধান তা কারুর জানার দরকার হয় না। আমি দেখেছি এখানে নারীরা এমন সব কাজ করেন যা সোয়াতে কল্পনাও করা যায় না। পুলিশ, নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে তাঁরা এখানে ঠিক পুরুষদের মতোই কাজ করে যাচ্ছেন। বড় বড় কোম্পানি তাঁরা চালাচ্ছেন। এখানে মেয়েরা যার যে পোশাক পরতে ভালো লাগে তাই পরছে।

আমাকে গুলি করার ঘটনাটা নিয়ে আমি বেশি ভাবি না; যদিও প্রতিদিন সকালে হাতমুখ ধোয়ার সময় আয়নায় চেহারা দেখতে গেলে ঘটনাটি মনে পড়েই যায়। চেহারা যতটা সম্ভব অবিকৃত রেখে ডাক্তাররা আমার স্নায়ু অপারেশন করেছেন। তবে আমি তো আর আগের মতো কখনো হতে পারব না। আগের মতো স্থিরভাবে তাকাতে পারব না। অপারেশনের পর এখন কথা বলার সময় আমার বাম চোখের পাতা ঘন ঘন বন্ধ হয়ে যায়। আমার আব্বার বন্ধু হেদায়েতুল্লাহ আব্বা বলেছেন, 'এটাই তার (আমার) আত্মত্যাগের বড় সৌন্দর্য।'

এটা এখনও নিশ্চিত নয়, আসলে ঠিক কে আমাকে গুলি করেছিল। তবে আতাউল্লাহ নামের এক ব্যক্তি এই কাজ করেছে বলে দাবি করেছে। পুলিশ আতাউল্লাহকে খুঁজে বের করতে পারেনি। পুলিশ বলছে তারা তাকে ধরার চেষ্টা করছে। পুলিশ বলছে তারা বিষয়টি তদন্ত করছে এবং আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।

সেদিন ঠিক কী ঘটেছিল তা আমি পুরোপুরি মনে করতে পারি না। তবে মাঝে মাঝে আমি যেন সেই ভয়ানক দৃশ্যে ফিরে যাই। হঠাৎ হঠাৎ এমনটা হয়। সবচেয়ে ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছিল দুবাইয়ে। হজ করতে যাওয়ার পথে বিরতি হিসেবে আমরা সেখানে থেমেছিলাম। আম্মা ক্বাবা শরিফে নামাজ আদায় করবেন বলে একটা ভালো বোরখা কিনতে চাইছিলেন। আমি বোরখা চাইনি। আমি শুধু শাল মাথার ওপর জড়িয়ে যেতে চেয়েছি কারণ মেয়েদের অবশ্যই বোরখা পরতে হবে এমন কথা কোথাও নির্দিষ্ট করে বলা নেই। যাই হোক, আমরা যখন শপিং মলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ দেখি আমার চারপাশে অনেকগুলো মানুষ। আমার মনে হল তাদের সবার হাতে বন্দুক। তারা আমাকে গুলি করার জন্য সেখানে অপেক্ষা করছে। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। তবে কিছু বললাম না। শুধু মনে মনে নিজেকে বললাম,

মালালা, তুমি ইতিমধ্যেই মৃত্যুকে মোকাবিলা করে ফেলেছ। তুমি এখন যে জীবন কাটাচ্ছ সেটা তোমার দ্বিতীয় জীবন। ভয় পেয়ো না। ভয় পেলে আর সামনে বাড়তে পারবে না।

আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের পবিত্রতম জায়গা ক্বাবা শরিফে প্রথম দৃষ্টি রেখে কেউ কোনো দোয়া করলে আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে তার দোয়া কবুল করেন। আমরা ক্বাবা শরিফে নামাজ পড়ার পর পাকিস্তানে শান্তি এবং নারীদের শিক্ষা ও অগ্রগতির জন্য দোয়া করলাম। অবাক হয়ে দেখলাম আমি দোয়া করার সময় কাঁদছি। কিন্তু আমরা মক্কার অন্যান্য জায়গায় মহানবীর (সা.) স্মৃতিবিজড়িত

www.pathagar.com

স্থানে গিয়ে দেখলাম প্লাস্টিকের খালি বোতল আর বিস্কুটের ছেড়া প্যাকেটে জায়গাগুলো নোংরা করে ফেলা হয়েছে। আমার মনের হলো, এখানকার লোকজন আমাদের পবিত্রতম ইতিহাসকে অবহেলা করে চলেছে। মনে হলো, তারা সেই হাদীসটি ভুলে গেছে, পরিচ্ছন্নতাই ঈমানের অর্ধেক।

আমার জগৎ এখন অনেক বদলে গেছে। ভাড়া করা এই বাড়ির শেলফে আমেরিকা, ভারত, ফ্রান্স, স্পেন, ইতালি এবং অস্ট্রেলিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে পাওয়া পুরস্কারগুলো সাজিয়ে রাখা হয়েছে। সর্বকালের সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে আমাকে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীতও করা হয়েছে। স্কুলে যখন আমি কোনো পুরস্কার গ্রহণ করতাম তখন সেগুলো আমাকে অনেক পরিশ্রম করে পড়াশুনা করে অর্জন করতে হতো। কিন্তু এই পুরস্কারগুলো ছিল একেবারেই আলাদা ধরণের। সন্দেহ নেই, এসব পুরস্কার পেয়ে আমি ধন্য। তবে এগুলো আমাকে প্রতিনিয়ত মনে করিয়ে দেয় প্রতিটি ছেলে মেয়ের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আমাকে এখনও কত পরিশ্রম করতে হবে। 'তালেবানের গুলিতে আহত বালিকা'–এই পরিচয়ে নয়, বরং 'শিক্ষার জন্য লড়াই করা মেয়ে'–এই পরিচয়ে আমি বড় হতে চাই। এই কারণেই আমি আমার জীবনকে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত আছি।

আমার ষোলতম জন্মদিনে আমি নিউইয়র্কে জাতিসংঘে ভাষণ দিয়েছিলাম। বিশাল হলে ভাষণ দিতে গিয়ে দেখি আমার চারপাশে বিশ্বের সমস্ত নেতা। আমি প্রথমে শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু আমি জানতাম আমাকে কী বলতে হবে। আমি নিজেকে বলতে লাগলাম, 'এটাই তোমার সুযোগ মালালা।' আমার চারপাশে মোটে চারশ লোক ছিলেন। কিন্তু কল্পনার চোখে আমি দেখলাম কোটি কোটি মানুষ আমাকে ঘিরে রেখেছে। আমি আমার বক্তৃতা শুধুমাত্র বিশ্বনেতাদের কথা মাথায় রেখে লিখিনি, বিশ্বে পরিবর্তন আনতে সক্ষম এরকম প্রত্যেক মানুষের কথা চিন্তা করে আমি আমার বক্তব্য লিখেছিলাম। চরম দারিদ্র্যে নিপতিত বিশ্বের সব মানুষ, পেটের পীড়নে কাজ করতে বাধ্য হওয়া সব শিশু এবং যারা পড়ালেখা থেকে বঞ্চিত হয়েছে বা সন্ত্রাসের শিকার হয়েছে–এদের সবার কাছে আমি আমার বার্তা পৌঁছে দিতে চেয়েছি।

আমার পছন্দের গোলাপী সালোয়ার কামিজের ওপর বেনজির ভুট্টোর ব্যবহৃত একটা সাদা শাল জড়িয়ে বক্তব্য দিচ্ছিলাম। সেখানে আমি বিশ্বনেতাদের প্রতি প্রতিটি শিশুকে বিনামূল্যে শিক্ষালাভের সুযোগ দেওয়ার অনুরোধ জানালাম। আমি বললাম, 'আসুন আমরা বই আর কলম তাদের হাতে তুলে দেই।' আমি বললাম, 'এই শিশুরা পৃথিবীর সবচেয়ে মোক্ষম অস্ত্র। একটি শিশু, একজন শিক্ষক, একটি বই এবং একটি কলম দুনিয়া বদলে দিতে পারে।' দর্শকেরা দাঁড়িয়ে অভিনন্দন না জানানো পর্যন্ত আমি বুঝতে পারিনি সবাই আমার বক্তব্যকে কীভাবে নিয়েছে। আম্মা তখন কাঁদছিলেন। আব্বা তাঁকে বলছিলেন, মালালা শুধু আমাদের একার নয় সে এখন সবার মেয়ে হয়ে গেছে।'

www.pathagar.com

সেদিন ব্যতিক্রম ঘটল। এই প্রথম আম্মা সাংবাদিকদের তাঁর ছবি তুলতে দিলেন। যেহেতু তিনি পর্দানশীন থাকতেন এবং ক্যামেরার সামনে মুখ দেখাননি, সে কারণে প্রথমবারের মতো ক্যামেরার সামনে দাড়ানো তাঁর জন্য অনেক কঠিন ছিল। পরেরদিন সকালে হোটেলে নাশতা করার সময় অটল আমাকে বললো; 'মালালা, আমি বুঝতে পারছি না তুমি বিখ্যাত হলে কেন, আসলে তুমি করেছোটা কী?' নিউইয়র্কে যে কয়দিন ছিলাম, সেখানে অটল স্ট্যাচু অব লিবার্টি, সেন্ট্রাল পার্ক এবং তাঁর প্রিয় খেলা বেব্লেড নিয়ে খুব উত্তেজিত ছিল। জাতিসংঘে ভাষণ দেওয়ার পর কেবলমাত্র আমার নিজের দেশ ছাড়া পৃথিবীর বহু দেশ থেকে আমাকে সমর্থন জানিয়ে বহু বার্তা এল। আমার পাকিস্তানি ভাই বন্ধুরা ফেসবুক-টুইটারে আমার বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় বইয়ে দিল। তাঁরা আমাকে 'খ্যাতির লালসায় মত্ত ছুড়ি' বলতেও দ্বিধা করেনি। একজন আমাকে উদ্দেশ করে লিখলেন, 'মন থেকে তুমি দেশের ছবি মুছে দাও, স্কুলের কথা ভুলে যাও।' তিনি লিখলেন, 'সে যা চেয়েছে তাই পেয়েছে–বিদেশের বিলাসবহুল জীবন।'

আমি এসব মন্তব্যে কিছু মনে করিনি। আমি জানি মানুষ এসব কথা বলবেই; কারণ আমার দেশের নেতা ও রাজনীতিকেরা বারবার আশ্বাস দিয়েও জনগণকে দেওয়া কথা রাখে না। উপরন্তু পাকিস্তানের অবস্থা আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। সীমাহীন সন্ত্রাসী হামলা পুরো জাতিকে হতাশায় ডুবিয়ে দিচ্ছে। মানুষ পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থা হারিয়ে ফেলছে। কিন্তু আমি সবাইকে জানাতে চাই আমি ব্যক্তিগতভাবে কারও কোনো সমর্থন চাই না। তবে আমি আমার শান্তি ও শিক্ষার আন্দোলনে সবার সমর্থন চাই।

যার চিঠি পেয়ে আমি সবচেয়ে অবাক হয়েছি, তিনি হচ্ছেন সম্প্রতি জেল থেকে পালিয়ে যাওয়া একজন তালেবান কমান্ডার। তাঁর নাম আদনান রশিদ। তিনি এক সময় পাকিস্তানের বিমান বাহিনীতে ছিলেন। প্রেসিডেন্ট মুশাররফকে হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়ি থাকার দায়ে ২০০৩ সাল পর্যন্ত তিনি জেলে ছিলেন। তিনি আমাকে লিখেছিলেন, তালেবান আমাকে আমার শিক্ষা আন্দোলনের জন্য গুলি করেনি। আমি তাঁদের ইসলামি জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করেছি বলেই নাকি তারা আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছে। তিনি বলেছেন, আমাকে গুলি করার ঘটনা তাঁকে মর্মাহত করেছে এবং তিনি যদি আমাকে আগেভাগে হুশিয়ার করতে পারতেন তাহলে তাঁর ভালো লাগত। তিনি লিখেছেন, আমি যদি পাকিস্তানে ফিরে আসি এবং বোরখা পরি এবং মাদ্রাসায় যাই তাহলে তালেবান আমাকে ক্ষমা করে দেবে।

সাংবাদিকেরা আমাকে ওই চিঠির জবাব দিতে বললেন। কিন্তু আমি ভাবলাম, আমাকে এসব কথা বলার তিনি কে? তালেবান তো আমাদের শাসক নয়। এটা আমার জীবন। আমি কীভাবে বাঁচব সেটা আমার বিষয়। তবে মোহাম্মাদ হানিফ এক নিবন্ধে লিখলেন, তালেবান আমাকে চিঠি লেখায় একদিক থেকে ভালোই হয়েছে। তালেবান দায় স্বীকার করেনি বলে বহু লোক এখনও মনে করে আমাকে তালেবান গুলি করেনি। আমি জানি আমি অবশ্যই পাকিস্তানে ফিরব।

www.pathagar.com

কিন্তু যখনই আমি আব্বাকে বলি আমি দেশে যাব তখনই তিনি অজুহাত দাড় করান। 'না জানি, তোমার চিকিৎসা এখনও শেষ হয়নি' অথবা 'এই স্কুলগুলো খুবই ভালো'– এই ধরণের কথা বলেন। আব্বা বলেন, 'এখানে থেকে তোমার আরও অনেক জ্ঞান আহরণ করা দরকার যাতে তুমি আরও শক্তিশালীভাবে তোমার আন্দোলনের কথা বলতে পার।'

আব্বার কথা ঠিক। আমি আরও জানতে চাই। নিজেকে শিক্ষার অস্ত্রে ভালোভাবে সজ্জিত করতে চাই। লেখাপড়া শেষ করার পর আমি আমার লক্ষ্য পূরণে আরও কার্যকরভাবে সমর্থ হব। আজ আমরা সবাই জানি শিক্ষা আমাদের মৌলিক অধিকার। শুধু পশ্চিমা বিশ্বেই নয়, ইসলামও আমাদের এই অধিকার দিয়েছে। ইসলাম বলেছে, প্রত্যেক ছেলে ও প্রত্যেক মেয়ের স্কুলে যাওয়া উচিত। কোরআনে বলা হয়েছে আল্লাহ আমাদের প্রজ্ঞা অবলম্বন করা দেখতে চান। তিনি চান আসমান কেন নীল হয় তা নিয়ে আমরা যেন ভাবি, সমুদ্র ও তারকাপুঞ্জ নিয়ে যেন ভাবি। আমি জানি এটা একটা বিরাট সংগ্রাম–বিশ্বের পাঁচ কোটি ৭০ লাখ শিশু স্কুলে যেতে পারে না। এদের মধ্যে তিন কোটি ২০ লাখই কন্যা শিশু। খুবই পরিতাপের বিষয় আমার দেশ পাকিস্তানের সংবিধানে প্রতিটি শিশুর শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা থাকলেও সেখানে প্রতি পাঁচজন শিশুর মধ্যে একজন শিশু প্রাথমিক স্কুলে যাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। আমাদের মোট জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় পাঁচ কোটি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ লিখতে পড়তে জানে না। এদের দুই তৃতীয়াংশই আমার মায়ের মতো নিরক্ষর মহিলা।

পাকিস্তানে এখনও মেয়েদের হত্যা করা হচ্ছে, স্কুল উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। মার্চ মাসে করাচিতে একটা গার্লস স্কুলে হামলা হয়েছে। একটা পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার অল্প কিছুক্ষণ আগে স্কুলের মাঠে একটি বোমা এবং একটি গ্রেনেড ফাটানো হয়। এতে প্রধান শিক্ষক আব্দুর রশিদ নিহত হন। পাঁচ থেকে দশ বছর বয়সী আটজন শিশু আহত হয়। একটা আট বছরের শিশু একেবারে পঙ্গু হয়ে যায়। খবরটা শুনে আম্মা শুধু কেঁদেই যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, 'আমাদের বাচ্চারা যখন ঘুমায় তখন তারা বিরক্ত হবে ভেবে একটা চুল পর্যন্ত তাদের মাথায় পড়তে দেই না। আর সেই বাচ্চাদের যারা গুলি করে এবং বোমা ফাটিয়ে মারছে তাদের কাছে এই শিশুদের মৃত্যুর কোনো দামই নেই।

সবচেয়ে ভয়াবহ হামলা হয়েছিল গত জুন মাসে কোয়েটা শহরে। সেখানে একটা গার্লস স্কুলের ছাত্রীবাহী বাসে এক আত্মঘাতী বোমা হামলা চালায়। এতে চল্লিশজন ছাত্রী মারা যায়। আহতদের যে হাসপাতালে নেওয়া হয়, সেখানে তাদের চিকিৎসা করার জন্য নার্সদেরও গুলি করা হয়।

শুধু তালেবানের হামলাতেই যে শিশুরা মারা যাচ্ছে তা নয়। কখনো ড্রোন হামলা, কখনো যুদ্ধ, কখনো ক্ষুধা তাদের জীবন কেড়ে নিচ্ছে। কখনো নিজেদের পরিবারের হাতেও তাদের মরতে হচ্ছে। গত জুন মাসে সোয়াতের একটু উত্তর দিকে অবস্থিত গিলগিত এলাকায় আমার বয়সী দুইটি মেয়ে খুন করা

www.pathagar.com

হয়। স্থানীয় পোশাক পরে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে নাচ গান করে ভিডিও করে তারা তা অনলাইনে পোস্ট করেছিল। ধারণা করা হয়, তাদের সৎভাই শুধু মাত্র এই কারণে তাদের গুলি করে মেরে ফেলে।

এখন সোয়াত আগের চেয়ে অনেকটা শান্ত। কিন্তু তালেবানকে দৃশ্যত উৎখাত করার চার বছর পরও সেখানে এখনও সর্বত্র সেনাবাহিনী মোতায়েন করা আছে। ফজলুল্লাহ এখনও মুক্ত। অন্যদিকে আমাদের বাস ড্রাইভার এখনও গৃহবন্দী। এক সময় আমাদের এই উপত্যকা পর্যটকদের স্বর্গভূমি ছিল। কিন্তু এটা তাদের জন্য এখন আতঙ্কপুরী। এখানে এখন কোনো বিদেশি পর্যটককে আসতে হলে আগে তাকে ইসলামাবাদ থেকে অনাপত্তিপত্র যোগাড় করতে হয়। হোটেল এবং হস্তশিল্পের দোকানগুলো এখন ক্রেতাশূণ্য। পর্যটকদের ফিরে আসতে দীর্ঘ সময় লেগে যেতে পারে।

গত এক বছরে আমি পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছি। আমাদের উপত্যকাই আমার কাছে সবচেয়ে সুন্দর রয়ে গেছে। আবার কবে সেখানে যেতে পারব তা জানি না। তবে জানি সেখানে আমি ফিরবই। রমজান মাসে আমি বাগানে যে আমগাছটা লাগিয়েছিলাম সেটা কত বড় হয়েছে তা দেখব। আমি ভাবি, কেউ ভবিষ্যত সন্তানদের কথা ভেবে গাছটার গোড়ায় পানি ঢেলে সেটাকে বড় করছে কি না।

এখন আমি রোজ আয়নার দিকে তাকাই। কিছুক্ষনের জন্য চিন্তা করি। এক সময় আমি এক বা দুই ইঞ্চি লম্বা হওয়ার জন্য দোয়া করতাম। তার বদলে আল্লাহ আমাকে আকাশের সমান বড় করেছেন। এত উঁচু করেছেন যে আমি নিজেই আমার উচ্চতাকে ধরতে পারি না। উঁচু হওয়ার আশায় আমি একশ রাকাত নফল নামাজ পড়ার মানত করেছিলাম। এখন আমি সেই শোকরানা নফল নামাজ পড়েছি।

আমি আমার আল্লাহকে ভালোবাসি। আমি সারাদিন তাঁর সঙ্গে কথা বলি। তিনি সত্যিই মহান। মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য তিনি আমাকে উচ্চতা দেওয়ার পাশাপাশি মহান দায়িত্বও দিয়েছেন। প্রতিটি ঘরে, প্রতিটি সড়কে, প্রতিটি গ্রামে, প্রতিটি দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে– এই আমার স্বপ্ন। স্কুলে বন্ধুদের সঙ্গে চেয়ারে বসে পড়াশুনা করা আমার অধিকার। প্রতিটি মানুষের মুখে সুখের হাসি দেখাই আমার স্বপ্ন। আমি মালালা। আমার পৃথিবী বদলেছে। আমি বদলাইনি।

www.pathagar.com

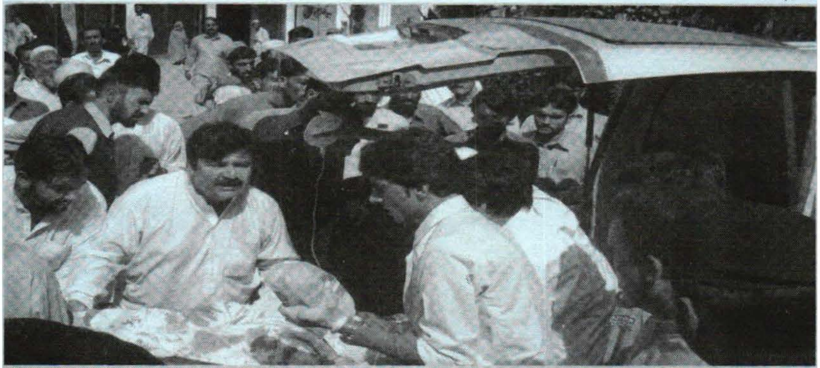

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

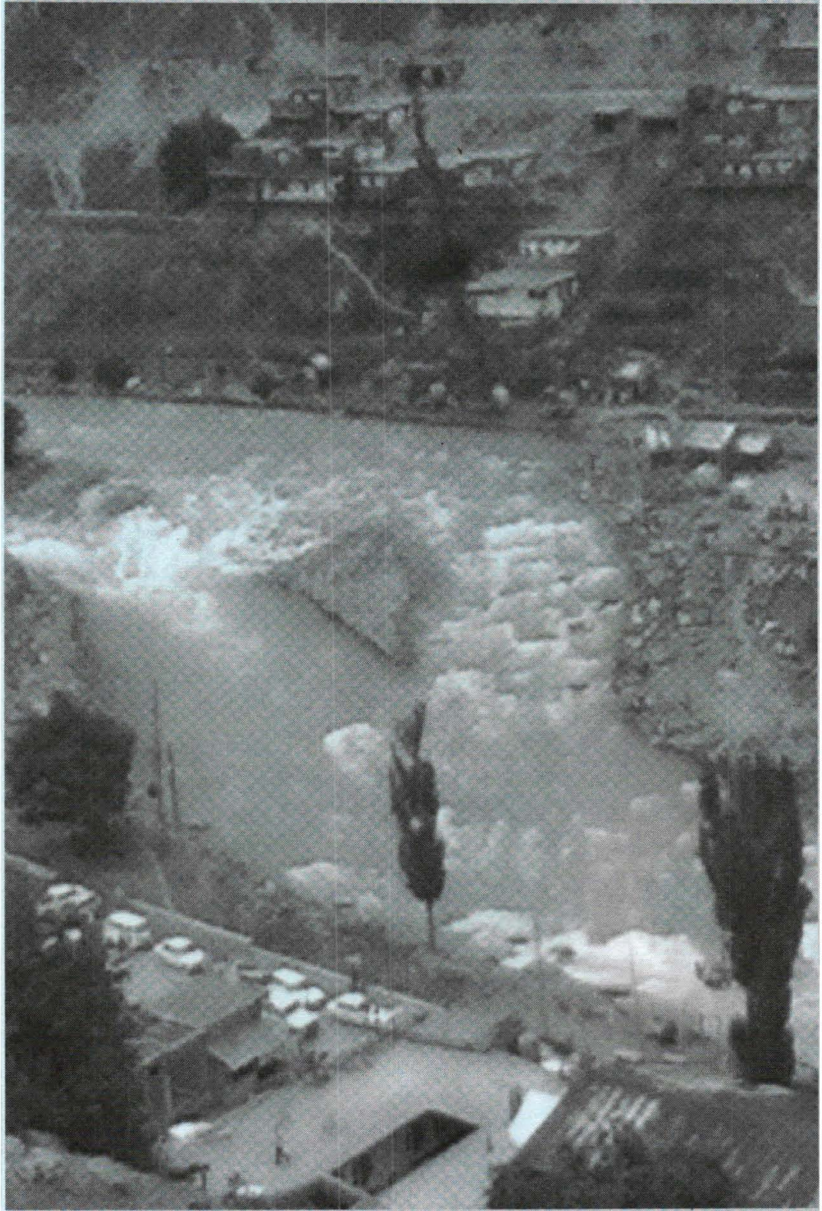

www.pathagar.com

www.pathagar.com

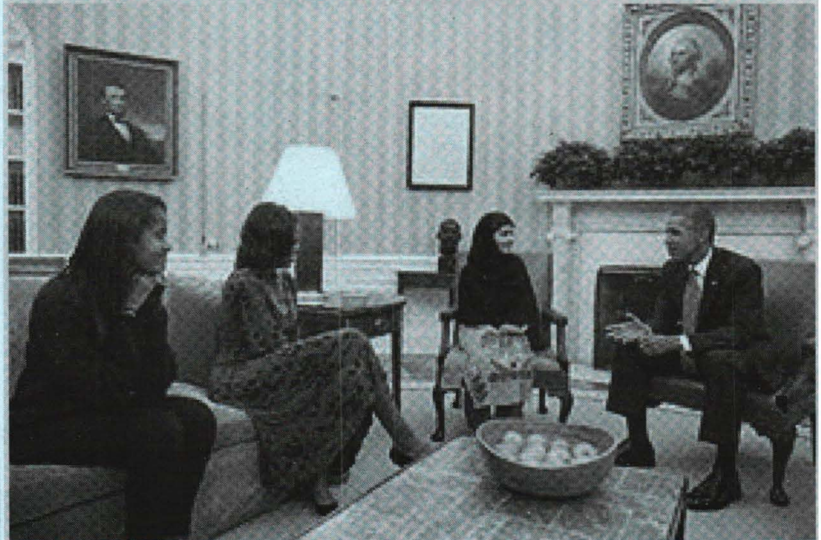

www.pathagar.com

www.pathagar.com

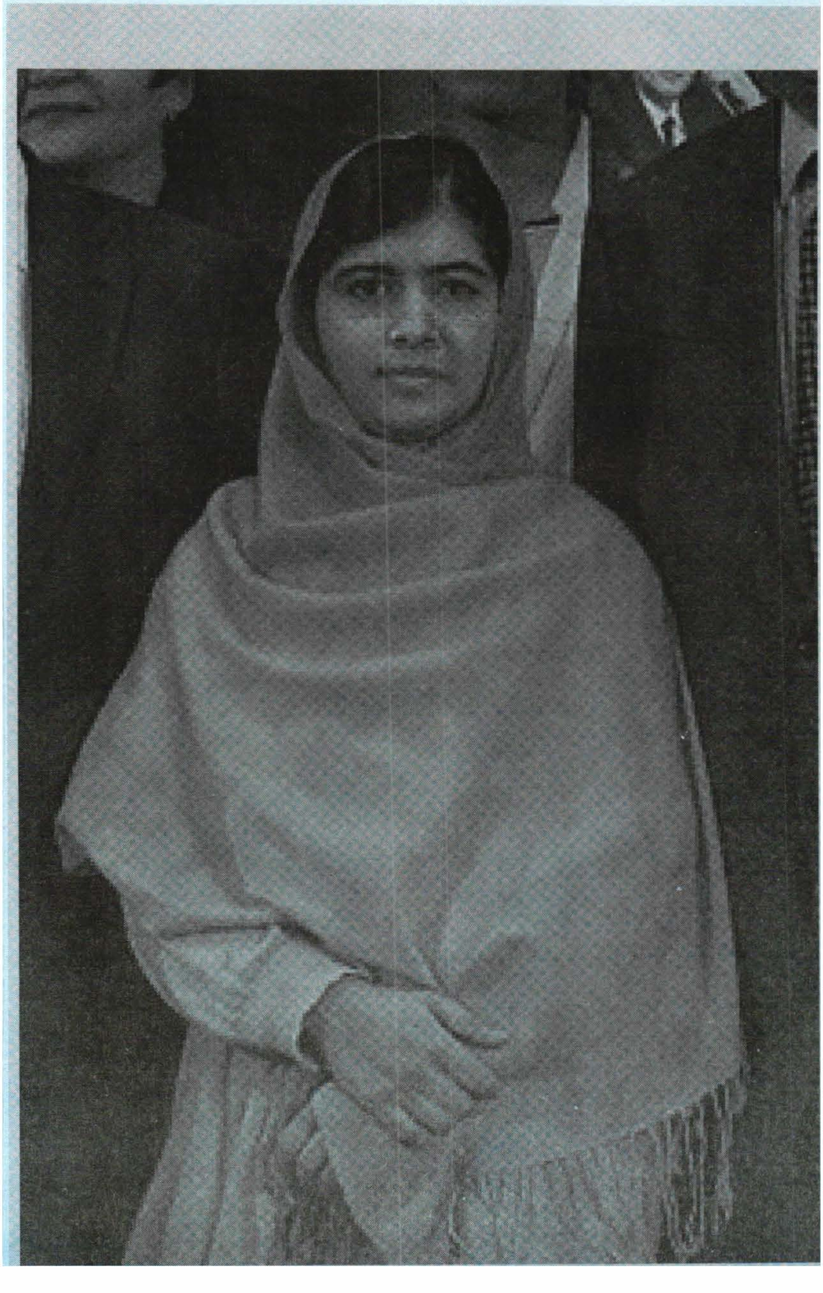

www.pathagar.com

শিশু অবস্থায়

মিঙ্গোরার বাসায় আমি। পাশে ছোটভাই খুশাল

www.pathagar.com

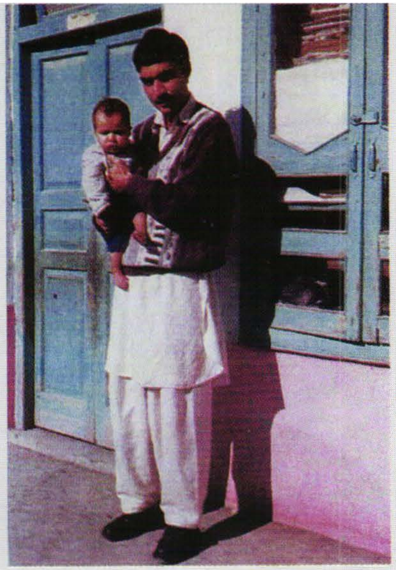

আমাদের প্রথম স্কুলভবনের বাইরে
আব্বার বন্ধু হেদায়েতুল্লাহর কোলে আমি

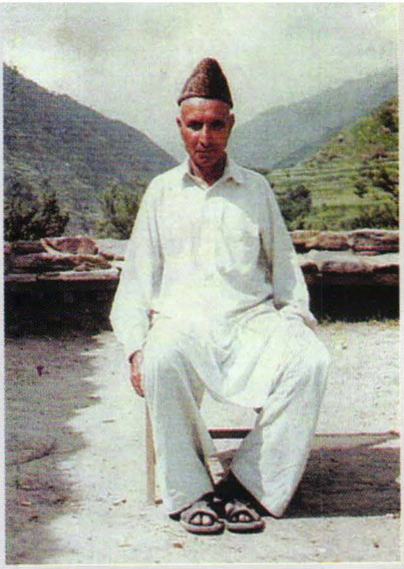

শাংলা গ্রামে আমার নানা
মালিক জানসির খান

এই বাড়িতে আব্বার শৈশব কেটেছে

www.pathagar.com

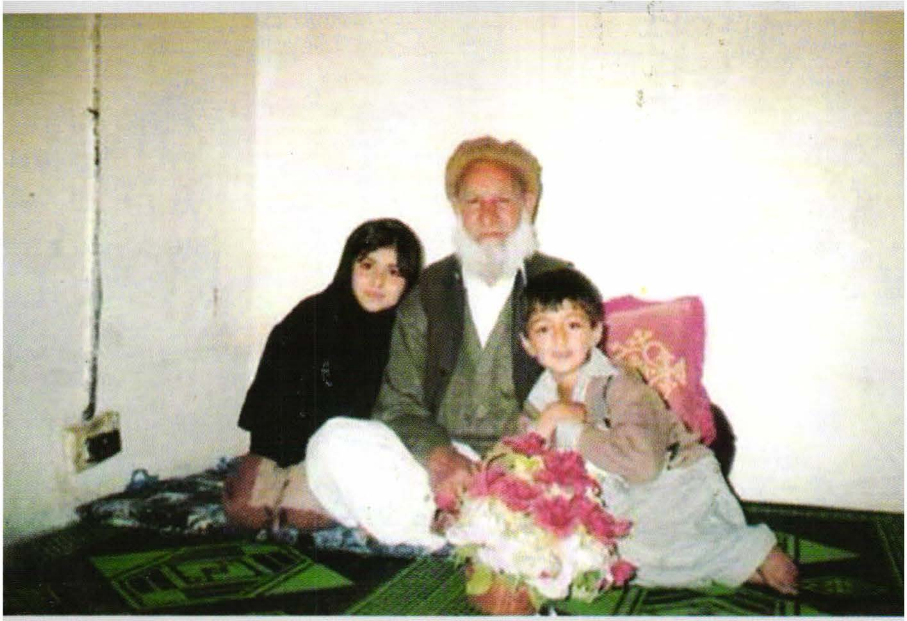

মিঙ্গোরার বাসায় দাদাজানের সঙ্গে আমি আর খুশাল

ভাই খুশালের সঙ্গে আমি

www.pathagar.com

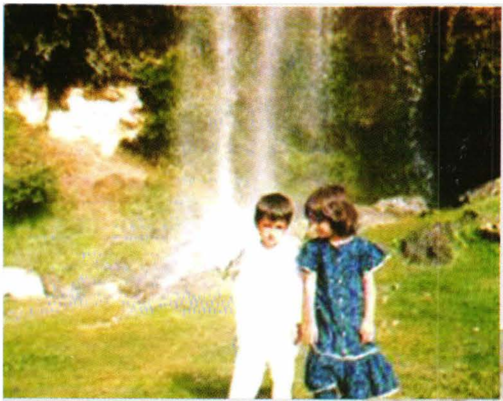

শাংলায় জলপ্রপাতের
সামনে আমি আর খুশাল

স্কুলের পিকনিকে

খুশাল স্কুলের এসেম্বলিতে মোনাজাতরত আমরা

www.pathagar.com

শুরুর দিকে ফজলুল্লাহকে লোকজন বহু অর্থ চাঁদা হিসেবে দিয়েছে

প্রকাশ্যে লোকজনকে চাবুক পেটা করতো তালেবান

www.pathagar.com

হাজী বাবা এলাকায় আত্মঘাতী
হামলায় নিহতদের সম্মানে
আয়োজিত সভায়
বক্তব্য রাখছি

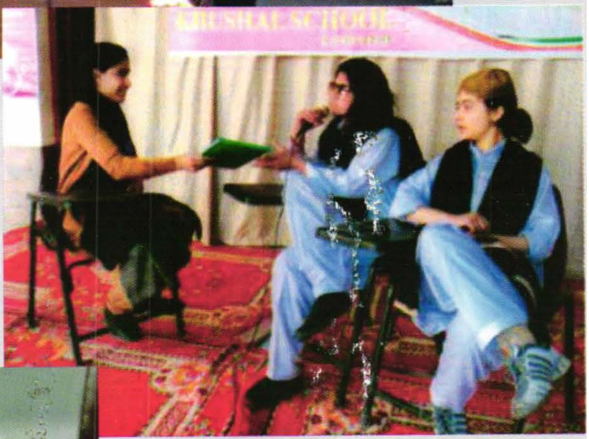

স্কুলে একটা নাটকের মহড়ায়

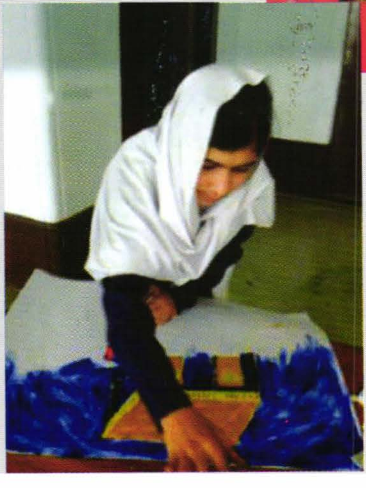

স্কুলে ছবি আঁকছি

১২ বছর বয়সে আমার আঁকা ছবি। সর্বমতের সহাবস্থানের স্বপ্ন এই ছবির মূল বিষয়

মিঙ্গোরার বাড়িতে, তুষার দিয়ে নিজের বানানো মূর্তির পাশে
আমি আর আমার ছোটভাই অটল

www.pathagar.com

স্পালবান্ডিতে বেড়াতে এসে। আব্বা এখানে থেকেই পড়াশুনা করেছিলেন

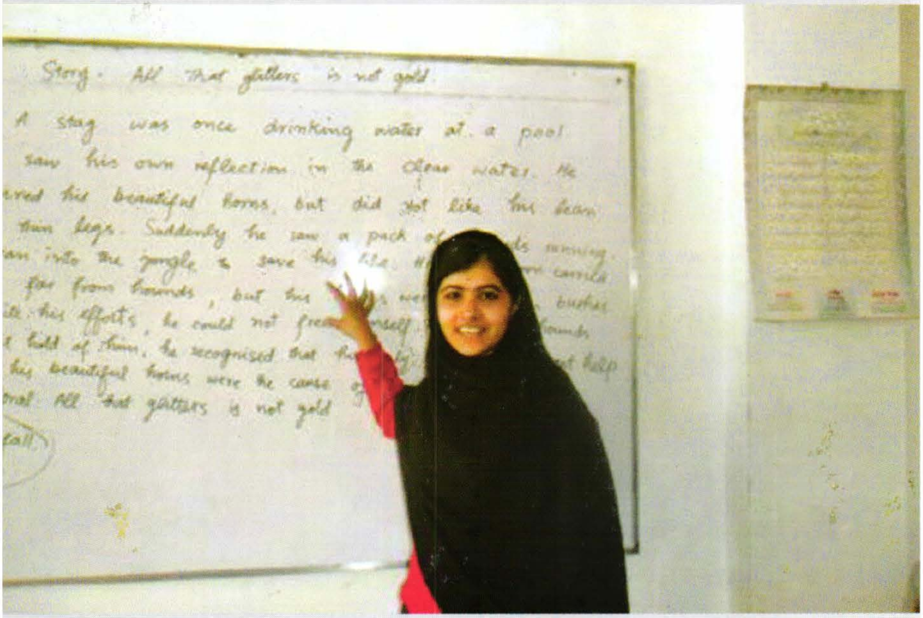

স্কুলে গল্প পড়ে শোনাচ্ছি : 'অল দ্যাট গ্লিটারস্ ইজ নট গোল্ড'

www.pathagar.com

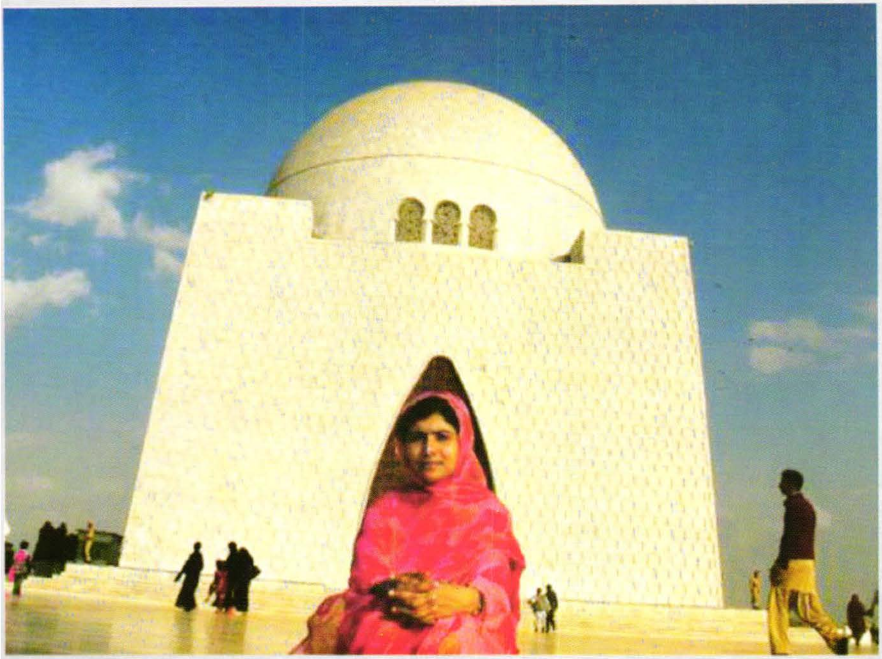

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সমাধিতে

স্থানীয় এক বৈঠকে স্থানীয় মুরুব্বীদের সঙ্গে আব্বা

www.pathagar.com

স্কুলে বোমা হামলা

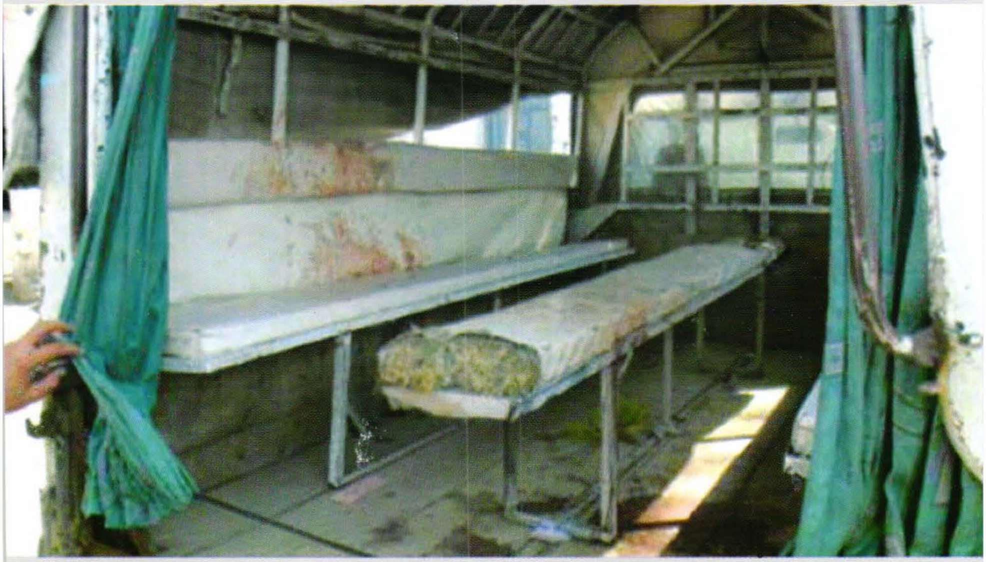

বাসের মধ্যে যে জায়গাটায় আমাকে গুলি করা হয়

www.pathagar.com

আমার চিকিৎসা করছেন ড. ফিয়োনা এবং ড. জাভিদ

বার্মিংহাম হাসপাতালে জ্ঞান ফেরার পর

www.pathagar.com

হাসপাতালে পড়ছি

আমাদের প্রধান শিক্ষিকা মরিয়ম আপা (বাঁয়ে) এবং সাজিয়া।
আমার সঙ্গে সাজিয়াকেও গুলি করা হয়েছিল

www.pathagar.com

বন্ধুরা আমার জন্য একটা চেয়ার খালি রেখেছে

খুশাল স্কুলের বালক শাখার প্রধান শিক্ষক আমজাদ
স্যার আমার ছবি স্কুলের দেওয়ালে টাঙিয়েছেন

www.pathagar.com

জাতিসংঘে বান কি মুন, গর্ডন ব্রাউন, আমার
পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের সঙ্গে আমি

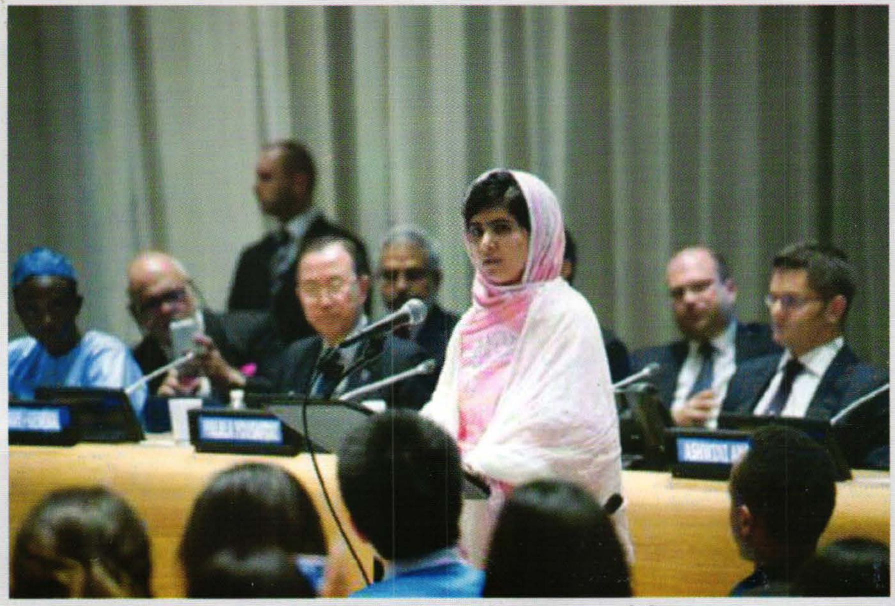

আমার ষোলতম জন্মদিনে জাতিসংঘে ভাষণ দিচ্ছি

www.pathagar.com

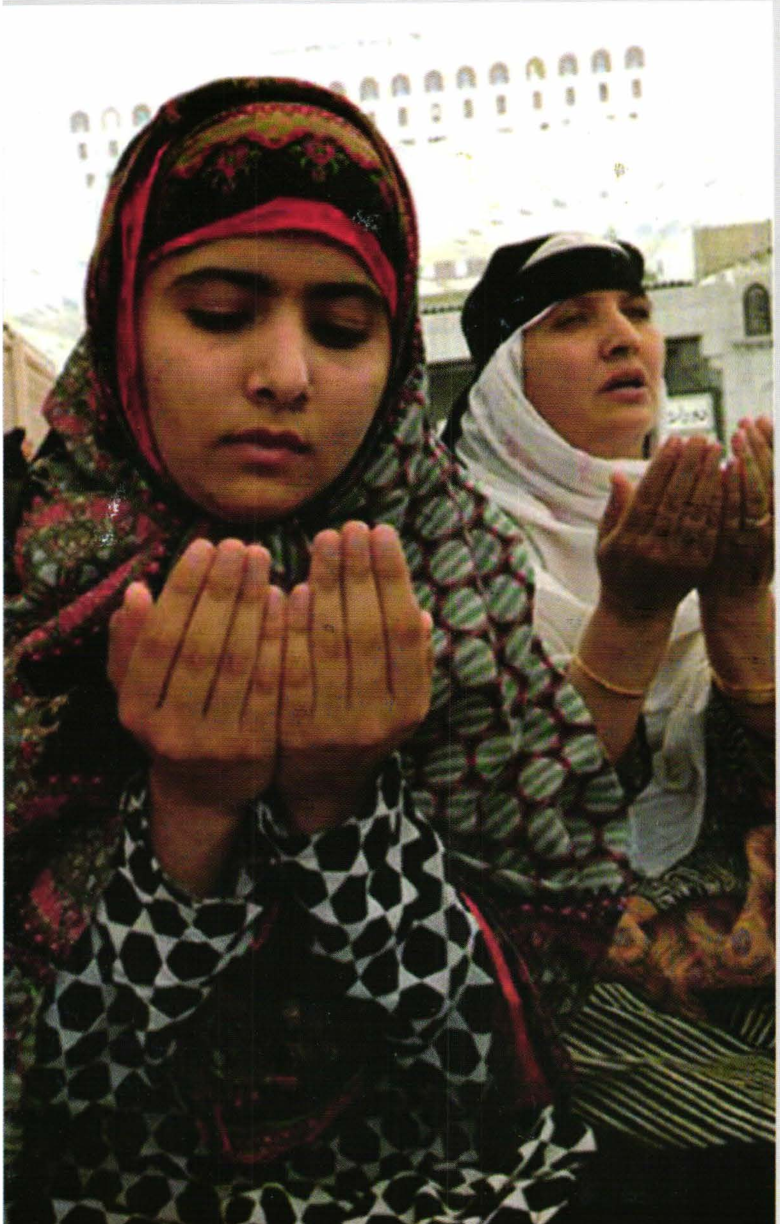

মদিনায় দোয়ারত আমি আর আম্মা

www.pathagar.com

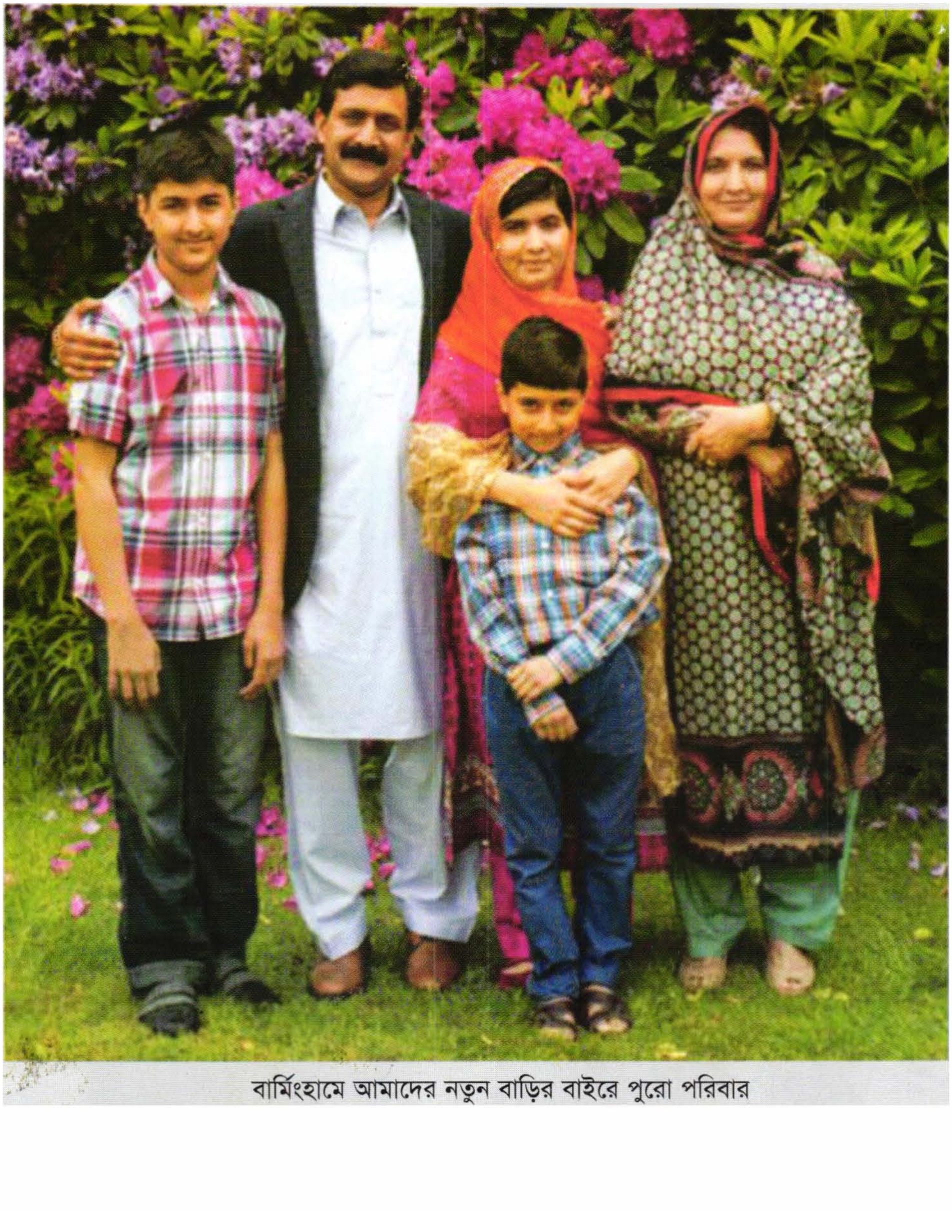

বার্মিংহামে আমাদের নতুন বাড়ির বাইরে পুরো পরিবার

www.pathagar.com

সারফুদ্দিন আহমেদ। শূণ্য দশকের গোড়াতে ছোটকাগজে কবিতা লিখতে লিখতে যাত্রা শুরু। ইংরেজি কবিতা অনুবাদ করতে গিয়ে গল্প উপন্যাস অনুবাদের লোভে পড়ে যান। অনুবাদের পাপে কবিতা প্রথমে শিকেয় উঠে এখন কোমায়। কবিতা লেখা পুরোপুরি বন্ধ। মনের পীড়নে অনুবাদ 'পাপ' এখনও চলছে। পেটের পীড়নে আজকের কাগজ, যুগান্তর ও সমকাল পার হয়ে এখন দৈনিক প্রথম আলোতে জ্যেষ্ঠ সহ-সম্পাদক (পালা প্রধান) হিসেবে কাজ করছেন।

www.pathagar.com

"যে দেশ থেকে আমি এসেছি
তার জন্ম হয়েছিল মধ্যরাতে
যখন আমি প্রায় মারা যাচ্ছিলাম
তখন সময়টা ছিল মধ্য দুপুরের ঠিক পরেই"

তালেবান যখন সোয়াত উপত্যকা কব্জায় নিল তখন মেয়েটি মুখ খুলেছিল। মালালা ইউসুফজাই চুপ থাকতে রাজী হল না। শিক্ষার অধিকারের জন্য লড়াই চালাতে লাগলো।

২০১২ সালের ৯ অক্টোবর মঙ্গলবার তাঁকে মূল্য দিতে হলো। বাসে করে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময় তার মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি করা হয়। তার বাঁচার কথা ছিল না।

কিন্তু অলৌকিকভাবে সে শুধু যে সুস্থ্য হয়ে উঠেছে তাই নয়, তার সেই বেঁচে ওঠা তাকে পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলীয় একটি প্রত্যন্ত উপত্যকা থেকে নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তরের সভাস্থল পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। মাত্র ১৬ বছর বয়সেই সে শান্তি আন্দোলনের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

পৃথিবী বদলে দেওয়ার প্রেরণা হিসেবে একজন মানুষের সোচ্চার কণ্ঠ যে কত শক্তিশালী তা আপনাকে বিশ্বাস করতে সাহায্য করবে এই বই।

'মালালা কে?'– পিস্তলধারী জিজ্ঞেস করলো।
আমিই মালালা– আর এটিই আমার 'গল্প।

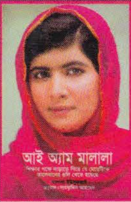

আই অ্যাম মালালা
মালালা ইউসুফজাই
অনুবাদ : সারফুদ্দিন আহমেদ
প্রচ্ছদ : মূল প্রচ্ছদ অবলম্বনে তাহমিদা খাতুন

9789845031172

www.pathagar.com